পরিমার্জিত সংস্করণ

ড. রাগেব সারজানী

তাতারীদের ইতিহাস

সম্পাদনা
মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন

অনুবাদ
মাওলানা আবদুল আলীম

লেখক পরিচিতি

ড. রাগেব সারজানী
জন্ম : ১৯৬৪ ঈ.
আল মুহাল্লা কুবরা, মিশর।

ড. রাগেব সারজানী মিশরের বিশিষ্ট ইসলামপ্রচারক, ইতিহাসবিদ ও একজন আধুনিক আরবলেখক। পেশায় মূলত তিনি একজন ডাক্তার। তবে ডাক্তারি পেশার পাশাপাশি ইসলামী ইতিহাসের গভীর গবেষণা বর্তমান পৃথিবীতে তাকে একজন বিশিষ্ট ইসলামী ইতিহাসবিদ হিসেবে পরিচিত করেছে। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করার পর পবিত্র কুরআনুল কারীম হিফজ করেন। ইসলামের প্রতি আস্থা ও ভালোবাসা, ইসলামের ইতিহাসের প্রতি দরদ ও শ্রদ্ধা—তার চোখের তারায় যে আগামীর স্বপ্ন আঁকে—সেই স্বপ্ন বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতেই তার লেখালেখি। এই স্বপ্ন ছবি হয়ে উড়ে বেড়ায় তার রচনার ছত্রে ছত্রে।

শিক্ষা

তিনি ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন অনুষদ থেকে ইউরোসার্জারি বিষয়ে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র কুরআনুল কারীম হিফজ করেন।

কর্মক্ষেত্র

অধ্যাপক : মেডিসিন অনুষদ, কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়।
সদস্য : ইন্টারন্যাশনাল মুসলিম উলামা পরিষদ।
সদস্য : মানবাধিকার শরীয়া বোর্ড, মিশর।
সদস্য : আমেরিকান ট্রাস্ট সোসাইটি।
প্রধান : ইতিহাস বিভাগ, ইদারাতুল মারকাযিল হাজারা, মিশর।

রচনাবলি

ইতিহাস ও ইসলামী গবেষণা বিষয়ে এ পর্যন্ত তার ৫৬টি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য—
কিসসাতুত তাতার [তাতারীদের ইতিহাস]
কিসসাতু উন্দুলুস [স্পেনের ইতিহাস]
কিসসাতু তিউনুস [তিউনেসিয়ার ইতিহাস]
আর রহমা ফি হায়াতির রসূল
মা'আন নাবনী খায়রা উম্মাতিন প্রভৃতি।

আমরা তাঁর সুস্থ সুন্দর দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

তাতারীদের ইতিহাস

তাতারীদের ইতিহাস

মূল
ড. রাগেব সারজানী

অনুবাদ
মাওলানা আবদুল আলীম
উস্তাযুল হাদীস, আল জামিয়াতুল
ইসলামিয়া ইদারাতুল উলূম আফতাবনগর, ঢাকা

সম্পাদনা
মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন
সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া
মুহাম্মদপুর, ঢাকা

উৎসর্জন

ইমাম কুতয

আমাদের নায়ক নয়, মহানায়ক।
আমাদের চেতনা ও আদর্শের অমর তেজস্বী শিক্ষক!!
হায়! এ যুগে যদি কোনো কুতযের আবির্ভাব হোতো!

—আবদুল আলীম

সম্পাদকের কথা

ড. রাগেব সারজানী একজন আধুনিক আরবলেখক। ইসলামের প্রতি আস্থা ও ভালোবাসা, ইসলামের ইতিহাসের প্রতি দরদ ও শ্রদ্ধা—তার চোখের তারায় যে আগামীর স্বপ্ন আঁকে—সেই স্বপ্ন বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতেই তার লেখালেখি। এই স্বপ্ন ছবি হয়ে উড়ে বেড়ায় তার রচনার ছত্রে ছত্রে।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয় বর্বর তাতারীদের ঘৃণ্য জঘন্য ইতিহাস। লেখক প্রতিষ্ঠিত সত্যের পাটাতনে দাঁড়িয়ে বলে গেছেন ইতিহাসের দাস্তান। সেই সঙ্গে ইসলামের শাশ্বত বিশ্বাস বরিত চরিত্র এবং মুসলমানদের রক্তে নির্মিত ঐতিহ্য ও আদর্শের প্রতি যত্নবান থেকেছেন পূর্ণ সতর্কতায়। লেখকের গদ্য শক্তিমান ও প্রাঞ্জল। আরবী আধুনিক এবং বর্ণনাভঙ্গি ঋজু। ইতিহাসের গ্রন্থ বলে শব্দব্যবহারে ভাষাপ্রাচুর্যও লক্ষণীয়। সবমিলিয়ে *তাতারীদের ইতিহাস* একটি বর্ণাঢ্য রচনা।

দুই.

উত্থান-পতনই এই পৃথিবীর জীবনছন্দ এবং যুদ্ধে পরাজয় কোনো বীরের জন্যে সাময়িক অপমান হতে পারে, আবার সেটাই হতে পারে তার জাতির জন্যে বিজয়ের পাঠ ও পাঠশালা। যেকোনো সভ্য জাতির জন্যে ইতিহাস-ঘনিষ্ঠতার এবং ইতিহাস-মুখিতার রহস্যও হয়তো এটা। তাই যে জাতি তার পেছনের ইতিহাস সংরক্ষণ করে না, পড়ে না, চর্চা করে না—সে জাতি কোনো দিন বুক টান করে দাঁড়াতে পারে না। এ কারণেই আমাদের পূর্বসূরি মনীষীগণ শত্রুর কয়েদখানায় বসেও জিহাদের দাস্তান লেখতে ভোলেননি। কয়লার কালিতে, কাফনের কাপড়ে ইতিহাস লেখার ইতিহাস তো আমাদেরই।

তিন.

মাওলানা আবদুল আলীম অসামান্য মেধাবী এক তরুণ। ঈর্ষণীয় প্রতিভার অধিকারী এই তরুণ আলেম। ভেবে দেখেছি—কলমই তার যথার্থ জগৎ। আধুনিক এই আরবী গদ্যের অনুবাদে তিনি আমাকে আশান্বিত করেছেন। আমি তার অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। আমাদের তরুণ পাঠকগণ এই বই পড়ে অনুবাদ নয়—মৌলিক গদ্যের স্বাদ পাবেন ইনশাআল্লাহ। আর পড়তে পড়তে কখনও বা কাতর হবেন বেদনায়, আবার কখনওবা মনের অজান্তেই প্রবল ক্ষোভে মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠবে হাত।

বড় আনন্দের কথা, জাতির কর্ণধার আলেমসমাজ কলমের নেতৃত্বে শক্ত-পোক্তভাবে দাঁড়াতে শুরু করেছেন। তাদের বহুরৈখিক রচনাসম্ভার এবং দৃষ্টিনন্দন প্রকাশনার মুখ দেখে শয়তানপাড়ায় গাত্রদাহ শুরু হয়েছে আরও আগেই। আমাদের সৃজনশীল এই সত্যসংগ্রামে বাণিজ্য নয়—আদর্শের শপথে যারা সময় স্বপ্ন সম্পদ অবারিত হাতে বিলিয়ে যাচ্ছেন তাদের মধ্যে মাকতাবাতুল হাসান পরিবার অন্যতম।

এই গ্রন্থ তার বিষয় তথ্যশক্তি টার্গেট এবং ভাষার সৌকর্যে আমাদের বাঙলা সাহিত্যে একটি উত্তম সংযোজন বলে বিবেচিত হবে—ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ দয়াময় এর লেখক প্রকাশককে কবুল করুন। আর অনুবাদক প্রিয় আবদুল আলীমকে ঠাঁই দিন তার প্রিয় কলমসৈনিকদের বরিত কাফেলায়। আমীন ॥

ঢাকা
১৭. ০৪. ২০১৬ ঈ.

দোয়ার মোহতাজ
মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন

অনুবাদকের কথা

قصة التتار... *[তাতারীদের ইতিহাস]* গ্রন্থটি ষষ্ঠ শতাব্দীর মুসলিম সাম্রাজ্যের ওপর ধেয়ে আসা তাতারী আগ্রাসনের ইতিহাস নিয়ে রচিত একটি অনবদ্য গ্রন্থ। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ড. রাগেব সারজানী গ্রন্থটি রচনা করেছেন। গ্রন্থটিতে তাতারীদের বিস্তারিত ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে তাতারী হামলার প্রেক্ষাপট, কারণ, ফলাফল, মুসলমানদের ঘুরে দাঁড়াবার বিস্তারিত বিবরণ।

সত্যিই মুসলিম উম্মাহর ওপর পৃথিবীর ইতিহাসে যত বিপদ-দুর্যোগ নেমে এসেছিল, তার মধ্যে পৈশাচিক বর্বর পাষণ্ড তাতারী জাতির হামলাই ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ ও হৃদয়বিদারক। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনুল আছীর রহ. তাতারী হামলার ইতিহাস লিখতে গিয়ে তার মনঃকষ্ট চেপে রাখতে পারেননি। তিনি বলেন—

> "কতিপয় বন্ধুর দাবি, আমি এই ঘটনা ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষণ করি। কিন্তু তাতারী হামলার ইতিহাস এতটাই লোমহর্ষক ও হৃদয়বিদারক যে, তা আমি লিখব কী লিখব না, কয়েক বছর এই দ্বিধাদ্বন্দ্বেই ছিলাম ... নারী পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ কারো প্রতিই এই পশুরা দয়া করেনি। যাকে পেয়েছে তাকেই হত্যা করেছে। গর্ভের সন্তান পর্যন্ত।"[১]

ইবনে কাছীর রহ. বলেন—

> "চল্লিশ দিন পর্যন্ত বাগদাদে গণহত্যা ও লুটতরাজ অব্যাহত ছিল। হাট-বাজারে, অলিতে-গলিতে লাশের স্তূপ পড়ে ছিল। লাশপচা গন্ধে সারা শহরে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল। অসংখ্য মানুষ এই মহামারিতে মারা যায়।"[২]

---

[১] *আল কামিল* : ১০/২০২-২০৩।

[২] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া।*

একপর্যায়ে অর্ধপৃথিবী তাতারীদের গোগ্রাসে পরিণত হয়েছিল। সবার মাঝে এই বদ্ধমূল ধারণা জন্ম নিয়েছিল যে, 'তাতারীরা অপরাজেয়'। তাদের পরাজিত করা সম্ভব নয়।

তবে মাত্র ১০ মাসের পরিশ্রম ও সুলতান সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এর লিল্লাহিয়াত ও একনিষ্ঠতা, তাকওয়া ও খোদাভীরুতার অসিলায় আল্লাহ রব্বুল আলামীন 'আইনে জালুত' নামক স্থানে তাতারীদের পরাজিত করেন। সুলতান সাইফুদ্দীন কুতয রহ. শুরু করে দিয়েছিলেন। তারপর জহির বাইবার্স বেশ কয়েকবার তাতারীদের পরাজিত করেন এবং পর্যায়ক্রমে সমগ্র সিরিয়া মিশর থেকে তাদের পরাজিত করেছেন।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে তাতারীদের উত্থান-পতন ও মুসলমানদের পতন-উত্থানের দীর্ঘ ইতিহাস ও কারণ বিবৃত হয়েছে। বর্তমান মুসলিমবিশ্ব যদি সত্যিকার অর্থে এই ইতিহাস মোতাবেক নিজেদের গঠন করে, তবে আজও ইসলাম সমগ্র বিশ্বে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াবে ইনশাআল্লাহ!

শুকরিয়া জ্ঞাপন

উসতাযে মুহতারাম মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীনকে। আল্লাহ তা'আলা নিজ শান মোতাবেক তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। হুজুরের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও দক্ষ কলমের সম্পাদনায় বইটি অসাধারণ চমৎকারিত্ব লাভ করেছে। আল্লাহ তা'আলা হুজুরকে দীর্ঘজীবি করুন। তার রচনাসম্ভার ও ভাষার সৌকর্যের মাধ্যমে পাঠকসমাজকে কেয়ামত পর্যন্ত উপকৃত করুন।

মাকতাবাতুল হাসান মাদানীনগর এর সত্বাধিকারী রাকিবুল হাসানকে আল্লাহ তা'আলা জাযায়ে খায়ের দান করুন। তার উদারহস্ত সম্প্রসারিত না হলে হয়তো কিতাবটি অনুবাদ করা অধমের পক্ষে সম্ভব হতো না।

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন বইটির লেখক-সম্পাদকসহ প্রকাশনাসংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করুন এবং আমি অধমকেও। আমীন ॥

১৩.০৪.২০১৬ ঈ. আবদুল আলীম

পরিমার্জিত সংস্করণের ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ! ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তা'আলার অশেষ কৃপায় *তাতারীদের ইতিহাস* বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ বের হতে যাচ্ছে। পাঠকমহলের আগ্রহ উচ্ছ্বাস আর ভালোবাসায় আমরা আপ্লুত। বইটি পড়ে অনেক ভাই তাদের অনুভূতি, ভালোলাগা ও ভালোবাসার কথা আমাদের জানিয়েছেন। পাশাপাশি সুপরামর্শ দিয়েও বাধিত করেছেন। তাদের সবার পরামর্শের ভিত্তিতে বইটির পরিমার্জিত সংস্করণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

বইটির পরিমার্জিত সংস্করণও ব্যাপক সমাদৃত হোক। এই কামনায়—

দুআর মোহতাজ

আবদুল আলীম

১৫.১১.২০১৬ ঈ.

আমি সেই দিনের স্বপ্ন দেখি...

আমি সেদিনের স্বপ্ন দেখি, যেদিন ভূপৃষ্ঠের মুসলিম-অমুসলিম সবার কাছে ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস পৌঁছবে। যেন সবাই জানতে পারে, ইসলামধর্ম পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম ইতিহাস রচনা করেছে এবং সবাই একথাও জানতে পারে, মুসলিম জাতির শিকড় এত গভীর, যার গভীরতা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। ইতিহাসের পাঠকমাত্রই যেন উপলব্ধি করতে পারে, মুসলিম উম্মাহ ততদিন পর্যন্ত সজীব ও প্রাণবন্ত থাকবে যতদিন ভূপৃষ্ঠে 'জীবন' থাকবে এবং শীঘ্রই তারা গোটা পৃথিবীর নেতৃত্ব লাভ করবে, যেমনটি পূর্বে লাভ করেছিল।

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰٓى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

"নিজ কাজে আল্লাহ পূর্ণ ক্ষমতাবান, কিন্তু বহু মানুষ তা জানে না।"[৩]

ড. রাগেব সারজানী

[৩] সুরা ইউসুফ : ২১।

সূ। চি। প। ত্র।

ইতিহাসের মঞ্চে তাতারী শক্তির উত্থান

তাতার বাহিনীর প্রথম আক্রমণ

তাতারীদের দ্বিতীয় আক্রমণ

তাতারীদের তৃতীয় আক্রমণ

বাগদাদ পতন

সিরিয়া আক্রমণ

দাস [মামলুক] বংশের উত্থান

আইনে জালুতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ

আইনে জালুত

আইনে জালুতের যুদ্ধ থেকে শিক্ষণীয় বিষয়াদি

আইনে জালুতে বিপুল সহযোগিতা লাভের কারণ

উম্মাহর ব্যাধি ও আল্লাহর মদদ লাভের উপায়

লেখকের ভূমিকা

إن الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، أما بعد..

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন সৃষ্টিজীবের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে পৃথিবী পরিচালনার এমন কতিপয় নীতিমালা স্থাপন করেছেন, যা অপরিবর্তনশীল। এসব নীতিমালার ভিত্তিতেই মানবজীবন টিকে থাকে এবং মানুষ নিজ কাজ-কর্ম ও চলাফেরায় এসব নীতিমালার ওপরই নির্ভর করে থাকে। যদি প্রত্যেক যুগ কিংবা প্রত্যেক স্থানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র নীতিমালা থাকত, তবে মানবজীবন অস্থিতিশীল হয়ে পড়ত এবং পূর্ববর্তী সকল ইতিহাস ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতো।

কিন্তু মহান আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ ও কৃপায় ইতিহাস কখনো ধ্বংস হয় না; বরং গতকাল আপনার সঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছে আজ তার পুনরাবৃত্তি ঘটে, আজ যা সংঘটিত হচ্ছে কাল তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকবে।

ইতিহাস পাঠের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি

সুতরাং পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহ বারংবার পুনরাবৃত্ত হতে থাকে এবং বাহ্যত তা কখনো কখনো একই রকম হয়ে থাকে। যেন তা ভূ-পৃষ্ঠে নতুন কোনো ঘটনা নয়। তাই আমরা যখন ইতিহাস পাঠ করে এ কথা জানতে পারি যে, বর্তমান সময়ের কোনো ঘটনা পূর্ববর্তী কোনো ঘটনার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল, তখন আমাদের পক্ষে ঘটনাটির শেষ পরিণতি ও ফলাফল উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব। সুতরাং সংঘটিত ঘটনাটি যদি কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক হয়, তবে আমরা সেই পথ ও পন্থা অবলম্বন করব, যেই পথে পরিচালিত হয়েছেন পূর্ববর্তীগণ।

পক্ষান্তরে সংঘটিত ঘটনাটি যদি লজ্জাজনক, অশুভ ও পরাজয়মূলক হয়, তবে আমরা পূর্ববর্তীদের ভুল কর্মপন্থা থেকে বিরত থাকব এবং তাদের পরাজয় ও লজ্জার পথ পরিহার করব।

এই পদ্ধতিতে ইতিহাস পাঠ করলে ইতিহাস প্রাণবন্ত ও সজীব হয়ে ওঠে। আপনি ইতিহাস পাঠ করবেন প্রতিক্রিয়াশীল হওয়ার জন্য; কেবল সান্ত্বনালাভ কিংবা ইতিহাসবিদ হওয়ার জন্য ইতিহাস পাঠ করবেন না। এই পদ্ধতিতে ইতিহাস পাঠের সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। তা হলো ইতিহাসের ফাঁকে ফাঁকে ছত্রে ছত্রে ইবরত ও শিক্ষা অনুসন্ধান করা। এই বিষয়টি মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন কোরআনে কারীমে এভাবে এরশাদ করেন—

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

'নিশ্চয় তাদের ঘটনায় বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে শিক্ষা গ্রহণের উপাদান।'[৪]

এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা কোরআনে কারীমের এক-তৃতীয়াংশে ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছেন। যাতে পূর্ববর্তী জাতিদের সঙ্গে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের রীতিনীতি সম্পর্কে মুসলমানগণ অবগত হন এবং একথা নিশ্চিত বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তা'আলার এ সকল রীতিনীতি অবধারিত ও অপরিহার্য। এর ফলে তারা কোনো ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তার পরিণাম সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবে এবং তা থেকে উপকৃত হতে পারবে। তবে প্রতিটি ঘটনা যাবতীয় দিক পাঠ করা এবং তা দিয়ে উপকৃত হওয়ার এবং শিক্ষা গ্রহণের এই মহামূল্যবান দক্ষতা অর্জন অসম্ভব। এ কারণেই মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন এরশাদ করেন—

فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

'সুতরাং (হে নবী,) তুমি তাদের এসব ঘটনা শোনাতে থাকো, যাতে তারা কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করে।'[৫]

বক্ষ্যমাণ কিতাবটিতে আমাদের সামনে রয়েছে মুসলিম ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি ইতিহাস; বরং এভাবে বললে অত্যুক্তি হবে না যে, সর্বদিক

---

[৪] সুরা ইউসুফ : ১১১।
[৫] সুরা আ'রাফ : ১৭৬।

বিবেচনায় পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস আমাদের সামনে বিদ্যমান।

তা হলো হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে ভূপৃষ্ঠে আবির্ভূত একটি শক্তিধর নব পরাশক্তির উত্থানের ইতিহাস। এই পরাশক্তির আবির্ভাব পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন সাধন করে, বিশেষত মুসলিম সাম্রাজ্যের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে।

যেই পরাশক্তির নাম তাতারী সাম্রাজ্য

আপনি যেভাবেই তুলনা করুন না কেন, বস্তুত তাতারী ইতিহাস এমন এক ইতিহাস, ইতিহাসশাস্ত্রে যদি তা সংরক্ষিত না থাকত এবং পৃথিবীর অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে যদি তার কোনোরূপ মিল না থাকত, তাহলে আমরা তাতারীদের ইতিহাসকে কল্পনাপ্রসূত কিংবা কল্পনার উর্ধ্বে মনে করতাম।

সত্যিই তাতারীদের ইতিহাস এক বিস্ময়কর ইতিহাস। কারণ, সে সময় খুব অল্প সময়ে একটি দুর্বল জাতি পৃথিবীর পরাশক্তিতে পরিণত হয় অথবা একটি পরাশক্তি দুর্বল জাতিতে পরিণত হয়। মাত্র কয়েক বছরের মাঝে আল্লাহ রব্বুল আলামীন একটি সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করেন এবং আরেকটি সাম্রাজ্যকে অপদস্থ করেন। অতঃপর কয়েক বছর অতিবাহিত হতে না-হতেই পূর্ববর্তী সম্মানিত সাম্রাজ্যকে অপদস্থ করেন এবং দ্বিতীয় জাতিকে সম্মানিত করেন!!

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ
مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"(হে নবী,) বলো, হে আল্লাহ, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক! তুমি যাকে চাও ক্ষমতা প্রদান করো, যার থেকে চাও ক্ষমতা কেড়ে নাও। যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করো এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করো। সমস্ত কল্যাণ তোমারই হাতে। নিশ্চয়ই তুমি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।"[৬]

সংখ্যাধিক্যের অতিশয়তার দিক থেকেও তাতারীদের ইতিহাস অতি বিস্ময়কর। যথা—নিহতের সংখ্যা, সৈন্যসংখ্যা, অধঃপতিত শহরের সংখ্যা, দখলকৃত বিস্তীর্ণ ভূমির সংখ্যা এবং জুলুম ও অত্যাচারের সংখ্যা ইত্যাদি।

---

[৬] আলে ইমরান : ২৬।

অনুরূপ তাতারীদের ইতিহাস ও বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যকার পূর্ণাঙ্গ সামঞ্জস্যের দিক থেকেও তাতারীদের ইতিহাস অতি আশ্চর্যজনক।

সুবহানাল্লাহ!

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন পৃথিবী পরিচালনার রীতিনীতি এবং ইতিহাস পুনরাবৃত্তির রহস্য স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। ফলে বর্তমান সময়ের সংঘটিত ঘটনাসমূহকে হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে ঘটে যাওয়া ঘটনার সঙ্গে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ বানিয়েছেন। ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করলে অন্যান্য ঘটনার সঙ্গেও আমরা বর্তমান পৃথিবীর মিল খুঁজে পাব।

এ কারণেই ইতিহাসের পাঠকমাত্রই খুব সহজে ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থার মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে এবং ভূপৃষ্ঠ ও সৃষ্টিজীব পরিচালনায় মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের রীতিনীতি উদ্‌ঘাটন করতে পারে।

তাতারীদের ইতিহাস সবিস্তার আলোচনা করা এবং তাতারী জাতির সকল দিক উল্লেখ করা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটির উদ্দেশ্য নয়; কারণ এতে গ্রন্থ দীর্ঘাকার ধারণ করবে; বরং আমি কেবল শিক্ষণীয় ঘটনাবলি, সেকাল ও একালের সামঞ্জস্যপূর্ণ দিক এবং দ্রুত অধঃপতন ও সাহায্য লাভের কারণসমূহ আলোচনা করব। যে ব্যক্তি এ বিষয়ে বিস্তারিত পড়াশুনা করতে ইচ্ছুক, সে যেন এ বিষয়ে লিখিত ইতিহাসশাস্ত্রের বিশাল ও বিপুল তথ্যসমগ্রের শরণাপন্ন হয়, যা দিয়ে ইসলামী পাঠাগারসমূহ ভরপুর।

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে আমি দোয়া করি, তিনি যেন এই বিস্ময়কর ইতিহাসের প্রতিটি পাতা, প্রতিটি বাক্য; এমনকি প্রতিটি অক্ষরের মাধ্যমে আমাদের উপকৃত করেন। —আমীন ॥

ড. রাগেব সারজানী

ইতিহাসের মঞ্চে তাতারী শক্তির উত্থান

হিজরী সপ্তম শতাব্দীর শুরুর দিকে তাতারী শক্তির উত্থান ঘটে। যে প্রেক্ষাপটে তাতারী শক্তির উত্থান ঘটেছিল, তা বোঝার জন্য তৎকালীন বিশ্বের সার্বিক অবস্থার কিয়ৎ আলোকপাত করা আবশ্যক।

তৎকালীন বিশ্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, তখনকার বিশ্বশক্তি দুটি শক্তিতে বিভক্ত ছিল।

এক. মুসলিম পরাশক্তি

তৎকালীন মুসলিম ভূখণ্ড প্রায় অর্ধ পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত ছিল। চীন থেকে শুরু করে এশিয়া, আফ্রিকা মহাদেশ হয়ে ইউরোপের স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

মূলত মুসলিম ভূখণ্ড ছিল আদিগন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূখণ্ড। কিন্তু এই সুবিশাল মুসলিমবিশ্বের অধঃপতন ছিল বড়ই বেদনাদায়ক। সুবিশাল বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড, অগণিত জনসংখ্যা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান, অস্ত্র-শস্ত্র, ধন-সম্পত্তির বিপুলতা সত্ত্বেও তখন মুসলিমবিশ্বে বিরাট বিভেদ বিরাজমান ছিল। রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল বিরাট অবক্ষয়ের শিকার। আরও বড় আশ্চর্যের বিষয় হলো, মুসলিমবিশ্বের এই অধঃপতন হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ কয়েক বছরে সৃষ্টি হয়েছিল, যখন মুসলিম পরাশক্তি ছিল বিশ্বের একক পরাশক্তি। কিন্তু এ তো মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন কর্তৃক পূর্ব-নির্ধারিত নীতি। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন—

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

"এ তো দিন-পরিক্রমা, যা আমি মানুষের মাঝে পালাক্রমে বদলাতে থাকি।"[৭]

আমরা হিজরী সপ্তম শতাব্দীর শুরুর দিকের মুসলিমবিশ্বের দিকে একটু তাকাই।

---

[৭] সুরা আলে ইমরান : ১৪০।

১. আব্বাসী শাসনামল

আব্বাসী শাসনামল ছিল মুসলিমবিশ্বের প্রাচীনতম শাসনামল। ১৩২ হিজরীতে উমাইয়া শাসনামলের অধঃপতনের পর আব্বাসী শাসনামল শুরু হয়। দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী পর আব্বাসী শাসন হিজরী সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। বস্তুত তখন ইরাক ব্যতীত অন্য কোনো অঞ্চলে তাদের কর্তৃত্ব ছিল না। ১৩২ হিজরীতে ইরাকের রাজধানী বাগদাদকেই আব্বাসী শাসনের শাসনাধীন অঞ্চল মনে করা হতো। তা ছাড়া তখন বাগদাদের চারপাশে আরও আট-দশটি শক্তির উত্থান ঘটেছিল, যারা ইসলামী খেলাফতের অনুগামী ছিল না। তবে তারা স্পষ্টভাবে আব্বাসী খেলাফতের বিরোধিতার ঘোষণাও করত না। আপনি চাইলে বলতে পারেন, আব্বাসী খেলাফত তখন বাহ্যত খেলাফতের আকৃতি ধারণ করেছিল, মূলত তা খেলাফত ছিল না। আব্বাসী খেলাফত সেই প্রতিচ্ছবির আকার ধারণ করেছিল, মুসলমানরা যা স্থায়ী হওয়ার কামনা করত। যদিও তখন তার উল্লেখযোগ্য কোনো সাম্রাজ্য ছিল না। যেমন বর্তমানে ইংল্যান্ডে ইংরেজ জাতির রাজত্ব ঐতিহাসিক প্রতিচ্ছবির আকার ধারণ করেছে, রাজতন্ত্রে উল্লেখযোগ্য কোনো ক্ষমতা তাদের হাতে নেই। পক্ষান্তরে আব্বাসী খলিফা ইরাকের উত্তর অংশ ব্যতীত কার্যত ইরাক অঞ্চলের রাজত্ব পরিচালনা করত।

ইরাক ভূখণ্ডে বনি আব্বাসের খলিফাগণ পর্যায়ক্রমে একের পর এক রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। তারা 'খলিফা' নামক মহান উপাধি ধারণ করতেন। কিন্তু হিজরী সপ্তম শতাব্দীর পরবর্তী সময়ে আর কখনো তারা এই উপাধি ধারণ করেননি এবং এই মহান উপাধিতে ভূষিত হওয়ার কোনো মনোবাসনা তারা রাখতেন না। ধন-সম্পত্তি পুঞ্জিভূতকরণ ও গোটা দুনিয়া ছেড়ে ইরাকের নির্দিষ্ট একখণ্ড ভূমিতে নিজেদের রাজত্বকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরাই ছিল তাদের একমাত্র মনোবাসনা ও আকাঙ্ক্ষা। তারা একবারের জন্যও নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের দিকে বিশুদ্ধ চোখে তাকায়নি। এ বিষয়ে তাদের জ্ঞানও ছিল না যে, একজন রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রের আমানত পরিপূর্ণভাবে আদায় করা, সৈন্যবাহিনীকে শক্তিশালী করা, প্রজাদের সম্মানের জীবনযাপন সুনিশ্চিত করা, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া, নির্যাতিত নিপীড়িতদের হক আদায় করা, ক্ষতিপূরণ করা, অত্যাচারীদের শাস্তি প্রদান করা, প্রজাদের মাঝে আল্লাহর বিধান কায়েম করা, সৎকাজের আদেশ ও

অসৎ কাজে বাধাপ্রদান করা এবং মানুষের হৃদয়আত্মাকে আল্লাহর একত্ববাদের গুণে গুণান্বিত করা।

তৎকালীন আব্বাসী খলিফাদের মাঝে উল্লেখিত গুণাবলি ছিল অবিদ্যমান। তারা ছিল দায়িত্ববোধহীন। রাজ-সিংহাসনকে যথাসাধ্য স্থায়ীকরণ ও নিজেদের উত্তরসূরিদের রাজত্বের ওয়ারিশ বানানোই ছির তাদের মূল লক্ষ্য। অনুরূপ অঢেল ধন-সম্পত্তি ও বিরল দুর্লভ উপহার-উপঢৌকন সংগ্রহের প্রতি তারা ছিল অতি আগ্রহী। পাশাপাশি নৈশ পার্টিতে অংশগ্রহণ, গান-বাজনা, কাওয়ালি শ্রবণ ও খেল-তামাশায় অপব্যয় করার প্রতি তাদের আগ্রহ আসক্তি ছিল বলাবাহুল্য।

শাসকবর্গ মুসলমানদের শাসক হওয়া তো দূরের কথা একজন সাধারণ মুসলমান হওয়ারও যোগ্য ছিল না। খেলাফতের ভাবমূর্তি পরিপূর্ণ বিলীন হয়েছিল। খলিফার উচ্চাভিলাষ হ্রাস পেয়েছিল।

এই ছিল হিজরী সপ্তম শতাব্দীর শুরুলগ্নের আব্বাসী খেলাফতের অভ্যন্তরীণ অবস্থা।

২. মিশর সিরিয়া হেজাজ ইয়ামান

হিজরী সপ্তম শতাব্দীর শুরুর দিকে এ সমস্ত অঞ্চল সুলতান ছালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর বংশধরদের দখলে ছিল। তবে আক্ষেপের বিষয় হলো, তারা তাদের মহান আদর্শ সুলতান ছালাহ উদ্দীনের গুণে গুণান্বিত ছিলেন না। যিনি ক্রুশেডবাহিনীকে চরমভাবে পর্যুদস্ত করেছিলেন; বরং তারা রাজত্ব নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিল এবং সুবিশাল আইয়ূবী সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন ছোট ছোট সাম্রাজ্যে বিভক্ত করে ফেলেছিল!!

ফলে সিরিয়া মিশর থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং হেজাজ ও ইয়ামান সিরিয়া ও মিশর থেকে পৃথক রাজ্যে পরিণত হয়। এমনকি সিরিয়া কয়েকটি দ্বন্দ্বমুখর ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। হিমস নগরী আলেপ্পো ও দামেস্ক থেকে পৃথক হয়ে যায়। অনুরূপ ফিলিস্তিন ও জর্দান পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সুলতান ছালাহ উদ্দীন আইয়ূবী যে সকল পুণ্যভূমিকে ক্রুশেডবাহিনীর হাত থেকে স্বাধীন করেছিলেন, এই বিভেদ সৃষ্টির পর সেগুলো বেশিদিন অক্ষত থাকেনি। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিইয়িল আজীম।

৩. পশ্চিমা বিশ্ব ও স্পেন

তৎকালীন পশ্চিমা বিশ্ব ও স্পেনেও আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী মুসলমানদের রাজত্ব ছিল। তখন মুসলিম সাম্রাজ্য ছিল সুবিশাল। পূর্বে লিবিয়া থেকে শুরু করে পশ্চিমে মরক্কো, উত্তরে স্পেন থেকে শুরু করে দক্ষিণে আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। এতদসত্ত্বেও এই সুবিশাল মুসলিম সাম্রাজ্য হিজরী সপ্তম শতাব্দীর শুরুলগ্নে অকাল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। বিশেষত ৬০৯ হিজরীর ক্রুশেড যুদ্ধের পর মুসলিম সাম্রাজ্য পুরোপুরি প্রাণ হারিয়ে ফেলে।

৪. খাওয়ারেযম

খাওয়ারেযম সাম্রাজ্য ছিল দিগন্তবিস্তৃত। তা ছিল এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে বড় মুসলিম সাম্রাজ্য। পূর্বে চীনের পশ্চিমাঞ্চল থেকে পশ্চিমে ইরান পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ড নিয়ে বিস্তৃত। আব্বাসী সাম্রাজ্য ও খাওয়ারেযম সাম্রাজ্যের মাঝে শক্ত বিরোধ বিরাজমান ছিল। এই দুই সাম্রাজ্য একে অপরের ক্ষতিসাধনের লক্ষ্যে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশল অবলম্বন করত। কখনো কখনো খাওয়ারেযম সাম্রাজ্য আদর্শিকভাবে শিয়া মতাদর্শীদের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাদের মাঝে নানানরকম ফেতনা-ফ্যাসাদ, আন্দোলন ও বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। গৌরী, আব্বাসী ও অন্যান্য মুসলিম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তারা বহুবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

৫. হিন্দুস্তান

তৎকালে হিন্দুস্তান গৌরী সাম্রাটদের অধীনস্থ ছিল। খাওয়ারেযম ও গৌরী সাম্রাজ্যের মাঝে অসংখ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

৬. পারস্য

বর্তমান ইরান তৎকালে পারস্য নামে পরিচিত ছিল। সে সময় পারস্যের বহু অঞ্চল খাওয়ারেযম সাম্রাজ্যের দখলে ছিল এবং পারস্যের পশ্চিমাঞ্চল শিয়াদের ইসমাঈলী গ্রুপের শাসনে পরিচালিত হতো। শিয়াদের ইসমাঈলী গ্রুপটি ছিল খুব নিকৃষ্ট একটি দল। তাদের সঙ্গে আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের চরম বিরোধ ছিল। বহুসংখ্যক উলামায়ে কেরাম তাদের পরিপূর্ণভাবে ইসলাম বহির্ভূত মনে করতেন। তারা নিখাদ ইসলামকে দর্শনশাস্ত্রের মাঝে অনুপ্রবেশ

ঘটিয়েছিল। মূলত তারা অগ্নিপূজারিদের বংশধর ছিল। পরবর্তী সময় তারা বাহ্যত ইসলামের পোশাক পরিধান করে অগ্নিপূজাকে ধামা-চাপা দিয়েছিল। তারা মনমতো কুরআনের অপব্যাখ্যা করত। তারা সেইসব বাতেলপন্থীদের অন্যতম, যারা এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, দীনের প্রত্যেকটি বাহ্যিক বিষয়ের অন্তরালে একটি গোপন হেকমত বা রহস্য লুকিয়ে থাকে। যা কতিপয় মানুষ ব্যতীত কেউ জানে না (তারা নিজেদের সেই দলের অন্তর্ভুক্ত মনে করত)। দীনের এই গোপন বিষয় সম্পর্কে তারা কেবল তাদেরই অবহিত করত যারা তাদের আদর্শ গ্রহণ করতো। তারা নবী রাসূল ও শরীয়তকে অস্বীকার করত। তাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল "রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্য"। তাই তারা যুদ্ধ-বিদ্রোহের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করেছিল।

মোটকথা, ইসমাঈলিয়া গ্রুপটি ইসলামের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর ছিল, যা অভ্যন্তরীণভাবে ক্ষতিসাধন করত। তারা ছিল ইসলামী আকীদা বিশ্বাস, সংবিধান এবং মহান মুসলিম ব্যক্তিদের গুপ্তহত্যার স্থায়ী কারণ।

৭. তুরস্ক

তৎকালীন তুরস্কে রোমান বাদশাদের হুকুমত প্রতিষ্ঠিত ছিল। অন্যদিকে রোমান বাদশারা ছিল তুরস্ক বংশোদ্ভূত। তাদের রয়েছে এক সোনালি ইতিহাস এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর বিশাল দাস্তান। সেটা ছিল বিখ্যাত মুসলিম বাদশা সেনাপতি আলব আরসলানের যুগ। তবে অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় হলো, কূটকৌশল ও শক্তিমত্তায় এ অঞ্চলের শাসকবর্গ এতটা দুর্বল ছিল যে, যা পরবর্তী সময় তাদের চরম বিপর্যের মুখে ফেলে দেয়।

এই হলো তৎকালীন মুসলিম জাতির আলোকচিত্র।

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা লক্ষ করলাম, তখন মুসলিম জাতির মাঝে বিভিন্ন রকম ফেতনা ফ্যাসাদ ছড়িয়ে পড়েছিল। মুসলিম উম্মাহর জীবনে নেমে এসেছিল ব্যাপক অবক্ষয় ও অধঃপতন। মুসলমানদের পরস্পর একাধিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। অন্যায় ও অপকর্মের সয়লাব শুরু হয়েছিল। দুনিয়াপ্রীতি ও পার্থিব মোহ তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। কবীরা গোনাহ তাদের কাছে অতি হালকা মনে হতো। এমনকি একসময় ব্যাপকভাবে এ ধরনের বাক্য শোনা যেত যে, অমুক অমুকের প্রতি জুলুম করেছে, অমুক অমুককে হত্যা করেছে। মানুষ খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে এ জাতীয় বাক্যাবলি বলাবলি করত। যেন নিহতদের প্রাণগুলো কোনো 'মানুষ' এর প্রাণ নয়!!

উক্ত আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এমন ব্যক্তি বা জাতির অবস্থার পরিবর্তন আবশ্যকীয়!! গোট মুসলিমবিশ্ব তখন এমন কোনো দুর্যোগ ও দুর্ঘটনার অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ ছিল, যা বিশ্বব্যাপী সকল দুর্বল শাসকদের ধ্বংস করে ফেলবে। যাতে পরবর্তী সময় এমন এক প্রজন্মের আবির্ভাব হয়, যারা অবক্ষয় ও অধঃপতনকে উন্নতি ও অগ্রগতির চাদরে আবৃত করবে, ইসলামকে তার পূর্বের শান-শওকত ফিরিয়ে দেবে এবং খেলাফতের শক্তি ও মর্যাদার পুনর্জাগরণ ঘটাবে।

তৎকালীন বিশ্বের দ্বিতীয় পরাশক্তি

হিজরী সপ্তম শতাব্দীর শুরুলগ্নে পৃথিবীর দ্বিতীয় পরাশক্তি ছিল ক্রুশেড শক্তি। ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চলগুলো ছিল তাদের প্রধান কেন্দ্র। সেখানে তাদের বহু দুর্গ ও কেল্লা ছিল। তারা লাগাতার মুসলমানদের সঙ্গে অনেক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, আলমেনিয়া ও ইটালির খ্রিস্টানরা সিরিয়া ও মিশর আক্রমণে ক্রুশেডদের সহযোগিতা করে এবং স্পেন ও পর্তুগালের খ্রিস্টানরা স্পেনে মুসলমানদের পরাভূত করার লক্ষ্যে ক্রুশেডদের সহযোগিতা করে।

ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষা এসব অঞ্চলের ক্রুশেড বাহিনীর সংখ্যা ছিল বিপুল এবং মুসলমানদের প্রতি তাদের বিদ্বেষ ও ঘৃণাও ছিল চরম পর্যায়ের। এই ক্রুশেড বাহিনী ও মুসলিমবিশ্বের মধ্যকার যুদ্ধগুলোও ছিল মারাত্মক। নিম্নে এ অঞ্চলের ক্রুশেড বাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করা হলো—

১. বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ও মুসলিম উম্মাহর সঙ্গে তাদের যুদ্ধ বড়ই নিষ্ঠুর ও ঐতিহাসিক। তবে হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ক্রমশ নিজেদের শৌর্যবীর্য হারাতে বসে। ফলে সে সময় তারা মুসলমানদের বড় কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারেনি। তবে বিশ্বমানবতা তাদের শৌর্যবীর্য ও শক্তি সামর্থ সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিল।

২. আরমেনিয়া সাম্রাজ্য

আরমেনিয়া সাম্রাজ্য পারস্যের উত্তর ও তুরস্কের পশ্চিমে অবস্থিত। তারাও বহুবার মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল।

৩. জর্জিয়া সাম্রাজ্য

বর্তমানে এই সাম্রাজ্যের নাম হলো জর্জিয়া। তৎকালীন যুগে এর নাম ছিল কুরজ। মুসলমানদের সঙ্গে তাদের উল্লেখযোগ্য কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। তবে তারা খাওয়ারেযমের মুসলমানদের সঙ্গে সীমিত কয়েকটি যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল।

৪. সিরিয়া ফিলিস্তিন ও তুরস্কে ক্রুশেড সাম্রাজ্যের প্রভাব

হিত্তিন, বাইতুল মুকাদ্দাস ও অন্যান্য অঞ্চলে সুলতান ছালাহ উদ্দীন রহ. ক্রুশেড বাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করা সত্ত্বেও ক্রুশেড শক্তি অবশিষ্ট থেকে যায়। এমনকি দীর্ঘদিন যাবৎ পার্শ্ববর্তী বেদখলকৃত ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর ওপর ক্রুশেড বাহিনীর প্রভাব বলবৎ থাকে। তাদের প্রসিদ্ধ সাম্রাজ্যগুলো হলো আন্তাকিয়া, আকা, ত্রিপোলি, সয়দা ও বাইরুত। অনুরূপ প্রায়শই মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি ভূখণ্ডে যুদ্ধ লেগেই থাকত এবং ক্রমান্বয়ে মুসলিম উম্মাহর ওপর ক্রুশেড বাহিনীর প্রভাব বিস্তার লাভ করছিল।

অন্যদিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন চাইলেন, ষষ্ঠ শতাব্দীর শুরুর বিপরীতে শেষাংশে মুসলিম উম্মাহর জন্য হোক সুখময় ও শুভকর। আর ক্রুশেড বাহিনীর জন্য হোক দুঃখকর ও অমঙ্গলজনক। হিজরী সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে আল্লাহ তা'আলা ক্রুশেড বাহিনীর বিপক্ষে মুসলমানদের দুইজন মহান ব্যক্তিত্বকে রক্ষাকবজ হিসেবে দান করেন। ৫৮৩ হিজরীতে সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী রহ. এর মাধ্যমে সিরিয়া অঞ্চলাধীন 'হিত্তিন' নামক স্থানে ক্রুশেড বাহিনীর বিপক্ষে মুসলমানদের বিজয় সাধিত হয়। এর আট বছর পর ৫৯১ হিজরীতে স্পেনের খ্রিস্টানদের বিপক্ষে সুলতান মানসূর মুওয়াহাহিদী রহ. এর মাধ্যমে 'অরোক' নামক স্থানে বিজয় লাভ হয়।

হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দিকে দুটি মহান বিজয় সাধিত হওয়ার পরও হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর শুরুভাগে মুসলমানগণ খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সুলতান ছালাহ উদ্দীন আইয়ূবী রহ.-এর ইন্তেকালের পর[৮] মুসলমানদের বিভাজন-বিভক্তি, আত্মকলহ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারণে মুসলমানদের সেই শক্তি ও প্রতিভা হারিয়ে

---

[৮] সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী ২৭ শে সফর ৫৮৯ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। - অনুবাদক।

যায়। অনুরূপ মানসূর মুওয়াহাহিদীর ইন্তেকালের পর মুওয়াহহিদ্বীন জামাতের ঐক্য ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে। তবে ক্রুশেড বাহিনী ধীরে ধীরে আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ওপর সে সময় তাদের কোনো প্রভাব ছিল না। যদিও বিচার-ক্ষমতা ও রাষ্ট্রদখলের প্রতি তাদের ছিল লোলুপ দৃষ্টি। এই ছিল হিজরী সপ্তম শতাব্দীর শুরুর দিকে মুসলিমবিশ্বের অবক্ষয় ও অধঃপতন।

এমন সময় পৃথিবীর মানচিত্রে এক নতুন পরাশক্তির উত্থান ঘটে, যা পৃথিবীর মানচিত্রকে পরিবর্তন করে দেয়। সকল অনুমান ও ধারণাকে পাল্টে দেয়। তা নিজেকে পৃথিবীর বুকে তৃতীয় পরাশক্তিরূপে আবিষ্কার করে। অথবা আপনি বলতে পারেন, সপ্তম হিজরীর প্রথম অর্ধাংশে ভূপৃষ্ঠের শ্রেষ্ঠ পরাশক্তি।

এই পরাশক্তির নাম হলো তাতারী পরাশক্তি কিংবা তাতারী সাম্রাজ্য।

কারা এই তাতারী, তাতারীদের পরিচয়

আনুমানিক ৬০৩ হিজরীতে তাতারী সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটে। সর্বপ্রথম তাদের উত্থান ঘটে চীনের উত্তরে অবস্থিত 'মঙ্গোলিয়া' দেশে। তাদের প্রথম নেতা ছিল 'চেঙ্গিজ খান'। মঙ্গোলিয়া ভাষায় 'চেঙ্গিজ খান' অর্থ শক্তিধর, বিশ্বশাসনকর্তা, রাজাধিরাজ। তার মূল নাম 'তিমুজিন'। সে ছিল মানুষ হত্যাকারী শক্তিধর সেনাপতি। সে তার চারপাশে মানুষের ভিড় জমাতে পারত। মানুষ তার চারপাশে হুমড়ি খেয়ে ভিড় করত। দিনে দিনে তার রাজ্য বিস্তৃত হতে থাকে। একসময় তার রাজ্যের সীমানা পূর্বে কোরিয়া থেকে পশ্চিমে খাওয়ারেযম পর্যন্ত এবং উত্তরে সাইবেরিয়া থেকে দক্ষিণে চীনসমুদ্র পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। অর্থাৎ বর্তমান বিশ্বের চীন, মঙ্গোলিয়া, ভিয়েতনাম, কোরিয়া, থাইল্যান্ড, সাইবেরিয়ার কিছু অংশ থেকে লাউস, মায়ানমার, নেপাল ও ভুটান পর্যন্ত তার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

চীনের উত্তরে অবস্থিত 'জুবি' উপত্যকার অধিবাসীদের তাতার বলা হয়। তাতারীরা এই অঞ্চলের মূল অধিবাসী। পরবর্তীতে তাতারীদের বহু শাখাগোত্র প্রকাশ পেয়েছে। যেমন মোঘল, তুর্কী, সেলজুকি ইত্যাদি। মোঘল গোত্র যখন এ অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করে এবং ক্ষমতা লাভ করে, তখন থেকে এসব গোত্রগুলোর ওপর মোঘল শব্দের প্রয়োগ শুরু হয়। চেঙ্গিজ খান মোঘলো গোত্রেরই সন্তান।

তাতারীদের ধর্ম ছিল বড় অদ্ভুত। তাদের ধর্ম ছিল বিভিন্ন ধর্মের সংমিশ্রণে সৃষ্ট এক নবধর্ম। চেঙ্গিজ খান ইসলামধর্ম, খ্রিস্টধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের কতিপয় বিধি-

বিধান একত্রিত করে এবং নিজের পক্ষ থেকে কতিপয় বিধান সংযোজন করে তাতারীদের জন্য একটি ধর্মীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করে। তার প্রণোদিত গ্রন্থটিকে ইয়াসিক বা ইয়াসাহ অথবা ইয়াসিক্ব বলা হয়।

তাতারীদের সমরবৈশিষ্ট্য

তাতারী জাতির যুদ্ধবিগ্রহ বেশকিছু কারণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল। যথা :

১. সর্বত্র দ্রুত ভীতিসঞ্চার।

২. সুসংঘটিত ও সুবিন্যস্ত নীতিমালা।

৩. ব্যতিক্রমধর্মী বিশাল সৈন্যবাহিনী।

৪. কঠোর নিষ্ঠুরতা।

৫. যোগ্য ও অভিনব সমরনীতি।

৬. নির্দয়, নিষ্ঠুর—যেন অন্তরহীন!!

ফলে তাদের যুদ্ধগুলো হতো অস্বাভাবিক বিধ্বংসী। তাই সহসাই তাদের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায়, তারা কোনো শহরে প্রবেশ করলে গোটা শহর ধ্বংসের পাশাপাশি সকল অধিবাসীদের হত্যা করত। এক্ষেত্রে তারা পুরুষ-মহিলা, যুবক-বৃদ্ধ, ছোট-বড়, জালেম-মাজলুম, শহুরে ও বিদ্রোহীদের মাঝে কোনো পার্থক্য করত না। তারা এত রক্তক্ষয়ী বীভৎস ও নিষ্ঠুর ছিল যে, কোনো চতুষ্পদ প্রাণীও এতটা রক্তক্ষয়ী, বীভৎস ও নিষ্ঠুর হতে পারে না। যেমনটি মুওয়াফফিক আবদুল লতিফ তাতারীদের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন—'যেন গোটা বিশ্ব ও বিশ্বমানবতাকে ধ্বংস করা তাদের মূল লক্ষ্য ছিল; রাজত্ব ও সম্পদ তাদের লক্ষ্য ছিল না।'

৭. একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও অপর পক্ষকে পূর্ণ প্রত্যাখ্যান।

তারা বিপক্ষ দলের সঙ্গে সংলাপের কোনো সুযোগ রাখত না। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, তাতারীরা সব সময়ই আত্মপক্ষ সমর্থনকরতঃ একথা প্রকাশ করত যে, তারা দ্বীন কায়েম, ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ও দেশকে জালেমদের হাত থেকে রক্ষা করার মহৎ উদ্দেশ্যে আগমন করেছে।

৮. তাদের কাছে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার কোনো পরওয়া ছিল না। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ছিল তাদের কাছে সবচেয়ে সহজ বিষয়।

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً

"তারা কোনো মুমিনের সঙ্গে আত্মীয়তা কিংবা অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষা করে না।"[৯]

অঙ্গীকার ভঙ্গকরণ ছিল তাদের মজ্জাগত স্বভাব এবং অধঃপতনের পূর্ব পর্যন্ত তারা কখনো কোনো অবস্থাতেই অঙ্গীকার ভঙ্গের 'গুণ' থেকে সরে আসেনি।

তাতার বাহিনী এসব গুণে গুণান্বিত ছিল। ইতিহাস সাক্ষী, পৃথিবীর সকল খোদাদ্রোহী দল উল্লেখিত গুণে গুণান্বিত ছিল, যারা আল্লাহর আদেশ নিষেধ ও বিধিবিধানের পরওয়া করত না। সুতরাং যারা দীনের স্বার্থে রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণের প্রত্যাশা রাখে, তাদের উচিত এসব চরিত্র পরিহার করা।

ধর্মত্যাগী পারস্য, রোমান, সিরিয়া, মিশর, স্পেনের ক্রুশেড বাহিনীও একই আদর্শে আদর্শবান ছিল। তাদের সমরনীতিও তাতারীদের সমরনীতির অনুরূপ ছিল। পরবর্তী সময় তাদের পথেই পরিচালিত হয়েছে ইস্পাহান, পর্তুগাল, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের অধিবাসী এবং ইটালিয়ান ও ইহুদী এবং আমেরিকানরাও!!

তাদের বাহ্যিক গঠন ও আকার-আকৃতি ভিন্ন হলেও হৃদয়াত্মা ছিল এক। মুসলমান কিংবা যেকোনো সভ্য জাতির প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ, রাগ-ক্ষোভে তাদের অন্তর ছিল ভরপুর।

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা তাদের সবার ক্ষেত্রে সুরা যারিয়াতে বলেন—

أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ

"তারা কি পরস্পর এ কথার অসিয়ত করে আসছে? না; বরং তারা এক উদ্ধত সম্প্রদায়।"[১০]

মোটকথা, আপনি চাইলে এভাবে বলতে পারেন যে, সপ্তম হিজরীর শুরুলগ্নে ভূপৃষ্ঠের পরাশক্তি তিনভাগে বিভক্ত ছিল। যথা—

---

[৯] সুরা তওবা : ১০।

[১০] সুরা যারিয়াত : ৫৩।

এর আগের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, (ভাবার্থ) পূর্ববর্তী সকল জাতি নিজ নিজ নবী-রাসূলকে জাদুকর বা উন্মাদ বলেছে। এই আয়াতে সেই বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। -অনুবাদক।

১. মুসলিম শক্তি

মুসলিম শক্তির রয়েছে এক সুবিশাল ইতিহাস। তবে সময়ে সময়ে এই শক্তি দুর্বলতার শিকার হয়েছে। কিন্তু অমুসলিমদের অন্তর থেকে চিরতরে কখনো মুসলিম শক্তির ভীতি দূরীভূত হয়নি। কারণ, মুসলমানদের শত্রুরা ভালভাবে জানত যে, মুসলিম জাতির সহযোগিতা লাভের উপায় ও তাদের শক্তি সঞ্চারের উপকরণ হৃদয়ের গহিনে প্রোথিত। তারা কেবল সেই মহান ব্যক্তিত্বের অভাব অনুভব করত, যিনি তাদের অভ্যন্তরীণ শক্তিকে বৃদ্ধি করবেন এবং সেই শক্তির পুনঃউন্মেষ ঘটাবেন।

২. ক্রুশেড শক্তি

যদিও তদানীন্তন সময়ে ক্রুশেড বাহিনীর শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আর বর্তমান বিশ্বের মুসলিম শক্তি ও ক্রুশেড শক্তির মধ্যকার তুলনামূলক জ্ঞান আমার নেই, তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে, ক্রুশেড শক্তিকে কখনো অবহেলা করা যায় না। কারণ, তাদের মাঝে তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে—

১. তাদের সংখ্যাধিক্য।

২. মুসলমানদের প্রতি চরম বিদ্বেষ।

৩. যুদ্ধে মুসলমানদের পরাভূত করার তীব্র প্রচেষ্টা।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যথার্থ বলেছেন। তাদের বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

> "তারা (কাফেররা) ক্রমাগত তোমাদের (মুসলমানদের) সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকবে, এমনকি পারলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফেরাতে চেষ্টা করবে।"[১১]

তৎকালীন বিশ্বে মুসলিম শক্তি ও ক্রুশেড শক্তিকে সমপর্যায়ের শক্তি মনে করা হতো।

---

[১১] সুরা বাকারা : ২১৭।

৩. তাতারী শক্তি

মুসলিম জাতির ওপর ওই সময় যত বিপদ ও দুর্যোগ নেমে এসেছে, তার মধ্যে বর্বর তাতারী জাতির হামলাই ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ ও নির্মম। তাতারী শক্তি ছিল পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও বর্বর শক্তি। ইতিহাসে এর কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। আকস্মিক আবির্ভূত এক পরাশক্তি। অন্যের ওপর বিজয় লাভ ও প্রভাব বিস্তার করার মতো তাদের কোনো সভ্যতা, সংস্কৃতি কিংবা ধর্ম ছিল না। ফলে বর্বরতা ও পাশবিকতাই ছিল তাদের একমাত্র অবলম্বন, যার মাধ্যমে তারা অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করত। বর্তমান বিশ্বের অমুসলিম শক্তি ও তৎকালীন বর্বর তাতারী শক্তির মাঝে পূর্ণ সাদৃশ্য বিদ্যমান রয়েছে।

সকল কুফরি শক্তি এক ও অভিন্ন

আল্লাহ তা'আলার রীতি হলো, তিনি শক্তিধরদের মাঝে পরস্পর যুদ্ধ লাগিয়ে রাখেন। বিভিন্ন দল একে অপরকে প্রতিহত করতে থাকে। অনুরূপ শক্তিশালীরা তাদের পাশে দুর্বলদের অস্তিত্ব বরদাশত করতে পারে না। এটিও আল্লাহর নীতি যে, বাতেল ও ভ্রান্ত যত আকৃতিতেই তাদের আত্মপ্রকাশ করুক না কেন, তারা হকের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। আল্লাহর আরেকটি নীতি হলো, কেয়ামত পর্যন্ত হক ও বাতিলের সংঘাত চলতে থাকবে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক প্রবর্তিত উল্লেখিত অমোঘ নীতিমালাগুলোর আলোকে আমরা একথা সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, তাতার জাতি ও ক্রুশেড বাহিনী তাদের পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও একে অপরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহযোগিতা করবে। এটা খুবই স্বাভাবিক। তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা কোনো পরিকল্পিত বিষয় নয়; বরং সকল কুফরি শক্তি এক ও অভিন্ন!!

ক্রুশেডরা একদল শক্তিশালী সৈন্য ইউরোপ থেকে মঙ্গোলিয়া প্রেরণ করে। উদ্দেশ্য—মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাতারীদের সহযোগিতা করা, (ইউরোপ থেকে মঙ্গোলিয়ার দূরত্ব বারো হাজার কিলোমিটারের বেশি) আব্বাসী খেলাফতকে ধ্বংস করা এবং তৎকালীন বিশ্বের ইসলামী প্রাণকেন্দ্র বাগদাদে অনুপ্রবেশ করা। তখন তারা তাতারীদের সামনে ইসলামী সাম্রাজ্যের শক্তি উল্লেখ করে তাদের এই আশ্বাস প্রদান করে যে, ক্রুশেড বাহিনী মুসলমানদের

বিরুদ্ধে তাদের সহযোগিতা প্রদান করবে এবং তাদের পক্ষে গুপ্তচরের ভূমিকা পালন করবে। এতে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করতে এবং তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে তারা আরও প্ররোচিত হয়।

আহ! ক্রুশেড বাহিনীর ইচ্ছা বাস্তবায়িত হলো। আব্বাসী সাম্রাজ্যের ওপর তাতারীদের লোলুপ দৃষ্টি পড়ল। তাদের মুখের লালায় ভেসে গেল আব্বাসী খেলাফত। কল্যাণে ভরপুর বিপুল সম্পত্তির আধার, বিশাল বিস্তৃত আব্বাসী খেলাফতের বিরুদ্ধে তারা সম্মিলিত প্রয়াসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখনো তাতারী বাহিনী ও ক্রুশেড বাহিনীর মাঝে পরস্পর বহু বিষয়ে দ্বন্দ্ব বিরাজমান ছিল। এমনকি পরবর্তী সময় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তারা পরস্পর বহুবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু যখন তারা (উভয় দল) মুসলমানদের মুখোমুখি হলো, ইসলাম ও মুসলমানদের বিপক্ষে এক কাতারবদ্ধ হলো। এটি কোনো আশ্চর্যজনক ঘটনা নয়; বরং এটি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে বাতেল দলগুলোর চিরায়ত রীতি।

এর পূর্বে ইহুদীরা মুশরিকদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সহযোগিতা করেছিল। অথচ তাদের পরস্পরে আকিদাগত শক্ত বিরোধ বিদ্যমান ছিল।

রোম ও পারস্যের মাঝে দীর্ঘ যুদ্ধ, বিদ্রোহ ও চরম বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে পারসিকরা রোমানদের সহযোগিতা করেছিল।

ওসমানী সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করতে এবং ফিলিস্তিনের অধঃপতনের জন্য ইংল্যান্ড ইহুদীদের পক্ষপাতিত্ব করেছিল। ইহুদী খ্রিস্টানদের মাঝে চরম শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও ফিলিস্তিনের বরকতময় ভূমিতে ইসরাঈলীদের বীজ বপনের জন্য ইংল্যান্ড ইহুদীদের সহযোগিতা করেছিল।

আর সাম্প্রতিককালে 'ইসলামী জঙ্গিবাদ' ধ্বংসের নামে মুসলমানদের বিরুদ্ধে রাশিয়া আমেরিকাকে সাহায্য প্রদান করছে। ফলে রাশিয়া আফগানিস্তান, ইরাক ও ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে আমেরিকাকে সাহায্য করছে এই উদ্দেশ্যে যে, আমেরিকা যেন রাশিয়াকে চেচনিয়ার বিরুদ্ধে সহযোগিতা করে। উভয় স্থানেই মুসলমানরা তাদের বলিতে পরিণত হচ্ছে!!

বোঝা গেল, মুসলমানদের বিরুদ্ধে বাতেল শক্তির ঐক্য একটি প্রাচীনতম চিরায়ত রীতি।

কাজেই 'আমার শত্রু, না আমার বন্ধু' এ জাতীয় দ্বন্দ্বে না থেকে কে শত্রু কে মিত্র, তা ভালোভাবে জানা দরকার এবং শত্রুর শত্রুকেও চেনা আবশ্যক। কারণ, কখনো শত্রুর শত্রুরাও শত্রুতে পরিণত হয়। তবে হ্যাঁ, নির্দিষ্ট মেয়াদে বিশেষ উদ্দেশ্যে কখনো কখনো মুসলমান ও শত্রুদের মাঝে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন হয়েছিল। তবে মনে রাখবেন, তা ছিল শিথিলতা বিবর্জিত, মুসলমানদের হক আদায়ে অকুণ্ঠ, পূর্ণ সজাগ-সতর্ক এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য। মুসলমানদের এরূপ সম্পাদিত সন্ধি কখনো বন্ধুত্বে পরিণত হয়নি এবং তারা কখনো মুসলমানদের অধিকার ও হক ভুলে যায়নি। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে এ বিষয়ে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন—

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

"(হে নবী,) ইহুদী ও খ্রিস্টানরা তোমার প্রতি কিছুতেই খুশি হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবে।"[১২]

একসময় তাতারীরা মুসলিম সাম্রাজ্য দখল করার জন্য গভীর চিন্তা-গবেষণা শুরু করল এবং আব্বাসী খেলাফত ধ্বংস করার এবং মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী বাগদাদে প্রবেশের ছক আঁকতে শুরু করল।

---

[১২] সূরা বাকারা : ১২০।

তাতার বাহিনীর প্রথম আক্রমণ

চেঙ্গিজ খান ভাবল, ইরাকে আব্বাসী খেলাফত ধ্বংস করার সর্বোত্তম পন্থা হলো, আফগানিস্তান ও উজবেকিস্তানে মজবুত ঘাঁটি স্থাপন করা। কারণ, ইরাক ও চীনের মাঝে বহু দূরত্ব বিদ্যমান। কাজেই ইরাক পতনের জন্য ইরাক ও চীনের মাঝামাঝি স্থানে তাতার বাহিনীর জন্য একটি মজবুত ঘাঁটি স্থাপন জরুরি। ইরাক ও চীনের মধ্যবর্তী এই স্থানটির নাম হলো কাকেশাস। অত্র অঞ্চলটি কৃষিশিল্পের উর্বর অঞ্চল হওয়ার কারণে অর্থনৈতিকভাবে খুব সচ্ছল ছিল। কাকেশাস ছিল ইসলামের অন্যতম প্রধান নগরী। এখানে বিপুল পরিমাণ খনিজ সম্পদ ছিল। ফলে সরাসরি ইরাক আক্রমণ করা তাতারীদের পক্ষে বড়ই দুরূহ ছিল। কৌশলগতভাবেও তারা ইরাক আক্রমণ করতে পারছিল না। কারণ, ইরাক-ভূমি ছিল মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র, যা তাদের পরাভূত করতে সদা প্রস্তুত ছিল।

এসব কারণে চেঙ্গিজ খান প্রথমত মুসলিম সাম্রাজ্যের পূর্বে অবস্থিত খাওয়ারেযম সাম্রাজ্যের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধের চিন্তা শুরু করল। খাওয়ারেযম সাম্রাজ্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত ছিল। যেমন আফগানিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিকিস্তান, কাজাখাস্তান, তোজেকিস্তান, পাকিস্তান ও ইরানের কিছু এলাকা। তখন এই বিশাল ভূখণ্ডের রাজধানী ছিল 'উরজিন্দা' শহর। বর্তমানে যা তুর্কমেনিস্তান নামে পরিচিত।

খাওয়ারেযম সম্রাট মুহাম্মদ ইবনে খাওয়ারেযম শাহের সঙ্গে চেঙ্গিজ খান পরস্পর উত্তম আচরণ প্রদর্শনের সন্ধিতে আবদ্ধ ছিল। তবে চেঙ্গিজ খান ব্যক্তিগতভাবে প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী কিংবা সন্ধিচুক্তি রক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল না। এতদসত্ত্বেও খাওয়ারেযম সাম্রাজ্যের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম সাম্রাজ্যে নিরাপদে চলাফেরা করা। এতে সে এশিয়া পূর্বাঞ্চলে অবাধ বিচরণের অনুমতি লাভ করল এবং চীন ও মঙ্গোলিয়া অঞ্চলে তাতারীদের অবস্থান মজবুত হলো। এ পর্যায়ে তারা ভাবল, পশ্চিমের দেশসমূহে প্রভাব বিস্তারের সময় ঘনিয়ে এসেছে। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা এবং

পূর্ববর্তী সকল চুক্তিনামা ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করতে কোনো বাধা ছিল না। এ তো সব বাতেলপন্থীদের চিরায়ত অভ্যাস।

أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

"যখনই তারা কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সর্বদা তাদের একটি দল তা ভেঙে ছুঁড়ে মেরেছে; বরং তাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।"[১৩]

যেকোনো যুদ্ধে পক্ষ-বিপক্ষ উভয় দলকে কার্যকরী ভূমিকায় অবতীর্ণ করার জন্য যুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী একটি যথার্থ কারণ থাকতে হয়। শুরু থেকেই চেঙ্গিজ খান এরূপ একটি যথার্থ কারণ সন্ধানে সচেষ্ট ছিল। কিন্তু সে এমন কারণ খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়।

সুবহানাল্লাহ! মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন চেঙ্গিজ খানের কোনোরূপ প্রস্তুতি ব্যতীতই একটি আকস্মিক ঘটনা ঘটালেন। সেই আকস্মিক ঘটনাটি যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধকারী যথার্থ ঘটনা হতে পারে। হ্যাঁ, সেই ঘটনাটিই চেঙ্গিজ খানকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পূর্ণ উৎসাহ প্রদান করে। অপরদিকে চেঙ্গিজ খানের সামনে পূর্ণ সুযোগ কাজে লাগানোর পথে কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিল না। ফলে সে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে যুদ্ধের ছক আঁকতে শুরু করে।

কী উপায়ে চেঙ্গিজ খান খাওয়ারেযম শাহের ভূখণ্ডে প্রবেশ করল

ঘটনা হলো, একদল মোঘল ব্যবসায়ী খাওয়ারেযমের উতরার নামক শহরে গমন করেছিল। শহরের শাসক তাদের বন্দী করে হত্যা করল। তাদের হত্যার কারণ কী ছিল? এই কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে ইতিহাসবিদগণ এই ঘটনার আলোচনায় বিভিন্ন মত পেশ করেন—

১. কেউ কেউ বলেন, বণিকদলটি চেঙ্গিজ খানের গুপ্তচর ছিল। সে তাদের গুপ্তচরবৃত্তি কিংবা মুসলিম সাম্রাজ্যে ফেৎনা সৃষ্টির হীন উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিল। এ কারণে উতরার শহরপ্রধান তাদের হত্যা করে।

২. কেউ কেউ বলেন, 'মাওরাউন নাহার' দেশে তাতারীরা মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করেছিল এবং মালামাল ছিনতাই করেছিল। সেই আক্রমণের প্রতিশোধস্বরূপ এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল।

---

[১৩] সুরা বাকারা : ১০০।

৩. কারও কারও অভিমত হলো, এটি ছিল তাতারী বাহিনীকে যুদ্ধের প্রতি উস্কানিমূলক ইচ্ছাকৃত ঘটনা। যাতে তাতারীরা যুদ্ধের প্রতি উদ্যত হলে মুসলিম সম্রাট খাওয়ারেযম শাহ পাল্টা আক্রমণমূলক তুরকিস্তানে প্রবেশের সুযোগ পান।

তবে এই তৃতীয় অভিমতটি অসঙ্গত মনে হয়। কারণ, তাতারী সাম্রাজ্যের প্রতি মুসলিম সম্রাট মুহাম্মদ ইবনে খাওয়ারেযম শাহের কোনোরূপ আকর্ষণ ছিল না। তিনি চাইতেন, প্রত্যেকে নিজ নিজ রাজ্যে নিরাপদে বসবাস করুক। কেউ যেন অন্যের প্রতি জুলুম-অত্যাচার না করে। প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সবাই যেন সচেষ্ট থাকে। আর এটি একটি দুর্বোধ্য বিষয় যে, তিনি তাতারীদের সৈন্যসংখ্যা, শৌর্যবীর্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও তাদের উস্কিয়ে দেবেন। এটাও দুর্বোধ্য যে, তিনি তাদের শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কে কোনো ধারণা রাখবেন না, অথচ তারা তাঁর আষ্টেপৃষ্ঠে লেগে আছে। সর্বত্র চেঙ্গিজ খান চেঙ্গিজ খান ধ্বনি গুঞ্জরিত হচ্ছে।

৪. কোনো কোনো ইতিহাসবেত্তা বলেন, চেঙ্গিজ খান কতিপয় তাতারী ব্যবসায়ীকে হত্যার উদ্দেশ্যেই কিছু গুপ্তচর মুসলিম ভূখণ্ডে প্রেরণ করেছিল। যাতে কালের দুর্যোগে তা-ই যুদ্ধের কারণে পরিণত হয়। এই অভিমতটিও ভিত্তিহীন।

৫. কেউ কেউ বলেন, সম্রাট খাওয়ারেযম শাহ সম্পত্তির লোভে তাদের হত্যা করে।

মোটকথা, ব্যবসায়ীদের হত্যার কারণ হিসেবে ইতিহাসের কিতাবাদিতে উল্লেখিত কারণগুলো খুঁজে পাওয়া যায়। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সবগুলোর শেষফল হলো ব্যবসায়ী (বা গুপ্তচর)-রা নিহত হয়েছিল।

চেঙ্গিজ খানের নিকট এই হতাহতের সংবাদ পৌঁছলে সে সম্রাট মুহাম্মদ ইবনে খাওয়ারেযম শাহের নিকট এই মর্মে একটি চিঠি প্রেরণ করে যে, তিনি যেন হত্যাকারীদের তার কাছে হস্তান্তর করেন। সে নিজেই তাদের বিচার করবে। কিন্তু মুহাম্মদ ইবনে খাওয়ারেযম শাহ তার এই সিদ্ধান্তকে মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি সীমালঙ্ঘন মনে করেন। তিনি মুসলিম অপরাধীদের বিচার ভিনদেশে ভিন্ন শরীয়ত মোতাবেক হোক, এটা চাইলেন না। তবে তিনি বলেন, আমি নিজে আমার দেশে তাদের শাস্তি প্রদান করব। যদি তারা অপরাধী প্রমাণিত হয় তবে ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক আমি তাদের শাস্তি প্রদান করব।

মুসলিম সম্রাটের এই প্রস্তাব যদিও বিশ্বের সকল ভূখণ্ডে গৃহীত হওয়ার মতো, কিন্তু চেঙ্গিজ খান এতে সন্তুষ্ট হলো না। অথবা আপনি বলুন, চেঙ্গিজ খান স্বেচ্ছায় রাজি হয়নি। কাজেই যুক্তি-তর্ক বা দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনের কোনো সুযোগই অবশিষ্ট রইল না। বাস্তবতা হলো, চেঙ্গিজ খান পূর্ব থেকেই মুসলিম সাম্রাজ্যে হামলা করার নকশা আঁকছিল। কেউ তা প্রতিহত করতে পারবে না। সে শুধু একটু উপযুক্ত সুযোগ বা কারণ সন্ধানে ব্যতিব্যস্ত ছিল। ফলে সে এই হতাহতের ঘটনাটিকে মোক্ষম সুযোগ মনে করল।

শুরু হলো বর্বর তাতারীদের পৈশাচিক আক্রমণ

শুরু হলো মুসলিমবিশ্বের ওপর বর্বর তাতারী বাহিনীর পৈশাচিক আক্রমণ। বর্বর তাতারীরা সর্বপ্রথম সম্রাট খাওয়ারেযম শাহের সাম্রাজ্যের ওপর আক্রমণ করল।

চেঙ্গিজ খান বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ অভিযান শুরু করল। অপর দিকে মুসলিম সম্রাট মুহাম্মদ ইবনে খাওয়ারেযম শাহও দলবল নিয়ে বের হলেন। একটি ভয়ানক জায়গায় তারা মুখোমুখি হলো। টানা চারদিন যুদ্ধ চলল। তা ছিল কাজাকিস্তানের সাইহুন নদীর পূর্ব প্রান্তে। বর্তমানে সেই নদীটিকে 'সারদারিয়া' বলা হয়। যুদ্ধে উভয় দলের বহুসংখ্যক সৈন্য নিহত হয়। বিশ হাজার মুসলিম সৈন্য শাহাদাতবরণ করেন। আর এর চেয়ে কয়েকগুণ বেশি নিহত হয় তাতারী সৈন্য। একপর্যায়ে উভয় দল যুদ্ধবিরতি করে প্রত্যাবর্তন করে। মুসলিম সম্রাট মুহাম্মদ ইবনে খাওয়ারেযম শাহ সৈন্যদের নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। কারণ তিনি দেখলেন, তাতারীদের সংখ্যা অগণিত। তাই তিনি নিজ সাম্রাজ্যের বড় বড় শহর, বিশেষত রাজধানী তুরমেনিস্তান, রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। ৬১৬ হিজরীতে এই রক্ষক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

এরপর মুহাম্মদ ইবনে শাহ তাঁর সাম্রাজ্যের চতুর্দিক থেকে সৈন্যবাহিনী একত্রিত করতে শুরু করেন। কিন্তু আপনি হয়তো অবগত আছেন যে, তাঁর সাম্রাজ্যের রাজ্যগুলো ছিল শতধা বিভক্ত। এমনকি পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন। তিনি ইরাকের আব্বাসী খেলাফত এবং অন্যান্য মুসলিম দেশগুলো থেকে পৃথক ছিলেন। ফলে বর্বর তাতারীদের বিরুদ্ধে নিরুপায় হয়ে তিনি একাকী যুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

(বক্ষ্যমাণ গ্রন্থরচয়িতা ড. রাগেব সারজানী বলেন—) আমি মনে করি তাতারীদের শক্তি-সামর্থ, শৌর্যবীর্য কিংবা সংখ্যাধিক্যের কারণে এই ট্রাজেডি

ঘটেনি; বরং এই করুণ পরাজয় ও ট্রাজেডির প্রধান ও একমাত্র কারণ হলো মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর পরস্পর বিভক্তি ও অনৈক্য। আল্লাহ তা'আলা যথার্থ বলেছেন। তিনি এরশাদ করেন—

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

"পরস্পরে কলহ করবে না, অন্যথায় তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের হাওয়া (প্রভাব) বিলুপ্ত হবে। বিশ্বাস রাখো আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"[১৪]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা 'প্রভাব হরিয়ে ফেলা'কে কলহ বিবাদের ফল স্বরূপ দাঁড় করিয়েছেন। অথচ মুসলমানরা সর্বদা কলহে লিপ্ত থাকে, বিরোধিতায় মত্ত থাকে। আপনি একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ইতিহাস পাঠ করলে দেখবেন, সে সময় সামান্য সময়ের জন্য তাতারী বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধবিরতি হলেই মুসলমানগণ পরস্পরে কলহে লিপ্ত হতো। একে অপরকে বন্দী করত, একে অপরকে হত্যা করত!! একথা সুনিশ্চিত যে, যারা এমন গুণের অধিকারী হবে, তারা কখনোই সাহায্যপ্রাপ্ত হয় না।

ইমাম মুসলিম রহ. *সহীহ মুসলিমে* হযরত ছাওবান রা.-এর সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ، وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا - أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا - حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا، وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا

"আমি আমার উম্মতের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি, যেন তিনি তাদের মহামারিতে ধ্বংস না করেন, তাদের ওপর শত্রুপক্ষের কাউকে চাপিয়ে না দেন, যে তাদের মূলোৎপাটিত করবে। আল্লাহ তা'আলা

[১৪] সূরা আনফাল : ৪৬।

বলেন, হে মোহাম্মদ! আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয় না। আমি তোমার উম্মতকে মহামারিতে ধ্বংস করব না। তাদের ওপর শত্রুপক্ষের কাউকে চাপিয়ে দেব না যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। তবে তারা একে অপরকে হত্যা করবে, একে অপরকে বন্দী করবে।"[১৫]

সে সময় মুসলমানরা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করত। পরস্পরকে বন্দী করত। কাজেই তাতারী বাহিনী কিংবা অন্য কোনো দল তাদের ওপর বিজয় লাভ করলে আশ্চর্যের কিছু নেই। অনৈক্যের পাশাপাশি মুহাম্মদ ইবনে খাওয়ারেযম শাহের আরেকটি বড় ভুল ছিল। তা হলো, তিনি রাজধানী তুরমেনিস্তান হেফাজতের প্রতি পূর্ণ গুরুত্বারোপ করেছিলেন বটে, তবে সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলগুলো হেফাজতের প্রতি তিনি যথেষ্ট পরিমাণ গুরুত্বারোপ করেননি। প্রশ্ন হলো, রণকৌশলে পূর্ণ দক্ষ, বিচক্ষণ সম্রাট এমন সুস্পষ্ট ভুলে কীভাবে পতিত হলেন?

বস্তুত কৌশলগত ভুল ছিল না, ভুল ছিল আত্মিক ও চারিত্রিক। মুহাম্মদ ইবনে খাওয়ারেযম শাহ কেবল নিজের, নিজের পরিবারের ও আত্মীয়স্বজনের নিরাপত্তাবিধানের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছিলেন। পক্ষান্তরে অন্যান্য গোত্রের নিরাপত্তাবিধনের প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করেন। নিজের সহায়-সম্পত্তি ও বাপ-দাদার সহায় সম্পত্তি পূর্ণরূপে হেফাজত করেন। অপর দিকে অন্যান্য গোত্রের ধন-সম্পদের হেফাজতের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেন। সাধারণত বীরসেনানীরা বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে ভেঙে পড়েন না। ভেঙে পড়েন না তার সৈন্যবাহিনী। চলুন দেখি, কালের দুর্বিপাক মুহাম্মদ ইবনে খাওয়ারেযম ও তার সেনাবহিনীর জন্য কী বয়ে এনেছিল?

প্রথম অভিযানের পর চেঙ্গিজ খান কী পদক্ষেপ গ্রহণ করল

চলুন, মুসলিম সাম্রাজ্যের দেশগুলোতে চেঙ্গিজ খানের পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করি—

বুখারা আক্রমণ

চেঙ্গিজ খান তার সেনাদের নতুন আঙ্গিকে নবসাজে সজ্জিত করল এবং কাজাখাস্তানের প্রত্যেকটি অঞ্চল জ্বালিয়ে দিতে অগ্রসর হলো। সর্বপ্রথম

---

[১৫] *মুসলিম : ২৮৮৯।*

(বর্তমান উজবেকিস্তানের অঞ্চল) বুখারা অভিমুখে রওয়ানা হয়। এটি বিখ্যাত হাদীস বিশারদ খ্যাতনামা ইমাম বুখারী রহ.-এর আবাসভূমি। চেঙ্গিজ খান ৬১৬ হিজরীতে এই পুণ্যভূমি অবরোধ করে। জনপদবাসীকে আত্মসমর্পণের শর্তে নিরাপত্তা প্রদান করতে চায়। সে সময় মুহাম্মদ ইবনে খাওয়ারেযম শাহ বুখারা অঞ্চল থেকে দূরে অবস্থান করছিলেন। এতে বুখারাবাসী পেরেশান হয়ে পড়ে। কী করবে, বুঝে উঠতে পারে না। তাদের সামনে দুটি অভিমত উত্থাপিত হয়—

প্রথম অভিমত : আমরা তাতারীদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হব এবং আমাদের শহরকে রক্ষা করব।

দ্বিতীয় অভিমত : আমরা নিরাপত্তা গ্রহণ করি। তাতারীদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করে দেই। কিন্তু তারা কী জানত যে, তাতারীরা—

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً

"কোনো মুমিনের সঙ্গে আত্মীয়তা কিংবা অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষা করে না।"[১৬]

এভাবে বুখারাবাসী দু-দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল। একদল মুজাহিদ, যারা যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা শহরে বড় দুর্গে অবস্থান করে। তাদের সঙ্গে শহরে ফকিহ ও আলেম-উলামা মিলিত হন। অপর দিকে দ্বিতীয় দল আত্মসমর্পণকারী। এরা সংখ্যায় অনেক বেশি। তারা তাতারীদের জন্য শহরের ফটক খুলে দেওয়ার এবং তাতারীদের নিরাপত্তা প্রদানের ওপর ভরসা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

তাতারীদের জন্য বুখারা শহরের দ্বার খুলে দেওয়া হলো। চেঙ্গিজ খান শহরে প্রবেশ করল। শহরে প্রবেশের প্রথম দিকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য শহরবাসীকে নিরাপত্তা প্রদান করল। এই নিরাপত্তা দুর্গে অবস্থানকারী মুজাহিদ বাহিনীর ওপর প্রভাব বিস্তার পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল।

চেঙ্গিজ খান দুর্গ অবরোধ করল। শহরবাসী মুসলমানদেও দুর্গের চারপাশে খন্দক খননে তাদের সহযোগিতা করার নির্দেশ দিল। যাতে তারা অনায়াসে

---

[১৬] সুরা তাওবা : ১০।

দুর্গে প্রবেশ করতে পারে। শহরবাসী চেঙ্গিজ খানের কথামতো খন্দক খননে সহযোগিতা করল!!

দীর্ঘ দশদিন তারা দুর্গ অবরোধ করে রাখল। অতঃপর বলপূর্বক দুর্গে প্রবেশ করে সকল মুজাহিদকে হত্যা করল!! বুখারা শহরে আর কোনো মুজাহিদ অবশিষ্ট রইল না।

এরপরই চেঙ্গিজ খান প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ শুরু করল। সে শহরবাসীর কাছে তাদের ধন-সম্পত্তি, অর্থ-কড়ি, স্বর্ণ-রুপা চাইল। তাদের সব সম্পত্তি নিজের করে নিল। অতঃপর পুরো মুসলিম শহরকে তার সৈন্যবাহিনী তথা তাতারীদের জন্য অবাধ ঘোষণা করল। এরপর তারা সেখানে এমনসব ঘৃণ্য কাজ করল, যা কেউ কল্পনাও করতে পারে না! আল্লামা ইবনে কাছীর রহ. *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* গ্রন্থে সেই পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন—

فقتلوا من أهلها خلقاً لا يعلمهم إلا الله عز وجل، وأسروا الذرية والنساء، وفعلوا مع النساء الفواحش في حضرة أهليهن ..!! ارتكبوا الزنا مع البنت في حضرة أبيها، ومع الزوجة في حضرة زوجها، فمن المسلمين من قاتل دون حريمه حتى قتل، ومنهم من أُسر فعذب بأنواع العذاب، وكثر البكاء والضجيج بالبلد من النساء والأطفال والرجال، ثم أشعلت التتار النار في دور بخارى ومدارس ها ومساجدها، فاحترقت المدينة حتى صارت خاوية على عروشها

“তারা এত বিপুলসংখ্যক মানুষ হত্যা করেছে, যার সঠিক সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। তারা শিশু ও নারীদের বন্দী করেছে। নারীদের সঙ্গে তাদের পরিবার-পরিজনের উপস্থিতিতে অশ্লীল কর্মসাধন করেছে!! (পিতার উপস্থিতিতে মেয়ের সঙ্গে, স্বামীর উপস্থিতিতে স্ত্রীর সঙ্গে অপকর্ম করেছে!!!) যারা নিজেদের আত্মমর্যাদা রক্ষার লড়াই করেছে, তাদের তারা নির্বিচারে হত্যা করেছে। বন্দীদের বিভিন্ন ধরনের শাস্তি প্রদান করেছে। শহরের আকাশ বাতাস নারী-পুরুষ ও শিশু-কিশোরদের আর্তনাদে কেঁপে উঠেছে। এরপর তারা বুখারার মাদরাসা ও মসজিদগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয়। শহর পুড়ে ভস্ম হয়ে বিরানভূমিতে পরিণত হয়।”

এই ছিল ইবনে কাছীর রহ. এর বর্ণনা। আল্লাহই একমাত্র সাহায্যকারী। চিরসত্য। আল্লাহই একমাত্র সাহায্যকারী।

একটি মুসলিম শহর (বুখারা) ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো!!

ধৈর্যশীল মুজাহিদ বাহিনী ধ্বংস হলো। অনুরূপ আত্মসমর্পণকারী লাঞ্ছিত মুসলিমরাও ধ্বংস হলো।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. উম্মুল মুমিনীন যয়নব বিনতে জাহাশ রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন—

يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ

> "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের মাঝে নেককার সৎ লোকেরা উপস্থিত থাকলেও কি আমরা ধ্বংস হব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ! যখন মন্দ কাজ বৃদ্ধি পাবে।"[১৭]

সে দেশে খুব বেশি পরিমাণে মন্দকাজ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

একটি মন্দ কাজ হলো, নিজেদের দ্বীন-ধর্ম, ইজ্জত-সম্মান ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য মুসলমানগণ তরবারি উত্তোলন করত না।

আরেকটি মন্দ কাজ হলো, মুসলমানগণ কাফেরদের প্রতিশ্রুতিকে সত্যজ্ঞান করত।

আরেকটি মন্দ কাজ হলো, যারা জিহাদের পতাকা উত্তোলন করত, মুসলমানগণ তাদের শত্রুপক্ষের কাছে অর্পণ করত।

আরেকটি মন্দ কাজ হলো, মুসলমানগণ নিজেরা বহু দলে বিভক্ত হয়েছিল। তারা পরস্পর যুদ্ধ করত।

আরেকটি মন্দত্ব হলো, মুসলমানগণ কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তথা কুরআন হাদীসের বিচার কামনা করত না।

উল্লিখিত সবকিছুই হলো মন্দত্ব! ঘৃণ্য কাজ!

'যখন মন্দ কাজ বৃদ্ধি পাবে, আবশ্যম্ভাবীভাবে ধ্বংস নেমে আসবে!' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথার্থ বলেছেন।

---

[১৭] *বুখারী : ৩৩৪৬, মুসলিম : ২৮৮০।*

এভাবেই বুখারা ৬১৬ হিজরীতে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়!!!

কিন্তু এটিই কি ছিল শেষ ট্রাজেডি? এটিই কি ছিল শেষ বিপর্যয়? না; বরং এটি ছিল বিপর্যয়ের প্রথম পৃষ্ঠা। ঘটনার শুরুভাগ! তুফানের শুরু, ধ্বংসের সূচনা। সামনের ঘটনাগুলো আরও শোকার্ত, অধিক রক্তক্ষয়ী। মুসলমানগণ ৬১৭ হিজরীতে পদার্পণ করছে, যা মুসলমানদের সুদীর্ঘ ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ফেতনা ও দুর্যোগের বছর। নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য, অবক্ষয় ও অধঃপতনের বছর।

৬১৭ হিজরী মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের বছর

শুরু হলো ৬১৭ হিজরী।

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর আবির্ভাবের পর থেকে আজ পর্যন্ত ৬১৭ হিজরীর চেয়ে অধিক ভয়াবহ ও মর্মান্তিক কোনো বছর মুসলিম উম্মাহর ওপর অতিক্রম হয়নি। সে বছর তাতারীদের গগন তারকা মধ্যাকাশে জ্বলজ্বল করছিল। মুসলিম সাম্রাজ্য তাতারী আগ্রাসনের থাবায় পরিণত হয়েছিল। যার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। তারা এমন সব অপকর্ম ও ভয়াবহ দুর্ঘটনার অবতারণ করেছে যে, যা কেউ শোনেনি, কেউ কখনো কল্পনাও করেনি।

তাতারী আগ্রাসনের বিবরণ উল্লেখ করার পূর্বে আমি ভূমিকাস্বরূপ ইসলামী ইতিহাসবিদ ইবনে আছীর জাযারী রহ. এর উক্তি উল্লেখ করাকে যথার্থ মনে করছি। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। অন্যের তুলনায় এ বিষয়ে তাঁর অভিমত অধিক মূল্যবান। কারণ, তিনি ছিলেন তাতারী আগ্রাসনের সমসাময়িক।

শুনুন! ঐতিহাসিক ইবনে আছীর রহ. কী বলেন? তিনি তাতারী হামলার ইতিহাস লিখতে গিয়ে তার মনোবেদনা ও হৃদয়-যন্ত্রণা চেপে রাখতে পারেননি। তিনি বলেন—

لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها، كارها لذكرها، فأنا أقدم إليه رجلا وأؤخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل حدوثها وكنت نسيا منسيا، إلا أنني حثني

جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف، ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعا، فنقول: هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى، والمصيبة الكبرى التي عقت الأيام والليالي عن مثلها، عمت الخلائق، وخصت المسلمين، فلو قال قائل: إن العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم، إلى الآن، لم يبتلوا بمثلها، لكان صادقا، فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها .ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بخت نصر ببني إسرائيل من القتل، وتخريب البيت المقدس، وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعن من البلاد، التي كل مدينة منها أضعاف البيت المقدس، وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى من قتلوا، فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من بني إسرائيل، ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم، وتفنى الدنيا، إلا يأجوج ومأجوج .وأما الدجال فإنه يبقي على من اتبعه، ويهلك من خالفه، وهؤلاء لم يبقوا على أحد، بل قتلوا النساء والرجال والأطفال، وشقوا بطون الحوامل، وقتلوا الأجنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لهذه الحادثة التي استطار شررها و عم ضررها و سارتقي البلاد كالسحاب استدبرته الريح.

"এ ঘটনা এমনই লোমহর্ষক ও হৃদয়বিদারক যে, কয়েক বছর আমি লিখব কি লিখব না এই দ্বন্দেই ছিলাম। একবার ভাবি লিখব, আরেকবার ভাবি না, লিখব না। আসলে ইসলামের দুর্দশা এবং মুসলিম উম্মাহর সর্বনাশের কাহিনি লিখতে পারে এমন কলিজা কারই বা আছে। হায়! যদি আমার জন্মই না হতো, কিংবা এর আগেই আমি মরে যেতাম এবং আমার অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়ে যেত। কিন্তু কিছু বন্ধুর দাবি, এ ঘটনা আমি যেন ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষণ করি। তবু দ্বিধাদ্বন্দ্বেই ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখলাম, না লেখার মধ্যেও কোনো ফায়েদা নেই।

এ ছিল এমন বিপদ ও দুর্যোগ যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আর নেই। যদিও এর প্রধান শিকার ছিল মুসলিম জাতি, তবুও এর বিস্তার ছিল অন্যান্য জাতি পর্যন্ত। কেউ যদি দাবি করে যে, আদম আ. থেকে আজ পর্যন্ত দুনিয়ায় এমন ঘটনা আর ঘটেনি, তাহলে তার দাবি মিথ্যা হবে না। কারণ, এর ধারে-কাছের ঘটনাও ইতিহাসের পাতায় নেই এবং কেয়ামত পর্যন্ত সম্ভবত দুনিয়া এমন ঘটনা আর দেখবে না, ইয়াজুজ-মা'জুজের ঘটনা ছাড়া। নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ কারও প্রতি এই পশুরা কোনো দয়া করেনি। যাকে পেয়েছে তাকেই খুন করেছে, পেট ফেড়ে গর্ভের সন্তান পর্যন্ত। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। লা হাওলা ওয়ালাকুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিইয়িল আজীম।

এ ফেতনা ছিল বিশ্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী। যা এক ভয়ংকর তুফানের মতো ধেয়ে এসেছিল এবং সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল।"[১৮]

এটি ঐতিহাসিক ইবনে আছীর রহ. রচিত দীর্ঘ রচনার ভূমিকা ছিল, যা মনোবেদনা ও হৃদয়যন্ত্রনাকে উসকে দেয়।

আপনি যেভাবেই তুলনা করুন, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ বিবেচনায় তা ছিল মুসলিমবিশ্বের জন্য সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা।

৬১৭ হিজরীতে কী ঘটেছিল

সমরকন্দ অভিমুখে তাতারী বাহিনী

তাতারী বাহিনী সুবিশাল বিস্তৃত বুখারা শহর ও বুখারার অধিবাসী জনপদ, মসজিদ ও মাদরাসাসমূহ ধ্বংস করার পর পার্শ্ববর্তী শহর সমরকন্দ অভিমুখে রওয়ানা হয়। (সমরকন্দ বর্তমান উজবেকিস্তান রাজ্যের একটি শহর।) তারা বুখারা থেকে বিপুলসংখ্যক মুসলিম বন্দীদের নিয়ে রওয়ানা হয়। ইবনে আছীর রহ. বলেন, অতি নিকৃষ্ট পন্থায় তারা তাদের সঙ্গে নিয়ে চলল। কেউ দুর্বল হয়ে হাঁটতে না পারলে তাকে হত্যা করে ফেলত।

কেন তারা বন্দী মুসলমানদের সঙ্গে নিল? বিভিন্ন কারণে তারা মুসলমান বন্দীদের সঙ্গে নিয়েছিল—

এক. তারা প্রত্যেক দশজনের দলকে তাদের পতাকা প্রদান করেছিল। যাতে তারা তাতারীদের পতাকা উঁচিয়ে চলে। দূর থেকে কেউ তাদের দেখলে যেন

---

[১৮] ইবনে আছীর রচিত *আল কামিল :* ১৩/২০১-২০৩।

মনে করে যে, এরাও তাতারীদের দলভুক্ত। ফলে শত্রুবাহিনী তাদের বিপুলসংখ্যক মনে করে যুদ্ধ করার কল্পনাও না করে। এতে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই শত্রুপক্ষ মানসিকভাবে হেরে যেত।

দুই. তারা বন্দীদের শত্রুদের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে বাধ্য করত। কেউ যুদ্ধ করতে অস্বীকার করলে কিংবা কারও মাঝে যুদ্ধ করার মতো শক্তি না থাকলে তারা তাকে হত্যা করে ফেলত।

তিন. তাতারীরা তাদের রণক্ষেত্রে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করত। তাদের প্রথম কাতারে দাঁড় করাত। পেছনে তারা আত্মরক্ষা করত। তাদের পেছন থেকে তারা তির-বর্শা নিক্ষেপ করত। মুসলমান বন্দীরা নিজেদের জীবন দিয়ে তাদের জীবন রক্ষা করত।

চার. শহরের প্রধান ফটকগুলোতে তাতারীরা মুসলমান বন্দীদের রক্তবন্যা বইয়ে দিত। যাতে শত্রুদের অন্তরে তাদের ভীতি ছড়িয়ে পড়ে এবং যেন একথা জানতে পারে যে, যে-ই তাতারীদের বিরোধিতা করবে এমন হবে তার শেষ পরিণতি।

পাঁচ. কোথাও তাতারী সৈন্যরা বন্দী হলে মুসলমান বন্দীদের বিনিময়ে তারা নিজেদের বন্দীদের ফিরিয়ে নিত। তবে এমন খুব কমই ঘটেছে। কারণ, তাতারীরা খুব কমই হেরেছে।

সমরকন্দ পরাজয়ের বিবরণ

সে সময় সমরকন্দ ছিল দুনিয়ার সবচেয়ে সভ্য ও ধনী নগরী। শহরটি ছিল সুউচ্চ প্রাচীর ও মজবুত দুর্গে বেষ্টিত। শহরটি রণকৌশলগত দিক থেকে শক্তিশালী ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার কারণে সম্রাট মুহাম্মদ ইবনে খাওয়ারেযম শাহ তা সংরক্ষণের জন্য পঞ্চাশ হাজার খাওয়ারেযমী সৈন্য নিয়োগ দেন। তা ছিল নাগরিক সংখ্যার প্রায় অর্ধেক। শহরটির জনসংখ্যা ছিল আনুমানিক লক্ষাধিক। এদিকে মুহাম্মদ ইবনে খাওয়ারেযম শাহ তখন উরজিন্দা (বর্তমান তুরমেনিস্তান) রাজধানীতে অবস্থান করতেন।

চেঙ্গিজ খান সমরকন্দে পৌঁছে চারপাশ থেকে তা ঘিরে ফেলে। এ অবস্থায় খাওয়ারেযমের সুসংগটিত সৈন্যবাহিনী মোকাবেলার উদ্দেশ্যে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসাই পরিস্থিতির দাবি ছিল। কিন্তু আফসোস! তারা ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়ে। জীবনকে তারা লাঞ্ছনার অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে। তারা শহর রক্ষার স্বার্থে বের হতে অস্বীকৃতি জানায়।

অবশেষে শহরবাসী সৈন্যদলের পক্ষ থেকে কোনোরূপ সহযোগিতার আশ্বাস না পেয়ে একত্রিত হয়ে এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করে। কতিপয় পাহাড়সম সুদৃঢ় মনোবলচিত্ত সাধারণ লোক তাতারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যেই সিদ্ধান্ত সেই কাজ! কৃষক-মজুর, ছাত্র-শিক্ষক ও শহরের দৃঢ়সাহসী যুবকদের সত্তর হাজার তাজাপ্রাণ তাতারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। তারা সবাই পদব্রজে বেরিয়ে পড়ে। তাদের সঙ্গে কোনো ঘোড়া কিংবা উট তথা কোনো বাহন ছিল না। তাদের কাছে উল্লেখযোগ্য যুদ্ধসরঞ্জামাদিও ছিল না, যা দিয়ে তারা শত্রুর মোকাবেলা করতে পারে। এত কিছুর পরেও তারা সেই দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছে, সেনাবাহিনীর যে দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার কথা ছিল। আফসোস! তাদের সেই দায়িত্ববোধ জাগ্রত হলো না, তাদের ভেতরে আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হলো না।

তাতারীরা সমরকন্দবাসীকে বের হতে দেখে মারাত্মক ধোঁকার আশ্রয় নিল। তারা প্রথমত পলায়নপরভাব প্রকাশ করলে শহরের চারপাশের প্রাচীর পথে তারা প্রত্যাবর্তন শুরু করে। এদিকে মুসলিম মুজাহিদরা শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লে তারা শহর দখল করে নেয়। এভাবেই তাতারীদের রণকৌশল সফল হয়। রণকৌশলে অনভিজ্ঞ মুসলিম মুজাহিদরা যখন শহর থেকে বহু দূরে চলে যায়, তখন তাতারী বাহিনী মুসলমানদের বেষ্টন করে ফেলে। শুরু হয় মুসলিম নিধন, নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ!

এই অপ্রতিরোধ্য হত্যাযজ্ঞে নিহত মুসলমানদের সংখ্যা

তারা সকলকে হত্যা করেছে ...!!

মুসলমানদের সর্বশেষ ব্যক্তিও শহীদ হয়েছে ...!!

মুসলমানগণ সমরকন্দ যুদ্ধে তাতারীদের এক অভিযানে সত্তর হাজার মুসলিম সেনা হারিয়েছে। (একটু ভেবে দেখুন, সেদিন মুসলমানগণ কীরূপ বেদনাবিভোর হয়েছিলেন, যেদিন তারা সত্তর হাজার সৈন্য হারিয়েছিলেন!!) এটা কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না; বরং যা হবার ছিল তা-ই হয়েছে। এ যুদ্ধে মুসলমানগণ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ না করা ও নবপ্রজন্মকে রণকৌশল শিক্ষা না দেওয়ার মূল্য দিয়েছে। মূল্য দিয়েছে শক্তিশালী শত্রুর প্রতি মনোনিবেশ না করার।

ফলে তাতারীরা নব উদ্যমে সমরকন্দ অবরোধ করতে ফিরে এসেছে। আর সুসংহত খাওয়ারেযমী সৈন্যবাহিনী লাঞ্ছনার জীবন বেছে নিয়েছে!!

তারা নিরাপত্তার বিনিময়ে সমরকন্দ শহর তাতারীদের হাতে অর্পণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অথচ তারা খুব ভাল জানত যে, তাতারী জাতি প্রতিশ্রুতি রক্ষায় শ্রদ্ধাশীল নয়, তারা কোনো সন্ধিচুক্তি রক্ষা করে না। বুখারার পবিত্র ভূমিতে মুসলিমনিধনের ঘটনা খুব দূরের নয়! কিন্তু হায়! তারা জীবনের মায়া ত্যাগ করতে পারেনি! সাধারণ জনগণ তাদের বলেছিল, তাদের সঙ্গে তাতারীরা কী আচরণ করেছে, তা তো ইতিহাসের পাতায় সমুজ্জ্বল। তবু তারা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার কল্পনাও করতে পারত না। অভ্যাসমোত তাতারীরা সমরকন্দবাসীকে ভুয়া নিরাপত্তা প্রদানে একমত হলো। সৈন্যবাহিনী তাদের জন্য সমরকন্দ শহর উন্মুক্ত করে দিল। সাধারণ জনগণ কিছুতেই তাদেরকে বাধা দিতে পারল না। খাওয়ারেযমের সৈন্যরা নিজ গোত্রে ছিল বাঘ, আর শত্রুবাহিনীর সামনে ছিল বিড়াল!!

তারা তাতারী বাহিনীর সামনে কাতর আত্মসমর্পণ করল। তাতারীরা তাদের বলল, তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র, ধন-সম্পত্তি ও বাহনজন্তুগুলো আমাদের হাতে অর্পণ করো। আমরা তোমাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাব। তারা নতিস্বীকারকরতঃ হুকুম তামিল করল। তাতারীরা তাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও বাহন জন্তুগুলো নিয়ে নেওয়ার পর তা-ই করল, যা তাতারী জাতির কাছে আশা করা যায়। তারা তরবারি কোষমুক্ত করে তাদের সবাইকে নির্দয়ভাবে হত্যা করল। মুসলিম সেনারা মনোবলহীনতার প্রতিদান দিল!! লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

এরপর তাতার বাহিনী রক্তে ভাসমান সমরকন্দে প্রবেশ করে সেই সব ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হলো, ইতিপূর্বে তারা বুখারায় যেসব কাজে লিপ্ত হয়েছিল। তারা অগণিত নারী-পুরুষ ও শিশু বাচ্চাদের হত্যা করল। শহরের সব সম্পত্তি ছিনিয়ে নিল। নারীদের ইজ্জত-সম্ভ্রম কেড়ে নিল। লোকদের বিভিন্ন ধরনের মর্মান্তিক শাস্তি দিল। অসংখ্য শিশু ও নারী বন্দী করল। বয়সের ভার কিংবা শারীরিক দুর্বলতার কারণে যারা বন্দী উপযুক্ত ছিল না, তাদের অমানবিক হত্যা করল। কেন্দ্রীয় মসজিদ জ্বালিয়ে দিল। সমরকন্দ শহরকে বিরানভূমিতে পরিণত করল।

আহ! পৃথিবীর মুসলমানগণ এই হত্যাযজ্ঞের কথা শুনে কীভাবে আরাম আয়েশে বিভোর ছিল!! গগনবিদারী আহাজারি কি তাদের কানে পৌঁছেনি?! তবু কেন তারা তাতারীদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হলো না?!

ধন-সম্পত্তি, ইজ্জত-সম্মান, জান-প্রাণ ও দ্বীন-ধর্ম নিশ্চিত ধ্বংস জেনেও তারা কীভাবে বিভাজন-বিভক্তি, আত্মকলহ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত থেকেছে?! মুসলিম শাসকবৃন্দ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য পরিচালনা করত এবং সেখানে স্বাধীন পতাকা উত্তোলন করত। তারা একথা বিশ্বাস করত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের ক্ষুদ্র রাজ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ সৃষ্টি না হয়, ততক্ষণ তারা নিরাপদ জীবনযাপন করবে!! তারা ভুয়া নিরাপত্তার স্বপ্নে বিভোর হয়ে নিজেদের ধোঁকা দিত। এমনকি নিজ রাজ্য থেকে কয়েক মাইল দূরেও যুদ্ধ হলে তাদের টনক নড়ত না! আমার কথা শুনে আপনি বিস্ময়াভিভূত হবেন না! অনুগ্রহপূর্বক আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে বলুন তো, কয়জন মুসলিম সৈন্য ফালুজা বা ফিলিস্তিনের মুসলমানদের বাঁচানোর জন্য গা নড়ে বসেছে? কয়জন মুসলিম সৈন্য ফিলিস্তিনীদের বাঁচাও, বাঁচাও আর্তনাদ শুনে শিহরিত হয়েছে?!

মুসলিম শাসকগণ একথা চিন্তা করেননি যে, তারা এই ভয়ানক পরিস্থির মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন। বুখারা ও সমরকন্দ এলাকায় যে হত্যাযজ্ঞ ঘটেছে, তা সকল মুসলমানের ভবিষ্যৎ অবশ্যম্ভাবী ভয়ানক পরিস্থিতির ভূমিকামাত্র। কাছের দূরের কেউই তা থেকে রক্ষা পাবে না। ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

নিকৃষ্ট সমাপ্তি

চেঙ্গিজ খান—তার ওপর আল্লাহর লানত অবতীর্ণ হোক—সমরকন্দ অঞ্চলে অবস্থান শুরু করল। সে সময় আমলাকা শহরের দিকে তার কুদৃষ্টি পড়ল। এর পূর্বে সে এর চেয়ে দৃষ্টিনন্দন কোনো শহর দেখেনি। আমলাকা দখলের জন্য সে যে দুরভিসন্ধি এঁটেছে, তা হলো, সর্বপ্রথম এই সাম্রাজ্যের সম্রাটকে হত্যা করতে হবে। যাতে শহর দখলের পথে সৈন্যবাহিনীর সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার কোনো আশঙ্কা অবশিষ্ট না থাকে। এ লক্ষ্যে সে মুসলিম সম্রাট মুহাম্মদ ইবনে খাওয়ারেযম শাহকে তলব করার জন্য বিশ হাজার সৈন্য প্রেরণ করল।

চেঙ্গিজ খান কর্তৃক মাত্র বিশ হাজার সৈন্য প্রেরণের মাধ্যমে মূলত মোহাম্মদ ইবনে খাওয়ারেযম ও তাঁর প্রজাদের প্রতি নেহায়েত তুচ্ছ-তাচ্ছল্য প্রদর্শন করা হয়েছে। কারণ, এই স্বল্পসংখ্যক তাতারী বাহিনীকে বিশাল মুসলিম বাহিনী অনায়াশে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে পারে। এই ক্ষুদ্রসংখ্যক তাতারী বাহিনী কী করল, তা আমরা আলোচনা করব—ইনশাআল্লাহ! চেঙ্গিজ খান তাদের বলল,

"খাওয়ারেযম শাহকে ডেকে নিয়ে এসো। সে যেখানেই থাকুক না কেন, আসমানের সঙ্গে ঝুলে থাকলেও।"

চেঙ্গিজ খানের নির্দেশে তাতারী বাহিনী উরজিন্দা (তুরমেনিস্তান) অভিমুখে রওয়ানা হলো, যে শহরে সম্রাট মুহাম্মদ ইবনে খাওয়ারেযম শাহ অবস্থান করতেন। শহরটি জাইহুন (আমুদরিয়া) নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। তাতারী বাহিনী নদীর পূর্ব দিক থেকে আগমন করল। ফলে নদী দুই দলের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। মুসলমানগণ তাতারীদের প্রতিহত কারার জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে এল। তাদের দৃঢ় প্রত্যয়ের কারণ ছিল, তারা জানত, নদী তাদের মাঝে প্রতিবন্ধক আর তাতারী বাহিনীর সঙ্গে কোনো নৌকা নেই।

তাতারী বাহিনী কী পন্থা অবলম্বন করল

তাতার বাহিনী বাঁশের বড় বড় খাঁচা তৈরি শুরু করল। এরপর খাঁচাগুলোকে গরুর চামড়া দ্বারা আবৃত করল, যাতে খাঁচায় পানি প্রবেশ না করে। সেসব খাঁচায় অস্ত্র, আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখল। এরপর ঘোড়াগুলোকে পানিতে নামাল। ঘোড়া তো খুব সাঁতার জানে। এরপর তারা শক্ত করে ঘোড়ার লেজ আঁকড়ে ধরল। অবস্থা এই দাঁড়াল যে, ঘোড়াগুলো সাঁতার কাটছে। সৈন্যরা লেজ আঁকড়ে ঝুলে আছে। আর তাদের পিঠে বাঁশের খাঁচা। যাতে রয়েছে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র।

এই অভিনব পদ্ধতিতে তাতারী বাহিনী আমুদরিয়া পাড়ি দিল। আমি জানি না, তখন খাওয়ারেযম বাহিনীর গুপ্তচররা কোথায় ছিল? মুসলিম সৈন্যরা হঠাৎ তাতারী বাহিনী নিজেদের কাছাকাছি দেখতে পেয়ে হতভম্ব হলো। বিপুলসংখ্যক মুসলিম বাহিনী সত্ত্বেও তারা তাতারীদের দেখে ভীতসন্ত্রস্ত হলো। একটু পূর্বে তারা লড়াই করার জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিল কেবল এই জন্য যে, তারা জানত তাদের মাঝে নদী রয়েছে। আর এখন ...। এখন তাদের সামনে একটাই পথ। আপনি কী মনে করেছেন, তা লড়াইয়ের পথ? না; বরং তা পালাবার পথ!!

যেমনটি ইবনে আছীর রহ. বলেন—

"সম্রাট খাওয়ারেযম শাহ তাঁর বিশেষ ফোর্সের সহযোগিতা ছাড়াই তুরমেনিস্তান ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। নিশাপুর অভিমুখে রওয়ানা হলেন (নিশাপুর বর্তমানে ইরানে অবস্থিত)। মুসলিম বাহিনী বিভিন্ন দিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!"

এ যাত্রায় তাতারী বাহিনীর নিদৃষ্ট লক্ষ্য ছিল মুহাম্মদ ইবনে খাওয়ারেযম শাহকে খুঁজে বের করা। তাই তারা তুরমেনিস্তান ছেড়ে মুসলিম সাম্রাজ্যের সুবিশাল বিস্তৃত ভূমি পাড়ি দিয়ে নিশাপুর অভিমুখে রওয়ানা হলো।

তারা সংখ্যায় বিশ হাজারের অধিক ছিল না! চেঙ্গিজ খান সমরকন্দেই অবস্থান করছিল। মুসলিম সাম্রাজ্যের যেকোনো ভূখণ্ডে তাতারী বাহিনীর এই ক্ষুদ্র দলকে অবরোধ করা অতি সহজ ছিল। কিন্তু তাতারীদের ভয়ভীতি মুসলমানদের অন্তরে চেপে বসেছিল। তারা সর্বত্রই তাদের দেখলে পলায়নপর হতো। ফলে তারাও সম্রাটের অনুকরণে পালাবার পথ ধরল। সেই সম্রাট নিয়মিত এক শহর থেকে অন্য শহরে পলায়ন করছে, যা আমরা প্রত্যক্ষ করলাম।

এই যাত্রায় তাতারী বাহিনীর লক্ষ্য হত্যা, লুণ্ঠন, কিংবা জনপদ ধ্বংস করা ছিল না। তাদের লক্ষ্য ছিল সুস্পষ্ট। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মুসলিমপ্রধান সম্রাটকে পাকড়াও করা। তারা গনিমত সঞ্চয় কিংবা হত্যার পেছনে পড়ে সময় বিনষ্ট করতে চায়নি। অন্যদিকে তাদের বাধা দিলে পাল্টা আক্রমণ ও বিপদের শঙ্কায় সাধারণ জনগণও তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

এভাবেই তাতারী বাহিনী অল্প কিছুদিনের ভেতরে নিশাপুর শহরের নিকটে পৌঁছল। সম্রাট মুহাম্মদ ইবনে খাওয়ারেযম শাহ সেনাবাহিনী সুসংহত করার সুযোগ পাননি। সময় ছিল খুবই সংকীর্ণ। আর দুর্বার তাতারী বাহিনী ছিল তাঁর পেছনে। তারা নিশাপুরের কাছাকাছি পৌঁছেছে শুনে সম্রাট নিশাপুর ছেড়ে (ইরানের এক শহর) 'মাজিন্দারান' অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তাতারী বাহিনী এ সংবাদ পেয়ে নিশাপুর গমন না করেই তাঁর পিছু ধাওয়া করল। ফলে সম্রাট মাজিন্দারান ছেড়ে রায়নগরী অতঃপর হামাদান নগরীর অভিমুখে রওয়ানা হলেন (রায় ও হামাদান ইরানের দুটি শহরের নাম)। তাতারী বাহিনী তাঁর পিছু পিছুই রয়েছে। এরপর সম্রাট মাজিন্দারান শহরে পালিয়ে এলেন। এ পলায়নপরতা সম্রাটের জন্য ছিল বড়ই লজ্জা ও অপমানকর। তারপর সম্রাট কাযবীন সমুদ্রতীরে অবস্থিত তবারিস্তান অঞ্চলের দিকে রওয়ানা হলেন। তিনি সেখানে একটি জাহাজে আরোহণ করে সমুদ্রের মাঝে চলে গেলেন। তাতারী বাহিনী সমুদ্র পাড়ে দাঁড়িয়ে রইল। সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার মতো তারা কোনো নৌযান পেল না।

এতক্ষণে সফল হলেন মুসলিম সম্রাট খাওয়ারেযম শাহ!! সফল হলো তাঁর পলায়নপরতা।

মুহাম্মদ ইবনে খাওয়ারেযম শাহ কাযবীন সমুদ্রের মধ্যখানে অবস্থিত একটি দীপে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তিনি সেখানকার একটি দুর্গে অবস্থান করলেন। আহ! হতদরিদ্র অবস্থায় দুর্বিসহ জীবনযাপন। তিনি সেই সম্রাট, যিনি সুবিশাল বিস্তৃত সাম্রাজ্য ও অঢেল সম্পত্তির মালিক। কিন্তু মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য বিভীষিকাময় জীবনযাপন পেয়েও তিনি সন্তুষ্টচিত্ত।

সুবহানাল্লাহ! মৃত্যুর হাত থেকে তো কেউই বাঁচতে পারবে না। কয়েক দিন অতিবাহিত না হতেই সেই উপত্যকার দুর্গের ভেতরে পলায়নপর ঘরছাড়া হতদরিদ্র অবস্থায় মুসলিম সম্রাট মুহাম্মদ ইবনে খাওয়ারেযম শাহ ইন্তেকাল করেন। এমনকি তারা কাফন দেওয়ার মতো কিছু পায়নি। অবশেষে যে বিছানায় তিনি ঘুমাতেন, সেই বিছানাতেই তাঁকে কাফন দেওয়া হয়!!!

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ

"তোমরা যেখানেই (একদিন না-একদিন) মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, চাই তোমরা সুরক্ষিত কোনো দুর্গেই থাকো না কেন।"[১৯]

কোন অবস্থার মৃত্যু সম্মানজনক

বন্ধুরা, বলুন তো, কোন অবস্থার মৃত্যু সম্মানজনক?

সমুদ্রপৃষ্ঠের উপত্যকায় অপমানিত অবস্থায় মুসলিম সম্রাটের মৃত্যুবরণ, নাকি জিহাদের ময়দানে প্রশান্ত মনে মাথা উঁচিয়ে মৃত্যুবরণ সম্মানজনক?!

অগ্রবর্তী অবস্থায় নাকি পশ্চাৎপদ অবস্থায় মৃত্যুবরণ সম্মাজনক?

পলায়নপর অবস্থার নাকি শহীদের অমীয় সুধা পান করা অবস্থার মৃত্যুবরণ উত্তম?

মানুষ নিজের মৃত্যুক্ষণ নির্ধারণ করতে পারে না। তবে মৃত্যুপদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারে। কোনো বীর বাহাদুর হায়াত হ্রাস করতে পারে না, যেমন কাপুরুষতা ও পলায়নপরতা হায়াত বৃদ্ধি করতে পারে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদ হয়ে বেঁচে থাকে, সে আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদ অবস্থায় ইন্তেকাল করে। যদিও তার মৃত্যু হয় নিজ বিছানার ওপর।

ইমাম মুসলিম রহ. হযরত সাহল ইবনে হুনাইফ রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

[১৯] সুরা নিসা : ৭৮।

مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ، بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ

"যে ব্যক্তি হৃদয়ের গভীর থেকে শাহাদাত কামনা করে। আল্লাহ তা'আলা তাকে শহীদদের মর্যাদা দান করবেন। যদিও সে নিজ বিছানার শোয়া অবস্থায় ইন্তেকাল করে।"[২০]

ইবনে আছীর রহ. মুহাম্মদ ইবনে খাওয়ারেযম শাহের ব্যক্তিগত জীবন আলোচনা করতে গিয়ে কিছু অদ্ভুত বিষয়ের অবতারণা করেছেন। তার গুণাবলি পাঠ করলে আপনার মনে হবে আপনি যেন বিখ্যাত কোনো মুসলিম মনীষীর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। পক্ষান্তরে যখন তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তে তার পলায়নপরতা এবং কাপুরুষতা নিয়ে আলোচনা করবেন, তখন সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ফুটে উঠবে।

ইবনে আছীর রহ. তার জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বলেন—

وكانت ملكه احدى و عشرين سنة و شهورا تقريبا واتسع ملكه و عظم محله و اطاعه العالم باسره ملك من حد العراق الى تركستان و ملك بلاد غزنة (في افغانستان) و بعض الهند وملك سجستان و كرمان (باكستان) و طبرستان و جرجان و بلاد الجبال و خراسان و بعض فارس (وكلها مناطق في ايران)

"তাঁর রাজত্বকাল ছিল প্রায় একুশ বছর কয়েক মাস। তা সুবিশাল বিস্তৃতি লাভ করেছিল। গোটা বিশ্ব তার অনুগত হয়েছিল। ইরাক থেকে তুরকিস্তান, আফগানিস্তান, হিন্দুস্তানের কিছু প্রদেশ, সিজিস্তান, পাকিস্তান, তবারিস্তান, জুরজান, খোরাসান এবং পারস্যের কিছু এলাকা পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব বিস্তৃত ছিল।"

ইবনে আছীর রহ. এর উল্লেখিত বক্তব্য থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি নিজ রাজত্ব ও মহিমায় ছিলেন সুমহান ব্যক্তিত্ব। এখান থেকে তাঁর রাজ্য পরিচালনার দক্ষতা ও বিচক্ষণতার বিষয়টিও প্রতিভাত হয়। এমনকি ইবনে আছীর রহ. বলেন—

---

[২০] *মুসলিম :* ১৯০৯।

وكان صبورا على التعب و ادمان السير غير متنعم ولا مقبر على اللذات.
انما همه في لا ملك و تدبيره و حفظه خفز رعاياه

''তিনি কষ্ট-ক্লেশে পাহাড়সম ধৈর্যশীল ছিলেন। প্রচুর সফর করতেন। আয়েশী বা বিলাসী ছিলেন না। সর্বদা তিনি রাজ্য পরিচালনা ও রক্ষা এবং প্রজাদের জান-মাল হেফাজতের বিষয়ে ব্যস্ত থাকতেন।"

এবং তার ইলমী জীবন পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন—

وكان فاضلا عالما وكان مكرما للعلماء محبا لهم محسنا اليهم يكثر مجالسهم و
مناظرتهم بين يديه وكان معظما لاهل الدين مقبلا عليهم متبركا بهم

"তিনি ছিলেন মহৎ আলেম। উলামায়ে কেরামকে যথার্থ সম্মান করতেন। তাদের ভালোবাসতেন। তাদের প্রতি সদাচরণ করতেন। তার দরবারে উলামায়ে কেরামের মজলিস ও মুনাজারা (তর্ক-বিতর্ক) অনুষ্ঠান প্রচুর পরিমাণে আয়োজিত হতো। তিনি দ্বীনদার লোকদের খুব সম্মান করতেন। নিজে তাদের কাছে যেতেন এবং তাদের সাহচর্যে বরকত লাভ করতেন।"

মুহাম্মদ ইবনে খাওয়ারেযম শাহের উল্লেখিত গুণাবলি পাঠকমহলকে ধাঁধায় ফেলে দেয় যে, এমন উত্তম গুণাবলির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এরূপ নিকৃষ্ট পরাজয়ের শিকার কেন হলেন? কী করে? কেন তিনি তাতারী বাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য সুবিশাল বিস্তৃত রাজ্যের প্রদেশগুলোর সহযোগিতা পেলেন না? ফলে এই নিকৃষ্ট সমাপ্তির শিকার হলেন?!

আমিও [লেখক] বিষয়টি নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। এর সঠিক কারণ অনুসন্ধান করছিলাম। বহু খোঁজাখুঁজির পর অন্য এক জায়গায় ইবনে আছীর রহ.-এর লিখিত এক বক্তব্য খুঁজে পেলাম। তার এই বক্তব্যে মুহাম্মদ ইবনে খাওয়ারেযম শাহের পরাজয় ও সহযোগিতা না পাওয়ার কারণ ফুটে উঠেছে। ইবনে আছীর রহ. বলেন—

محمد بن خوارزم شاه قد استولي على البلاد و قتل ملوكها وافناهم وبقي هو
وحده سلطان البلاد جميعها فلما انهزم من التتار لم يبق من يمنعهم و لا
من يحميها

> "মুহাম্মদ ইবনে খাওয়ারেযম শাহ সাম্রাজ্যের প্রত্যেকটি প্রদেশের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। রাজা-বাদশাদের হত্যা করেছিলেন। সাম্রাজ্যের একনায়করূপে তিনিই অবশিষ্ট ছিলেন। ফলে তাতারী হামলার সময় তাঁর পাশে দাঁড়ানোর মতো কিংবা তাঁকে সাহায্য করার মতো কেউই বেঁচে ছিল না।"

উল্লেখিত বক্তব্য তৎকালীন মুসলিম জাতির ব্যাপক অধঃপতনের সুস্পষ্ট বিবরণ তুলে ধরছে। একথা চিরসত্য যে, ব্যক্তিগত জীবন ও রাজ্য পরিচালনায় মুহাম্মদ ইবনে খাওয়ারেযম শাহ ছিলেন দক্ষ ও বিচক্ষণ সম্রাট। তবে তিনি পার্শ্ববর্তী মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। তাদের প্রতি কখনোই সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করেননি; বরং বিপরীতে একের পর এক সবাইকে হত্যা করেছেন। রাজাদের হত্যা করে তিনি সেসব রাজ্য নিজের দখলে নিয়ে নিতেন। নিঃসন্দেহে তাঁর এই কূটকৌশল এসব অঞ্চলের প্রজাদের ভেতরে চাপা ক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল। এক্ষেত্রে তিনি প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনচরিত্রের দিকে দেখুন, তিনি কোনো অঞ্চল নিজের করলে পূর্বেকার রাজাকে সেই রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করতেন। তাদের ঘরবাড়ি অক্ষত রাখতেন। এতে মুসলিম রাজ্যের পরিধি বিস্তৃতি লাভ করার পাশাপাশি মানুষের ভালোবাসা অর্জিত হতো। তিনি বাহরাইনের পূর্ব রাজা মুনজির ইবনে সাওয়ারকেই বাহরাইনের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। ওমানের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন পূর্বেকার দুই রাজা জিদার ও ইবাদকে এবং ইয়ামানের শাসনকর্তা বাজান ইবনে সালমান ফারেসী। ইসলামগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ইয়ামানের শাসনক্ষমতা তাকে অর্পণ করেছিলেন।

এটিই ছিল একই সঙ্গে রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার পরিচায়ক। এটি হলো ক্রোধ ও ভালোবাসার উত্তম সংমিশ্রণ। এটি রাজ্য পরিচালনার উৎকৃষ্ট পন্থা।

পক্ষান্তরে মুহাম্মদ ইবনে খাওয়ারেযম শাহের দিকে তাকান। তিনি ক্রোধ, ভালোবাসা এবং উদারতা ও রূঢ়তার মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেননি। তিনি শাসক হয়েছেন শক্তিবলে; মানুষের ভালোবাসা জয় করেননি। ফলে তার প্রয়োজনের সময় মানুষ তার দিকে এগিয়ে আসেনি। সাহায্য লাভের আশায় তিনি তাদের দ্বারস্থও হয়েছেন। কিন্তু হায় ...!!

আব্বাসী খেলাফত ও খাওয়ারেযম সাম্রাজ্যের মাঝে কেবল দ্বন্দ্ব-সংঘাত ছিল না; বরং খাওয়ারেযম সাম্রাজ্য নিজে নিজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংঘাতে লিপ্ত

ছিল। ফলে এই অঞ্চলের জনগণও এক আদর্শের আজ্ঞাবহ ছিল না। ফলে তারা এক কাতারভুক্ত হয়নি এবং পরস্পর সহযোগিতা করেনি। কোনো দল বা জাতি এমন শতধা বিভক্ত হলে সাহায্য লাভের উপযুক্ত থাকে না।

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ

> "যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মতো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।"[২১]

এই ছিল সুবিশাল বিস্তৃত রাজ্যের সম্রাট, প্রতাপপ্রবল বিপুল সৈন্যের সেনাপতি মুহাম্মদ ইবনে খাওয়ারেযম শাহের অধঃপতনের মূল রহস্য। যার শেষ পরিণতি হয়েছিল পলায়নপর অবস্থায় সমুদ্রপৃষ্ঠে নির্জন দ্বীপে একাকী অনাহারে মৃত্যু!!

সুনানে নাসায়ী ও *মুসনাদে আহমদে* হযরত আবু দারদা রা. সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ

> "তোমরা দলবদ্ধ থাকবে, কারণ নেকড়ে বাঘ সঙ্গীহীন ভেড়াকে খেয়ে ফেলবে।"[২২]

মুসলিম সম্রাট মুহাম্মদ ইবনে খাওয়ারেযম শাহের পলায়নের পর তাতারী বাহিনী কী করেছিল?

বিশ হাজার সৈন্যের ক্ষুদ্র তাতারী বাহিনী কী করেছিল? মুসলিম সাম্রাজ্যের গভীরে প্রবেশ করে শত্রু বাহিনী কী করেছিল?

পারস্য আক্রমণ

বিশ হাজার তাতারী বাহিনীর ক্ষুদ্র দল চেঙ্গিজ খানের প্রধান ঘাঁটি সমরকন্দ থেকে ৬৫০ কিলোমিটারেরও দূরে অবস্থান করছিল। এই দূরত্ব নির্ধারিত হয়েছে মহাসড়কের হিসাব অনুযায়ী। যদি আপনি সে অঞ্চলে পাহাড়ি পথের দূরত্ব কিংবা নদীপথের হিসাব করেন, তাহলে তা বহু গুণে বৃদ্ধি পাবে। উপরন্তু তাতারী বাহিনী অত্র অঞ্চলের অধিবাসী ছিল না। তারা এ অঞ্চলের পথ-ঘাট, গিরিপথ ও অলিগলিও চিনত না। আপনি যদি উক্ত বিষয়গুলোর আলোকে বিবেচনা করেন, তাহলে দেখবেন, বাহ্যত তাতারী বাহিনীর বড় বিপর্যয়ের

---

[২১] সুরা সাফ : ৪।

[২২] *নাসায়ী : ৮৪৭, মুসনাদে আহমদ :* ২৭৫১৪।

মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল, যে বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠা বড় দুরূহ ব্যাপার ছিল। কারণ, সংখ্যায় তারা খুব বেশি ছিল না। তারা ছিল মাত্র বিশ হাজার। সুতরাং—

১. সৈন্য স্বল্পতা।

২. নিজ এলাকা থেকে ৬৫০ কিলোমিটারের দূরত্ব।

৩. পথ-ঘাট অপরিচিত ইত্যাদি বিষয়াদি বিবেচনায় বলা যায়, তাতারী বাহিনী ধ্বংস হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। যদি মুসলিম সৈন্যরা তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াত যারা সংখ্যায় কয়েক মিলিয়ন ছিল, তাহলে তাতারীরা কোনোভাবেই বিজয় লাভ করতে পারত না।

এটি ছিল খাতা-কলমের ফলাফল।

কিন্তু পরবর্তী সময় কী ঘটেছে?!

আমরা প্রত্যক্ষ করেছি আশ্চর্যজনক লাঞ্ছনা, অবক্ষয় ও অধঃপতন!!

মুসলমানদের অন্তর কাপুরুষতার কালো ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। নিকৃষ্ট দুনিয়ার অর্থহীন মোহে তারা মত্ত ছিল। ঘরের চার দেয়ালের ভেতর ক্ষুদ্র তাতারী বাহিনীর হাতে অকাল মৃত্যুবরণ করার অপেক্ষায় তারা দিন গুনছিল।

ইমাম আবু দাউদ রহ. হযরত ছাওবান রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا، فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: حُبُّ الدُّنْيَا، وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ

'খুব শীঘ্রই আমার উম্মতরা একে অপরকে ডাকতে থাকবে, যেমন খাবার ভক্ষণকারীরা একে অপরকে ডাকতে থাকে। কেউ জিজ্ঞাসা করবে, সে দিন কি আমরা সংখ্যায় কম হব? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, না, সে দিন তোমরা সংখ্যায় অনেক বেশি হবে। তবে স্রোতে ভাসমান খড়কুটোর মতো হবে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় সরিয়ে দেবেন। আর

তোমাদের অন্তরে 'ওহান' ঢেলে দেবেন। কেউ জিজ্ঞাসা করল, 'ওহান' কী? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দুনিয়াপ্রীতি ও মৃত্যুর ভয়।"[২৩]

পার্থিব মোহ ও দুনিয়া প্রীতিতে তাদের অন্তর মোহাপিষ্ট ছিল। মুসলমানরা আল্লাহর পথে শাহাদাতবরণকে অপছন্দ করতে শুরু করেছিল। ফলে তারা নদীর স্রোতে ভাসমান খড়কুটার মতো হয়েছিল। স্রোতের আবহে তারা গা হেলিয়ে দিত। স্রোত যেদিকে মোড় নিত, তারাও সেদিকে মোড় নিত। তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বলতে কিছুই ছিল না। আল্লাহ তা'আলা তাতারী বাহিনীর অন্তর থেকে মুসলমানদের ভয়ভীতি দূর করে দিয়েছিলেন। ফলে ক্ষুদ্র তাতারী বাহিনী মুসলমানদের বিশাল বাহিনী দেখে ভীতিবিহ্বল হয়ে পশ্চাদ্গমন করেনি। অন্য দিকে মুসলমানদের অন্তরে কাপুরুষতা, মনোবলহীনতা ও দুর্বলতা ঢেলে দিয়েছিলেন। ফলে একশজন মুসলিম সৈন্য একজন সাধারণ তাতারী সৈন্যের সামনে পা শক্ত করে দাঁড়াতে পারেনি। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

তাতারীদের বিশেষ ফোর্স কী পদক্ষেপ গ্রহণ করল

সম্রাট মুহাম্মদ ইবনে খাওয়ারেযম শাহকে ধরতে না পেরে তাতারী বাহিনী কাযবীন সমুদ্রতীর থেকে প্রত্যাবর্তন করে ইরানের মাঝের প্রদেশটি দখল করে ফেলল। অথচ তৎকালীন মুসলিমবিশ্বের সবচেয়ে সুরক্ষিত অঞ্চল ছিল মাজিন্দারান। তাতে ছিল বহু শক্তিশালী দুর্গ। এটি সে সময় মুসলিম দেশসমূহের মাঝে সবচেয়ে শক্তিধর বিবেচিত হতো। এমনকি খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর যুগে মুসলমানগণ ইরাক থেকে খোরাসান পর্যন্ত সুবিশাল ভূখণ্ড দখল করলেও মাজিন্দারান প্রদেশে প্রবেশ করতে পারেনি। সবশেষে বিখ্যাত উমাইয়া খলিফা সুলাইমান ইবনে আবদুল মালেক রহ. এর যুগে মুসলমানগণ তা জয় করেন। অথচ তাতারী বাহিনী তা খুব সহজে অতিদ্রুত দখল করে ফেলে। তাতারীরা তা শক্তিবলে দখল করেছে, বিষয়টি এমন নয়; বরং মুসলমানদের মনোবলহীনতার সুযোগে তারা তা দখল করেছিল। অঞ্চলটি দখল করার পর ছিনতাই, হত্যা, বন্দী, শাস্তি প্রদান, জনপদ জ্বালিয়ে দেওয়াসহ তারা তা-ই করেছে, যা তারা অন্যান্য অঞ্চলে করেছিল।

---

[২৩] *আবু দাউদ : ৪২৯৬।*

এরপর তারা ইরানের বিখ্যাত 'রায়' নগরীর দিকে কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে। সুবহানাল্লাহ! মুহাম্মদ ইবনে খাওয়ারেযম শাহের মৃত্যুর পরও আল্লাহ তা'আলা তাকে লাঞ্ছিত করতে চেয়েছিলেন। মাজিন্দারান থেকে 'রায়' নগরীর দিকে ফেরার পথে পথিমধ্যে তারা সম্রাট মুহাম্মদ ইবনে খাওয়ারেযম শাহের শ্রদ্ধেয় মাতা ও তার স্ত্রীদের দেখতে পায়। তাদের সঙ্গে ছিল বিপুল পরিমাণ মূল্যবান ধন-সম্পত্তি। তারা তাদের সবাইকে বন্দী করে এবং গনিমতস্বরূপ ধন-সম্পত্তি দখল করে। তৎক্ষণাৎ তাদের ক্ষমতাসীন চেঙ্গিজ খানের কাছে পাঠিয়ে দেয়।

এরপর তাতারী বাহিনী রায়নগরীতে পৌঁছে তাও দখল করে নেয়। তাতে তারা ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়। ছিনতাই করে শহরের সব মূল্যবান সম্পত্তি। শিশু বাচ্চাদের চুরি করে এবং এমনসব হীন কাজ আঞ্জাম দেয়, যা পৃথিবীর ইতিহাস কখনো শোনেনি!! এরপর তারা ইরানের শহর কাযবীনে প্রবেশ করে। যেখানে তারা চল্লিশ হাজার ঊর্ধ্ব মুসলমান হত্যা করে। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

আযারবাইজান আক্রমণ

কাযবিন শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার পর তাতারী বাহিনী কাযবিন সমুদ্রের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত আযারবাইজান অভিমুখে রওনা হয়।

পথিমধ্যে তারা তিবরিয শহর গমন করে। তিবরিয সে সময়ের আযারবাইজান দেশের একটি শহর। বর্তমানে তা ইরানের উত্তরে অবস্থিত। দেশটির প্রধানমন্ত্রী উজবেক ইবনে বাহলাওয়ান (তিনি তিবরিয শহরে অবস্থান করতেন) তাতারী বাহিনীর সঙ্গে ধন-সম্পত্তি, আসবাবপত্র ও বাহন জন্তু সম্পর্কে সন্ধিচুক্তি করতে চাইলেন। মোটেও যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার চিন্তা করলেন না। কারণ, তিনি সর্বদা মদের নেশায় ডুবে থাকতেন। কখনো হুঁশ ফিরে পেতেন না!! তাতারীরা সন্ধিচুক্তি করতে সম্মত হলো। তিবরিয শহরে প্রবেশ করল না। কারণ তিবরিয হলো শীতপ্রধান অঞ্চল। উপরন্তু তখন ছিল হাড় কাঁপানো শীত। ফলে তারা কাযবিন সমুদ্রের পশ্চিম প্রান্ত অভিমুখে রওনা হলো এবং আযারবাইজানের পশ্চিমাঞ্চলসমূহে আক্রমণ শুরু করল।

আর্মেনিয়া ও জুর্জিয়া আক্রমণ

এ দুটি অঞ্চল আযারবাইজানের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। আযারবাইজানের অন্য শহরগুলোর ধ্বংসকর্ম শেষ না হতেই তাতারী বাহিনী এ দুটি অঞ্চল ধ্বংস

করতে মনোনিবেশ করল। কারণ, ইতিমধ্যে তারা তাদের বিরুদ্ধে জুজিয়া অঞ্চলের অন্যান্য জনপদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার কথা শুনেছিল। জুজিয়ার জনপদগুলো হলো মূর্তিপূজারি ও খ্রিস্টানধর্মাবলম্বী। এদের সঙ্গে মুসলমানদের দীর্ঘদিন যাবৎ স্থায়ী যুদ্ধ চলে আসছিল। তারা বিপদ অত্যাসন্ন মনে করে জুজিয়া অঞ্চলাধীন তাফলীস শহরে একত্রিত হয়েছিল। সেখানে মুসলমানদের সঙ্গে তাতারীদের রক্তক্ষয়ী দীর্ঘ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে তাতারীরা বিজয় লাভ করে। এ যুদ্ধে জুজিয়া অঞ্চলের অসংখ্য লোক নিহত হয়।

৬১৭ হিজরীতে মুহাম্মদ ইবনে খাওয়ারেযম শাহের পশ্চাদ্ধাবনের পর চেঙ্গিজ খান কী করেছিল

অপ্রতিরোধ্য তাতারী হামলার ভয়ে মুসলিম সম্রাট মুহাম্মদ ইবনে খাওয়ারেযম শাহের এক শহর থেকে অন্য শহরে পলায়নের ব্যাপারে চেঙ্গিজ খান নিশ্চিত হওয়ার পর সমরকন্দের চারপাশের অঞ্চলসমূহের ওপর আক্রমণ শুরু করে।

চেঙ্গিজ খান খাওয়ারেযম ও খোরাসান অঞ্চলকে সবচেয়ে মূল্যবান ও শক্তিশালী অঞ্চল হিসেবে পায়।

খোরাসান সাম্রাজ্য বিশাল অঞ্চলজুড়ে বিস্তৃত। যেমন : বালখ, হেরাত, নিশাপুর, গজনীসহ প্রভৃত অঞ্চল খোরাসান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। সাম্রাজ্যটি বর্তমানে ইরানে পশ্চিম ও আফগানিস্তানের উত্তরে অবস্থিত।

আর খাওয়ারেযম অঞ্চল খাওয়ারেযম সাম্রাজ্যের মূল কেন্দ্রভূমি ছিল। অঞ্চলটি সুরক্ষিত দুর্গ, দক্ষ রণকৌশল ও ধন-সম্পত্তির কারণে বিখ্যাত ছিল। তা সমরকন্দের উত্তর-পশ্চিমে জাইহুন নদীর পাশ ঘেঁষে অবস্থিত।

বর্তমানে তা উজবেকিস্তান ও তুরকিমিনিস্তান অঞ্চলে অবস্থিত। চেঙ্গিজ খান এ সমস্ত অঞ্চলে সশস্ত্র আক্রমণ না করে পরোক্ষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল, যা মুসলমানদের মনোনিবেশকে দুর্বল করে দেবে। অতঃপর চেঙ্গিজ খান তার সৈন্যবাহিনীদের তিন ভাগে বিভক্ত করল—

১. এক উজবেকিস্তানের ফারগানা অঞ্চল ধ্বংসের জন্য। ফারগানা অঞ্চলটি সমরকন্দ থেকে পাঁচশো কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত।

২. দ্বিতীয় দল নিয়োজিত ছিল তুরমেনিস্তানের তিরমিয শহর ধ্বংসের জন্য। এই শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন *সুনানে তিরমিযীর* বিখ্যাত সংকলক ইমাম তিরমিযী রহ.। শহরটি সমরকন্দ থেকে একশো কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত।

৩. তৃতীয় দলটি 'কিলাবা' দুর্গ ধ্বংস করার জন্য নিয়োজিত ছিল। সে সময় কিলাবা দুর্গ ছিল জাইহুন নদীর তীরবর্তী সবচেয়ে সুরক্ষিত দুর্গ।

চেঙ্গিজ খানের পরিকল্পনা অনুযায়ী তিন দলই নিজ নিজ দায়িত্ব পুরোপুরি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করে। প্রত্যেকে নিজ নিজ এরিয়ায় প্রভাব বিস্তারকরত ব্যাপকভাবে ছিনতাই, রাহাজানি, হত্যাকাণ্ড, ধ্বংসযজ্ঞ, জেল-জুলুম শুরু করে। এমনকি সেসব অঞ্চল আগুনে জ্বালিয়ে দেয়। সর্বত্র তাতারীদের এই অঘোষিত বার্তা পৌঁছে যায় যে, মানবরক্ত ব্যতীত অন্য কোনো কিছু পানে তাতারীদের তৃষ্ণা মেটে না। ধ্বংসযজ্ঞ ব্যতীত তারা সুখী হয় না। তাতারীরা অপরাজেয়! তাদের পরাজিত করা সম্ভব নয়। সর্বত্র তাদের ভীতি ছড়িয়ে পড়েছিল। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

এই তিনটি দলই নিজেদের হীন উদ্দেশ্যসাধন শেষে চেঙ্গিজ খান তদপেক্ষা অধিক নিকৃষ্ট কর্মসাধনের লক্ষ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করে। সে খোরাসান ও খাওয়ারেযম সাম্রাজ্যের সকল অঞ্চলে আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়।

খোরাসান আক্রমণ

১. বলখ ও বলখের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ (বর্তমান আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চল)

বলখ শহর তিরমিয শহরের দক্ষিণে অবস্থিত। যেই তিরমিয শহরকে তাতারী বাহিনী অল্প কয়েকদিনের মাঝে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল। তিরমিয শহরের ধ্বংসকাহিনি নিশ্চয়ই আপনি জেনেছেন। বলখের অধিবাসীদের অন্তরে তাতারীভীতি প্রখরভাবে বিরাজমান ছিল। তাতারী বাহিনী তাদের নিকট পৌঁছলে তারা তাতারীদের কাছে নিরাপত্তা ভিক্ষা চায়। তাতারীরা অভ্যাসবিরুদ্ধ তাদের নিরাপত্তা প্রদান করে। তাদের প্রতি কোনোরূপ অত্যাচার করে না। বলখবাসীর সঙ্গে তাতারী বাহিনীর আচরণ দেখে সত্যিই আমি [লেখক] অবাক হয়েছি! আমি অবাক হয়েছি এই দেখে যে, কেন তাতারীরা তাদের হত্যা করল না, যা তাদের চিরায়ত অভ্যাস?! তবে কিছুদিন পরের ইতিহাসে আমি আমার এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছি, যখন চেঙ্গিজ খান বলখে ফিরে এসে বলখবাসীকে অন্য একটি মুসলিম শহর ধ্বংস করতে তাকে সহযোগিতা করার নির্দেশ প্রদান করেছে। সেই শহরটির নাম হলো 'মারওয়া' [শীঘ্রই এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আসবে]। আশ্চর্য! বাস্তবেই বলখবাসী মারওয়াবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য মাঠে নেমে এসেছিল!! অথচ উভয় দলই মুসলমান!! বস্তুত মুসলমানদের হীনম্মন্যতা, মনোবলহীনতা, কাপুরুষতা ও তাতারীদের কালো থাবার ভয়ভীতিতে আচ্ছন্ন অন্তর তাদের নিজেদের ভাইদের বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলনে উদ্বুদ্ধ করেছে। এভাবেই বর্বর চেঙ্গিজ খান সকল যুদ্ধের জন্য শক্তি সঞ্চার করেছে এবং মুসলমানদের মাধ্যমেই মুসলিম নিধন করেছে।

আমি [লেখক] বলি, তাতারীদের ইতিহাস দেখে চক্ষু বিস্ফোরিত করবেন না। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের বহু ভূখণ্ডে আমরা এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি এবং এমন ঘটনা আমরা চিরদিন দেখব। ২০০২ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় মুসলমানদের কাবুলের মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কাজে লাগিয়েছে। আমেররিকা ইরাক-যুদ্ধে ইরাকের উত্তরাঞ্চলীয়

মুসলমানদের ব্যবহার করেছে। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিইয়িল আজীম!!

২. তালিকান আক্রমণ

তাতারীদের একটি দল সমরকন্দ থেকে তালিকান (তাজিকিস্তানের নিকটবর্তী আফগানিস্তানের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত) অঞ্চলের দিকে রওয়ানা হয়। অঞ্চলটির শক্তিশালী দূর্গের কারণে তা জয় করা তাতারীদের পক্ষে দূরহ হলে তারা এই মর্মে চেঙ্গিজ খানের নিকট সংবাদ পাঠায়। চেঙ্গিজ খান সংবাদ পেয়ে সশরীরে মাঠে অবতীর্ণ হয় এবং কয়েকমাস ধরে সে অঞ্চলটি অবরোধ করে রাখে। অবশেষে তারা সে অঞ্চলটি জয় লাভ করে। পুরুষদের হত্যা করে, নারী ও শিশুদের বন্দী করে এবং ধন-সম্পত্তি আসবাবপত্র ছিনতাই করে। যেটি তাদের রক্তে মিশ্রিত অভ্যাস!

৩. মারওয়ার বিপর্যয়

মারওয়ার সে সময়ের বিশ্ববিখ্যাত শহর। বর্তমানে শহরটি তুরমেনিস্তানে অবস্থিত। বলখ থেকে আনুমানিক ৪৫০ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। শহরটি দখলের জন্য বিপুলসংখ্যক তাতারী বাহিনী গমন করে। নেতৃত্ব দেয় চেঙ্গিজ খানের কতিপয় সন্তান। এ আক্রমণেও তাতারীরা বালখবাসী মুসলমানদের কাজে লাগায়। বিপুলসংখ্যক ভয়ংকর তাতারী বাহিনীও যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। তাদের সংখ্যার সঠিক পরিমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, লক্ষ লক্ষ মুসলমানদের বিপরীতে তারা অতি নগণ্যই ছিল। আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলের মুসলমানগণ ব্যতীতই তারা ছিল লক্ষ লক্ষ। তাতারী বাহিনী মারওয়া শহরের প্রধান ফটকে পৌঁছতেই শহরের বাইরে দুই লাখ মুসলিমকে সজ্ঘবদ্ধ দেখতে পায়। দুই লক্ষ সৈন্য সে যুগ অনুযায়ী ছিল বিশাল সৈন্যবহর। মারওয়ার প্রধান ফটকে দুই পক্ষের মাঝে ভয়ংকর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলমানদের ওপর আবর্তিত হয় এক মহা বিপর্যয়। তাতারীরা মুসলিম সেনাপতিদের নির্দয়ভাবে জবাই করে এবং অবশিষ্টদের বন্দী করে ফেলে। অতি অল্পসংখ্যক মুসলমান রেহাই পায়। ধন-সম্পত্তি, বাহনজন্তু, অস্ত্র-শস্ত্র; সবকিছুই লুট করে। ঐতিহাসিক ইবনে আছীর রহ. সেই যুদ্ধের বিভীষিকাময় করুণ পরিস্থিতির বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন—

"বর্বর তাতারী বাহিনী তাদের নিকট পৌঁছলে মুসলমানগণ মুখোমুখি যুদ্ধে লিপ্ত হন। মুসলমানগণ ধৈর্যধারণ করেন। আর তাতারীরা তো পরাজয় কাকে বলে তা জানে না।"

কোনো সৈন্যদল যদি এই বিশ্বাস রেখে শত্রুপক্ষের মোকাবেলা করে যে, শত্রুবাহিনী অপরাজেয়, তারা পরাজিত হবে না, কেমন হবে তাদের মনোবল? কেমন হবে তাদের দৃঢ়তা?

যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর তিক্ত পরাজয় ঘটে। তাতারী বাহিনীর জন্য মারওয়া শহরের দরজা উন্মুক্ত হয়। সেখানে সাত লক্ষ মুসলমান নারী-পুরুষ ও শিশু বসবাস করত। সুবিশাল শহরটিকে তাতারীরা অবরোধ করে ফেলে। চোখের সামনে সৈন্যবাহিনীর অমানবিক ধ্বংস দেখে মারওয়াবাসীর অন্তরে তাতারীত্রাস ছড়িয়ে পড়ে। তবুও তারা চারদিন পর্যন্ত প্রধান ফটক বন্ধ রেখেছিল। পঞ্চম দিনের মাথায় (চেঙ্গিজ খানের পুত্র) তাতারী বাহিনীর সেনাপতি মারওয়া-প্রধানের কাছে এই মর্মে চিঠি প্রেরণ করে—

"নিজেকে ও শহরবাসীকে ধ্বংস কোরো না। আমাদের সামনে বের হয়ে এসো। আমরা তোমাকে এই শহরের আমীর নিযুক্ত করে চলে যাব।"

মারওয়ার সেনাপতি তাতারী সেনাপতির কথাকে বিশ্বাস করল অথবা বিশ্বাসের নামে নিজেকে ধোঁকা দিল। সে তাতারী সেনাপতির কাছে বের হয়ে আসল। তাতারীরা তাকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানাল। সম্মান প্রদর্শনপূর্বক তাকে নৈকট্যশীল বানিয়ে নিল। এরপর এই বলে তাদের দুরভিসন্ধি প্রকাশ করল যে, 'তুমি তোমার সাথী, আত্মীয় ও গোত্রপ্রধানদের বের করে নিয়ে এসো। যাকে আমরা খেদমতের যোগ্য মনে করব, তাকে আমরা আমাদের সঙ্গে রেখে দেব। বিনিময়ে তাকে আকর্ষণীয় উপঢৌকন ও নির্ধারিত ভাতা প্রদান করব।' ধোঁকাগ্রস্ত আমীর তাতারী সেনাপতির কথায় প্রলুব্ধ হয়ে তার সহযোগী, বড় বড় আমীর ও সৈন্যবাহিনীর নিকট এই মর্মে বার্তা পাঠায় যে, তারা যেন চেঙ্গিজ খানের পুত্রের সঙ্গে আয়োজিত একটি গুরুত্বপূর্ণ মতবিনিময় সভায় উপস্থিত হয়। এই সংবাদ পেয়ে একটি বিরাট দল বের হয়ে আসে। তাতারীরা তাদের হাতের মোয়ার মতো কাছে পেয়ে সবাইকে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলে।

অতঃপর তাদের দুটি দীর্ঘ তালিকা তৈরি করার নির্দেশ দেয়—

এক. মারওয়া শহরের বড় বড় ব্যবসায়ী ও ধনবানদের তালিকা।

দুই. পেশাজীবী ও ইঞ্জিনিয়ারদের তালিকা।

এরপর চেঙ্গিজ খানের পুত্র তাতারীদের গোটা শহরবাসীকে একত্রিত করার নির্দেশ দেয়। তাদের প্রবলপ্রতাপে শহরের সকলেই বের হয়ে আসে। এমনকি আক্ষরিক অর্থে শহরের কেউই অবশিষ্ট ছিল না। অতঃপর স্বর্ণনির্মিত একটি চেয়ার আনা হয়। চেঙ্গিজ খানের পুত্র সেই চেয়ারে বসে তাতারী বাহিনীকে নিম্নবর্ণিত নির্দেশ প্রদান করে—

এক. শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সেনাপতি ও আমীর সাহেবকে এনে জনসাধারণের সামনে হত্যা করা হোক!! বাস্তবেই তারা বিশাল বাহিনীকে উপস্থিত করে এক এক করে সবাইকে হত্যা করল! সাধারণ লোকেরা তাকিয়ে তাকিয়ে এই হত্যাযজ্ঞ দেখছিল আর কাঁদছিল।

দুই. প্রকৌশলী ও পেশাজীবীদের বের করে মঙ্গোলিয়ায় প্রেরণ করা হোক। যাতে তারা তাদের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে।

তিন. সম্পদশালীদের বের করে শাস্তি প্রদান করা হোক। যাতে তারা তাদের সব ধন-সম্পত্তির সন্ধান দেয়। তাতারী বাহিনী তা-ই করল। তাদের অনেকেই বেত্রাঘাতে নিহত হলো; কিন্তু মুক্তিপণ দেওয়ার মতো কিছুই পেল না।

চার. শহরে প্রবেশ করে প্রত্যেক বাড়ি থেকে তন্ন তন্ন করে আসবাপত্র ও মালামাল বের করা হোক। এই হুকুম তামিলে তারা স্বর্ণ-রুপা পাবে, এই আশায় বাদশা সাঞ্জারের কবর পর্যন্ত খনন করেছিল। তিনদিন পর্যন্ত হন্যে হয়ে তারা ধন-সম্পদ খুঁজতে থাকে।

পাঁচ. পঞ্চম বিষয়টি ছিল সবচেয়ে ভয়ংকর। চেঙ্গিজ খানের পুত্র শহরবাসী সবাইকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিল!! ...!!

এই নির্দেশ পেয়ে বর্বর তাতারী বাহিনী মারওয়ার সকল অধিবাসীকে নির্মমভাবে হত্যা শুরু করে। নারী-পুরুষ, শিশু-বাচ্চা নির্বিচারে সবাইকে হত্যা করে।

তারা বলেছিল, মারওয়া শহরবাসী আমাদের অবাধ্য হয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। যারা আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাদের শেষ পরিণতি এমনই হয়।

ইবনে আছীর রহ. বলেন—

“শহরবাসীর সবাইকে হত্যা করার পর চেঙ্গিজ খানের পুত্র তাতারী বাহিনীকে নিহতের সংখ্যা গণনার নির্দেশ দেয়। তাদের গণনার হিসাব দাঁড়িয়েছিল সাত লক্ষ। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!!

মারওয়া শহরের সাত লাখ মুসলিম নারী-পুরুষকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। এটি কোনো কল্পনার বিষয় নয়, স্বপ্নলোকের কথা নয়—এটি সত্য! মহা সত্য!! আদম সৃষ্টি পর থেকে আজ অবধি কাছের দূরের কোনো সময়েই মানবজাতির ওপর এমন নির্মম হত্যাকাণ্ড দ্বিতীয় আর ঘটেনি। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

মারওয়া নগরী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো। ইতিহাসের পাতা থেকে তার আলোচনা চিরতরে মুছে গেল।

৪. নিশাপুর আক্রমণ

খোরাসান সাম্রাজ্যের আরেকটি বড় শহর হলো নিশাপুর। (বর্তমানে তা ইরানের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত) মারওয়া শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার পর তাতারী বাহিনী নিশাপুর আক্রমণের জন্য অগ্রসর হয়েছিল। পাঁচদিন পর্যন্ত তারা নিশাপুর শহর অবরোধ করে রেখেছিল। এ সত্ত্বেও শহরবাসী দৃঢ় মনোবলে সঙ্ঘবদ্ধ অবস্থান করেছিল। তবে মারওয়া বিপর্যয়ের সংবাদ নিশাপুরে পৌঁছেছিল বিধায় তাদের অন্তরে তাতারীভীতি বিস্তার লাভ করেছিল। তাতারী বাহিনীর মোকাবেলা করার মতো শক্তি-সামর্থ্য তাদের ছিল না। তারা সকল শহরবাসীকে মরুভূমিতে এনে দাঁড় করায়। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি এসে চেঙ্গিজ খানের পুত্রকে সংবাদ প্রদান করে, মারওয়ার কতিপয় অধিবাসীর প্রাণরক্ষা পেয়েছে। অর্থাৎ তারা তাদের তলোয়ারের আঘাত করেছিল বটে তবে নিহত ধারণায় তাদের ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু মূলত তারা নিহত হয়নি। এ সংবাদ পেয়ে চেঙ্গিজ খানের পুত্র নিশাপুরের সকল পুরুষকে হত্যার নির্দেশ প্রদান করে এবং মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার জন্য ধর থেকে মাথা ছিন্ন করার নির্দেশ দেয়। এরপর অভিশপ্ত চেঙ্গিজ খানের পুত্র মুসলিম নারীদের বন্দী করে। তাতারীরা দীর্ঘ পনেরো দিন নিশাপুরের ধন-সম্পত্তি হন্যে হয়ে খোঁজে। এরপর তারা নিশাপুর ত্যাগ করে। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

৫. হেরাত আক্রমণ

মুসলিম সাম্রাজ্যের সুরক্ষিত শহরগুলোর অন্যতম হলো হেরাত শহর। এটি মারওয়ার মতই বৃহৎ শহর ছিল। তা আফগানিস্তানের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। চেঙ্গিজ খানের পুত্র হেরাত নগরীর দিকে কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে। এই শহরটিও সেই নিকৃষ্ট পরিণতি থেকে রেহাই পায়নি, যেই পরিণতির শিকার হয়েছিল

মারওয়া ও নিশাপুর। সেখানকার সকল পুরুষ নিহত হয়। নারীরা বন্দী হয়। গোটা শহর বিরানভূমিতে পরিণত হয়। যদিও তৎকালীন সে অঞ্চলের রাজা 'মালিক খান' একদল সৈন্য নিয়ে আফগানিস্তানের দক্ষিণে অবস্থিত গজনী অভিমুখে পালিয়ে প্রাণে বাঁচে। তৎকালীন সকল মুসলিম রাজা বাদশা আত্মরক্ষামূলক পলায়নপরতার ব্যাপারে একমত ছিল, যখন তাদের প্রজাদের জীবন বর্বর তাতারী বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে বলি হতো। এমনই ছিল তাদের চরিত্র-সুষমা!!

হেরাত পতনের মধ্য দিয়ে খোরাসান সাম্রাজ্যের শেষ ভূখণ্ডও তাতারীদের হাতে পরাজিত হয়। একটি শহরও তাতারী আগ্রাসনের সর্বনাশা থাবা থেকে রক্ষা পায় না। এ সকল দুর্যোগ ও বিপর্যয় মাত্র এক বছরেই সংঘটিত হয়। সেটি হলো ৬১৭ হিজরী। এটি ভূপৃষ্ঠে সংঘটিত আশ্চর্য ঘটনাবলির অন্যতম!!

খাওয়ারেযম আক্রমণ

খাওয়ারেযম ছিল মুসলিম সম্রাট মুহাম্মদ ইবনে খাওয়ারেযম শাহের প্রধান কার্যালয়। সেখানে হাজার হাজার মুসলমানদের সমাগম হতো। প্রতিরক্ষা ও সুরক্ষার বিবেচনায় সেখানকার দুর্গগুলো ছিল পৃথিবী-বিখ্যাত। বর্তমানে খাওয়ারেযম সাম্রাজ্য উজবেকিস্তান ও তুরমেনিস্তানের সীমান্তসীমা এবং জাইহুন নদীর গা ঘেঁষে অবস্থিত। অর্থনীতি, রণকৌশল ও আধুনিক রাজনীতির বিবেচনায় খাওয়ারেযম ছিল মুসলিম জাতির আদর্শ শহর।

সার্বিক দিক বিবেচনায় পৃথিবীর অন্যতম প্রধান শহর হওয়ার কারণে চেঙ্গিজ খান তার প্রধান ও শক্তিশালী দলটিকে খাওয়ারেযম আক্রমণ করার জন্য পাঠায়। তাতারী বাহিনী দীর্ঘ পাঁচ মাসব্যাপী শহরটি অবরোধ করে রাখে। তবুও তারা শহরে প্রবেশ করতে পারে না। অপারগতাবশত তারা চেঙ্গিজ খানের কাছে অতিরিক্ত সহযোগিতা কামনা করে। চেঙ্গিজ খান বিপুলসংখ্যক 'বহিনী দিয়ে তাদের সহযোগিতা প্রদান করে।

..। সঙ্ঘবদ্ধভাবে শহরে প্রবেশের অব্যাহত চেষ্টা করতে থাকে। বিভিন্ন স্থানে প্রাচীর ধ্বংসের চেষ্টা করে। অবশেষে তারা একটি সুড়ঙ্গপথখুঁজে পায়। সে পথ দিয়ে তারা শহরে প্রবেশ করে। শুরু হয় মুসলমান ও তাতারী বাহিনীর মাঝে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। উভয় দলের বহুসংখ্যক সৈন্য নিহত হয়। তবে ময়দানে তাতারীরাই প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল। হঠাৎ তাতারীদের নতুন এক বাহিনী ...গে শহরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতেই মুসলমানদের পরাজয় নেমে

আসে। নির্বিচারে মুসলিম-নিধন শুরু হয়। মুসলমানগণ পালাতে শুরু করে। অলি-গলিতে, গর্ত-খন্দকে, ঘর-বাড়িতে আত্মগোপন করতে শুরু করে। আহ! বর্বর তাতারী বাহিনী!! মুসলমানদের সমূলে ধ্বংস করার জন্য কী জঘন্য পন্থা অবলম্বন করল?! জাইহুন নদীর পানি আটকে রাখার জন্য একটি বিশাল বাঁধ নির্মিত ছিল। তাতারীরা সেই বাঁধ ভেঙে দেয়। এতে গোটা খাওয়ারেযম শহর পানিতে তলিয়ে যায়। বাঁধভাঙা স্রোত ঘর-বাড়ি, খাল-বিল, গর্ত-খন্দক, সর্বত্র পৌঁছে যায়। তুফান স্রোতে ঘর-বাড়ি ভেসে যায়। শহরবাসীর একজনও প্রাণে রক্ষা পায় না। ঘটনাচক্রে কেউ যুদ্ধে প্রাণ রক্ষা পেলেও বাঁধ ভেঙে কিংবা পানিতে ডুবে মারা যায়। সুবিশাল সাম্রাজ্য বিরানভূমিতে পরিণত হয়। পরবর্তী সময় দর্শণার্থী সেই এলাকা পরিদর্শন করলে কোনো জীব-জন্তুর চিহ্ন খুঁজে পেত না। এমন সর্বনাশা দুর্যোগ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। হয়তোবা নূহ আ. এর সম্প্রদায়ের ওপর এমন ব্যাপক প্লাবন এসেছিল। বিজয়ের পর পরাজয় ও সম্মানের পর বেইজ্জতি হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

৬১৭ হিজরীতেই এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল!!

আফগানিস্তান অভিমুখে তাতারীদের হামলা

খোরাসান ও খাওয়ারেযম ভূখণ্ড ধ্বংসের মাধ্যমে বর্বর তাতারী বাহিনী খাওয়ারেযম সাম্রাজ্যের উত্তরাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এমনকি তারা ইরাক-সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তবে তখনো তারা খাওয়ারেযম সাম্রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। খাওয়ারেযম সাম্রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চল তাতারী বাহিনীর ভয়ে পলাতক ও কাযবিন সমুদ্র উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণকারী মুসলিম সম্রাট মুহাম্মদ ইবনে খাওয়ারেযম শাহের পুত্র জালাল উদ্দীনের অধীনে ছিল।

সে সময় আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের দক্ষিণাঞ্চল ও মধ্যমাঞ্চল খাওয়ারেযম সাম্রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হিন্দুস্তান ও এ অঞ্চলের মাঝে সিন্ধুনদীর ব্যবধান ছিল। সুলতান জালাল উদ্দীন গজনী এই শহরে অবস্থান করতেন। গজনী শহর বর্তমানে আফগানিস্তানের কাবুল শহর থেকে দেড়শো কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। নিষ্ঠুর চেঙ্গিজ খান মুহাম্মদ ইবনে খাওয়ারেযম শাহের আদিগন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্য তছনছ করার পর পুত্র জালাল উদ্দীনকে হত্যার পাঁয়তারা করে। তাই বিশাল ও শক্তিশালী এক বাহিনীকে গজনী অঞ্চল আক্রমণের জন্য পাঠায়।

স্বভাবতই পুত্র জালাল উদ্দীন খাওয়ারেযম সাম্রাজ্যের ওপর তাতারী বাহিনী অপ্রতিরোধ্য বর্বর আক্রমণ ও পিতার নির্মম মৃত্যুর কথা জানত। ফলে পিতার মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য রক্ষার গুরুদায়িত্ব তার কাঁধেই অর্পিত হয়। সে অঘোষিত সম্রাটের আসনে সমাসীন হয়। এ কারণেই তার দায়িত্ব বেড়ে যায়। দেশ, জাতি ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে সে তাতারীদের মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করে। সাম্রাজ্যের সৈন্যবাহিনীকে সঙ্ঘবদ্ধ করে। তুরস্কের রাজা সাইফুদ্দীন বাগরাক তার সঙ্গে মিলিত হয়। সে ছিল একজন দুর্দান্ত রণকৌশলী বীর সেনানী। তার সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার। অপরদিকে খাওয়ারেযম পতনের পর সে সকল সৈন্য বিভিন্ন রাজ্যে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল, এমন ষাট হাজার সৈন্য এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হয়। হেরাত শহরের আমীর মালিক খানও একদল সৈন্য নিয়ে তাদের দলে যুক্ত হয়। ফলে জালাল উদ্দীনের সৈন্যবাহিনী এক বিশাল বাহিনীতে পরিণত হয়। এই বিশাল বাহিনী নিয়ে জালাল উদ্দীন গজনি শহরের পার্শ্ববর্তী শহর বালকে (বালক পাহাড়ি অঞ্চলের এবড়ো-খেবড়ো অঞ্চল) এসে উপস্থিত হয়। তাতারী বাহিনীও এই অঞ্চলে এসে উপস্থিত হয়! গজনি অঞ্চলের সবচেয়ে ভয়ানক স্থান বালকে জালাল উদ্দীনের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি ও তাতারী বাহিনীর অপরাজেয় শক্তি মুখোমুখি হয়। মুসলমান বাহিনী আত্মঘাতী হামলা শুরু করে। এই অঞ্চলটি হলো খাওয়ারেযম সাম্রাজ্যের সর্বশেষ সীমানা। যদি এ অঞ্চলটি পরাজিত হয়, তবে খাওয়ারেযম সাম্রাজ্যের আর কোনো প্রদেশ অবশিষ্ট থাকবে না। এ যুদ্ধে মুসলমানদের রক্ষার পক্ষে ছিল সাইফ উদ্দীন বাগরাক তুর্কী সুসংহত নেতৃত্ব, জালাল উদ্দীনের অভিজ্ঞ দিকনির্দেশনা এবং লক্ষাধিক মুসলিম সৈন্যের ইতিহাসখ্যাত সমাবেশ। তাতারীদের বিরুদ্ধে জয়লাভের এসব ছিল সুস্পষ্ট নিদর্শন।

তিনদিন পর্যন্ত ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের প্রতি ঐশী সাহায্য নাজিল করেন। তাতারীরা প্রথমবারের মতো মুসলিম সাম্রাজ্যে পরাজিত হয়!! ব্যাপকহারে তারা নিহত হয়। অবশিষ্টরা পালিয়ে আফগানিস্তানের পূর্ব-উত্তরে অবস্থিত 'তালিকান' দেশে চেঙ্গিজ খানের কাছে গিয়ে কোনোমতে প্রাণ রক্ষা করে।

এতে মুসলমানগণ হারিয়ে যাওয়া মনোবল ফিরে পান। আকাশচুম্বী দুর্বার হিম্মত ও সাহস তাদের মাঝে জেগে ওঠে। এই যুদ্ধের পূর্বে অধিকাংশ মুসলমানদের মাঝে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছিল যে, তাতারীরা অপরাজেয়, তাদের পরাজিত করা সম্ভব নয়। কিন্তু গজনিতে মুসলিমবাহিনীর সুসজ্জিত

পুনর্জাগরণ তাদের বদ্ধমূল ধারণার অপনোদন করে। এই যুদ্ধে জালাল উদ্দীনের সৈন্যবাহিনী, ইবনে খাওয়ারেযমের অবশিষ্ট বাহিনী, সাইফ উদ্দীন বাগরাকের নেতৃত্বে একদল তুর্কীবাহিনী এবং হেরাতের বাদশা মালিক খানের নেতৃত্বে একদল সৈন্য ঐক্যবদ্ধ হয়। মুসলমানগণ যুদ্ধের উপযুক্ত এক স্থান ও যুদ্ধের উপযুক্ত সরঞ্জামাদি গ্রহণ করেন। ফলে আসমান থেকে ঐশী মদদ নেমে আসে!

বাদশা জালাল উদ্দীন তার সৈন্যবাহিনীর অভূতপূর্ব কৃতিত্ব দেখে আস্থা ফিরে পায়। নতুন যুদ্ধের আহ্বানকরত চেঙ্গিজ খানের প্রতি পত্র প্রেরণ করে। চেঙ্গিজ খান একটু হলেও অশুভপরিণতির আশঙ্কা অনুভব করে। ফলে সে নতুন ধাঁচে বিশালবাহিনী প্রস্তুত করে তার এক ছেলের নেতৃত্বে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য পাঠায়। মুসলিম বাহিনীও প্রস্তুতি গ্রহণ করে। উভয় দল কাবুল শহরে মুখোমুখি হয়।

কাবুল মুসলিম অধ্যুষিত প্রাচীন শহর। শহরটি চতুর্দিক থেকে পাহাড়বেষ্টিত। উত্তরে হান্দুকুশ, পশ্চিমে বারুবা এবং পূর্ব-দক্ষিণে সুলাইমান পাহাড় অবস্থিত। কাবুলপ্রান্তরে পৃথিবীবিখ্যাত মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়। সংঘটিত হয় গজনিপ্রান্তরে সংঘটিত যুদ্ধের চেয়েও ভয়াবহ তীব্র সংঘাত।

দৃঢ়পদ, উচ্চমনোবলসম্পন্ন মুসলিম বাহিনী তাতারীদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। এমনকি তাতারীদের হাত থেকে দশ হাজার মুসলিম বন্দীদের রক্ষা করে। মুসলমানদের মনোবল-সাহস আরও বেড়ে যায়। অসংখ্য তাতারী সৈন্য ধরাশয়ী হয়। এ যুদ্ধে মুসলমানগণ প্রচুর মূল্যবান গনিমত লাভ করেন। কিন্তু আফসোস! গনিমত নেয়ামত হওয়ার পরিবর্তে গজব হয়ে দাঁড়ায়! উপকারের পরিবর্তে অপকার বয়ে আনে!!

ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. হযরত আমর ইবনে আউফ রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

فَوَاللَّهِ مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ

"আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের দরিদ্রতার ভয় পাই না। আমি ভয় পাই তোমাদের পূর্ববর্তীদের মতো দুনিয়া তোমাদের ওপর চেপে

আসবে। তখন তোমরা তাদের মতোই দুনিয়া নিয়ে মশগুল হবে। আর দুনিয়া তাদের মতো তোমাদেরও ধ্বংস করবে।”[২৪]

তৎকালীন অল্পসংখ্যক মুসলমান ব্যতীত অধিকাংশ মুসলমানদের অন্তর ব্যাপকভাবে পার্থিব রোগে আক্রান্ত ছিল। তারা পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির জন্য যুদ্ধ করত। তাদের যুদ্ধ 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' ছিল না। তা ছিল অস্তিত্ব রক্ষা, ক্ষমতালিপ্সা। যুদ্ধ ছিল বন্দীদশা ও মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার যুদ্ধ। গনিমত প্রাচুর্যতা ও সম্পত্তির আধিক্যের সময় তাদের অভ্যন্তরীণ রূপ প্রকাশ পায়।

মুসলমান ফেৎনায় নিপতিত হয়!

মুসলমানগণ গনিমতের মাল বণ্টন করতে গিয়ে মতবিরোধে লিপ্ত হয়!!

তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী সাইফ উদ্দীন বাগরাক, হেরাত শহর প্রধান মালিক খান গনিমতের অংশ চেয়ে বসে। শুরু হয় মতবিরোধ। হই-হুল্লোড়। সম্পত্তির লোভে শুরু হয় যুদ্ধ!!

হ্যাঁ! মুসলমানরা সম্পদ-লোভে পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়, নিজেরাই নিজেদের হাতে নিহত হয়। যুদ্ধে সাইফ উদ্দীন বাগরাকের ভাই নিহত হয়। এতে সে জালাল উদ্দীনের দল থেকে পৃথক হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তার অধীনে ছিল ত্রিশ হাজার রণযোদ্ধা। সৃষ্টি হয় ঘোলাটে পরিস্থিতি। বাদশা জালাল উদ্দীন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। সাইফ উদ্দীনকে ফিরিয়ে আনতে নিজে অগ্রসর হয়। কারণ, সকলকে ধরে রাখার, সবার শক্তির সমন্বিত শক্তি ও সবার মেধাশক্তিকে কাজে লাগানোর তীব্র প্রয়োজন ছিল। উপরন্তু এই মতবিরোধ অবশিষ্ট বাহিনীর মাঝে পরোক্ষ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। কারণ, তুর্কী বাহিনী মুসলিম বাহিনীর মাঝে সবচেয়ে রণকৌশলী ও যোগ্য ছিল। কিন্তু সাইফ উদ্দীন বাগরাক ছিল নাছোড়বান্দা। বাদশা জালাল উদ্দীন তাকে ফেরানোর সকল প্রচেষ্টা ব্যয় করে। সশরীরে তার কাছে যায়। তাকে জিহাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আল্লাহর ভয় দেখায়। কিন্তু সাইফ উদ্দীন কোনো উপদেশ গ্রহণ করে না। কার্যত সৈন্যবাহিনী নিয়ে পৃথক হয়ে যায়!!

মুসলিম বাহিনীর মাঝে বিভক্তি বিভাজন সৃষ্টি হয়। বিচ্ছিন্ন হয় তাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি! প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ভাবে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

---

[২৪] *বুখারী :* ৩১৫৮, *মুসলিম :* ২২৯৬।

গজনি ও কাবুল শহরে মহান বিজয় লাভের পরও সেই বিজয়কে ফলপ্রসু করতে এবং সেই বিজয়কে টিকিয়ে রাখতে তারা ব্যর্থ হয়।

ইমাম মুসলিম রহ. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ

“নিশ্চয়ই দুনিয়া সবুজ-শ্যামল ও সুমিষ্ট। আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দুনিয়ার প্রতিনিধি বানিয়ে দেখেন তোমরা কী আমল করো। সুতরাং তোমরা দুনিয়া থেকে বেঁচে থাকো ও নারী থেকে দূরে থাকো। বনি ইসরাঈলের প্রথম ফেতনা নারীকে নিয়ে হয়েছিল।”[২৫]

সেই সংকটময় মুহূর্তে মুসলমানরা দুনিয়ার কদর্যতা ও হাকিকত অনুধাবন করতে পারেনি। তারা ভুলে গিয়েছিল দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী ও পরীক্ষাকেন্দ্র, চিরস্থায়ী নয়; তারা প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে গিয়েছিল। ভুলে গিয়েছিল তাঁর সম্মুখে দাঁড়ানোর কথা; আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণের কথা।

তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সতর্কবাণী— فَاتَّقُوا الدُّنْيَا 'দুনিয়া থেকে বেঁচে থাকো' ভুলে গিয়েছিল। ফলে তারা ব্যাপক অধঃপতনের শিকার হয়।

মুসলমানদের এহেন আত্মিক অধঃপতনের মুহূর্তে চেঙ্গিজ খান স্বয়ং সৈন্যবাহিনীসহ সেই বীর বাহাদুর মুসলমানদের দেখতে আসে, যারা তার বিরুদ্ধে পরপর দুই বার বিজয় লাভ করে। তার আগমন-বার্তা শুনে মুসলমানরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। আর ভীতসন্ত্রস্ত হবেই না কেন? তাদের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় অনেক হ্রাস পেয়েছিল। তারা মনোবল হারিয়ে ফেলেছিল। বাদশা জালাল উদ্দীন তার বাহিনীর মনোবলহীনতা দেখে কী করবে ভেবে উঠতে পারছিলেন না!!

নিরুপায় হয়ে চেঙ্গিজ খানের ভয়ে অথবা (কমপক্ষে এভাবে বলা যায়) যুদ্ধ থেকে বেঁচে থাকার জন্য দক্ষিণ অভিমুখে রওয়ানা হয়।

এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে বাঁচার জন্য জালাল উদ্দীন সেই পন্থা অবলম্বন করলেন, যেই পন্থা তার পিতা মুহাম্মদ ইবনে খাওয়ারেযম শাহ অবলম্বন

---

[২৫] *মুসলিম :* ২৪৭৪।

করেছিলেন! এক শহর থেকে আরেক শহর পলায়ন। একসময় বর্তমান পাকিস্তানের সীমান্ত অঞ্চল পাড়ি দিয়ে সিন্ধু নদীর পাড়ে এসে পৌঁছেন। তৎকালে হিন্দুস্তানের রাজাদের সঙ্গে বাদশা জালাল উদ্দীনের সুসম্পর্ক ছিল না; এ সত্ত্বেও তিনি চেঙ্গিজ খানের মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে হিন্দুস্তানে পলায়ন করাকে অধিক শ্রেয় মনে করলেন!!

কিন্তু বাদশা জালাল উদ্দীন ও তার সৈন্যবাহিনী বিশাল সিন্ধু নদী পাড়ি দেওয়ার জন্য কোনো নৌকা বা জাহাজ পেলেন না। দূরবর্তী স্থান থেকে জাহাজ আনার ব্যবস্থা করেন। জাহাজের অপেক্ষায় থাকাকালীন চেঙ্গিজ খান সৈন্যবাহিনীসহ এসে উপস্থিত হয়!!

যুদ্ধ ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। পেছনে সিন্ধু নদী, সামনে চেঙ্গিজ খান! সংঘটিত হয় নজীরবিহীন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। এমনকি প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য হলো, "এই যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করলে অতীতের সকল যুদ্ধ খেল-তামাশা মাত্র!"। লাগাতার তিনদিন যুদ্ধ চলে। উভয় দলে রক্তের বন্যা প্রবাহিত হয়। মুসলিম নিহতদের মাঝে আমীর মালিক খান অন্যতম, যে খানিক পূর্বে সাইফ উদ্দীন বাগরাকসহ গনিমতের সম্পত্তি নিয়ে মতবিরোধ করেছিলেন। অথচ দুনিয়া তাকেই কিছুই দেয়নি; বরং দুনিয়া তাকে হত্যা করেছে। তার মৃত্যুক্ষণ এক মুহূর্ত বিলম্বিত হয়নি। যে ব্যক্তি সর্বস্ব ব্যয়ে মুসলমানদের সহযোগিতা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ফেতনায় নিপতিত হয়ে তিক্ত পরাজয়ে ধ্বংস হয়, এই দুই ব্যক্তির মৃত্যু কি এক পর্যায়ের?!

চতুর্থ দিন মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। প্রত্যেকে নিজ ক্ষতস্থানে পট্টি বাঁধতে থাকে, হিসাবের খাতা গোছাতে থাকে। সৈন্যবাহিনীর এই ছত্রভঙ্গ ক্ষণে জাহাজ নদীর তীরে এসে নোঙর ফেলে। বাদশা জালাল উদ্দীন ভিন্ন চিন্তায় কালক্ষেপণ না করে পূর্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তা হলো 'পলায়ন'!!

মুসলিমপ্রধান লাফ দিয়ে জাহাজে উঠলেন। সাথে তার বিশেষবাহিনী ও সভাসদবৃন্দ। সিন্ধু নদী পাড়ি দিয়ে তারা হিন্দুস্তানে পৌঁছে। কিন্তু জালাল উদ্দীন কি কেবল তাতারীদের এই ভূখণ্ড রেখে গিয়েছিলেন?

না; তাতারীদের সঙ্গে সঙ্গে সে মুসলিম গ্রাম-গঞ্জ, শহর-জনপদ, দেশ-দেশান্তর রেখে গিয়েছিলেন! আর জনপদবাসীর কোনোরূপ সৈন্য-প্রতিরক্ষা ছাড়াই রেখে এসেছিলেন। এ সুযোগে চেঙ্গিজ খান মুসলিম সাম্রাজ্যের ওপর তার ক্রোধের পেয়ালা ঢেলে দেয়। তাতারী বাহিনী যা করার প্রস্তুতি নিয়েছিল, তা-ই করল; বরং আরও বেশি।

মুসলিম শক্তি ঐক্যবদ্ধ থাকাকালীন যেই গজনি শহরে মুসলিম জাতি দীর্ঘদিন যাবৎ বিজয় লাভ করেছিল, চেঙ্গিজ খান শেই শহরে প্রবেশ করে নির্বিচারে সকল পুরুষকে হত্যা করে, সকল নারীদের বন্দী করে, ঘর-বাড়ি সব জ্বালিয়ে দেয়!! গজনী শহর ইবনে আছীর রহ. এর ভাষায়—

وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ

"যেন তা ছাদ উল্টে (থুবড়ে) পড়েছিল।[২৬]

যেনো গতকাল তার অস্তিত্বই ছিল না।"[২৭]

যাদের চেঙ্গিজ খান বন্দী করেছিল তাদের মধ্যে বাদশা জালাল উদ্দীন ইবনে খাওয়ারেযমের সন্তানরাও ছিল। চেঙ্গিজ খান তাদের সবাইকে জবাই করার নির্দেশ দেয়। এভাবেই বাদশা জালাল উদ্দীন তিক্ত জীবনের স্বাদ গ্রহণ করে। হায়! জীবনের মায়া!!

ইমাম বাইহাকী রহ. বিশুদ্ধ সনদের ধারাবাহিকতায় বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

كُنْ كَمَا شِئْتَ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ

"মনমতো বেঁচে থাকো। যেমন কর্ম করবে, তেমইনই ফল পাবে।"[২৮]

এর মাধ্যমে আরেকবার প্রমাণিত হলো তাতারীরা অপরাজেয়। কিন্তু এত সহজে তা হওয়ার কথা ছিল না। আফগানিস্তান তাতারীদের অধ্যুষিত ভূমিতে পরিণত হলো।

কিন্তু আফগানিস্তান কেন চেঙ্গিজ খান বা অন্য যেকেনো শত্রুর করায়ত্ত হবে? কেন আফগানিস্তান পতন মুসলিম উম্মাহর পতনের পথ রচনা করবে? কেন গোটা মুসলিম উম্মাহর জন্য বিধ্বংসী হাতে আফগানিস্তানের পতন ঘটবে?

বস্তুত আফগানিস্তান পতন অনেকগুলো দুর্যোগ ও দুর্ঘটনার কারণ

এক. যেকোনো সাম্রাজ্যের মজ্জাগত স্বভাব হলো, শত্রুপক্ষের আক্রমণকে সে প্রায় অসম্ভব মনে করে। আত্মনির্ভরতার এই মজ্জাগত স্বভাবই আফগানিস্তানের

---

[২৬] সুরা বাকারা : ২৫৯।

[২৭] সুরা ইউনুস : ২৪।

[২৮] *বাইহাকী শরীফ :* ১৩২, *জামে মা'মার ইবনে রাশেদ :* ২০২৬২।

পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ অরক্ষিত হওয়ার কারণ। ফলে আফগানিস্তান পতনের সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ পতনের শিকার হয়। পরবর্তীতে পাকিস্তান, ইরান, ইরাক খুব সহজেই পতনের মুখ দেখে।

দুই. সমর-দক্ষতা ও উপযুক্ত রণভূমি হিসেবে আফগানিস্তান মুসলিমবিশ্বের মানচিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। কারণ, আফগানিস্তান এশিয়া মহাদেশের মধ্যভাগে অবস্থিত। যারাই আফগানিস্তান দখল করতে পারবে, অন্যান্য অঞ্চলের ওপর প্রভাব বিস্তারকরণ তাদের পক্ষে খুবই সহজ। শুধু ইরান ও পাকিস্তান নয়; বরং রাশিয়া-হিন্দুস্তানের মত গুরুত্বপূর্ণ দেশের এবং চীনের কিয়দাংশের ওপর তাদের পক্ষে প্রভাব বিস্তার করা খুবই সহজ। এ কারণে আফগানিস্তান দখল করার পর গোটা এশিয়া মহাদেশের ওপর প্রভাব ও কর্তৃত্ব বিস্তার করা সম্ভব।

তিন. সার্বিক দিক বিবেচনায় আফগানিস্তান তার ঘাঁটি ও উপত্যকাসমূহকে শক্তিশালী হিসেবে গড়ে তুলেছিল। কাজেই আফগানিস্তান পতন অন্য অঞ্চলসমূহের পতনের পথকে সহজ করেছিল।

চার. আফগানিস্তানবাসীও ইসলামী চেতনায় সমুন্নত ও জিহাদী প্রেরণায় ছিল উজ্জীবিত। তাই তারা সহজে অন্যের হস্তক্ষেপ ও আধিপত্য বিস্তার মেনে নিত না। পরপর দুই বার তাতারী বাহিনীর ওপর জয় লাভ একথার সুস্পষ্ট প্রমাণও বহন করে। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর বিভক্তি-বিভাজন শত্রুপক্ষের প্রত্যাগমনের পথ সুগম করে দেয়।

পাঁচ. পূর্ব-বর্ণিত সকল প্রতিক্রিয়া ছাড়া সবচেয়ে ক্ষতিকর দিকটি হলো, আফগানিস্তান পতনের ফলে মুসলিম উম্মাহর মনোবলে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে তাতারী বাহিনীর মনোবল চাঙা হয়। কাজেই একটি পরাজিত জাতি কী করে নতুনভাবে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াবে? কী করে সহজ জয়লাভ কামনা করতে পারে? এটি বাস্তবেই অসম্ভব!

এই বিজয়লাভের মাধ্যমে তাতারীরা চীন হয়ে কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, তুরমেনিস্তান অতঃপর ইরান, আযারবাইজান, আর্মেনিয়া ও জুর্জিয়ায় পৌঁছে যায়। তারা ইরাকের একদম কাছাকাছি পৌঁছে যায়।

এ সকল ঘটনা মাত্র এক বছরে তথা ৬১৭ হিজরীতে সংঘটিত হয়। এমনকি ইবনে আছীর রহ. লেখেন—

"বর্বর তাতারীরা এমন সব ঘটনার জন্ম দেয়, যেসব ঘটনার কথা পূর্ববর্তীরা শোনেনি, বর্তমান যুগের লোকেরাও ইতিপূর্বে শোনেনি। তারা চীন-সীমান্ত থেকে বের হয়ে এক বছর অতিবাহিত হতে না হতেই কিছুসংখ্যক আর্মেনিয়ায় পৌঁছে যায় এবং হামাদান শহর হয়ে ইরাক অতিক্রম করে। আল্লাহর শপথ! পরবর্তী প্রজন্ম দীর্ঘদিন পর যখন ইতিহাসের পাতায় তাতারী বাহিনীর বর্বরতার কথা পড়বে, তা অস্বীকার করবে এবং অসম্ভব মনে করবে। তাই আমি এবং বর্তমান সময়ের সকল ইহিতাস-সংকলক এই বাস্তবতাকে ইতিহাসের পাতায় অংকন করে রাখছি। বর্তমান সময়ের বিজ্ঞ অজ্ঞ সকলেই এ বিষয়ে সম্যক অবগত।"

৬১৮ হিজরীতে আযারবাইজান অভিমুখে তাতারী বাহিনীর পুনরাগমন

৬১৮ হিজরীতে তাতারী বাহিনী আযারবাইজানের দিকে ফিরে আসে এবং মারাগা শহরে প্রবেশ করে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, শহরটি একজন নারী পরিচালনা করত। জানি না কেন মুসলমানরা নিজেদের লাগাম একজন নারীকে প্রদান করেছিল! বিশেষত তৎকালীন ভয়ংকর মুহূর্তে। যদি কোনো রাষ্ট্রে নেতৃত্বযোগ্য পুরুষ না থাকে, তবে ভিন্ন কথা!!

তাতারীরা মারাগা শহর অবরোধ করে চারপাশে ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করে। চতুর্দিক থেকে শহরে আক্রমণ শুরু করে। ফলে শহরবাসী যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে পড়ে। প্রথমত তাতারীরা বিভিন্ন দেশ থেকে বন্দী করে আনা মুসলমানদের ঢালস্বরূপ ব্যবহার করে। তাদের পক্ষে যুদ্ধ করতে বাধ্য করে। যারা যুদ্ধ করতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে, তাদের হত্যা করে ফেলে। সামান্য জীবনের মায়ায় বন্দী মুসলমানরা মুসলমান ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। সুবহানাল্লাহ! মৃত্যু যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন নিজে শাহাদাতের সুধা পান না করে কেন নিজ ভাইকে হত্যা করবে? যদি সে সময় মুসলিম বন্দীরা তাতারীদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ করত, হয়তো মুক্তির সুযোগ তৈরি হতো। কিন্তু আফসোস! তাদের চেতনাশক্তি লোপ পেয়েছিল, চোখ দৃষ্টিশূন্য হয়ে পড়েছিল! লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

তাতারীরা মারাগা শহরে ৪ঠা সফর ৬১৮ হিজরীতে প্রবেশ করে। এতে তারা অগণিত মানুষ হত্যা করে। আর যা কিছু ছিনতাইযোগ্য সবই তারা ছিনতাই

করে। আর যেসব সম্পদ তারা বহন করে নিতে পারেনি, সেগুলো আগুনে জ্বালিয়ে দেয়।

ইবনুল আছীর রহ. উল্লেখ করেন—

"একজন তাতারী মহিলা ঘরে প্রবেশ করে একদল মুসলমানকে হত্যা করে!! তিনি আরও লেখেন যে, স্বয়ং আমি জনৈক মারাগাবাসীর কাছে শুনেছি, একজন তাতারী সৈন্য একটি গলিতে প্রবেশ করে। সেখানে একশোজন মুসলমান পুরুষ ছিল। সে একা এক এক করে একশজনকে হত্যা করে। কিন্তু তারা তার সামনে প্রতিরোধের হাত বাড়ায়নি, পাল্টা আক্রমণ করেনি। মুসলমানদের ওপর লাঞ্ছনা নেমে এসেছিল। ফলে তারা সংখ্যায় কম হোক বা বেশি, কোনো অবস্থাতেই নিজেদের রক্ষা করতে পারেনি।"

উত্তর ইরাক আক্রমণের সতর্কবাণী

তাতারীরা ইরাকের উত্তরে অবস্থিত আরবিল শহরে আক্রমণের চিন্তা করে। আরবিল শহরে 'তাতারী ত্রাস' ছড়িয়ে পড়ে। অনুরূপ আরবিল শহরের পশ্চিমে অবস্থিত 'মসুল' শহরেও তাতারীদের ভয় ছড়িয়ে পড়ে। কতিপয় শহরবাসী দেশ ছেড়ে পালাবার চিন্তা করে। তৎকালীন আব্বাসী খলিফা নাছের তাতারীদের আরবিল শহর থেকে ফিরিয়ে দিতে ভয় পান। ফলে শহরবাসী সবাই বাগদাদ অভিমুখে পালাতে শুরু করে। সবার পলায়নপর পরিস্থিতি দেখে খলিফার গভীর তন্দ্রা উড়ে যায়, যে তন্দ্রায় তিনি বিগত কয়েক বছর ডুবন্ত ছিলেন। তাদের পালাবার সংবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

আপনি কি জানেন, খলিফা কয়জন সেনাকে একত্রিত করতে পেরেছিলেন?

খলিফা মাত্র আটশোজন সেনাকে একত্রিত করতে পেরেছিলেন!!

আমি জানি না, মাত্র আটশো সৈন্য নিয়ে কীভাবে খলিফা নাছের (সাহায্যকারী) আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করবেন?

কোথায় শক্তিশালী বিশেষ ফোর্স? কোথায় খলিফার দেহরক্ষীরা? কোথায় তুর্কীবাহিনী? কোথায় জিহাদী প্রেরণা? খলিফা নাছের খলিফা ছিলেন না; মূলত তিনি বাহ্যিকভাবে খেলাফতের বেশভূষা অবলম্বন করেছিলেন অথবা ছিলেন খলিফার অপচ্ছায়া!!

সেনাপ্রধান মুজাফ্ফর উদ্দীন সামান্যসংখ্যক বাহিনী নিয়ে তাতারীদের মোকাবেলা করার সাহস পায়নি। তাই তিনি সেনাবাহিনীসহ পালাতে থাকেন।

কিন্তু সুবহানাল্লাহ! অতি অল্পসংখ্যক বাহিনী দেখে তাতারীরা এটাকে এক ধরনের ধোঁকা মনে করে। মনে করে এরা অগ্রগামী সৈন্যদল। এটা বোধগম্য নয় যে, আব্বাসী খেলাফতের সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা মাত্র আটশো। এ কারণেই তাতারীরা প্রত্যাগমনের সিদ্ধান্ত নেয়। এতে ইরাক শহর আরও কয়েক বছর জীবন লাভ করে।

তাতারী বাহিনী প্রত্যাগমনের কারণ

এখানে তাতারী বাহিনীর প্রত্যাগমনের কারণ উল্লেখ করা প্রয়োজন উপলব্ধি করছি। তৎকালীন খেলাফতে আব্বাসীর শক্তি সামর্থ্যের কথা শুনলে তাতারীদের গা ঝাঁকুনি দিত। আব্বাসী খেলাফতের শক্তি-সামর্থ্য ও শৌর্য-বীর্যের কথা কে না জানত? আব্বাসী খেলাফতের রয়েছে বিজয়গাথার এক গর্বিত সুদীর্ঘ ইতিহাস। তাতারীরা তো পৃথিবীর বুকে মাত্র কয়েক বছর রাজত্ব করেছে। পক্ষান্তরে আব্বাসী খেলাফত ইতিহাসের সুদীর্ঘ পাঁচশ বছরের। কাজেই তাতারীরা ইরাকের শক্তি সম্পর্কে বাস্তবতার অধিক জ্ঞান করত। এ কারণেই তারা মুখোমুখি সংঘর্ষ ছেড়ে ‘ক্ষয়-যুদ্ধের’ পথ বেছে নেয়।

ক্ষয়-যুদ্ধের পন্থা ছিল—

১. অতর্কিত হিংস্র আক্রমণ।
২. টানা দীর্ঘ অবরোধ।
৩. পার্শ্ববর্তী দেশ ও রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে ইরাকবিরোধী ঐক্য গঠন।

হামাদান ও আরদাবিল আক্রমণ

হামাদান ও আরদাবীল বর্তমান ইরাকের আওতাভুক্ত শহর। তাতারীরা হামাদান শহর অবরোধ করে রাখে। অবরুদ্ধ শহরবাসীর খাদ্যদ্রব্য শেষ হয়ে গেলে তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। উভয় দলের মাঝে এক বিরাট রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তবে অবশেষে তাতারীরাই জয়লাভ করে। তারা শহরে রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়। ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়। এরপর আরদাবিল শহরে গিয়ে একই ঘটনা পুনরাবৃত্তি ঘটায়।

তিবরিয অভিমুখে তাতারী হামলা

তিবরিয ইরানের একটি বড় শহর। তাতারীরা এবার তিবরিয অভিমুখে রওয়ানা হয়। ইতিপূর্বে তাতারীরা হাড়-ভাঙা শীতকালে তিবরিয শহরে এসে শহরের

যাবতীয় সম্পত্তি ছিনতাই করে। তবে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কারণে যুদ্ধ বিরত থাকে। আউযবেক ইবনে বাহ্‌লাওয়ান হলেন এই শহরের বাদশা। এখন আবহাওয়া অনুকূলের কারণে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে তাতারীদের কোনো বাধা নেই।

পথিমধ্যে তাতারীরা একটি নতুন সংবাদ পেয়ে থমকে দাঁড়ায়। তারা জানতে পারে, আউযবেক ইবনে বাহ্‌লাওয়ানের পরিবর্তে তিবরিযের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন শামছুদ্দীন তাগরাই। তিনি ছিলেন বীর মুজাহিদ। দ্বীন ও দুনিয়া সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল অগাধ। তিনি জনসাধারণকে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেন। তাদের মনোবল চাঙা করেন। ভীরুতা ও লাঞ্ছনার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে তাদের সতর্ক করেন। তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান শিক্ষার পরিবর্তে বাস্তবজীবনের কার্যকরী শিক্ষা দান করেন। তিনি তাদের শিক্ষা দেন, মানুষ কখনোই তার নির্দিষ্ট মৃত্যুক্ষণের পূর্বে ইন্তেকাল করে না। জন্মের পূর্বেই মানুষের রিজিক ও মৃত্যুক্ষণ নির্ধারিত হয়। আর মুসলমানরা তাতারীত্রাসে যতই পলায়ন করুক, তাতারীরা তাদের পিছু ছাড়বে না। তাতারীত্রাস থেকে মুসলমানগণ তখনই রক্ষা পাবে, যখন তারা তলোয়ার ও ঢালের আশ্রয় নেবে। আর যুদ্ধের প্রস্তুতি ব্যতীত ভূপৃষ্ঠে হক সুরক্ষিত থাকে না।

তিবরিযবাসীর অন্তরে আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হয়। তারা তাদের মহান নেতার নেতৃত্বে দেশ রক্ষার জন্য দাঁড়িয়ে যায়। শহরের বেড়িবাঁধ সংস্করণ করে। খন্দক খনন করে। যুদ্ধের সরঞ্জামাদি প্রস্তুত করে। বহু বেরিকেড নির্মাণ করে। সুবিন্যস্ত কাতার সাজায়। দীর্ঘকাল পরে মুসলিম সম্প্রদায় জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

ইতিমধ্যে তাতারীরা মুসলমানদের জিহাদের প্রস্তুতি ও ব্যাপক সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে অবগত হয়। তারা 'নাড়ায়ে তাকবীর' শ্লোগানে মুখরিত জিহাদের ডাক শোনে!

কারও কারও ধারণা ছিল, সঙ্ঘবদ্ধ তাতারী বাহিনী তিবরিয মূলোৎপাটনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছে। তাদের মাঝে ক্রোধ ও ঘৃণা উথলে উঠেছে। তারা দীপ্তকণ্ঠে এগিয়ে আসছে।

কক্ষনো নয়; এমন হতে পারে না!!

তারা তিবরিয আক্রমণের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর পতাকাবাহী দলের সঙ্গে যুদ্ধে না নামার সিদ্ধান্ত নেয়। আল্লাহ তা'আলা তিবরিযবাসীর ভয় তাদের অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা ভয়ের মাধ্যমে সহযোগিতা করেছিলেন। অনুরূপ যারাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ গ্রহণ করবে, তাদের ভয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সহযোগিতা করবেন।

আল্লাহ তা'আলা জিহাদকে বহু কাঙ্ক্ষিত ও কার্যকরী সাব্যস্ত করেছেন। যদি কোনো সম্প্রদায় জিহাদ নাও করে, অন্তরে জিহাদে শরিক হওয়ার একনিষ্ঠ নিয়ত রাখার পাশাপাশি যথাসাধ্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে, এতেই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে। তা হলো 'শত্রুর অন্তরে ভীতি সঞ্চার'।

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

"(হে মুসলিমগণ,) তোমরা তাদের মোকাবেলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-ছাউনী প্রস্তুত করো, যা দ্বারা তোমরা আল্লাহর শত্রু ও নিজেদের (বর্তমান) শত্রুদের সন্ত্রস্ত করে রাখবে এবং তাদের ছাড়া সেইসব লোককেও যাদের তোমরা এখনো জানো না (কিন্তু) আল্লাহ জানেন। তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করবে তা তোমাদের পরিপূর্ণরূপে দেওয়া হবে এবং তোমাদের কিছু কম দেওয়া হবে না।"[২৯]

এটি হলো মেঘাচ্ছন্ন আকাশের আড়ালে আলোকময় সূর্যের হাতছানি।

আল্লাহ তা'আলা শাসছুদ্দীন তাগরাই রহ.কে অশেষ রহমত দান করুন, যিনি তিবরিয শহরে দ্বীন ইসলামকে পুনর্জীবন দান করেছেন।

বিলকান আক্রমণ

বিলকান বর্তমান ইরানের একটি অন্যতম শহর। আফসোস! বিলকানবাসী তিবরিযবাসীর আদর্শ গ্রহণ করতে পারেনি। তাতারীরা ৬১৮ হিজরীর রমজান মাসে বিলকান আক্রমণ করে। নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ কারও প্রতিই এই পশুরা কোনো দয়া করেনি। যাকে পেয়েছে, তাকেই হত্যা করেছে। ইবনে আছীর রহ. বলেন—

[২৯] সুরা আনফাল : ৬০।

“তারা পাগলদের পর্যন্ত হত্যা করেছে। পেট ফেড়ে গর্ভের সন্তান পর্যন্ত হত্যা করেছে। মহিলাদের সঙ্গে কুকর্মে লিপ্ত হয়েছে। মনোরঞ্জন শেষে স্বভাব অনুযায়ী শহরের সব ধন-সম্পত্তি লুট করে আগুন জ্বালিয়ে তা ভস্ম করেছে। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!”

কুঞ্জা অভিমুখে তাতারী হামলা

তাতারী বাহিনী কুঞ্জা অভিমুখে রওয়ানা হয়। কুঞ্জাবাসী তিবরিযবাসীর আদর্শ গ্রহণ করে এবং তাতারীরা তাদের সঙ্গে তা-ই করল, যা করেছিল তিবরিযবাসীর সঙ্গে।

কুঞ্জাবাসী জিহাদের ঘোষণা দেয় এবং যথাসাধ্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ফলে একজন তাতারীও কুঞ্জা শহরে প্রবেশ করেনি। এ শহর ছেড়ে অন্যত্র পলায়ন করে।

এটি কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না। যেই দেশ জিহাদের পতাকা হাতে তুলে নেয় এবং জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তাতারী বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ভয় পায়। এটা কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না। এটি আল্লাহর অমোঘনীতি। যদি প্রত্যেক শহরবাসী এ কাজ করত, শুধু তাতারী নয়, বরং কেউই মুসলিম ভূখণ্ডের ওপর অপবিত্র পা ফেলার দুঃসাহস পেত না।

মুসলমানগণ বছরের পর বছর এই দেশগুলোকে শত্রুর আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রেখেছিল। সংখ্যাধিক্যের বলে নয়, অন্যের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করে নয়, বরং তারা এই ভূখণ্ডগুলোকে সংরক্ষিত রেখেছিল একনিষ্ঠ জিহাদ, পবিত্র রক্ত ও ইখলাছপূর্ণ পবিত্রাত্মার বিনিময়ে।

আল্লাহর রীতি-নীতিতে কোনো পরিবর্তন ঘটে না; পরিবর্তন ঘটে বান্দার রীতিতে, বান্দার আমলে।

আল্লাহ তা'আলা কারও প্রতি সামান্য জুলুম করেন না। কিন্তু মানুষ নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করে।

দাগিস্তান ও শিশান আক্রমণ

দাগিস্তান ও শিশান দেশ দুটি আযারবাইজানের উত্তরে কাযবিন সমুদ্রতীরে অবস্থিত। বর্তমানে দেশ দুটি রাশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত। আমরা আল্লাহর কাছে দেশ দুটির পূর্ণ স্বাধীনতা কামনা করছি। তাতারীরা স্বভাব অনুযায়ী দেশ

দুটিকে তছনছ করে দিয়েছিল। রাস্তায় যাদের পেয়েছিল, অধিকাংশকে হত্যা করেছিল।

রাশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে আক্রমণ

তাতারীরা উত্তর প্রান্তে ক্রমশ ধাবিত হচ্ছে। শিশান ধ্বংসের পর তারা রাশিয়ার ভোলগা নদীর তীরে পৌঁছে। তারা নির্বিচারে এসব অঞ্চলের অধিবাসীদের হত্যা করতে থাকে। তারা সবাই ছিল খ্রিস্টান।

এমন দুর্বিপাকের মাঝেই ৬১৮ হিজরী শেষ হয়। ইতিমধ্যেই বর্বর তাতারী বাহিনী রাশিয়া ভূখণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে যায়। চীনের পূর্ব ও রাশিয়ার পশ্চিম প্রান্ত তাতারীদের চারণভূমিতে পরিণত হয়।

৬১৯ হিজরীতে তাতারীদের অবস্থান

এ বছর তাতারীরা রাশিয়া ভূখণ্ডে তাদের অভিযান চালায়। চীন ও ইরাকজোড়া সুবিশাল মুসলিম ভূখণ্ডে তারা প্রভাব বিস্তারে মরিয়া হয়ে ওঠে। ৬১৯ হিজরীতে তারা সে সকল অঞ্চলে রাজত্ব বিস্তার করেছিল বর্তমান বিশ্বমানচিত্রে সে সব অঞ্চলের তালিকা নিম্নরূপ—

১. কাজাখস্তান
২. কিরগিস্তান
৩. তাজিকিস্তান
৪. তুরমেনিস্তান
৫. উজবেকিস্তান
৬. পাকিস্তান (কিরমান অঞ্চল ব্যতীত)
৭. আফগানিস্তান
৮. ইরানের বৃহদাংশ (ইরাকসংলগ্ন ইরানের পশ্চিম সীমান্ত এলাকা ও ইসমাঈলিয়া অঞ্চল ব্যতীত)
৯. আযারবাইজান।
১০. আরমেনিয়া
১১. জুর্জিয়া
১২. রাশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল

৬২০ হিজরীতে তাতারীদের অবস্থান

তাতারী সম্রাট চেঙ্গিজ খান খাওয়ারেযম সাম্রাজ্যে নিজ প্রভাব বিস্তরকরত রাশিয়া অঞ্চলে একের পর এক আক্রমণ করছিল।

এ বছর পরপর চারটি দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাগুলো তৎকালীন মুসলমানদের সার্বিক পরিস্থিতির বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে। অনুরূপ এ কথার বর্ণনাও দেয় যে, তাতারীরা কীভাবে এই সুবিশাল অঞ্চল অতি অল্প সময়ে দখল করল?

প্রথম ঘটনা

তাতারী বাহিনী রাশিয়া ভূখণ্ডে প্রবেশ করে এবং বহু প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু তারা রাশিয়ার সীমান্ত অঞ্চলে বুলগার অঞ্চলের একদল রাশিয়ানের মুখোমুখি হয়। দু-দলের মাঝে বিকট যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতারী বাহিনী প্রথমবারের মতো এ অঞ্চলে পরাজিত হয়। যুদ্ধে বহুসংখ্যক তাতারী নিহত হয়। রাশিয়া ভূখণ্ডে তাতারীরা থমকে দাঁড়ায়। তাদের সৈন্যসংখ্যা হ্রাস পায়। এটা ছিল মুসলমানদের মোক্ষম সুযোগ। এ সুযোগে মুসলমানরা নিজেদের ছত্রভঙ্গ বাহিনীকে নতুনভাবে সাজাতে পারত। কারণ, তখন তাতারীরা বুলগায় পরাজিত হয়ে হীনম্মন্যতায় ভুগছিল।

তা কাম্য ছিল, তবে বাস্তবায়িত হয়নি

তবে যা ঘটেছে, তা হলো, এ অঞ্চলের জনৈক মুসলিম আমীর তার সেনাবাহিনী নিয়ে জুজিয়া অঞ্চলের ওপর আক্রমণ করে। এই মুসলিম আমীর মূসা ইবনে আদেলের অধীনস্থ ছিল। যিনি বহু উপত্যকার রাজা ছিলেন। (তিনি কুর্দী ছিলেন, ইরাকের উত্তরাঞ্চল শাসন করতেন।)

ঘটনাটি বড়ই বিস্ময়কর। কারণ, যদিও জুজিয়াবাসী ও মুসলমানদের মাঝে টানা যুদ্ধ লেগে থাকত, তবে সম্প্রতি তারা যুদ্ধবিরতি পালন করছিল। উপরন্তু তাতারী আক্রমণ প্রতিহত করতে নিজেদের যুদ্ধবিরতি করাই সময়ের দাবি ছিল। কারণ, জুজিয়াবাসীও তাতারীদের ঘৃণা করত। মুসলমানদের মতো তারাও তাতারীত্রাসে তটস্থ ছিল। তাই মুসলমানদের জন্য সময় উপযোগী পদক্ষেপ হতো তাতারীদের বিরুদ্ধে জুজিয়াবাসীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়া কিংবা কমপক্ষে জুজিয়াবাসীকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখা। যাতে অন্যত্র যুদ্ধ করে মুসলমানদের শক্তি নিঃশেষ না হয়। অধিকন্তু জুজিয়াবাসী এসব অঞ্চল সম্পর্কে

সম্যক অবহিত। ফলে যদি কোনোভাবে তাতারীরা জুজিয়াবাসীকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়, তাহলে মুসলমানরা বড় বিপদে পতিত হবে!

মুসলমানগণ এমন বিপদসংকুল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে, যাকে আমরা 'রাজনৈতিক সংকট' নামে অভিহিত করতে পারি। তারা সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, রণকৌশল, বিশুদ্ধ লক্ষ্য ও একতা হারিয়ে ফেলেছিল। মুসলমানদের অবস্থা হয়েছিল অসামঞ্জস্যশীল, অস্থিতিশীল ও অপরিপক্ব।

জুজিয়াবাসীদের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুদ্ধ চলার কারণে উভয় দলের বহুসংখ্যক সৈন্য নিহত হয়। তাতারীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ভরসাও তারা হারিয়ে ফেলে। ফলে কল্যাণকর পদক্ষেপ গ্রহণে দৃঢ়সংকল্প হওয়া অতি সহজ ছিল না। তাদের মনোবলহীনতার বড় কারণ ছিল এটি। যুদ্ধ বন্ধ হলো। নতুনভাবে সন্ধিচুক্তিও হলো বটে; তবে বহু পরে, যখন উভয়দল মৃত্যুর পথযাত্রী!!

দ্বিতীয় ঘটনা

এ যাত্রায় তাতারীদের পরাজয়ের কারণ হলো, মুহাম্মদ ইবনে খাওয়ারেযম শাহের সন্তান, হিন্দুস্তান অভিমুখে পলায়নকারী জালাল উদ্দীন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খাওয়ারেযম শাহের ভাই গিয়াশ উদ্দীন ইবনে মোহাম্মদ ইবনে খাওয়ারেযম শাহের আবির্ভাব।

গিয়াস উদ্দীন সৈন্যবাহিনীকে নতুন ধাঁচে ঢেলে সাজায়। রায়, ইস্পাহান, এমনকি ইরানের দক্ষিণে অবস্থিত কিরমান অঞ্চল পর্যন্ত তার ক্ষমতা বিস্তৃত হয়। তখনো তাতারীরা কিরমান অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছেনি। ফলে ইরানের দক্ষিণ ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল গিয়াশ উদ্দীনের কর্তৃত্বে চলে আসে। তবে পূর্ব ও পূর্ব উত্তরাঞ্চল তখনো (তথা গোটা খোরাসান ভূমি) তাতারীদের দখলেই ছিল। এভাবেই গিয়াস উদ্দীন তাতারীদের ও আব্বাসী খেলাফতের সম্মুখে বন্ধকপাট ও দুর্ভেদ্য প্রাচীরে পরিণত হন।

তৎকালীন আব্বাসী খলীফা নাছের লি ফি দীনিল্লাহ এসব অঞ্চলে গিয়াস উদ্দীনের প্রভাব-প্রতিপত্তি বদ্ধমূল করার জন্য সহযোগিতা করবেন, এটাই সকলের প্রত্যাশা ছিল। এটাও প্রত্যাশা ছিল যে, তিনি খাওয়ারেযম সাম্রাজ্য আব্বাসী খেলাফতের মধ্যকার দীর্ঘদিনের মতভেদকে ভুলে যাবেন। কারণ, এখন দলমত নির্বিশেষে সকলে এক শক্তিধর শত্রুর মুখোমুখি—তা হলো, তাতারী বাহিনী।

যদিও দ্বীন হেফাজত, ভ্রাতৃত্ব রক্ষা কিংবা মুসলমানদের সহযোগিতার জন্য এই প্রত্যাশা ছিল না; তবে অত্র অঞ্চলে গিয়াশ উদ্দীনের ক্ষমতাকে নির্ভেজাল করার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ রণকৌশল অনস্বীকার্য বিধায় আব্বাসী খলীফা নাছের লি দীনিল্লাহর কাছে এই সহযোগিতা ছিল বহু কাঙ্ক্ষিত। কারণ, গিয়াশ উদ্দীনই তাতারীদের মুখোমুখি হতে পারেন। যদি তাতারীরা গিয়াশ উদ্দীনকে পরাজিত করতে পারে, তাহলে তাতারীদের দ্বিতীয় চারণক্ষেত্র হবে আব্বাসী খেলাফত!!

কিন্তু আব্বাসী খলিফা 'নাছের লি দীনিল্লাহ' এই সহযোগিতা প্রদানের প্রয়োজন অনুভব করেননি। তিনি রাজনৈতিক সংকটকে খুব ভয় পেয়েছিলেন। ইতিহাসবিদদের ভাষায় তিনি ছিলেন, স্বৈরাচার জালেম শাসক। তিনি প্রজাদের ওপর শুল্ক-ট্যাক্স নির্ধারণ করেছিলেন। জনগণের আয়ের প্রতিটি উৎসের ওপর কর বসিয়েছিলেন।

আনন্দ-উল্লাস, খেল-তামাশা, প্রাণী শিকার ইত্যাদি মনোরঞ্জনকর অনুষ্ঠানের প্রতি তিনি গুরুত্বারোপ করতেন। তার খেলাফতকালে সর্বত্র ফেতনা-ফ্যাসাদ ছড়িয়ে পড়েছিল। পণ্যমূল্য ঊর্ধ্বগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল। বেতন-ভাতা হ্রাস পেয়েছিল। তিনি সংঘটিত ঘটনাবলি বা আসন্ন প্রেক্ষাপট নিয়ে সর্বদা গভীর চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন উপলব্ধি করতেন না। তৎকালে সংঘটিত কোনো ঘটনার ব্যাপারে তিনি নিশ্চিন্ত মনোভাব পোষণ করতেন না।

খলীফা নাছের লি দীনিল্লাহ্ যা করলেন

তিনি খাওয়ারেযম সাম্রাজ্যের মধ্যকার পুরোনো বিরোধ ভুলে যাননি। তিনি তাতারীত্রাসের কথা ভুলে গিয়ে সুলতান গিয়াস উদ্দীনের ক্ষমতাকে ভেঙে চুরমার করে দিতে চাইলেন। তিনি গিয়াশ উদ্দীনের মামা ইগান তাইসীর কাছে পত্র প্রেরণ করেন। ইগান তাইসী ছিলেন মহৎ ব্যক্তি। রণক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। তিনি ছিলেন গিয়াশ উদ্দীনের সেনাপ্রধান। গিয়াশ উদ্দীন তার পরামর্শ ব্যতীত কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না। খলিফা 'নাছের লি দীনিল্লাহ' পত্রযোগে তাকে গিয়াশ উদ্দীনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে উৎসাহিত করেন এবং তাকে রাজত্বের লোভ দেখিয়ে প্ররোচিত করেন। এভাবে খলিফা নাছের লি দীনিল্লাহ্ ইগান তাইসীর বন্ধুত্ব লাভ করেন এবং গিয়াস উদ্দীনকে অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করেন। কিন্তু পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তাতারী ফেতনা যে বিকট আকার ধারণ করছে তা তাকে সামান্যতম বিচলিত করেনি।

বিষয়টি ইগান তাইসীকে মুগ্ধ করল। বিষয়টি বহু আগ থেকে তার মাথায় ঘোরপাক খাচ্ছিল। খলিফা নাছের তাকে পত্র প্রেরণ করলে এবং সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি প্রদান করলে তার সংকল্প দৃঢ় হয়। সে কতিপয় সেনাপতিকে এ বিষয়ে লোভ দেখায়। ধীরে ধীরে যখন তার শক্তি-সামর্থ্য ও অনুসারী বৃদ্ধি পায়, তখন সে গিয়াশ উদ্দীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সঙ্গীদের সঙ্গে নিয়ে সে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। যোগাযোগব্যবস্থা ছিন্ন করে দেয়, শহর-জনপদের ধন-সম্পত্তি লুট করতে থাকে। কিন্তু মানুষ উপলব্ধি করতে পারেনি এই ধ্বংসযজ্ঞ কোত্থেকে আসছে? মুসলিম বাহিনীর পক্ষ থেকে নাকি বর্বর তাতারীদের পক্ষ থেকে?! উগ্রপন্থি বিপর্যয় সৃষ্টিকারী অসংখ্য মানুষ ইগান তাইসীর সঙ্গে মিলিত হয়।

তখনো তাতারীরা বহু দূরে অবস্থান করছিল। অজ্ঞতার ঘোরে নিমজ্জিত খলিফা নাছের অত্যাসন্ন মহা বিপর্যয় দেখেও সন্তুষ্ট ছিলেন। ইগান তাইসী ভাগ্নে গিয়াশ উদ্দীনের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

দুই মুসলিম দল যুদ্ধে মুখোমুখি হয়। উভয় দলের মাঝে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলমানের হাতে অসংখ্য মুসলমান নিহত হয়। যুদ্ধে ইগান তাইসী পরাজিত হয়। তার দলের অধিক সৈন্য নিহত হয়। অবশিষ্টরা বন্দী হয়। ইগান তাইসী তার কতিপয় সৈন্যসহ লাঞ্ছনার পরাজয় মাথায় নিয়ে পালিয়ে আযারবাইজান চলে যায়। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

ইমাম মুসলিম ও তিরমিযী রহ. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ

"শয়তান এ বিষয়ে নিরাশ হয়েছে যে, মুসল্লীরা তার ইবাদত করবে। তবে তাদের মাঝে ফেতনা সৃষ্টির ব্যাপারে সে হতাশ হয়নি।" *মুসলিম শরীফের* বর্ণনায়—"আরব ভূখণ্ড" শব্দ অতিরিক্ত এসেছে।

তৎকালীন মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ লড়াই ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেখে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই। মুসলিম উম্মাহর এই মহাসংকট ছিল চিরবাস্তব। সম্প্রতি আমরা মুসলমানদের পরস্পর দ্বন্দ্ব-লড়াই দেখতে পাই। অথচ মুসলমানগণ চরম

সংকটাপন্ন। তবু খুব কমসংখ্যক মুসলমানই এই সংকটাপন্ন পরিস্থিতি দেখে বিচলিত হয়!!

মিশর ও সুদানের বিরোধ কিংবা লিবিয়া ও আফ্রিকার প্রদেশ 'চাদের' মধ্যকার বিরোধ, মাগরিব ও পশ্চিমা মরুভূমির উপত্যকাসমূহের মধ্যকার বিরোধ, সেনেগাল ও সেনেগাল নদীর তীরে অবস্থিত মৌরিতানিয়া দেশের মধ্যকার বিরোধ, সৌদি আরব ও ইয়েমেনের মধ্যকার বিভেদ, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইরানের মধ্যকার বিভাজন, সিরিয়া ও তুরস্কের মধ্যকার বিরোধ; এছাড়াও অন্য মুসলিম দেশসমূহের মধ্যকার বিভেদসমূহ খুব কমসংখ্যক লোককেই আতঙ্কিত করে? ইরাক ও ইরান যুদ্ধে মুসলমানদের ক্ষয়-ক্ষতির কথা আমাদের সবারই জানা। ইরাক ও কুয়েত যুদ্ধের কথাও আমাদের অজানা নয়। মুসলিম উম্মাহর এ সকল বিভেদ-বিভাজন মুসলিম ভূখণ্ডের জন্য বড় ঝুঁকিপূর্ণ। অশুভ কালো থাবার পূর্বাভাস। দৈনন্দিন পত্রিকার পাতা খুললেই ভেসে ওঠে ফিলিস্তিন, ইরাক, শিশান, কাশ্মীর, সুদান, আলজেরিয়া, নাইজেরিয়া, সুমাল ও অন্যান্য দেশের মুসলিম-নিধনের নির্মম হত্যাযজ্ঞ। গগন-জাগানিয়া আহাজারি! অথচ আমরা অধিকাংশ এসব সংবাদ নিত্যদিনের স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে পাঠ করি। আমাদের মাঝে না কোনো যন্ত্রণা কাজ করে আর না আমরা সামান্যতম ব্যথিত হই। আমাদের মতোই তৎকালীন মুসলিমবিশ্বের মুসলমানরাও অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত মুসলিম-নিধনের ঘটনাগুলো বোধ ও চেতনাহীনভাবে শ্রবণ করত। এতে তারা না ব্যথিত হতো, না অন্তর্দহনে ভুগত। এসব ঘটনা কাছের দূরের কাউকেই ভাবিয়ে তুলত না। সত্যিই এ ছিল দুঃখজনক ও অনাকাঙ্ক্ষিত। আহ! সবাই কেবল নিজেকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত ছিল। আহ! তারা কেবল নিজের জীবন ও আত্মীয়-স্বজনের জীবন নিয়ে ভাবত! অপর ভাই নির্মমভাবে নিহত হলেও চোখ তুলে তাকাত না! কারও ঘর-বাড়ি ধ্বংস হলে, কারও স্ত্রী চুরি হলে কিংবা কারও ভূমি লুণ্ঠিত হলেও কেউ তাদের প্রতি দয়ার দৃষ্টিতে তাকাত না। সার্বিক বিবেচনায় সত্যিই এ ছিল চরম হতাশার ও দুঃখজনক। ইসলামের বিচারে ভ্রাতৃত্ব বিবেচনায় এমনকি মানবতার বিচারে এ ছিল মুসলিম উম্মাহর চরম অধঃপতন! লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

তৃতীয় ঘটনা

এ ঘটনাটিকে ইবনুল আছীর রহ. *'কামেল ফিত তারীখ'* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—

حادثة غريبة لم يوجد مثلها

“এটি একটি বিরল ঘটনা, যার দৃষ্টান্ত মেলা ভার!!”

কার্যতই ঘটনাটি বিস্ময়কর ও যারপরনাই বেদনাবিধুর।

ঘটনাটি হলো, মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের পর খ্রিস্টান রাজ্য জুজিয়ার শাসনভার গ্রহণ করেন জনৈক মহিলা। রাজ্যের আমীর-ওমারা ও নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আবেদন করেন। যাতে কোনো পুরুষ তার পক্ষ থেকে রাজ্যের বিভিন্ন দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে পারেন এবং যিনি যুদ্ধ-বিগ্রহের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন। ফলে তিনি রাজ-পরিবারের কোনো পুরুষকে বিয়ে করার ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু তিনি জুজিয়ায় তার উপযুক্ত কোনো পুরুষ খুঁজে পাননি। তুরস্কের মুসলিম সম্রাট মুগীস উদ্দীন তগরাল শাহ ইবনে কালাজ আরসালান এ সংবাদ শুনতে পেয়ে তার ছেলের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। রানি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, কোনো মুসলমান আমাদের সম্রাট হতে পারে না।

বাদশা মুগীস উদ্দীন ইবনে আরসালান কী করলেন

তিনি তাদের বললেন, আমার ছেলে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে তাকে বিয়ে করবে।

তারা সবাই এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন। বাস্তবেই তার ছেলে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে জুজিয়ার রানিকে বিয়ে করে এবং জুজিয়ার রাজ্যভার গ্রহণ করার জন্য সেখানে চলে যান। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

সে সময় মুসলমানরা নৈতিক অধঃপতনের এত গভীর গর্তে নিপতিত হয়েছিল যে, এ অবস্থায় আল্লাহর সহযোগিতা লাভ করা অসম্ভব। কীভাবে একজন মুসলিম সম্রাট ও তাঁর ছেলের মাথায় খ্রিস্টান হওয়ার চিন্তা হয়? খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করা তো বহু দূরের কথা!

খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলে যদি সারা পৃথিবী পরিচালনার দায়িত্বভারও আসে, তবু কি একজন মুসলিম বাদশার পক্ষে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করা সম্ভব? যদি কোনো দুর্বল ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ দুর্ঘটনা ঘটত, তবে হয়তো আমরা এই বলে নিজেদের প্রবোধ দিতে পারতাম যে, হয়তো তাকে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছে? কোনো সুস্থ বিবেক এমন চিন্তা করতে পারে না।

আমি জানি না, কেন সম্রাটের নাম মুগীস উদ্দীন (তথা দ্বীনের আশ্রয় দাতা) রাখা হয়েছিল? আমি জানি না, তিনি দ্বীনের জন্য কী সহযোগিতা প্রদান

করেছেন? আমি এও জানি না যে, তিনি কোন দ্বীন (ধর্ম) কে আশ্রয় দিয়েছেন? ইসলামধর্ম নাকি খ্রিস্টধর্ম?

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

"প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ হয় না; বরং অন্ধ হয় সেই হৃদয় যা বক্ষদেশে বিরাজ করে।"[৩০]

পরিস্থিতির পরিপূর্ণ চিত্র ফুটিয়ে তুলতে তার শেষ পরিণাম উল্লেখ করাকে যথোপযুক্ত মনে করছি। আমরা দেখব, যে ব্যক্তি দ্বীনকে দুনিয়ার স্বার্থে বিক্রি করে, তার পরিণাম কী হয়?

মুসলিম সম্রাট খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করত জুজিয়ার খ্রিস্টান রানিকে বিয়ে করে। মাঝখানে বহুদিন কেটে যায়। বেশ কিছুদিন পর সম্রাট শুনতে পান যে, তার স্ত্রী জনৈক দাসের প্রতি আসক্ত। তার সম্পর্কে অশ্রাব্য কটু মন্তব্য শুনতে পান। কিন্তু এ বিষয়ে কাউকে কিছু বলতে পারেন না। তিনি সুবিশাল রাজ্যে একাকিত্ব অনুভব করেন। একদিন তিনি রাজমহলে প্রবেশ করে রানিকে দাসের সঙ্গে বিছানায় অপ্রীতিকর অবস্থায় দেখতে পান। তার এই কুকর্মকে তিনি ঘৃণা করেন এবং (বৈবাহিক) সম্পর্ক রক্ষায় অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। রানি সর্বক্ষমতা প্রয়োগ করত বলেন, 'এ অবস্থায় যদি তুমি সন্তুষ্ট থাকতে পারো, তবে থাকো। অন্যথায় চলে যাও।' বাদশা বললেন, আমি এ অবস্থায় সম্পর্ক রক্ষা করতে পারব না। ফলে রানি তাকে অন্য দেশে পাঠিয়ে দেন এবং অন্য আরেক জন বিয়ে করেন!!

আল্লাহ তা'আলা আমাদের লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহর কাছে আমরা শুভ পরিণাম কামনা করি এবং যেদিন আমরা আল্লাহর সাক্ষাতে ধন্য হব, সেদিন যেনো আমাদের শ্রেষ্ঠ দিন হয়।

ইমাম মুসলিম রহ. হযরত আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا

---

[৩০] সুরা হজ : ৪৬।

"তোমরা পুণ্যকর্মের মাধ্যমে ফেতনাকে অতিক্রম করবে অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত পার করার মতো। (সে সময়) মানুষ সকালে মুমিন হবে আবার সন্ধ্যায় কাফের হবে। মানুষ দ্বীন-ধর্মকে দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রি করবে।"[৩১]

চতুর্থ ঘটনা

৬২০ হিজরীতে এমন একটি দুর্ঘটনা ঘটে, কেউ কেউ এটিকে আকস্মিক ঘটনা বলে আখ্যা দেয়। এই বছরগুলোতে মুসলমানদের ফেতনার কোনো অন্ত ছিল না। অর্থনৈতিক হাল ছিল অধঃপতিত। অনুরূপ রাজনৈতিক, সামরিক ও চারিত্রিক অধঃপতন নেমে এসেছিল। সবচেয়ে বড় বিপদ ছিল মুসলিম অঞ্চলসমূহে ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপালের আবির্ভাব। ইরাক, আরব ভূখণ্ড, সিরিয়া, পারস্যসহ অন্য মুসলিম দেশের প্রচুর শস্য ফলফলাদি এতে বিনষ্ট হয়।

এটা কি কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল

আল্লাহর শপথ! এটা কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না; বরং এটি ছিল কিতাবুল্লাহর হুঁশিয়ারি বাণীর বাস্তবায়ন—

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"যদি সে সকল জনপদবাসী ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর উভয়দিক থেকে বরকতের দরজাসমূহ খুলে দিতাম। কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করল। সুতরাং আমি ক্রমাগত অসৎকর্মের পরিণামে তাদের পাকড়াও করি।"[৩২]

এটি কিতাবুল্লাহর হুঁশিয়ারবাণীর বাস্তব নমুনা।

যখন তাকওয়া (খোদাভীতি) তাহারাত (পবিত্রতা) জাতির মাঝে বদ্ধমূল হবে, তখন তাদের জন্য আসমান-জমিনের বরকত খুলে দেওয়া হবে।

পক্ষান্তরে যখন তাকওয়া হারিয়ে যাবে—যেমন আমরা তৎকালীন মুসলমানদের অবস্থা প্রত্যশা করেছি—তখন আমরা ক্রমাগত বিপদাপদ, বালা-মসিবত ও সংকট-জটিলতা দেখতে পাবো।

---

[৩১] *মুসলিম :* ১৮৬।

[৩২] সুরা আ'রাফ : ৯৬।

এমনকি আল্লাহ তা'আলা কুদরত প্রমাণের জন্য কুরআনে কারীমে পঙ্গপালের কথাও উল্লেখ করেছেন যে, যারা শরীয়তের তোয়াক্কা করে না, তাদের ওপর পঙ্গপাল নেমে আসবে। আল্লাহ তা'আলা ফেরাউন সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেন—

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ

"সুতরাং আমি তাদের ওপর প্লাবন, পঙ্গপাল, ঘুণপোকা, ব্যাঙ ও রক্তের মসিবত ছেড়ে দিই। যেগুলো ছিল পৃথক পৃথক নিদর্শন। তথাপি তারা অহংকার প্রদর্শন করে। বস্তুত তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়।"[৩৩]

সুবহানাল্লাহ! আমরা দীর্ঘ এক বছর কিংবা ততোধিক সময় ধরে মুসলিমবিশ্বের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপাল নেমে আসা দেখেছি। আমি (লেখক) মনে করি, এটা কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না; বরং এটি ছিল মুসলমানদের জন্য সতর্কীকরণ, ইতিহাসের স্মারক এবং আল্লাহর পথে ফিরে আসার আহ্বান। আমরা আল্লাহর ক্রোধ থেকে পানাহ চাই। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেনো আমাদের তাঁর নিদর্শনাবলি দেখান এবং তাকওয়া ও খোদাভীতি, এখলাছ ও একনিষ্ঠতার গুণে গুণান্বিত হওয়ার এবং তার যাবতীন বিধানাবলির ওপর পূর্ণ আমল করার তৌফিক দান করেন।—আমীন।

৬২১ হিজরীর ঘটনাবলি

৬২১ হিজরীতে সম্রাট গিয়াশ উদ্দীন (ইরানের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত) নিজ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে চান। কিন্তু তার ও সে অঞ্চলের জনৈক আমীর সা'দ উদ্দীন ইবনে দাকলার মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং বছরব্যাপী যুদ্ধ চলতে থাকে। একপর্যায়ে উভয় দলই দেশ বিভক্তির প্রতি সন্তুষ্ট হয়। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

বাদশা গিয়াশ উদ্দীন যখন দক্ষিণ ইরানে সা'দ উদ্দীনের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত। এ সুযোগে তাতারী বাহিনীর ছোট্ট একটি দল—তিন হাজার সৈন্যের বেশি হবে না—রায় নগরীর ওপর আক্রমণ করে বসে। তাতারীরা যেভাবে ইচ্ছা শহরবাসীকে হত্যা করে ও লুণ্ঠন চালায়। রায় নগরীকে বিরানভূমিতে পরিণত করে। এরপর তারা সাওয়া শহরে গিয়ে একই রকম কার্যকলাপ চালায়। এরপর

---

[৩৩] সুরা আ'রাফ : ১৩৩।

তেহরানের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত কম শহরে (এটি ইরানের একটি শহর Qom) এরপর কাশান শহরে আক্রমণ করে শহর দুটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। এরপর হামাদান শহরে একই রকম কার্যকলাপ শেষে নিরাপদে চেঙ্গিজ খানের দরবারে ফিরে যায়।

মাত্র তিন হাজার তাতারী স্বল্প সময়ে যা আমরা উল্লেখ করলাম, তা সমাধা করে!!

আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের চোখে তাতারীদের অধিকসংখ্যকরূপে তুলে ধরেছিলেন এবং তাতারীদের চোখে মুসলমানদের সংখ্যা স্বল্পরূপে উপস্থাপন করেছিলেন। ফলে তাতারীত্রাস বিকট আকার ধারণ করেছিল। আর তাতারীদের অন্তর থেকে মুসলমানদের ভয়ভীতি দূর হয়ে গিয়েছিল।

কেন? এর কারণ কী?

এর কারণ হলো, মুসলমানরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তারা শত্রু-মিত্রের মাঝে পার্থক্য ভুলে গিয়েছিল। যখন মুসলমানদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার দরকার ছিল, তখন তারা ছিল বিভক্ত। আর তাদের এমন অবস্থার পেছনে কারণ ছিল অন্তরের ঈমান-স্বল্পতা, দুনিয়াকে বড় করে দেখা, নিকৃষ্ট প্রতিপালন ইত্যাদি।

এ ছিল জাতির আত্মার ব্যাধি ও চারিত্রিক অধঃপতনের ফলাফল। যেমনটি ইবনুল আছীর রহ. ৬২১ হিজরীর ঘটনাবলি উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন—

"এ বছর বৃষ্টি-স্বল্পতা দেখা দিয়েছিল। বিভিন্ন সময় দু'এক ফোঁটা বৃষ্টি নামত, যা ফসলাদির জন্য পর্যাপ্ত ছিল না। ফলে ফলন কমে যায়। উপরন্তু বের হয় অগণিত পঙ্গপাল। পঙ্গপাল জমিনের সকল ফসলাদি তছনছ করে ফেলে। ফলে ইরাক, মসুল এবং সকল আরবরাষ্ট্রে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পায় এবং খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতি দেখা দেয়।"

আর এ বছর সংঘটিত যাবতীয় বিপদাপদ, যেমন : পঙ্গপাল, দুর্ভিক্ষ, খাদ্যঘাটতি ছিল একটি স্বাভাবিক ঘটনা। এটি ছিল ঐশী বিধানমাফিক বিষয়। এগুলো আকস্মিক ঘটনা ছিল না।

কোনো যুগে যদি মুসলমানরা পণ্যমূল্য বৃদ্ধি, খাদ্যসংকট, অর্থনৈতিক ঘাটতি, সংকটাপন্ন জীবনযাপন দেখতে পায়, তখন যেন তারা নিজেদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, নিজেদের ঈমান-আমলের খোঁজ-খবর নেয় এবং নিজেদের যেন

আল্লাহর কিতাবের কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। বাস্তবেই যদি তারা এ কাজ করতে পারে তবে তারা রোগ নির্ণয় করতে পারবে এবং সঠিক চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারবে।

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

"আমি কিতাব (লওহে মাহফুজে) কোনো ত্রুটি রাখিনি।"[৩৪]

৬২২ হিজরীর ঘটনাবলি

৬২১-৬২২ হিজরী এই দুই বছরে খাওয়ারেযম সাম্রাজ্যের পশ্চিম তথা ইরানের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে তাতারীরা আক্রমণ করেছিল। তারা দূরবর্তী অঞ্চলসমূহের ওপর আক্রমণ করার প্রতি ব্যস্ত ছিল। তারা জাইহুন ও জাইহুন নদীর তীরবর্তী খাওয়ারেযম সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলসমূহে ও আফগানিস্তানের উত্তর ও ইরানের পূর্বাঞ্চলে আক্রমণ করতে এবং সেসব অঞ্চলে নিজেদের কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করতে গুরুত্বারোপ করেছিল। কিন্তু এ বছর নতুন ঘটনা জন্ম নেয়। হঠাৎ জালাল উদ্দীন ইবনে মোহাম্মদ খাওয়ারেযম শাহ, যিনি পাঁচ বছর পূর্বে ৬১৭ হিজরীতে হিন্দুস্তান পলায়ন করেছিলেন, হঠাৎ ফিরে আসেন। হঠাৎ তার ফিরে আসার কারণ হলো, তিনি হিন্দুস্তানে ঠিকঠাক জীবনযাপন করতে পারেননি। কারণ, হিন্দুস্তানের রাজা-বাদশাদের সঙ্গে তিনি সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেননি। ইতিমধ্যে তিনি এ সংবাদ পান, যে, তাতারীরা পারস্য ছেড়ে চলে গেছে। আর অন্য কাউকে তাতারী বাহিনীর দায়িত্ববান নিয়োগ করত চেঙ্গিজ খান দেশীয় স্বার্থে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছেন।

অপরদিকে তার সহোদর গিয়াশ উদ্দীন সা'দ উদ্দীন ইবনে দাকলার সঙ্গে যুদ্ধ শেষে পারস্যের কতিপয় অঞ্চলে কর্তৃত্ব সৃষ্টি করেছেন এবং উভয়ই পারস্য বিভক্ত করতে সহমত পোষণ করেছেন। তবে পারস্যের বৃহদাংশ ছিল গিয়াশ উদ্দীনের ভাগে। এ অবস্থায়ই ৬২১ হিজরী সমাপ্ত হয়।

জালাল উদ্দীন ভাবলেন, খাওয়ারেযম ফিরে গিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত রাজ্যগুলো নিয়ে সংলাপ করার এটাই উপযুক্ত সময়। কিন্তু আফসোস! তিনি গভীর দৃষ্টিপাত করতে পারেননি এবং তৎকালীন মুসলিম উম্মাহর ব্যাধি নির্ণয় করতে পারেননি। তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি, বিভক্তি-বিভাজন এবং মুসলিমবিরোধী পার্টিদের রক্তপাতকে সহনীয় দৃষ্টিতে দেখা বর্তমান মুসলিম

[৩৪] সুরা আন' আম : ৩৮।

উম্মাহর লাঞ্ছনা ও অবমাননার প্রধান কারণ। জালাল উদ্দীন এসব বিষয় উপলব্ধি না করতে পারার কারণেই ধ্বংসপ্রাপ্ত অঞ্চলসমূহে পুনঃসংস্করণ ব্যতীত নিজেকে খাওয়ারেযম সাম্রাজ্যের অন্যতম ওয়ারিশজ্ঞান করে খাওয়ারেযম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করেন!!

জালাল উদ্দীন কী করলেন

তিনি সিন্ধু নদী পাড়ি দিয়ে পাকিস্তানের দক্ষিণে অবস্থিত কিরমান শহর হয়ে পারস্যের দক্ষিণাঞ্চলে গমন করেন এবং তার সহযোগীদের সঙ্ঘবদ্ধ করেন এবং সা'দ উদ্দীন ইবনে দাকলার কাছে গিয়ে সহোদর গিয়াশ উদ্দীনের বিরুদ্ধে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হন।

নিজ ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। পারস্যের দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে যুদ্ধ শুরু করেন। একসময় ইরানের পশ্চিমে পৌঁছে যান। আব্বাসী খেলাফতের খুব কাছাকাছি পৌঁছে যান। উল্লেখ্য, খাওয়ারেযম সাম্রাজ্য ও আব্বাসী খেলাফতের মধ্যকার সুসম্পর্ক দীর্ঘদিনের। এমন সময় জালাল উদ্দীন নিজেকে শক্তিশালী মনে করে আর আব্বাসী খেলাফতের মাঝে দুর্বলতা লক্ষ করেন। তাই আব্বাসী খেলাফতের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধের ঘোষণা দেন। (এদিকে ইরানের পূর্বাঞ্চলে তাতারী বাহিনী ঘাপটি মেরে বসেছিল?!!) আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, তৎকালীন সময় অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ রাজনৈতিক সংকটে আক্রান্ত ছিল। জালাল উদ্দীন তার দলবল নিয়ে বসরা নগরীতে প্রবেশ করে এবং দুই মাস ধরে তা অবরোধ করে রাখে। এরপর আব্বাসী খেলাফতের রাজধানী বাগদাদের উত্তরাঞ্চল অভিমুখে রওনা হয়।

এ দেখে আব্বাসী খলীফা নাছের লি দীনিল্লাহ্ আতঙ্কিত হন এবং শহর রক্ষার্থে জালাল উদ্দীনকে প্রতিহত করার নিমিত্তে সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করেন। তিনি কেবল এতটুকু করেই ক্ষান্ত হননি; পাশাপাশি জাতীয় স্বার্থবিরোধী এক জঘন্যতম কাজে জড়িয়ে পড়েন। তা হলো, তিনি মুসলমানদের চিরশত্রু বর্বর তাতারী বাহিনীর কাছে জালাল উদ্দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সহযোগিতা প্রার্থনা করেন!!

সুবহানাল্লাহ!!

তিনি কীভাবে তাতারীদের সহযোগিতা কামনা করলেন, অথচ তিনি তাতারীদের ইতিহাস ও মুসলমানদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধের কথা ভালো করেই জানেন। একথা চিরসত্য যে, এ ক্ষেত্রে জালাল উদ্দীন ছিলেন জালেম। আর খলিফা

নাছের সত্যের ও হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাই বলে কি তাতারীদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা! তিনি কি জানতে না, জালাল উদ্দীনকে ধ্বংস করার পর তাতারীদের পরবর্তী পদক্ষেপ হবে আব্বাসী খেলাফত ধ্বংস করা!?

হে খলিফাতুল মুসলিমীন! আপনি কী চেয়েছিলেন?!

আপনি কি স্বল্প কয়েক বছর নিজ রাজত্ব বিস্তৃত করতে চেয়েছিলেন?!

না কি আপনি জালাল উদ্দীনের গোলাম না হয়ে তাতারীদের গোলাম হয়ে মরতে চেয়েছিলেন?!

এটা জালাল উদ্দীনের পক্ষ থেকে আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ ছিল না; ছিল মুসলিম শক্তিকে দ্বিখণ্ডিতকরণ। মুসলিম শক্তিকে দ্বিখণ্ডিত করার জন্য আমরা তার চরম নিন্দা জ্ঞাপন করি।

তিনি মুসলমানদের পরস্পর যুদ্ধ লাগিয়ে দিলেন। আহ! কতই না উত্তম সংঘাত-সংঘর্ষ! মুসলিম ভূখণ্ডে দ্বন্দ্বের অগ্নি প্রজ্বলিত হলো। যা মুসলিম জনপদকে গিলে ফেলল। এরপর আব্বাসী সাম্রাজ্য ধ্বংসের পালা। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতেও এর ব্যতিক্রম নয়; পশ্চিমা বিশ্বের নগ্ন থাবা একের পর এক সকল মুসলিম রাষ্ট্রকে মুসলমানদের মাধ্যমেই ধ্বংস করছে। রাজনৈতিক ও চারিত্রিক সকল অধঃপতন সত্ত্বেও মুসলমানদের সমস্যা সমাধান ও সংকট নিরসনের জন্য কোনো কাফের শক্তিকে মুসলিম রাষ্ট্রে স্থান দেওয়া অসম্ভব ব্যাপার।

আব্বাসী খলীফা নাছের লি দ্বীনিল্লাহর অবস্থা ছিল তপ্তভূমি থেকে পলায়ন করে আগুনের কাছে আশ্রয় প্রার্থনাকারী শরণার্থীর মতো। অথবা ওই ব্যক্তির মতো, যার ঘরে ছোট চোর প্রবেশ করেছে, আর সে এর চেয়ে বড় চোরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছে। বড় চোর এসে ছোট চোরকে তাড়িয়ে দিল এবং ঘরের সব আসবাবপত্র চুরি করল। শুধু তা-ই নয়, পার্শ্ববর্তী ঘর-বাড়িও লুণ্ঠন করল। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিইয়িল আজীম।

খলিফা নাছের তাতারী বাহিনীর দ্বারস্থ হলেও তখন তাতারীরা দখলকৃত বিশাল অঞ্চলে নিজেদের কর্তৃত্ব বিস্তার করতে ব্যস্ত ছিল। ফলে ৬২২ হিজরীর শেষ দিকে জালাল উদ্দীনের সঙ্গে তাতারী বাহিনীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। জালাল উদ্দীন এই অবসর সময়কে কাজে লাগায় বাগদাদের নিকটবর্তী অঞ্চল, ইরাকের উত্তরাঞ্চল, অতঃপর পারস্যের উত্তরাঞ্চলে নিজের ক্ষমতা সম্প্রসারণের পেছনে। এরপর তিনি আযারবাইজান ও আযারবাইজানের চারপাশের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে প্রবেশ করেন।

জালাল উদ্দীনের নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধসমূহ ছিল বিধ্বংসী ও রক্তক্ষয়ী। অথচ সেগুলো ছিল ইসলামী রাষ্ট্র। এই সমস্ত যুদ্ধে হত্যা, লুণ্ঠন, বন্দী, জ্বালাও পোড়াও তথা এহেন কোনো হীনকাজ নেই, যা তিনি করেননি। যেনো তাতারীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি শিখেছেন কীভাবে নিষ্ঠুর হৃদয়ের অধিকারী হওয়া যায়। যারা মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বর্বর তাতারীদের হাতে নির্যাতিত নিপীড়িত, তাতের প্রতি দয়া না শিখে শিখেছেন কীভাবে রূঢ় হওয়া যায়!

খ্রিস্টান রাজ্য জুজিয়া শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ার পর জালাল উদ্দীন সেখানে তার ক্ষমতা বিস্তারের চিন্তা করেন। এজন্য সহোদর গিয়াশ উদ্দীনের সঙ্গে সাময়িক সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হন এবং তাকে তার সেনাবাহিনীতে শামিল করে নেন। তবে তারা উভয়ই একে অপরের অনিষ্টের ব্যাপারে সজাগ ছিলেন।

এভাবেই সুকৌশল ও সুবুদ্ধি প্রয়োগ করে সুলতান জালাল উদ্দীন পারস্যের দক্ষিণাঞ্চল থেকে কাযবিন সমুদ্রের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে যান। আয়তনের দিক থেকে অঞ্চলটি বৃহৎ হলেও তা ছিল অরাজকতায় ভরপুর। আর রাজনৈতিক অরাজকতা জাতির বিপর্যয়ই ডেকে আনে। হায়! মুসলিম উম্মাহ যদি এই বিষয়টি অনুধাবন করত!

৬২২ হিজরীর শেষের দিকে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী জালেম খলিফা নাছের লি দ্বীনিল্লাহ একটানা সাতচল্লিশ বছর রাজত্ব পরিচালনার পর ইন্তেকাল করেন। তিনি প্রজাদের প্রতি সদাচরণ করতেন না। তিনি ইরাক ধ্বংস করেছেন। ইরাকবাসীর প্রতি অত্যাচার করেছেন। তাদের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করেছেন। ওজনে তাদের কম দিয়েছেন। তাদের প্রতি অর্থনৈতিক বিধান কায়েম করেছেন। অধিকন্তু যে মহা অন্যায় তিনি করেছেন, তা হলো, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাতারীদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা।

৬২৩ হিজরীর ঘটনাবলি

খলিফা নাছেরের পর আব্বাসী খেলাফতের রাজভার গ্রহণ করেন তদীয় পুত্র জাহের বি আমরিল্লাহ। তিনি পিতার মতো ছিলেন না। তিনি ছিলেন সৎ ও মুত্তাকী। তিনি যে ন্যায়-ইনসাফ ও সৎকর্ম প্রদর্শন করেছেন, ইতিহাসে এর নজির বড়ই বিরল। ইবনুল আছীর রহ. বলেন—

"যদি কেউ বলে যে, খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আযীযের পর তার মতো কোনো খলিফা ছিল না, তাহলে সে যথার্থই বলেছে।"

তিনি রাজস্ব কর কমিয়ে দেন। জনসাধারণের প্রাপ্য ফিরিয়ে দেন। মজলুমদের জেল থেকে মুক্তি দেন এবং গরীব দুঃখীদের দান-সদকা করেন। এমনকি তার সম্পর্কে বলা হয়, 'এই বিপর্যস্ত যুগে তিনি ছিলেন একজন বিরল ব্যক্তিত্ব।'

ইবনুল আছীর রহ. তার সমকালীন ছিলেন। তিনি তাঁর সম্পর্কে একটি বাক্য লেখেন। তিনি লেখেন—

'আমি তার খেলাফতকাল সংকীর্ণ হওয়ার আশঙ্কা করছি। কারণ এই যুগ ও এই যুগবাসী তার খেলাফতের যোগ্য নয়।'

সুবহানাল্লাহ!

ইবনুল আছীর রহ. এর উপলব্ধি বাস্তবায়িত হয়েছিল। খলিফা জাহের বি আমরিল্লাহ অকালে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তিনি মাত্র নয় মাস কয়েক দিন রাজত্ব পরিচালনা করেছিলেন। এই কয়েক দিনই তিনি ইতিহাসের স্মরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। ইতিহাসবিদগণ লেখেন—

'তার খেলাফতকালে দ্রব্যমূল্য ভারসাম্য ফিরে পায়। ইরাকের সুষম অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা পায়। এসবের মাধ্যমে তার প্রজ্ঞা প্রতিভাত হয়।'

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের, যিনি ভূপৃষ্ঠে এমন কতিপয় নীতিমালা স্থাপন করেছেন, যা কখনো পরিবর্তন পরিবর্ধন হয় না। আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী?!"

খলিফা জাহের বি আমরিল্লাহর পর মুসতানসির বিল্লাহ খলিফা মনোনিত হন। তিনি প্রায় সতেরো বছর অর্থাৎ ৬৪০ হিজরী পর্যন্ত এ দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। মধ্যবর্তী এ দীর্ঘ সময় সুলতান জালাল উদ্দীন অবিরাম যুদ্ধ করতে থাকেন। তাতারী বাহিনীর বিরুদ্ধে নয়, বরং মুসলমানদের বিরুদ্ধে!! কিছু কিছু শহর, অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তার সবচেয়ে বর্বরোচিত কাজ হলো, খালাতবাসীকে অবরোধ করা। খালাত (বর্তমান তুরস্কের) একটি মুসলিম শহর। তিনি বহুসংখ্যক খালাতবাসী হত্যা করেছেন। খাওয়ারেযম বাহিনীর অশুভ থাবায় খালাতবাসীর প্রাণ ছিল ওষ্ঠাগত। তারা গোটা শহর লুণ্ঠন করেছে; এমনকি মুসলিম নারীদের পর্যন্ত বন্দী করেছে।

৬২৪ হিজরীতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কেন্দ্রীয় ঘটনা সংঘটিত হয়। তা হলো, খুনি, রক্তপাতকারী বর্বর তাতারী বাহিনীর প্রধান নেতা চেঙ্গিজ খানের মৃত্যু। সে ৭২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করে। তার জীবনে ছিল হত্যা, লুণ্ঠন, জ্বালাও পোড়াও ইত্যাদি অপকর্মের সমারোহ। পূর্বে কোরিয়া থেকে পশ্চিমে

পারস্য পর্যন্ত তার রাজত্ব বিস্তৃত করে। এই সুবিশাল রাজত্বে মৌলিক ভিত ছিল মানুষ হত্যা ও রক্তপাত, নির্যাতন ও নিপীড়ন। (নিহতদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান।)

চেঙ্গিজ খানের মৃত্যুতে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়। সুলতান জালাল উদ্দীন যখন ইরান ও কাযবিন সমুদ্রের পশ্চিমাঞ্চলসমূহে ক্ষমতা বিস্তার করছিলেন, তখন তাতারীরা তাদের অধ্যুষিত এলাকাগুলো সুরক্ষিত রাখে, যেনো উভয় দলই নিজ মালিকানাধীন অঞ্চল নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল এবং যেসব অঞ্চলকে নিজেদের নিষ্কলুষ হক মনে করত। তার সুরক্ষায় যত্নবান ছিল।

৬২৪-৬২৭ হিজরীর মধ্যবর্তী সময়

৬২৪-৬২৭ হিজরীর মধ্যবর্তী তিন বছর হলো চেঙ্গিজ খানের মৃত্যু পরবর্তী যুদ্ধবিরতির সময়।

এই মধ্যবর্তী সময়ে মুসলমানরা কোথায় ছিলেন

এই মধ্যবর্তী সময়ে মুসলমানরা পরস্পর বিভেদ ও বিভাজন, এখতেলাফ ও মতানৈক্য, দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে লিপ্ত ছিল। মুসলমানরা চেঙ্গিজ খানের মৃত্যুতে তাতারীদের দুর্বলতা ও মনোবলহীনতাকে কাজে লাগাতে পারেননি; বরং তারা নিজেদের মাঝে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিল, একে অপরের প্রতি জুলুম করছিল। সুলতান জালাল উদ্দীন ও তার ভাই গিয়াশ উদ্দীনের মাঝে নতুন বিরোধ দেখা দেয়; এমনকি গিয়াশ উদ্দীন জালাল উদ্দীনকে ধ্বংস করার জন্য তার শত্রুদের সহযোগিতা প্রদান করেন।

শুধু এতটুকুই নয়, বরং গোটা সাম্রাজ্যে ফেতনা-ফ্যাসাদ, অস্থিরতা ও ব্যাকুলতায় ভরে গিয়েছিল। শুধু ইরাক ও পারস্য ভূখণ্ড নয়, বরং গোটা মুসলিমবিশ্বে। সিরিয়া ও মিশরের আমীর-ওমারাদের মাঝে দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ চলছিল। তারা ঐক্যের পতাকাতলে আসতে পারেননি। অথচ তাদের অধিকাংশ ছিলেন সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর পরিবারভুক্ত। এই অনৈক্যের ফলাফলস্বরূপ ৬২৬ হিজরীতে এক ভয়ংকর ঘটনা ঘটে। তা হলো, বাইতুল মুকাদ্দাস (যা ইতিপূর্বে ছালাহ উদ্দীন আইয়ূবী রহ. স্বাধীন করেছিলেন) সন্ধিস্বরূপ ক্রুশেডারদের হাতে অর্পণ করা। অর্থাৎ সিরিয়ার মুসলমানরা ক্রুশেডারদের এই শর্তে বাইতুল মুকাদ্দাস অর্পণ করতে সম্মত হয় যে, ক্রুশেডাররা সিরিয়ার কতিপয় সরকারি উচ্চপদে তাদের নিয়োগ দেবে।

আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমতার পর দুর্বলতা, সম্মানের পর অসম্মান এবং সহযোগিতার পর অসহযোগিতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এদিকে সুলতান জালাল উদ্দীন অবিরাম যুদ্ধ চালাতে থাকেন। দ্বিতীয় বারের মতো খালাত শহর অবরোধ করেন। অবরোধ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে। একপর্যায়ে শহরবাসী ঘোড়া ও গাধার গোশত ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়। এমনকি কুকুর বিড়াল ইঁদুর পর্যন্ত ভক্ষণ করে। 'খালাত' শহর সুলতান জালাল উদ্দীনের হাতে পরাজিত হয়। তিনি শহরটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেন। অধিকাংশ জনগণকে হত্যা করেন, নারী-শিশুদের বন্দী করেন। ইবনুল আছীর রহ. বলেন—

"পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ঘটনা কখনো শোনা যায়নি। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে রেহাই দেবেন না।"

উপরোল্লিখিত সমগ্র মুসলিম ভূখণ্ডে সংঘটিত ঘটনাবলি থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, মুসলিমবিশ্বের বিশালতা, সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও প্রবল-প্রতাপ সত্ত্বেও কেন তাতারীরা সফল হলো? এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, এটাই পৃথিবীর চিরায়ত বিধান। কারণ, যে জাতির অবস্থা এমন হবে—যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ করেছি—তাদের ওপর তাগুতি শক্তি সয়লাব করবে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাকেই সহযোগিতা করেন, যারা তার দ্বীনকে সহযোগিতা করে।

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ

"আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করলে কেউ তোমাদের পরাস্ত করতে পারবে না। আর তিনি যদি তোমাদের একা ছেড়ে দেন, তবে কে আছে যে তোমাদের সাহায্য করবে?"[৩৫]

---

[৩৫] আলে ইমরান : ১৬০।

তাতারীদের দ্বিতীয় আক্রমণ

৬২৮ হিজরী। এ বছর তাতারীরা নব উদ্যমে মুসলিম উম্মাহর ওপর আক্রমণ শুরু করে। বিভিন্ন শক্তির সমন্বয়ে দ্বিতীয় আক্রমণকে পূর্ববর্তী আক্রমণগুলোর সমপর্যায়ের কিংবা অধিক ফলপ্রসূ করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

৬২৮ হিজরীতে তাতারী বাহিনীর আক্রমণের কারণ

প্রথম কারণ

চেঙ্গিজ খানের মৃত্যুর পর মঙ্গোলিয়ায় তাতারী সাম্রাজ্যকে স্থায়ীকরণ। এবার তাতারীদের নতুন নেতা ওয়াকিতাই (Oakitai) নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এটি ৬২৪ থেকে ৬২৭ হিজরীর ঘটনা (১২১৯-১২২৬ খ্রি.)। ওয়াকিতাই চীন ও মঙ্গোলিয়ায় তার রাজত্ব সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

এরপর সে নতুনভাবে মুসলিমবিশ্বের ওপর আক্রমণ-যুদ্ধ এবং ইউরোপ বিজয়ের ইচ্ছা পোষণ করে। রাশিয়া এলাকায় যেখানে ইতিপূর্বে তাতারীরা পরাজিত হয়েছিল। একথা সুস্পষ্ট যে, আব্বাসী খেলাফত আক্রমণ কিংবা বাগদাদ পতন এবারের আক্রমণের মৌলিক লক্ষ্য ছিল না। কারণ, বাগদাদে অবস্থান না করে ইউরোপ পর্যন্ত পৌঁছা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কারণ, বাগদাদ অত্যন্ত সুরক্ষিত ও ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল। তা ছাড়া বাগদাদ পতন হলে ইরাক, সিরিয়া, মিশর উত্তেজিত হয়ে পড়বে। তখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা খুবই দুঃসাধ্য হবে। তাই তাতারীরা বাগদাদকে সর্বশেষে টার্গেট বানাল। আর এটাই ছিল বুদ্ধির পরিচয়।

উকিতাই তাতারীদের দ্বিতীয় আক্রমণের জন্য সেনাপতি শুরমাজানকে দায়িত্ব প্রদান করে। সেনাপতি বিপুলসংখ্যক তাতারী বাহিনী নিয়ে নতুন উদ্যমে মুসলিমবিশ্বের ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়।

দ্বিতীয় কারণ

৬২৮ হিজরীতে মুসলিম উম্মাহর মাঝে বিভেদ-বিভাজন বিরাজমান ছিল। প্রত্যেক মুসলিম নেতা নিজ নিজ রাজসীমা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। রাজ্য যত ছোটই

হোক না কেন? এমনকি কোনো কোনো রাজ্য মাত্র একটি শহরের ভেতরেই সীমাবদ্ধ ছিল। মুসলিম নেতারা কেবল বিভেদ-বিভাজনে লিপ্ত ছিল এমন নয়, বরং পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, একে অপরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করত। কেউ কাউকে শর্তহীন নিরাপত্তা প্রদান করত না। তাদের মাঝে ঐক্য ও একতার কোনো চিন্তাই ছিল না।

তৃতীয় কারণ

এই বছরটি সুলতান জালাল উদ্দীন ইবনে খাওয়ারেযম শাহের জন্য ছিল চরম বেদনাদায়ক ও হৃদয়বিদারক।

কারণ, যখন সেনাপতি শুরমাজানের নেতৃত্বে তাতারী বাহিনী মুসলিম সাম্রাজ্য আক্রমণের জন্য অগ্রসর হয়, তখন তারা জানতে পারে যে, সুলতান জালাল উদ্দীন এ বছর পরপর দুবার উত্তর ইরাক ও দক্ষিণ তুরস্কের নেতা আশরাফ ইবনে আদেলের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয়বরণ করার কারণে যারপরনাই দুর্বল হয়ে পড়েছে।

আশরাফ ইবনে আদেল চিঠি মারফত সুলতান জালাল উদ্দীনের দুর্বলতার কথা তাতারীদের জানিয় দেয়। আশরাফ ইবনে আদেলের সঙ্গে জালাল উদ্দীনের বিরোধ ছিল দীর্ঘদিনের। তাদের মাঝে বহু যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাই সে তাতারীদের আক্রমণকে প্রতিশোধ গ্রহণে উপযুক্ত সুযোগ মনে করে তাতারীদের তার দুর্বলতার কথা জানিয়ে দেয়।

বিপুলসংখ্যক তাতারী আগমন করে। রাস্তার দু-ধারের ঘর-বাড়ি গাছ-পালা সবকিছু ধ্বংস করে দেয়। কাঁচাপাকা সব ধরসের ফল-ফলাদি ও খাদ্যদ্রব্য খেয়ে ফেলে। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল জালাল উদ্দীন ইবনে খাওয়ারেযম শাহকে গ্রেপ্তার করা। এক রণভূমিতে জালাল উদ্দীনের সঙ্গে তাদের দেখা হয়। যুদ্ধে সুলতান জালাল উদ্দীন নিকৃষ্ট পরাজয়বরণ করেন। সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। সুলতান জালাল উদ্দীন পালাবার পথ ধরেন। তার বাবার শেষ পরিণতির পথে তিনিও অগ্রসর হন। গ্রাম থেকে গ্রাম, শহর থেকে শহর পালাতে থাকেন। তাতারী বাহিনী পিছু ধাওয়া করতে থাকে। আর পথিমধ্যে যাদের পায় হত্যা করে। বন্দী করে ও মালামাল ছিনতাই করে। একপর্যায়ে জালাল উদ্দীন উত্তর ইরাকে অবস্থিত উপত্যকায় পৌঁছেন। সেখানে তার সকল সৈন্য তার থেকে পৃথক হয়ে যায়। তিনি একাকী অসহায় সহযোগীহীন পড়ে থাকেন। ঠিক যেমন ঘটেছিল তার বাবার বেলায়। তাতারীদের ভয়ে গ্রামের পর

গ্রাম একাই পালাতে থাকেন। এরপর দীর্ঘদিন পর্যন্ত তিনি গুম হয়ে ছিলেন। কেউ জানত যে, তিনি নিহত হয়েছেন, আত্মগোপন করেছেন, নাকি এক দেশ থেকে অন্য দেশে পলায়ন করেছেন? একসময় জনৈক গ্রাম্য কুর্দী কৃষকের সঙ্গে তার দেখা হয়। কৃষক তাকে জিজ্ঞাসা করে, কে আপনি? কৃষক তার গায়ে পরিহিত দামি পোশাক ও স্বর্ণালঙ্কার দেখে অবাক হন। সুলতান জালাল উদ্দীন তাকে বলেন, আমি খাওয়ারেযমের সুলতান। তিনি কৃষকের অন্তরে ভয় সৃষ্টির জন্য একথা বলেন। কিন্তু সুবহানাল্লাহ! তার এই বক্তব্য যেন আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়ে ঘোষণা ছিল। এর পূর্বে কৃষকের অন্তরে খাওয়ারেযমদের প্রতি ঘৃণা ও ক্ষোভ দানা বেঁধেছিল। কৃষক সুলতানের পরিচয় পেয়ে সংবর্ধনা জানাল। সম্মান প্রদর্শন করল এবং আদর আপ্যায়ন করল। আহার গ্রহণ শেষে সুলতান নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়েন। এই সুযোগে কৃষক কুঠারাঘাতে সুলতানকে হত্যা করে এবং তার সঙ্গে থাকা স্বর্ণালঙ্কার ও দামি আসবাবপত্র এই অঞ্চলের আমীর গাজী শিহাব উদ্দীনকে অর্পণ করে।

এই হলো জালেমদের শেষ পরিণতি! সীমালঙ্ঘনকারীদের শেষ ফল! এই হলো সেইসব রাজা-বাদশার নিকৃষ্ট পরিণতি, যারা প্রজাদের শাসন করেন, কিন্তু আল্লাহর হক, প্রজাদের হক; এমনকি আত্মীয়তার হক আদায় করেন না। কেবল নিজেদের নিয়ে ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকেন। জনৈক ব্যক্তি যথার্থ বলেছেন—

“যে ব্যক্তি কেবল নিজেকে নিয়ে বেঁচে থাকে, তার জন্ম নেওয়ার কোনো অধিকার ছিল না।”

ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. হযরত আবূ মূসা আশ‘আরী রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ : وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ.

“আল্লাহ তা‘আলা জালেমকে সুযোগ দেন। আর যখন ধরেন, তখন কোনোক্রমেই ছাড়েন না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তেলাওয়াত করেন, (অর্থ) যে সকল জনপদ জুলুমে লিপ্ত হয়, তোমার প্রতিপালক যখন তাদের ধরেন, তখন তাঁর ধরা এমনই হয়ে থাকে। বাস্তবেই তার ধরা অতি মর্মন্তুদ, অতি কঠিন।”[৩৬]

---

[৩৬] বুখারী : ৪৬৮৬, সুরা হূদ : ১০২।

চতুর্থ কারণ

পূর্ববর্তী কৃতকর্মের ফলাফল অনুপযুক্ত প্রতিপালন, ইসলামের সঠিক বুঝের অভাব, সর্বাত্মকভাবে দুনিয়াকে আঁকড়ে ধরা এবং মানুষের সম্মুখে সঠিক বিষয়বস্তু বর্ণনা না করা। ফলে তারা জানত না কে বন্ধু কে শত্রু? তাতারীদের পূর্বেকার যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলাফল, তাতারীরা যেসব জনপদ ও গ্রাম অতিক্রম করেছে, সেসব অঞ্চলের কালো ইতিহাস—এসব বিষয় মুসলমানদের অন্তরে পরাজয়ের শিকল পরিধান করিয়েছিল। ফলে তারা তলোয়ার বহন করতে পারেনি, ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করতে পারেনি—এমনকি তাদের মাথা থেকে তাতারীদের মুখোমুখি দাঁড়াবার চিন্তাই দূর হয়ে গিয়েছিল। নিঃসন্দেহে এসব বিষয় তাতারীদের পথ বাধাহীন উন্মুক্ত করেছিল।

ইবনুল আছীর রহ. *কামেল ফিত তারীখ* গ্রন্থে ৬২৮ হিজরীর ঘটনাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে এমন কিছু চিত্র ফুটিয়ে তোলেন, যা তিনি তাতারী হামলা থেকে রক্ষাপ্রাপ্ত কতিপয় ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে নিজ কানে শুনেছেন। তিনি বলেন—

* এক একজন তাতারী সৈন্য এক এক গ্রামে প্রবেশ করত। এরপর এক এক করে গ্রামবাসী সবাইকে হত্যা করত। অথচ গ্রামবাসীর সংখ্যা অনেক হওয়া সত্ত্বেও একজনও প্রতিরক্ষা কিংবা আত্মরক্ষার জন্য হাত তুলত না।

* জনৈক তাতারী একজন মুসলমানকে ধরল। তার সঙ্গে হত্যা করার মতো কোনো অস্ত্র ছিল না। সে মুসলমান ব্যক্তিকে বলল, মাথা জমিনে ঠেকিয়ে রাখো। কোথাও যাবে না। মুসলমান ব্যক্তিটি জমিনে মাথা ঠেকিয়ে রাখল। এরপর তাতারীসেনাটি তলোয়ার ব্যবস্থা করে এনে তাকে হত্যা করল।

* এক ব্যক্তি ইবনুল আছীর রহ.কে বর্ণনা করে বলেন, আমি ও আমার সঙ্গে সতেরোজন রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম। একজন তাতারী সেনা এল। আমাদের নির্দেশ দিল, যেন আমরা পরস্পর নিজেদের বন্দী করি। আমার সাথীরা তার হুকুম মতো কাজ শুরু করল। আমি তাদের বললাম, সে তো একা। আমরা কেন তাকে হত্যা করব না? তারা বলল, আমরা ভয় পাই। (তাতারীত্রাস!) আমি বললাম, সে তোমাদের হত্যা করতে চায়। চলো উল্টো আমরাই তাকে হত্যা করি। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের রক্ষা করবেন। আল্লাহর শপথ কেউ একাজ করার দুঃসাহস দেখায়নি। ফলে বাধ্য হয়ে আমিই তলোয়ার হাতে নিয়ে তাকে হত্যা করলাম। এরপর সে অঞ্চল ছেড়ে পলায়ন করলাম এবং রক্ষা পেলাম। এ-জাতীয় বহু ঘটনা রয়েছে।

* তাতারী বাহিনী বর্তমান তুরস্কের দক্ষিণে অবস্থিত 'বাদলিস' শহরে প্রবেশ করল। এটি একটি সুরক্ষিত শহর। পাহাড়ের একটি সংকীর্ণ গিরিপথ ছাড়া শহরে প্রবেশ করার কোনো রাস্তা নেই। একজন শহরবাসীর বক্তব্য, আমাদের পাঁচশো সৈন্য থাকলে একজন তাতারীও রক্ষা পেত না। কারণ, পথ ছিল সংকীর্ণ। আর একথা বাস্তব যে, সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগরিষ্ঠদের পরাজিত করতে পারে। কিন্তু সুবহানাল্লাহ! শহরবাসী তাতারীদের হাতে শহর ছেড়ে দিয়ে পাহাড়ের দিকে পলায়ন করে। এরপর তাতারীরা বাদলিস শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে।

* তাতারীদের হাতে নিহত হওয়ার পূর্বে প্রত্যেক মুসলমান আল্লাহর ওয়াস্তে নিজের জান ভিক্ষা চেয়ে বলত, আমাকে হত্যা করো না। তাতারীরা মুসলমানদের এই আত্মরক্ষামূলক বাণী 'আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে হত্যা করো না' শুনতে শুনতে তারা এই বাক্যটিকে গানের সুরে গাইত 'লা বিল্লাহ'। জনৈক মুসলমান একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে লুকিয়ে ছিল। তাতারীরা টের পায়নি। তার বক্তব্য, আমি জানালার ফাঁক দিয়ে তাতারীদের দেখছিলাম। তারা নারী-পুরুষদের হত্যা করার পর বীরবেশে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে হাসতে হাসতে গান গাইছিল—লা বিল্লাহি, লা বিল্লাহি। ইবনুল আছীর রহ.-এর বক্তব্য অনুযায়ী এটি ছিল মহাবিপর্যয় ও তীব্র সংকট। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

এই ছিল তৎকালীন মুসলমানদের অধঃপতন, তিক্ত পরাজয়... বর্বর তাতারীদের আক্রমণ।

সুলতান জালাল উদ্দীনের মৃত্যুর পর শুরমাজান কী করল

শুরমাজান পারস্যের উত্তরাঞ্চলকে (বর্তমান ইরানের উত্তরাঞ্চল) তাতারী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে। এটি ৬২৯ হিজরীর ঘটনা। এরপর আযারবাইজান আক্রমণ করে সেটাও তাতারী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে।

এর মাধ্যমে গোটা পারস্য ভূখণ্ড তাতারীদের অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত হয়। তবে পশ্চিম পারস্যের এক সংকীর্ণ ভূখণ্ড শীয়াদের ইসমাঈলী গ্রুপের দখলে থেকে যায়।

এরপর শুরমাজান এসব অঞ্চলে স্থায়ী বসবাস শুরু করে। নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও সৈন্যবাহিনী সুসংহতকরণ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ সম্পর্কে যথাযথ

জ্ঞানার্জনের পূর্বে তার মিশন শেষ হয় না। এসব বিষয় তাতারী নেতা শুরমাজানকে এসব অঞ্চলে আক্রমণ করতে সহযোগিতা করে।

৬২৯ থেকে ৬৩৪ হিজরী পর্যন্ত মোট পাঁচ বছর শুরমাজান এসব অঞ্চলে তাতারী রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত রাখে। এই পাঁচ বছরের মাঝে একবারের জন্য মুসলমানদের ভয়ভীতি তাকে স্পর্শ করেনি। তার সঙ্গে লড়াই করার জন্য মুসলিম বাহিনী একটু নড়াচড়াও করেনি। অথচ চারপাশের অঞ্চলসমূহ ছিল মুসলমানদের দখলে। যেমন পারস্য, আযারবাইজান, ইরাক, মসুল, মিশর, হেজাজ ইত্যাদি। সবাই মনে করত, এটি পারস্য ও আযারবাইজানের জন্য দুঃশ্চিন্তার কারণ। আপামর মুসলমানদের বিপদ নয়। সেসব মুসলমানদের ওপর তখনো তাতারী হামলার নির্মম দুর্যোগ নেমে আসেনি, তারা বোঝেনি যে, খানিক বাদে তারাও তাতারীদের শিকারে পরিণত হবে। বিপদ আজ বা কাল, অবশ্যই তাদের পাকড়াও করবে।

এখানে আমি আরেকটু সংযোজন করি—ইরাক, সিরিয়া, মিশর, হেজাজের অধিকাংশ মুসলমান হলো আরবীয়। পক্ষান্তরে পারস্য, আযারবাইজান ও খাওয়ারেযম সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের আরবরা হলো অনারবীয়। তাদের মাঝে ইসলামের সঠিক বুঝ অবিদ্যমান। এ কারণেই আরবীয় ও অনারবীয়দের মাঝে বিস্তর ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। পরস্পর যেন তারা অপরিচিত। অথচ ইসলামের শিক্ষা, মুসলমানরা পরস্পর ভাই ভাই (শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ন্যায়)।

মুমিনগণ একে অপরের ভাই!

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো, আরবীয় মুসলিমরা তুর্কী, আফগানী, শিশানী, হিন্দুস্তানী কিংবা পারসীয় মুসলিম ভাইদের ব্যথায় ব্যথিত হয় না। এটি অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। এটি মুসলিম উম্মাহর মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার মতো মারাত্মক দুর্যোগ। কারণ, ইসলাম এমন এক দ্বীন (ধর্ম), যা বংশ, জাতি কিংবা বর্ণের মাধ্যমে গঠিত হয় না। ইসলাম গঠন হয় একমাত্র আল্লাহ, রাসূল ও এই দ্বীনের প্রতি অগাধ বিশ্বাসস্থাপনের মাধ্যমে। এটি হলো আকীদা-বিশ্বাসের বন্ধন।

ইমাম আহমদ রহ. আবু নাজরা রহ.-এর সূত্রে মুরসাল রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى

"হে লোকসকল, তোমাদের রব এক, তোমাদের পিতা এক। জেনে রাখো, তাকওয়া (খোদাভীতি) ব্যতীত (একে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই) অনারবীয়দের ওপর আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আরবীয়দের ওপর অনারবীয়রা শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্বেতাঙ্গদের ওপর কৃষ্ণাঙ্গদের কিংবা কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর শ্বেতাঙ্গদের শ্রেষ্ঠত্ব নেই।"[৩৭]

হাদীস শরীফে শ্রেষ্ঠত্বের নীতিমালা সুস্পষ্ট বিবৃত হয়েছে। ইসলামে বংশ কিংবা বর্ণের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হয় তাকওয়া ও খোদাভীতির মাধ্যমে।

এমনকি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের প্রধান দুটি দলে বিভক্ত করেছেন। তৃতীয় কোনো দলে বিভক্ত করেননি। তাঁর এই বিভক্তকরণ ছিল তাকওয়ার ভিত্তিতে। হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَكَبُّرَهَا بِآبَائِهَا، النَّاسُ رَجُلَانِ بَرٌّ تَقِيٌّ كَرِيمٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى}

"হে লোকসকল, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জাহেলী যুগের অহংকার ও গর্ব দূর করেছেন। মানুষ দুই দলে বিভক্ত : ১. মুমিন মুত্তাকী, আল্লাহর নিকট সম্মানী। ২. পাপিষ্ঠ হতভাগা, আল্লাহর কাছে হীন। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তেলাওয়াত করেন, (অর্থ) হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে।"[৩৮]

---

[৩৭] *মুসনাদে আহমদ : ২৩৪৮৬।*

[৩৮] *আবু দাউদ, তিরমিযী, আহমদ, ইবনে খুযায়মা, ইবনে হিব্বান, তাফসীরে ইবনে মারদুয়া।*

সুতরাং সত্যনিষ্ঠ মুমিন হলো সেই ব্যক্তি, যে আকীদা-বিশ্বাসে এক ও অভিন্ন ব্যক্তিদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। যদিও জাত ও বংশ কিংবা বর্ণ ও ভাষা ভিন্ন হয়।

সুতরাং ইসলামের গ্রহণযোগ্যতার একমাত্র মানদণ্ড হলো আকীদা-বিশ্বাস ও তাকওয়া-পরহেজগারি।

৬৩৪ হিজরী থেকে ৬৩৯ হিজরী পর্যন্ত তাতারী আক্রমণ

৬২৯ থেকে ৬৩৪ হিজরী পর্যন্ত মোট পাঁচ বছর পর শুরমাজান ৬৩৪ হিজরীতে কাযবিন সমুদ্র অভিমুখে বিজয়ধারা অব্যাহত রাখতে রওনা হয়। সে খুব দ্রুতই আর্মেনিয়া জুজিয়া, শিশান ও দাগিস্তান অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করে।

অপরদিকে ভিন্ন আরেকটি তাতারীদল বাতু ইবনে জাজীর নেতৃত্বে কাযবিন সমুদ্রের উত্তরে আক্রমণ শুরু করে এবং ভোগলা নদীর নিম্নবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত গোত্রসমূহকে নির্মূল করতে শুরু করে। এটি ৬৩৪ হিজরীরই ঘটনা। এরপর ৬৩৫ হিজরীতে রাশিয়ার বিস্তৃত ভূখণ্ডের ওপর আক্রমণ শুরু করে।

এরপর বর্বর তাতারীরা খ্রিস্টান সাম্রাজ্য রাশিয়া পতনের ডাক দেয়। রাশিয়ায় কতেক শহরকে মানুষ হত্যার কসাইখানায় পরিণত করে। এটি ৬৩৫-৬৩৬ হিজরীর ঘটনা। অল্প কিছুদিনের মাঝে রিদান ও কলম্বিয়া শহর দখল করে নেয়। এরপর ছয় দিনের মাথায় তাদের হাতে ব্লাদিমির (Vladimir) শহরের পতন ঘটে। কসাইখানায় যেমন গরু একটার পর একটা জবাই করা হয়, অনরূপ তাতারীদের হাতে একের পর এক শহরের পতন হতে থাকে। এরপর সুদান পতিত হয়। এ পর্যায়ে তারা রাশিয়ার রাজধানী মস্কো নগরীর দিকে হাত বাড়ায়। মস্কোকেও তারা তাতারী আক্রমণের কালো মানচিত্রে পরিণত করে। এরপর ক্রমান্বয়ে ইউরোপ, জালিশ, বারিসলাফ, রুস্তুফ, ইয়ারুসলাফ, তোরঝোক শহর ধ্বংসের মাধ্যমে তাতারীরা গোটা রাশিয়া দখল করে নেয়। (রাশিয়ার আয়তন হলো সতেরো মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার। এই সুবিশাল আয়তনের দেশটির জনসংখ্যাও ছিল বিপুল। অথচ তাতারীরা মাত্র দুই বছরে দেশটিকে দখল করে নেয়!)

৬৩৮ হিজরীতে বাতু ইবনে জাজীর নেতৃত্বে পশ্চিমে গোটা উকরানি (Ukraine) সাম্রাজ্যের ওপর কালো থাবা বিস্তৃত করে। উকরানির আয়তন ছিল ছয় লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। তারা উকরানির রাজধানী কাইভে আক্রমণ করে অধিকাংশ জনগণকে হত্যা করে শহরটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে।

৬৩৯ হিজরীতে তাতারী বাহিনী একটি শক্তিশালী দল বাইদারের নেতৃত্বে ইউক্রেন পোল্যান্ড রাজত্বের দিকে অগ্রসর হয়। পোল্যান্ড শহরে প্রবেশ করে অধিকাংশ জনপদ ধ্বংস করে ফেলে। কিন্তু পোলিশ রাজা অল্পসংখ্যক জার্মানি সৈন্যের সহযোগিতা পায়। (জার্মানি পোলিশের পশ্চিমে অবস্থিত)। প্রিন্স হেনরি ডিউক (Silesian) পোল্যান্ডের রাজার সঙ্গে একক সেনাবাহিনী গঠনের জন্য জোট বাঁধেন। কিন্তু এই সামরিক বাহিনী বাইদারের নেতৃত্বপূর্ণ তাতারী বাহিনীর হাতে নির্মম পরাজয় বরণ করে। এভাবেই পোল্যান্ড শহর তাতারী বাহিনীর হাতে পরাজিত হয়।

এরই মধ্যে ৬৩৯ হিজরীতে তাতারীদের ইউক্রেনের কমান্ডার বাতু এ অঞ্চলে একদল সৈন্য রেখে প্রধান দলটি নিয়ে হাঙ্গরের রাজার সঙ্গে দেখা করে। মুখোমুখি যুদ্ধে হাঙ্গরের রাজা পরাজিত হয়। এ যুদ্ধের মাধ্যমে হাঙ্গরও তাতারীদের চারণভূমিতে পরিণত হয়।

এদিকে পোল্যান্ড থেকে বাইদার বাতুর নেতৃত্বে প্রধান তাতারীদলের সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হয়। পথিমধ্যে স্লোভাকিয়া আক্রমণ করে তাতারী সাম্রাজ্যকে আরও সম্প্রসারিত করে।

এরপর তাতারী বাহিনী ক্রোয়েশিয়া আক্রমণ করে তা ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়।

এভাবেই তাতারী বাহিনী আদ্রিয়াটিক সাগরউপকূলে পৌঁছে যায় (আদ্রিয়াটিক সাগর ইটালি ও ক্রোয়েশিয়ার মাঝামাঝি অবস্থিত)। এভাবে তাতারীরা ইউরোপের প্রায় অর্ধেকাংশ তাদের রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত করে।

ইউরোপে অব্যাহত তাতারী বিজয় সম্ভব ছিল যদি তাদের মহান নেতা উকিতাই এ বছর (৬৩৯ হিজরী) মারা না যেত। ইতিমধ্যে তাতারী সাম্রাজ্য জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও ইটালি পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। ফলে তাতারী নেতা বাতু ইবনে জাজী যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হয়। সে জনৈক তাতারী কমান্ডারকে বিজিত অঞ্চলসমূহের দায়িত্ব প্রদানকরত তাতারীদের নতুন প্রিন্স নির্ধারণী নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য মঙ্গোলিয়ায় তাতারীদের রাজধানী কারাকুরমে ফিরে যায়।

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ (৬৩৯ হিজরী ও পরবর্তী সময়)

এক. এ বছর তাতারী সাম্রাজ্যের সীমানা পূর্ব-পশ্চিমে ইউরোপ থেকে পশ্চিমে পোল্যান্ড, উত্তরে সাইবেরিয়া থেকে দক্ষিণে চীন সাগর পর্যন্ত পৌঁছেছে। এটিকে অতি স্বল্প সময়ে ভয়াবহ প্রসার বলা যেতে পারে। তখন তাতারী শক্তি পৃথিবীর প্রধান পরাশক্তিতে পরিণত হয়েছিল, এতে কোনো দ্বিমত নেই।

দুই. তাতারী সম্রাট উকিতাইয়ের পর তার ছেলে কায়ুক ইবনে উকিতাই তাতারীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। নতুন সম্রাট কায়ুক ইবনে উকিতাইয়ের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, নতুন এলাকা বিজয় করার চেয়ে বিজিত অঞ্চলসমূহে ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করা। অন্যথায় ক্ষমতা বিলুপ্তির আশঙ্কা রয়েছে। এর ফলে নতুন সম্রাটের আমলে তাতারীদের বিজয়ধারা বাধাগ্রস্ত হয়। তবে বিজিত অঞ্চলসমূহে ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তারা সচেষ্ট থাকে।

তিন. তাতারীরা পূর্ববর্তী বিজয়ের মাধ্যমে মুসলিমবিশ্বের অর্ধেক পূর্বাচল গিলে ফেলেছিল। এশিয়ার অধিকাংশ মুসলিম অঞ্চলগুলোকে তারা তাতারী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিল। এসব অঞ্চলের সকল সভ্যতা-সংস্কৃতি তারা ধ্বংস করে ফেলেছিল। পরবর্তী বহু বছরের জন্য তাতারীরা এই সুবিশাল বিস্তৃত অঞ্চলের সভ্যতা, সংস্কৃতি, উন্নতিও অগ্রগতির সোপান ভেঙে দেয়।

চার. ইতিমধ্যে তাতারীরা মুসলিমবিশ্বের মধ্যভূখণ্ডকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলে, যা ইরাক থেকে মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত। ফলে এ অঞ্চলের মুসলমানরা পরস্পর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তাদের পরস্পর সম্পর্কহীনতা ও বিরোধ বিকট আকার ধারণ করে।

অনুরূপ লিবিয়া, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, মরক্কো ও ওয়েস্ট আফ্রিকা তথা মুসলিমবিশ্বের পশ্চিম ভূখণ্ড মুওয়াহিদ্বীন সাম্রাজ্য পতনের পর খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়।

পাঁচ. মুসলমানদের পূর্বেই ইউরোপীয় খ্রিস্টানরা তাতারী হামলার স্বাদ আস্বাদন করেছে। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ ইউরোপবাসীকে জবাই করা হয়, গির্জা ধ্বংস করা হয়, বহু শহর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। বস্তুত এটি ছিল রোমান খ্রিস্টান ক্যাথলিকদের অভ্যন্তরে প্রবেশের পূর্ব সতর্কবাণী।

ছয়. খ্রিস্টানরা তাতারীদের নির্মম ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও পশ্চিম ইউরোপ (ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, ইটালি ও জার্মানি)-এর খ্রিস্টানরা মনে করত, তাতারী আক্রমণ একটি সাময়িক বিষয়। তা যেকোনো মুহূর্তে বন্ধ হবে। কিন্তু মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ অবিরাম চলবে, তা কখনো থামবে না। আর এ কারণেই খ্রিস্টান সম্রাটরা নিজেদের লক্ষ লক্ষ মানুষ তাতারীদের হাতে নিহত হওয়ার পরও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাতারীদের পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করতে প্রস্তুত থাকত।

আচ্ছা, কেন ক্রুশেড (খ্রিস্টান) সম্রাটরা এ ধারণা পোষণ করত যে, মুসলমানদের যুদ্ধ চিরস্থায়ী। আর তাতারীদের যুদ্ধ সাময়িক? কারণ, মুসলমানদের সঙ্গে খ্রিস্টান সম্রাটদের যুদ্ধ হলো আকীদা-বিশ্বাসের যুদ্ধ। মুসলমান-খ্রিস্টানদের যুদ্ধ হলো দ্বীন-ধর্মের যুদ্ধ। মুসলিম-খ্রিস্টানদের যুদ্ধ হলো চিরন্তন যুদ্ধ। যতদিন পর্যন্ত মুসলমান ও খ্রিস্টানরা একই ধর্মালম্বী না হবে ততদিন পর্যন্ত মুসলমান ও খ্রিস্টানদের যুদ্ধ থামবে না। যেমন মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে বলেন—

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

"ইহুদী ও নাসারা তোমার প্রতি কিছুতেই খুশি হবে না যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবে।"[৩৯]

পক্ষান্তরে খ্রিস্টানদের সঙ্গে তাতারীদের আকীদাগত কোনো যুদ্ধ ছিল না। তাতারীদের আকীদা ছিল বিকৃত, বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়ে সৃষ্টি। একজন তাতারী নেতাও সভ্য দেশগুলোতে তাদের আকীদা-বিশ্বাস প্রচারে সক্ষম ছিল না। তাতারীদের মূল লক্ষ্য ছিল জ্বালাও-পোড়াও ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানো, শিশু নারীদের বন্দীকরণ ও ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত করা। এসব যাদের গুণ ও বৈশিষ্ট্য হয় তাদের পক্ষ থেকে কোনো কিছুর ধারাবাহিকতা আশা করা যায় না।

এ কারণেই ইউরোপীয় খ্রিস্টানরা তাতারীদের পক্ষ থেকে নানান রকম কষ্ট-যন্ত্রণা পেয়েও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি না নিয়ে মিশর, সিরিয়া তথা মুসলিম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তৎকালীন নাজুক মুহূর্তে খ্রিস্টানরা মুসলিম উম্মাহকে নির্মূল করার জন্য তাতারী সম্রাটের পক্ষ থেকে সহযোগিতা লাভের ব্যাপারে নিরাশ হয় ন।

সাত. ইউরোপ আক্রমণের পর তাতারী বাহিনীর আকীদা-বিশ্বাসে পরিবর্তন সাধিত হয়। বহুসংখ্যক মোঘল নেতা খ্রিস্টান মেয়েদের বিয়ে করে। এতে মোঘল ও খ্রিস্টধর্মের সংমিশ্রণ ঘটে। তাতার ও খ্রিস্টানদের পরস্পর সহযোগিতার এটি একটি অন্যতম কারণ।

আট. বহুদিন পূর্ব থেকে ইউরোপীয় খ্রিস্টান ও মিশর-সিরিয়ার মুসলমানদের পরস্পর যুদ্ধ চলছিল। তৎকালীন মিশর ও সিরিয়ায় আইয়ূবীদের শাসন চলত।

---

[৩৯] সুরা বাকারা : ১২০।

কিন্তু সে সময়টি ছিল আইয়ূবীদের শেষ সময়। আইয়ূবীদের পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছিল। মাঝে মুসলমানগণ উভয় সংকটে দিনাতিপাত করছিল। একদিকে তাতারী হামলা, অন্যপাশে ক্রুশেড (খ্রিস্টান) হামলা।

নয়. ৬৪০ হিজরীতে আব্বাসী খলিফা মুনতাসির বিল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন। তারপর তার ছেলে মুস্তাসিম বিল্লাহ খলিফা মনোনিত হন। তখন তার বয়স ছিল ত্রিশ বছর। যদিও অধিক কুরআন তেলাওয়াত, ফিকাহ ও তাফসীরশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ও অধিক পুণ্যকাজে তার সুখ্যাতি রয়েছে; কিন্তু তিনি রাজনীতির 'র'ও বুঝতেন না। 'মানবজ্ঞান' বলতে তার কোনো জ্ঞান ছিল না। (তিনি মানুষ চিনতেন না।) ফলে তিনি অসৎ বন্ধু গ্রহণ করেন এবং পূর্বের তুলনায় খেলাফত আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। শীঘ্রই এর বিস্তারিত বিবরণ আসবে ইনশাআল্লাহ! তিনি সর্বশেষ আব্বাসী খলিফা। এরপর তার শাসনামলেই বাগদাদের পতন ঘটে।

দশ. তাতার ও ইরাকের আব্বাসী খেলাফতের মাঝে শুধু পারস্যের (বর্তমান ইরানের) পশ্চিমে অবস্থিত একটি সংকীর্ণ অঞ্চলের ব্যবধান ছিল। আয়তনের দিক থেকে খুব ছোট হলেও ভৌগলিক দিক থেকে অঞ্চলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ অঞ্চলে বাস করত ইসমাঈলী শিয়াদের একটি গ্রুপ। তারা ছিল যুদ্ধপ্রিয়। তাদের বহু মজবুত দুর্গ ও ঘাঁটি ছিল। আব্বাসী খেলাফতের সঙ্গে সর্বদা তাদের বিরোধ লেগেই থাকত। তারা সুন্নী মাযহাবকে প্রচণ্ড ঘৃণা করত। তারা ইসলামের শত্রুদের প্রচুর সহযোগিতা করত। তারা একবার তাতারদের অনুগামী হতো, আরেকবার খ্রিস্টানদের অনুগামী হতো। তাতারীরা তাদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিল না। ভূপৃষ্ঠে কোথাও কোনো শক্তিশালী দল টিকে থাকুক, তাতারীরা তা কখনোই চাইত না।

মোটকথা, নতুন তাতারী সম্রাট কায়ুক ইবনে উকিতাই সুবিশাল রাজত্ব লাভ করে, যাকে তৎকালীন বিশ্বের পরাশক্তি মনে করা হতো। আর খ্রিস্টানরা তাতারীদের অনিরাময় ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের সহযোগিতা কামনা করে। অপরদিকে মুসলমানগণ ছিলেন চিরন্তন বিরোধে লিপ্ত। উভয় সংকট তাদের ঘিরে রেখেছিল; একপাশে তাতারী আক্রমণ, অন্য পাশে ক্রুশেড আক্রমণ। ছোট-বড় নির্বিশেষে কোনো মুসলিম নেতার তখন

দেশ স্বাধীন করা কিংবা জুলুম থেকে আল্লাহর বান্দাদের মুক্তি দেওয়ার কোনো চিন্তা ছিল না। তখন তাদের চাওয়া-পাওয়া বলতে ছিল নিজ বসবাস-ভূমিতে নিজের ক্ষমতা সুরক্ষিত রাখা। নিজ ক্ষমতাশীল এলাকা চাই ছোট হোক বা দুর্বল হোক। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

৬৩৯ হিজরী থেকে ৬৪৯ হিজরীর মধ্যবর্তী সময়

তাতারীদের নতুন সম্রাট কায়ুক ইবনে উকিতাই ক্ষমতা গ্রহণের পর ব্যাপক হামলানীতি প্রত্যাহার করে এবং তাতারী অধ্যুষিত বিক্ষিপ্ত অঞ্চলসমূহে নিজের ক্ষমতা সুদৃঢ় করার প্রতি মনোযোগ দেয়। সম্রাট কায়ুক ৬৩৯ হিজরী থেকে ৬৪৬ হিজরী পর্যন্ত রাজত্ব পরিচালনা করে। এই সাত বছরে তাতারীরা দু-একটি অঞ্চল ব্যতীত নতুন কোনো অঞ্চলে প্রবেশ করে না।

পশ্চিম ইউরোপের খ্রিস্টানরা যখন দেখতে পেল, সম্রাট কায়ুক কোনো যুদ্ধ-সম্প্রসারণ নীতি অবলম্বন করছে না, তখন তাতারীদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহযোগিতা লাভের কামনা তাদের মাঝে তীব্র আকার ধারণ করল। তারা ইনোসেন্ট রাবে' পোপকে ৬৪৩ হিজরীতে দূত হিসেবে মঙ্গোলিয়ায় প্রেরণ করে। তাকে দূত বানানোর উদ্দেশ্য ছিল মিশর ও সিরিয়ার মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাতারীদের সমর্থন জোগানো। (তাকে দূত বানানোর উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে, তিনি রাশিয়া ও ইউরোপের খ্রিস্টানদের ওপর থেকে জুলুম ও অত্যাচার রোধ করবেন।) তাতারী সম্রাট কায়ুক খ্রিস্টান দূতকে মোঘল অঞ্চলে খ্রিস্টানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে উষ্ণ সংবর্ধনা জানাল। কিন্তু সম্রাট কায়ুক দূতের চিঠি পাঠ করে দেখতে পেল, মুসলমানদের বিরুদ্ধে সামরিক সহযোগিতা কামনার তুলনায় চিঠিতে তাকে খ্রিস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়েছে। সে এটিকে একপ্রকার সীমালঙ্ঘন মনে করে। কীভাবে খ্রিস্টানরা তাতারী সম্রাটের ধর্মপরিবর্তন কামনা করে?!

সম্রাট কায়ুক চিঠির উত্তরে লেখে, তারা যেন পশ্চিম ইউরোপের আমীর-উমারাদের একত্রিত করে সম্রাটের আনুগত্য প্রদর্শনার্থে মঙ্গোলিয়ায় নিয়ে আসে। এরপর সহযোগিতা প্রদান করা হবে। স্বভাবতই পশ্চিম ইউরোপের আমীর-উমারারা তার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এ কারণে তাদের দৃঢ় উদ্দেশ্য সাধন ব্যর্থ হয়।

কিন্তু ক্যাথলিক পোপ ইনোসেন্ট রাবে' এতে নিরাশ না হয়ে আরেকটি চিঠি পাঠান। তবে এবার তিনি চিঠিটি ইসলামী খেলাফতের পারস্য অঞ্চলের তিবরিয শহরের তাতারী কমান্ডারের কাছে পাঠান। এই তাতারী কমান্ডারের নাম ছিল বিজু। এটি ৬৪৫ হিজরীর ঘটনা। পোপ তার পক্ষ থেকে আক্রমণ কিংবা সীমালঙ্ঘনের আশঙ্কা টের পায়নি; বরং সে তাকে সহযোগী হিসেবে পেয়েছে। পোপ বিজুর পক্ষ থেকে অভিনন্দিত হয়। বিজু মনে করে, মিশর ও সিরিয়ার মুসলমানদের ওপর খ্রিস্টানরা আক্রমণ করলে মুসলমানরা ইরাকের আব্বাসী খেলাফত রক্ষায় ব্যস্ত থাকবে। ফলে তাদের আক্রমণ করা খুবই সহজ হবে। কিন্তু একথা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট যে, খ্রিস্টানদের সহযোগিতা করার জন্য যে সামরিক যোগ্যতার প্রয়োজন, তা বিজুর মাঝে নেই। এদিকে কায়ুক ইবনে উকিতাই রাজ্য অসম্প্রসারণ নীতি এবং খ্রিস্টানদের সহযোগিতা প্রদান না করার নীতিতে অটল। তবে খ্রিস্টানরা যদি বিনয়াবত হয়ে তার কাছে আসে তবে তা ভিন্ন বিষয়। এভাবে দ্বিতীয় বারের সহযোগিতা কামনাও ভেস্তে যায়।

এ সময় ফ্রান্সের অধিপতি লুইস তাসে মিশর আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ইতিহাস পাঠ করে আমি জানতে পেরেছি এটি ছিল খ্রিস্ট-আক্রমণ। সে সাইপ্রাস দ্বীপে সৈন্যবাহিনী একত্রিত করতে থাকে। এটি ৬৪৬ হিজরীর ঘটনা। লুইস দেখল, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাতারীদের সমর্থনের সম্ভাবনা এখনো শেষ হয়নি। তাই সে তৃতীয় বারের মতো সাইপ্রাস থেকে মঙ্গোলিয়া যায়। তাতারী সম্রাট কায়ুকের সহযোগিতা কামনা করে চিঠি পাঠায়। চিঠির সঙ্গে বহু মূল্যবান হাদিয়া উপঢৌকন ও দামি দামি হিরা জহরত পাঠায়। কিন্তু চিঠিটা যখন মঙ্গোলিয়ার রাজধানী কারাকুরামে পৌছে তখন তাতারী সম্রাট কায়ুকের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। কায়ুক ছোট তিনজন সন্তান রেখে মারা যায়। তাদের কেউ এই বয়সে রাজত্ব গ্রহণের উপযুক্ত নয়। ফলে কায়ুকের স্ত্রী উগল কিউমেশ (Oogol Qemesh) ক্ষমতা গ্রহণ করে। এটি ৬৪৬ হিজরীর প্রথম দিকের ঘটনা। তার ক্ষমতা তিন বছর দীর্ঘায়িত হয়।

লুইস নতুন তাতারী সম্রাজ্ঞীর কাছে দূত প্রেরণ করে। সম্রাজ্ঞী তাকে সাদর সম্ভাষণ জানায়। কিন্তু সে খ্রিস্টানদের সহযোগিতা করতে না পারায় অপারগতা

প্রকাশ করে। কারণ, কায়ুকের অকালমৃত্যুর কারণে তাতারী সাম্রাজ্যে যেসব বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, সে তা সমাধানে ব্যতিব্যস্ত রয়েছে। উপরন্তু অধিকাংশ তাতারী নেতা সুবিশাল তাতারী সাম্রাজ্যের উপর নারীর ক্ষমতায়নকে মেনে নিতে পারছিল না, যেই সাম্রাজ্যের মূল বুনিয়াদ হলো শক্তি, ক্ষমতা ও দৌরাত্ম্য। কিন্তু লুইস তাতারীদের অংশগ্রহণ ব্যতীতই আক্রমণের সিদ্ধান্তে অটল থাকে। তাই সে সাইপ্রাস থেকে মিশর অভিমুখে রওয়ানা হয় এবং ৬৪৭ হিজরীতে দামিয়েত্তা নগরীতে অবতরণ করে তা ধ্বংস করে নীলনদ পাড়ি দিয়ে মিশরে পৌঁছে যায়। কিন্তু মানসুরা নামক স্থানে মিশরীয় বাহিনী তাদের মুখোমুখি হয়। তাদের সঙ্গে মিশরের সুলতান সালেহ আইয়ূবী ছিলেন। তিনি যুদ্ধ শুরু হওয়ার তিনদিন পর 'মানসুরা' স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর মিশরের রাজক্ষমতা তার স্ত্রী শাজারাতুদ দুর গ্রহণ করেন। তিনি স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ গোপন রাখেন এবং তুর্কীর এক প্রদেশের আমীর তাওরান শাহ ইবনে মালিক সালেহ নাজমুদ্দীন আইয়ূবীকে চলে আসতে বলেন। শাজারাতুদ দুর ক্রুশেডবিরোধী প্রসিদ্ধ যুদ্ধ মানসুরায় ফারেস উদ্দীন আকতাই ও রুকন উদ্দীন বাইবার্সের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়লাভ করেন। অতঃপর তাওরান শাহ মিশর পৌঁছে রাজকর্মে মনোনিবেশ করেন। তিনি ফারেসকুর অঞ্চলে আরেকবার ক্রুশেডারদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং ফ্রান্স সম্রাট লুইস যুদ্ধে বন্দী হয়। এটি ৬৪৮ হিজরীর ঘটনা। এরপর মিশরে বেশ কিছু যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাওরান শাহ নিহত হন। শাজারাতুদ দুর প্রকাশ্যে মিশরের ক্ষমতা হাতে তুলে নেন। কিন্তু মিশরের পরিবেশ-পরিস্থিতি নারী নেতৃত্ব মেনে নেয় না। তাই তিনি ইজ্জুদ্দীন আইবেকের বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। ইজ্জুদ্দীন ছিলেন মিশরের একজন সেনাপতি। তিনি সম্রাজ্ঞীর বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মিশরের সম্রাটে পরিণত হন। ইজ্জুদ্দীন আইবেক ছিলেন দাস বংশের। তার মাধ্যমে আইয়ূবীদের পর মিশরে দাসবংশের ক্ষমতার সূচনা ঘটে। তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

দাস শক্তির উত্থান, খ্রিস্টানদের সপ্তম আক্রমণের ব্যর্থতা সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি। নিঃসন্দেহে পরাজয় খ্রিস্টানদের সুপ্তক্ষোভের তীব্রতা বাড়িয়ে দিয়েছে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাতারীদের সহযোগিতা প্রদানের বিষয়টি আরও জোরালো করেছে।

এদিকে মঙ্গোলিয়ার অবস্থা স্থিতিশীল ছিল না। তাতারীরা সম্রাট কায়ুকের স্ত্রীর নেতৃত্ব মেনে নিতে পারছিল না। এ কারণেই ৬৪৯ হিজরীতে বালকুরালতাই নামক একটি জাতীয় কাউন্সিল সংঘটিত হয়। তারা নতুন সম্রাট নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে তারা মানকু খানকে তাতারীদের নতুন সম্রাট হিসেবে নির্বাচন করে।

মানকু খান তাতারী সাম্রাজ্যের সম্রাট নির্বাচিত হওয়ার পর তাতারী রাজনীতি ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। তাতারী সাম্রাজ্যের প্রধান স্থপতি চেঙ্গিজ খানের রাজনীতির সঙ্গে মানকু খানের রাজনীতির খুব মিল ছিল এবং ইউরোপ-বিজেতা উকিতাইর রাজনীতির সঙ্গেও যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। মানকু খান প্রথমত নতুনভাবে আব্বাসী খেলাফত পতনের চিন্তা করে, এরপর অন্যান্য অঞ্চল।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, মানকু খান ক্ষমতা গ্রহণের সময় মুসলিম আমীর-ওমারাগণ সঠিক মতাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না। যদিও মুসলমানরা ৬৪৮ হিজরীতে মানসুরার যুদ্ধেজয় লাভ করে। তথাপি তারা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত ছিল। অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহ তো আছেই, মুসলমানদের পরস্পর বহু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধও সংঘটিত হতো।

এমনই এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ মিশরী ও সিরিয়ার সেনাবাহিনীর মাঝে সংঘটিত হয়েছিল। মিশরীয় বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন ইজ্জুদ্দীন আইবেক। সিরিয়ার সৈন্যবাহিনীকে পাঠিয়েছিলেন আলেপ্পো ও দামেস্কের আমীর নাসের ইউসুফ। আব্বাসিয়া নামক স্থানে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটি বর্তমানে মিশরীয় শহর জাগাজিগের থেকে আঠারো কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। যুদ্ধে মিশরীয় বাহিনী জয়লাভ করে। আমি [লেখক] জানি না, এসব যুদ্ধে তারা কী স্বাদ খুঁজে পেত? অপর দিকে ক্রুশেড আক্রমণ অব্যাহত ছিল। আর তাতারী বাহিনী আব্বাসী খেলাফতের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল।

বড় আশ্চর্যের বিষয় হলো, এ সময় সমাজের জ্ঞানী-গুণী, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ—এমনকি উলামায়ে কেরামও একদম ভুলে গিয়েছিলেন যে, অর্ধেক মুসলিম জাতি তাতারী আক্রমণের শিকার হয়েছিল এবং তারা একথাও ভুলে গিয়েছিলেন যে, তাতারীরা আব্বাসী খেলাফত, হেজাজ, মিশর ও সিরিয়ার দুই

ধনুক দূরে কিংবা আরও কাছে পৌঁছেছে। এই মধ্যবর্তী সময়ে ঐতিহাসিকগণ তাতারীদের কোনো বিষয় উল্লেখ করেননি।

উদাহরণস্বরূপ, পাঠকবৃন্দ এ সময়ের তাতারীদের আলোচনা ইবনে কাছীর রহ. রচিত *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়ায়* অস্পষ্ট আকারে সম্রাট কায়ুকের বিদায় ও স্ত্রীর ক্ষমতায়ন (শিরোনামে) খুঁজে পাবেন।

ইবনে কাছীর রহ. এ সময়ের তাতারীদের ইতিহাস উল্লেখ না করার কারণ হলো, উৎসস্বল্পতা ও তথ্যস্বল্পতা। এ সময়ের ইতিহাস ইতিহাসের কোনো গ্রন্থেই পাওয়া যায়নি। ইরাক, সিরিয়া, মিশরবাসীও এ বিষয়ে খুব সামান্য আলোচনা করেছেন। এমনকি তাতারীদের অত্যাচার ও জুলুম নিষ্পেষিত মাজলুম মুসলমানদের থেকে এ বিষয়ে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায়নি।

এমনকি আপনি দেখবেন, ৬৩৯ থেকে ৬৪৯ হিজরী পর্যন্ত ইরাক, সিরিয়া ও মিশরবাসীর জীবনযাপন উল্লেখ করতে গিয়ে ইবনে কাছীর তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপনের চিত্র তুলে ধরেন। যেমন : খলিফা অর্থনৈতিক সমস্যা সুরাহা করছেন, ফকীর-মিসকীনদের মাঝে দান সদকা-করছেন, বিপদাপদ দূর করছেন, বাজারমূল্য বৃদ্ধি পেলে খলিফা উপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। কেউ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু করছে। কেউ সরাইখানা উদ্বোধন করছে। আবার কেউ চিকিৎসাকেন্দ্র খুলছে। এ সময়ের আরও কিছু ঘটনা—অমুক কবি, অমুক সাহিত্যিক, অমুক মান্যবর ব্যক্তি, অমুক মন্ত্রী ইন্তেকাল করেছেন ইত্যাদি।

কিন্তু কোথায় জ্ঞানীগুণী উলামায়ে কেরামের সুবিশাল জামাত, যারা মিম্বরে ও মতবিনিময় সভায় বসে জাতিকে তাতারী ফেতনা সম্পর্কে সচেতন করবেন? তাতারী অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে তাতারীদের বিপদাপদ ও নির্যাতনের কথা উল্লেখ করবেন?! সেদিন কোথায় ছিলেন প্রজ্ঞাবানরা, যারা অবশ্যম্ভাবী দিবসের জন্য জাতিকে প্রস্তুত করবেন? সত্যিকার অর্থে তৎকালে এসব বিষয় ছিল না বললেই চলে। এ কারণেই ইতিহাসের কিতাবাদিতে তা স্থান পায়নি।

মোটকথা, তৎকালীন ঘটনাবলি এ কথার প্রতি অকুণ্ঠ স্বীকৃতি প্রদান করে যে, তাতারীদের নতুন আক্রমণ শীঘ্রই সংঘটিত হবে। আর তা চেঙ্গিজ খানের যুগে সংঘটিত তাতারীদের প্রথম আক্রমণ ও উকিতাই-এর যুগে সংঘটিত

তাতারীদের দ্বিতীয় আক্রমণের মতোই হবে কিংবা আরও ভয়াবহ দুর্বোধ্য। কারণ, মুসলমানরা যতই নতি স্বীকার করে, তাতারীদের স্পর্ধা ততবেশি বৃদ্ধি পায়। মুসলমানরা কোনো কিছু ছেড়ে দিলে তাতারীরা পার্শ্ববর্তী বস্তুটির দিকে হিংস্র থাবা সম্প্রসারিত করে। এটাই বাতেলপন্থীদের চরিত্র। পাঠকবৃন্দ সমীপে ইতিহাস পাঠের আবেদন রইল।

তাতারীদের তৃতীয় আক্রমণ

মানকু খান তাতারী সাম্রাজ্যের সম্রাট মনোনীত হওয়ার পর থেকেই প্রথমত আব্বাসী খেলাফতের পতন ও ইরাক আক্রমণের কথা চিন্তা করতে থাকে। এরপর মিশর আক্রমণের চিন্তা করে। মানকু খান শক্তিশালী দৃঢ়প্রত্যয়ী সম্রাট। কিন্তু বাহ্যত তাকে তার বড় তিন ভাই সহযোগিতা প্রদান করে, যারা তার স্বপ্ন বাস্তবায়নে ছিল সহযোগী। আরিক বুকা নামক তার এক ভাই তার সঙ্গে সুবিশাল তাতারী সাম্রাজ্য দেখাশুনার জন্য রাজধানী কারাকুরামে অবস্থান করে। আরেক ভাইকে সে চীন, কোরিয়াসহ পূর্ববর্তী অঞ্চলসমূহ দেখাশুনার দায়িত্ব প্রদান করে। এই ভাইয়ের নাম হলো কাবিলা। তার তৃতীয় ভাইয়ের নাম হলো হালাকু। পারস্য ও পারস্যের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ পরিচালনার দায়িত্ব তাকে প্রদান করা হয়। সেসব অঞ্চল আব্বাসী খেলাফতের মুখোমুখি অবস্থিত। নিঃসন্দেহে ইতিপূর্বে সকলে 'হালাকু' নামটি শুনে থাকবেন!!

হালাকু রক্তপাতকারী সেই তাতারী নেতা, যার অন্তরে বিন্দুমাত্র মানবতাবোধ ছিল না, মানবরক্ত ব্যতীত যার তৃষ্ণা নিবারিত হতো না। সে ছিল চেঙ্গিজ খানের প্রতিচ্ছবি।

হালাকু পৃথিবীর ইতিহাসের নিকৃষ্টতম ব্যক্তিদের অন্যতম। হালাকু খানকে পারস্যের নেতৃত্ব প্রদান করা হয়। সে সুবাদে মুসলিম সাম্রাজ্য তার প্রধান চারণভূমিতে পরিণত হয়। সে যাদের হত্যা করেছিল তাদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান। আর যাদের অন্তরে সে যন্ত্রণার বীজ বপন করেছিল তারা ছিল মুসলমান। সুবহানাল্লাহ! হালাকুর অন্তরে যে বিদ্বেষ ও ঘৃণা ছিল, মুসলিম ভূখণ্ড ধ্বংসের জন্য যেন তা যথেষ্ট ছিল না, তাই সে মোঘল রাজকুমারী তকায খাতুনকে বিয়ে করে। ঘৃণা, অবিচার, বিদ্বেষ ও নিমর্মতার বিচারে যার অন্তর হালাকুর অন্তরের চেয়েও অধিক রূঢ় ছিল। মোঘল দরবারে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল অগাধ। উপরন্তু সে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। খ্রিস্টধর্মের বেলায় সে যতটা সহিষ্ণু, ইসলামের প্রতি সে ততটাই ছিল ঘৃণাপ্রবণ।

এভাবেই মুসলিম উম্মাহর মাঝে তাদের ক্রোধজীবাণু সংক্রমণের জন্য হালাকু খান তার স্ত্রী তকায খাতুনের সঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়। হালাকু খানের লক্ষ্য ছিল

সুস্পষ্ট। তার কামনা বাসনা ছিল আব্বাসী খেলাফতের রাজধানী বাগদাদ পতন। এরপর অন্যান্য অঞ্চল।

পারস্যের নেতৃত্ব গ্রহণের পর থেকেই হালাকু খান আব্বাসী খেলাফত পতনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। তার সৈন্যসংখ্যা ছিল বিপুল। এত বিপুলসংখ্যক যে, মুসলমানদের পক্ষে তাদের প্রতিহত করা অসাধ্য ছিল। হালাকুর বিরোধীরা মুসলমান হলে হালাকুর বিজয়লাভই ছিল পরিস্থিতির দাবি। কারণ, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কতিপয় নীতি রয়েছে, যা অপরিবর্তনীয় ও অপরিবর্ধনীয়। যে ব্যক্তি জয়লাভ করার যাবতীয় উপকরণ গ্রহণ করবে সে কাফের হলেও আল্লাহ তা'আলা তাকে বিজয় দান করেন। আর যে ব্যক্তি যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে না সে মুসলমান হলেও পরাজিত হবে।

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ

"যে কেউ পার্থিব জীবন ও তার শোভা কামনা করে, দুনিয়াতে আমি তার কর্মের ফল দান করি এবং সেখানে তাদের কম দেওয়া হবে না।"[৪০]

কাজেই হালাকু খান পার্থিব জীবন কামনা করেছিল এবং এর জন্য যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। তাই সে দুনিয়ার অংশ পরিপূর্ণ লাভ করেছিল। তাকে এ থেকে সামান্য কম দেওয়া হয়নি।

আব্বাসী খেলাফত পতনে হালাকু খানের পদক্ষেপ

হালাকু খান ৬৪৯ হিজরীতে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ও দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে তার কাজ শুরু করে। সে প্রত্যেক কাজ ধৈর্য, সহনশীলতা ও ধীরস্থিরভাবে করত। কাজেই আব্বাসী খেলাফতের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণাবোধ, তা ধ্বংস করার প্রতি তীব্র বাসনা, আব্বাসীদের ধন-সম্পত্তির লোভ, বিপুল সৈন্য এবং বাহ্যত আব্বাসীদের চেয়ে অধিক রণকৌশলী হওয়া সত্ত্বেও আব্বাসী খেলাফতের বিরুদ্ধে হুট করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় না; বরং ৬৪৯ থেকে ৬৫৪ হিজরী পর্যন্ত দীর্ঘ পাঁচ বছর ধৈর্যধারণ করে যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

---

[৪০] সুরা হুদ : ১৫

আসুন! হালাকু খানের যুদ্ধের প্রস্তুতি ও পদক্ষেপসমূহের প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করি। হালাকু খান সমন্বিতভাবে প্রধান চারটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই পদক্ষেপসমূহ আব্বাসী খেলাফতের বিরুদ্ধে বিজয়-সম্ভাবনা অনেক বাড়িয়ে দেয়। এগুলো ছিল যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পদক্ষেপ। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এসব প্রস্তুতি মুসলিম-অমুসলিম সবার চোখের সামনে গ্রহণ করা হয়েছিল!!

প্রথম পদক্ষেপ : অবকাঠামোর উন্নয়ন

অবকাঠামোর উন্নয়ন, আমলী প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও রসদ জোগানো।

১. হালাকু ইরাক থেকে চীন পর্যন্ত দীর্ঘ অঞ্চলজুড়ে সর্বত্র এই উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড শুরু করে। তবে সে তাজাকিস্তান, আফগানিস্তান ও পারস্যের অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশ বিবেচনা করেই বিপুলসংখ্যক তাতারী সৈন্য প্রস্তুতির পদক্ষেপে অগ্রসর হয়।

২. হালাকু খান পথিমধ্যে যে সব নদী অবস্থিত, বিশেষত সাইহুন ও জাইহুন নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করে এবং সেগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত সেনা মোতায়েন করে। শুধু তাতারীদের গমনাগমনের জন্যই এসব সেতুপথ খুলে দেওয়া হতো।

৩. হালাকু খান নিরোধ সরঞ্জামাদি চীন থেকে বাগদাদ নিয়ে যাওয়ার জন্য বিপুলসংখ্যক কুলি প্রস্তুত করে। এ কারণেই এত বিপুল সরঞ্জামাদি অতি অল্পসময়ের এত দূরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।

৪. তাতারী বাহিনীর সবাই যেন নির্বিঘ্ন আকস্মিক আক্রমণ ও লুটতরাজ থেকে নিরাপদ থাকে, সে লক্ষ্যে হালাকু খান প্রতিটি শহর ও পথিমধ্যের ঘাঁটিসমূহে নিজ আধিপত্য বিস্তার শুরু করে।

৫. হালাকু খান একটি অদ্ভুত বস্তুর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সত্যিই এতে তার প্রখর মেধা ও বিচক্ষণতার প্রমাণ মেলে। তা হলো, সে বাগদাদ থেকে চীন পর্যন্ত সুদীর্ঘ পথের গাছপালা কাটার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। যাতে তাতারী বাহিনীর বিপুল সংখ্যক সওয়ারী এবং যুদ্ধের সরঞ্জামাদি বহনকারী জন্তুসমূহ খাদ্যাভাবমুক্ত থাকে। ফলে সওয়ারীর খাবার বহন করার প্রয়োজন পড়ে না এবং হঠাৎ খাদ্য সংকটের শঙ্কা থেকেও মুক্ত থাকে। চলন্ত গাড়ির

পেট্রোল ফুরিয়ে যাওয়ার চেয়েও বিপজ্জনক হলো বাহনজন্তুর খাদ্য ফুরিয়ে যাওয়া। কারণ, পেট্রোল ফুরিয়ে গেলে গাড়ি অক্ষত থাকে। পক্ষান্তরে খাবার ফুরিয়ে গেলে বাহনজন্তু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ : রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পদক্ষেপ

বৃহৎ বিজয়সাধনের লক্ষ্যে তাতারীরা পার্শ্ববর্তী শক্তিশালী দেশসমূহের সঙ্গে কতিপয় রাজনৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা করে। এতে তাতারী রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়, যা ইতিপূর্বে দেখা যায় নি।

যেহেতু এই দ্বিতীয় পদক্ষেপটি তাতারী রাজনীতির জন্য বড়ই ভয়াবহ ছিল, তাই মানকু খান নিজেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই দায়িত্ব পালনের জন্য দাঁড়িয়ে যায়। এক্ষেত্রে হালাকু খানের কোনো এখতিয়ার রাখা হয়নি; যদিও তৎকালে সময়ে হালাকু খানের মতামতই সর্বাধিক গৃহীত হতো।

১.

মানকু খান ফ্রান্সের রাজা লুইস তাসে'র পক্ষ থেকে ৬৫১ হিজরীতে একটি চিঠি পায়। লুইস মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাতারীদের সহযোগিতা পাওয়ার বিষয়ে তখনো নিরাশ হয়নি। ঠিক ৬৪৮ হিজরীতে মানসুরার যুদ্ধে মুসলমানদের কাছে পরাজয়বরণ করার কারণে স্বভাবতই তার ভেতরে ক্রোধ দানা বেঁধেছিল। তখন ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ছিলেন উইলিয়াম রোবরোক। দুই দেশের মাঝে সংলাপ শুরু হলেও অতি দ্রুত তা ব্যর্থ হয়। কারণ, মানকু খান দিলদরিয়া মানুষ ছিল না এবং এতটা রাজনৈতিক দূরদর্শীও ছিল না, যা চুক্তিরক্ষার জন্য জরুরি। সে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বুঝত না এবং বুঝত না পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক প্যাঁচ। উত্তম কলাকৌশল প্রয়োগ করে কথাও বলতে পারত না। জানত না স্বার্থ কীভাবে হাসিল করতে হয়। সে ইউরোপীয় কপটতা কিংবা ইউরোপীয় মুচকি হাসির আড়ালে লুকিয়ে থাকা বিদ্বেষ সম্বন্ধে কিছুই জানত না। সে ছিল একজন সহজ সরল স্পষ্টভাষী।

মানকু খান আলোচনার শুরুতে বলে, গোটা বিশ্বে তিনি ছাড়া অন্য কোনো রাজা থাকতে পারবে না এবং কেউ তার সমকক্ষ থাকবে না। একমাত্র তার অনুসারীরাই পৃথিবীতে থাকতে পারবে। তারাই তার সাথী-সঙ্গী বিবেচিত হবে, যারা তার অন্ধ-অনুসরণ করবে এবং তার নেতৃত্ব ও আনুগত্যের কথা ঘোষণা করবে। পক্ষান্তরে যারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে কিংবা তার আনুগত্য প্রদর্শন

করবে না, তাদের সঙ্গে তার কোনো সংলাপ চলবে না। তারা তার শত্রু বলে বিচেচিত হবে। যুদ্ধ ও ধ্বংসই তাদের একমাত্র পরিণাম।

এটি ছিল খুব সহজ রাজনীতি। এক নায়কতন্ত্রের রাজনীতি!! তিনি বিশ্বকে দুটি সাম্রাজ্যে বিভক্ত করেন : ১. শত্রু সাম্রাজ্য ২. মিত্র সাম্রাজ্য।

ফ্রান্সের রাজা স্বভাবতই তাই এই শর্ত প্রত্যাখ্যান করে। এ কারণেই তাতারী ও পশ্চিম ইউরোপের মধ্যকার প্রথম সংলাপ ব্যর্থতায় পর্যুদস্ত হয়।

২.

আনুগত্য প্রদর্শনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনপূর্বক যখন পশ্চিম ইউরোপের খ্রিস্টান ও রাজা বাদশারা মানকু খানকে সহযোগিতা প্রদানে অস্বীকৃতি জানাল, তখন অন্যান্য রাজা বাদশা এই প্রস্তাব গ্রহণ করল।

খ্রিস্টান রাজ্য আর্মেনিয়ার রাজা হাইতুম মানকু খানের শর্ত মেনে নিয়ে তার সঙ্গে জোট বাঁধলেন। তিনি তাতারীদের ক্ষমতা সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। কারণ, ইতিপূর্বে তাতারী সম্রাট চেঙ্গিজ খান ও উকিতাই-এর যুগে তাতারীদের হাতে তার সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হয়েছিল।

তিনি একথাও জানতেন যে, কোনো অবস্থাতেই তার দুর্বল সাম্রাজ্য তাতারী সাম্রাজ্যের মোকাবেলা করতে পারবে না। আর্মেনিয়া সাম্রাজ্যের আয়তন হলো ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) বর্গকিলোমিটার। উপরন্তু আর্মেনিয়ার রাজা জানত তার সাম্রাজ্য একদিক থেকে তাতারীদের কারণে অবরুদ্ধ, অন্য দিকে মুসলমানদের কাছে অবরুদ্ধ। মুসলমানদের সঙ্গে তাদের বিরোধ দীর্ঘদিনের। মুসলমানদের আক্রমণ করার জন্য এবং আব্বাসী খেলাফত ধ্বংস করার জন্য তার অন্তর অস্থির হয়েছিল। কাজেই সে যদি আজ তাতারীদের বশ্যতা মেনে না নেয়, কাল মুসলমানরা তার ওপর চড়াও হবে এবং তার সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হবে।

রাজা হাইতুম এসব কিছু মোঘল রাজধানী কারাকুরামে নিজেই মানকু খানের মোকাবেলা করার জন্য করেছিল। সে জেনেছিল, মানকু খান রাজনীতিতে কলাকৌশল আয়ত্ত করেছে। মানকু খান বিশাল বাহিনীর উপস্থিতিতে আর্মেনিয়ার রাজা হাইতুমকে জমকালো সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে। তাকে একজন রাজা হিসেবে মূল্যায়ন করে, অনুসারী হিসেবে নয়। যদিও তাদের মধ্যকার চুক্তিনামা ও সংলাপ রাজা ও প্রজা হিসেবে সম্পাদিত হয়েছিল।

রাজা হাইতুমকে যিনি নিজেকে একজন সাধারণ প্রজা হিসেবে মানকু খানের সামনে উপস্থিত করেছেন, জমকালো সংবর্ধনা জ্ঞাপন শেষে মানকু খান বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি প্রদান করে এবং বহু মূল্যবান উপঢৌকন প্রদান করে। এর মাধ্যমে মানকু খান রাজা হাইতুমের আনুগত্য ক্রয় করেছিল।

মানকু খান রাজা হাইতুমকে কী কী প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিল

মারকু খান তাকে প্রদান করেছিল :

১. ব্যক্তিগত সম্পত্তির পূর্ণ নিরাপত্তা।

২. সমস্ত খ্রিস্টান গির্জা ও উপাসনালয়ের করের অব্যাহতি।

৩. সেলজুক যুদ্ধের সময় মুসলমানরা তাদের যেসব অঞ্চল দখল করেছিল, তা ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি।

৪. আর্মেনিয়া সাম্রাজ্যকে পশ্চিম এশিয়া বিষয়ক মানকু খানের উপদেষ্টা বানানো।

এভাবেই আর্মেনিয়ার রাজা তাতারী সম্রাটের নৈকট্যলাভে ধন্য হয়।

কিন্তু জিজ্ঞাসার বিষয় হলো, আর্মেনিয়া সাম্রাজ্যের সঙ্গে তাতারীদের বিনয়ের কী লক্ষ্য ছিল? তৎকালীন সামরিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি জেনে থাকবেন, আর্মেনিয়ার সামরিক শক্তি তাতারীশক্তির ধারে-কাছেরও ছিল না। তাহলে তাতারী সাম্রাজ্য কেন আর্মেনিয়া নামক ক্ষুদ্র খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের সম্মুখে বিনয়াবত হলো এবং নানান প্রতিশ্রুতি প্রদান করল?

পাঠকবৃন্দ এই ঘটনা থেকে খুঁজে পাবে

এক.

তাতারী সম্রাট মুসলমানদের যুদ্ধে আর্মেনিয়ার রাজার বিচক্ষণতা ও অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হতে চেয়েছিল। কারণ, আর্মেনিয়া ও মুসলমানদের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। মুসলিম সাম্রাজ্য ও তাদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে আর্মেনিয়া ভালো ধারণা রাখত। আর্মেনীয়রা মুসলমানদের সম্পর্কে তাতারীদের যে তথ্য প্রদান করবে, নিঃসন্দেহে তা যুদ্ধে কাজে আসবে। (যেমন : বর্তমান পরাশক্তি আমেরিকা দুর্বল শক্তি ইংল্যান্ডের সঙ্গে একতা ঘোষণা করে কেবল এজন্য যে, মুসলিম ভূখণ্ড ও বিশেষত ইরাক সম্পর্কে ইংল্যান্ডের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনেক।)

দুই.

এই সুবিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য তাতারী সম্রাটের অনেক সহযোগিতা প্রয়োজন। সুতরাং নিজ দেশের ওয়াফাদার বিশ্বস্ত সহযোগী বহির্বিশ্বের সহযোগীর চেয়ে উত্তম। কারণ, অভ্যন্তরীণ সহযোগী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও গোত্রীয় দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিয়ন্ত্রণে অধিক ক্ষমতাবান হয়।

তিন.

এই পদক্ষেপের মাধ্যমে তাতারী সম্রাট নতুনভাবে খ্রিস্টানদের সঙ্গে সম্পর্কের দ্বারা উন্মুক্ত করল। কারণ, সিরিয়া মিশর বিজয়ের সময় খ্রিস্টানদের প্রয়োজন দেখা দেবে। তা ছাড়া ইউরোপ সংলাপে আর্মেনিয়া রাজার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এতকিছুর পরেও তাতারী সম্রাট জানত, খ্রিস্টানদের অন্তরে তাদের প্রতি রয়েছে চরম বিদ্বেষ। কারণ, তাতারীরা রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপে খ্রিস্টানদের অকাতরে জবাই করেছিল। এবার জাতীয় স্বার্থে উভয়দল একই প্লাটফর্মে আসার সুযোগ পেয়েছে।

চার.

আর্মেনিয়া সাম্রাজ্যের সঙ্গে তাতারীদের ঐকমত্য মুসলমানদের মানসিকতার ওপর এক বড় প্রভাব সৃষ্টি করবে। কারণ তাতারীদের সঙ্গে যুদ্ধ করা এক কথা। আর জোট শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করা আরেক বিষয়। বস্তুত আর্মেনিয়ার একাত্মতা যদিও তাতারী শক্তির সামান্যতম শক্তিবৃদ্ধি করেনি, তথাপি 'জোট' শব্দটি মুসলমানদের মাঝে বড় প্রভাব সৃষ্টি করেছিল।

পাঁচ.

এতে আর্মিনিয়ান জোট শক্তির ওপর কতিপয় বিপদ আবর্তিত হয়। যে বিপদ তাতরীদের উপর আবর্তিত হওয়ার কথা ছিল। ফলে এই পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে তাতারীদের পরিবর্তে আর্মেনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সুতরাং যে ব্যক্তি বিশ্লেষকের চোখে তাতারী ও আর্মেনিয়ার মধ্যকার সংলাপ পর্যবেক্ষণ করবে, সে দেখতে পাবে যে, এতে তাতারীরা বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। মূলত সংলাপ হয়েছিল একজন রাজা যে সবকিছুর মালিক, একজন প্রজা যেকোনো কিছুরই মালিক নয়—এর মাঝে। এই হলো বিশ্বনেতাদের

চরিত্র। তারা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোকে নানান প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। গুরুত্বপূর্ণ বহু কাজ আঞ্জাম দেওয়ার আশ্বাস প্রদান করে। বিনিময়ে তাদের প্রতিবেশী মিত্রদেশ হওয়া ছাড়া আর কিছুই পাওয়া হয় না।

পাশাপাশি কিছু গর্বিত উপাধি পাওয়া যায়। যেমন পশ্চিম এশিয়া বিষয়ক তাতারীদের উপদেষ্টা, মিত্ররাজ্য, মিত্র সাম্রাজ্য ইত্যাদি।

উপাধির ফুলঝুড়ি কখনো ক্ষুধা মেটায় না। হাজারো উপাধি কোনো উপকারে আসে না। বাস্তবতা হলো তাতারীশক্তি যেমন মিত্রের ঝাণ্ডা প্রত্যাখ্যান করেছিল, অনুরূপ প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক দেশে শক্তিশালীরা দুর্বলদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। অধিকার শক্তি ব্যতীত কখনো আদায় হয় না।

তাতারী সম্রাটের এসব প্রতিশ্রুতি পেয়ে রাজা হাইতুম খুশি মনে, আনন্দচিত্তে, গর্বিত হৃদয়ে উদ্বেলিত হয়ে ফিরে আসেন। কারণ, তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে নিজ রাজ্যকে বিরত রাখতে পেরেছেন।

৩.

মানকু খানের আরেক ইচ্ছা এও ছিল যে, তিনি সিরিয়ার ক্রুশেড নেতাদের সঙ্গে জোট বাঁধবেন। কারণ, আন্তাকিয়া, ত্রিপোলি, সিদোন ও হাইফা সাম্রাজ্যের চেয়ে তাদের সাম্রাজ্য বড় ছিল। সিরিয়া ছিল মুসলমানদের তীর্থভূমি। কাজেই তারা সবাই যদি মুসলমানদের ওপর আক্রমণ চালায়, তাহলে মুসলমানরা আব্বাসী খেলাফত রক্ষা করতে পারবে না।

ক্রুশেডনেতাদের বীরত্ব ও সাহসিকতা বিবেচনা করে মানকু খান ঐক্যের আহ্বান নিয়ে তার নতুন বন্ধু হাইতুমকে পাঠায়, যে তৎকালে এসব অঞ্চলে তাতারী বাহিনীর দূত হিসেবে দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছিল। ক্রুশেড নেতাদের বীরত্বের দরুন তাতারী সম্রাট মানকু খান তাদের বাইতুল মুকাদ্দাস হস্তান্তর করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। (উল্লেখ্য সিরিয়ার আইয়ূবী নেতাগণ ৬২৬ হিজরীতে বাইতুল মুকাদ্দাসকে ক্রুশেডারদের হাতে অর্পণ করার পর তা ৬৪৩ হিজরীতে দ্বিতীয় বারের মতো সুলতান আইয়ূবীর হাতে বিজিত হয়েছিল।) যেন মানকু খান বাইতুল মুকাদ্দাসের মালিক! যেন বাইতুল মুকাদ্দাস হাদিয়া হিসেবে ক্রুশেডারদের দেওয়ার অধিকার সে সংরক্ষণ করে!!

এটি হলো মালিকানাহীন বস্তু অযোগ্য ব্যক্তিকে অর্পণ করার নামান্তর .... ইতিহাস পুনরাবৃত্তি হয় আদ্যোপান্তসহ!!

তবে সিরিয়ার ক্রুশেডনেতারা তাতারী সম্রাটের আহ্বানে ঐকমত্য হতে পারছিল না। তবে আন্তাকিয়ার নেতা বুহমন্দ ছিলেন ব্যতিক্রম, সে বিষয়টিকে উত্তম মনে করে কার্যত তাতারীদের সঙ্গে মিলিত হয়।

সিরিয়ার অন্যান্য নেতাদের মিলিত না হওয়ার কারণ কী ছিল?

এক.

তারা জানত, তাতারীরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না। তারা তাদের মূল্য ছাড়াই বিক্রি করে দেবে। অথবা যেকোনো কিছুর বিনিময়ে তারা তাদের জবাই করে দেবে কিংবা বিনিময় ছাড়াই জবাই করবে।

দুই.

দ্বিতীয়ত তারা ইসলামী বিশ্বের মধ্যভাগে বসবাস করে। তারা নিজেদের ব্যাপারে মুসলমানদের যেমন ভয় পায়, তাতারীদেরও তেমন ভয় পায়। এমনকি তাতারীদের তারা মুসলমানদের চেয়েও বেশি ভয় পেত। এ কারণেই তারা প্রকাশ্যে তাতারীদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করার দুঃসাহস দেখায়নি। যদিও স্পষ্টত তা প্রত্যাখ্যানও করেনি। এক্ষেত্রে তারা রাজনৈতিক কপটতার আশ্রয় নেয়। সাক্ষাতে মুচকি হাসির আড়ালে তাতারীশক্তি ও মুসলিমশক্তি—এই দুই শক্তির কোনো একটি বিজয়ের অপেক্ষায় দিনাতিপাত করছিল। তখন তারা বিজয়ী দলের দিকে সফলবলে অগ্রসর হবে, করমর্দন করবে, শুভেচ্ছা ও সংবর্ধনা জানাবে আর এই বলে ওজরখাহী করবে, যদি পরিবেশ-পরিস্থিতি প্রতিকূল না হতো, তবে তারা তাদের সঙ্গেই থাকত। কেউ কেউ বলেন, এই কর্মপদ্ধতির নামই হলো 'রাজনীতি'।

৪.

মানকু খান সিরিয়া ও ইরাকের খ্রিস্টানদের সঙ্গে কতিপয় বিষয়ে সন্ধিচুক্তি করার চেষ্টার করে। এই সকল খ্রিস্টান রাজা-বাদশা বা আমীর-ওমারা ছিলেন না। তারা ছিলেন সেই সকল খ্রিস্টান, যারা সিরিয়ার মুসলিম সাম্রাজ্যের তত্ত্বাবধানে কিংবা ইরাকে আব্বাসী খেলাফতের অধীনে বসবাস করত। এটা স্বভাবতই প্রচলিত কিংবা প্রকাশ্য কোনো জোট বা একাত্মতা ছিল না; এটা ছিল কতিপয় খ্রিস্টান পাদরির সঙ্গে পরোক্ষ সন্ধিচুক্তি। এর উদ্দেশ্য ছিল, সহজে এসব দেশে অনুপ্রবেশ করা ও তাতারীদের খবরাখবর আদান-প্রদান করা।

কার্যত মানকু খান সে সকল খ্রিস্টানদের কাছে পৌঁছতে সফল হয়। বাগদাদে খ্রিস্টানপ্রধান ছিল মাকিকা। তাতারীদের বাগদাদ প্রবেশের ক্ষেত্রে সে বিরাট ভূমিকা রাখে।

৫.

মানকু খান খ্রিস্টসাম্রাজ্য জুজিয়ার সঙ্গেও সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়। যদিও জুজিয়া সাম্রাজ্যের সঙ্গে তাতারীদের রয়েছে এক কালো ইতিহাস; তবে মুসলমানদের সঙ্গে জুজিয়া সাম্রাজ্যের ইতিহাসও কম কালো নয়। তাই জুজিয়ার খ্রিস্টানরা তাদের নতুন শত্রু তাতারীদের প্রবীণ শত্রু মুসলমানদের বিপক্ষে সহযোগিতা প্রদান করে। এর দুটি কারণ ছিল—

এক.

তৎকালে তাতারীরা ছিল বিশ্বের পরাশক্তি। তারা জয়লাভ করবে, এটাই ছিল স্বাভাবিক।

দুই.

খ্রিস্টান ও মুসলমানদের যুদ্ধ হলো আকীদাগত চিরন্তন যুদ্ধ। (যেমনটি আমরা আলোচনা করেছি) উভয়পক্ষেই ঘৃণাবোধ ছিল বদ্ধমূল। আর এই ঘৃণাবোধ তখনই দূর হওয়া সম্ভব, যখন আকীদাগত বিরোধ দূর হবে। আর তা কোনোদিনই সম্ভব নয়। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন—

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

> "তারা (কাফেরগণ) ক্রমাগত তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকবে, এমনকি পারলে তারা তোমাদের তোমাদের দ্বীন থেকে ফেরাতে চেষ্টা করবে।"[৪১]

পক্ষান্তরে তাতারীদের সঙ্গে খ্রিস্টানদের যুদ্ধ হলো স্বার্থের যুদ্ধ। স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটলে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। আর স্বার্থ নিষ্কলুষ থাকলে সৌম্য ভ্রাতৃত্ব টিকে থাকে। তৎকালে খ্রিস্টান জুজিয়া সাম্রাজ্যের সঙ্গে মূর্তিপূজারি তাতারীদের স্বার্থগত মিল থাকায় তারা এক পথের পথযাত্রী হয়েছিল। এটাকেই 'রাজনীতি' বলা হয়।

---

[৪১] সুরা বাকারা : ২১৭।

৬. এসব সংলাপ, সন্ধিচুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ছিল একদিকে আর অপর দিকে সেসব সংলাপ ও সন্ধিচুক্তি চলছিল, কেবল সেগুলোর গুরুত্বের কারণে নয়, বরং সেগুলো বড়ই অদ্ভুত ও কদর্যপূর্ণ হওয়ার কারণে সেগুলো এখন উল্লেখ করব!!

মুসলিম সাম্রাজ্যের ওপর আক্রমণ ও আঘাত হালকা ও লঘুকরণের উদ্দেশ্যে এসব সংলাপ কতিপয় মুসলিম নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সংঘটিত হয়েছিল।

সম্রাট মানকু খান নিজে এসব সংলাপ বাস্তবায়ন করেননি। কারণ তিনি এসব মুসলিম আমীরদের তুচ্ছতাচ্ছল্যের দৃষ্টিতে দেখতেন। কারণ, এদের প্রত্যেকের সাম্রাজ্য ছিল মাত্র কয়েক কিলোমিটারব্যাপী। এইটুকু সাম্রাজ্য নিয়েই তারা নিজেদের 'আমীর' নামকরণ করেছিল। এমনকি বহু বিখ্যাত উপাধিতে তারা ভূষিত হতো। যেমন : মু'জাম, আশরাফ, আযীম, সাঈদ ইত্যাদি।

সম্রাট মানকু খান এসব সংলাপ বাস্তবায়নের জন্য সহোদর হালাকু খানকে দায়িত্ব প্রদান করে। ফলে দুর্বল মুসলিম নেতৃবৃন্দ শক্তিশালী তাতারী বাহিনীর দিকে অগ্রসর হয়।

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ

"সুতরাং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তুমি তাদের দেখতে পাচ্ছ যে, তারা অতি দ্রুত তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। তারা বলছে, আমাদের আশঙ্কা হয়, আমরা কোনো মসিবতের পাকে পড়ে যাব। (কিন্তু) এটা দূরে নয় যে, আল্লাহ মুসলমানদের বিজয় দান করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে অন্য কিছু ঘটাবেন। ফলে তখন তারা নিজেদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিল, তজ্জন্য অনুতপ্ত হবে।"[৪২]

মসুলের নেতা এবং বদর উদ্দীন লুলু সেলজুকের দুই নেতা কেকাভাস ছানি ও কালাজ আরসালান রাবে হালাকু খানের কাছে সন্ধিচুক্তির জন্য আসে। সেলজুকের দুই নেতা উত্তর ইরাকের একটি স্পর্শকাতর স্থানে (বর্তমান তুরস্ক) অবস্থান করতেন। তাদের সন্ধিচুক্তির ফলে উত্তর থেকে ইরাক অবরুদ্ধ হয়।

---

[৪২] সুরা মায়েদা : ৫২।

কেকাভাস ছানির তাতারী নেতাদের তোষামোদ করার পদ্ধতি ছিল বড়ই লজ্জাজনক ও লাঞ্ছনাকর।

আলেপ্পো ও দামেস্কের আমীর নাছের ইউসুফ ও নাছের সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর মিত্র হওয়া সত্ত্বেও তাতারীদের আনুগত্য প্রদর্শন করেন। অথচ কেবল মিত্রই নয়, বরং নাম ও উপাধিতেও তিনি ছিলেন সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী। তবে রূহ ও প্রাণ, আখলাক ও চরিত্রের দিক থেকে সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর সঙ্গে তার কোনো মিল ছিল না। এমনকি তিনি এতটা নীচ ছিলেন যে, নিজ সন্তান আযীযকে কেবল হালাকু খানের অনুগত্য প্রদর্শনের জন্যই পাঠাননি, বরং হালাকু খানের একজন আমীর হিসেবে কাজ করার জন্য পাঠিয়েছিলেন।

অনুরূপ হিমসের আমীর আশরাফ আইয়ূবী তাতারী নেতার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য আসেন।

এ সমস্ত সন্ধিচুক্তি ও ঐক্যজোট ছিল খুবই ভয়াবহ। সন্ধিচুক্তির বিষয়াদি নিকৃষ্ট হেয়পূর্ণ হওয়া ছাড়াও এসব সন্ধির কারণে তাতারীদের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা ইরাককে চতুর্দিক থেকে অবরোধ করতে শুরু করেছিল এবং মুসলিম বিশ্বের অভ্যন্তরীণ সংবাদ সম্পর্কে অবগত হওয়ার পথ তাদের সামনে উন্মুক্ত হয়েছিল। এ ছাড়াও দল-উপদল গোত্র-উপগোত্রসমূহ এসব সন্ধির কারণে চরম অবক্ষয় ও অধঃপতনের শিকার হয়েছিল। কারণ, তারা আমীর-ওমারাদের লাঞ্ছনাকর পরিস্থিতি দেখে মনোবল হারাতে বসেছিল, সংকল্পচ্যুত হয়েছিল, নেতা নেতৃদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল। এ কারণে তাতারীদের মুখোমুখি দাঁড়াবার কোনো শক্তি তাদের ছিল না।

৭.

হালাকু খান রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় আব্বাসী সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রতাপশালী মন্ত্রী মুআইয়িদ উদ্দীন আলকামী শা'বীর কাছে পৌঁছেছিল।

মুআইয়িদ উদ্দীন ছিলেন একজন ফেতনাবাজ, নিকৃষ্ট রাফেজী। (সে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রা. এর খেলাফতকে প্রত্যাখ্যান করে) সে কট্টর শিয়া ছিল। সুন্নত ও আহলে সুন্নতকে খুব ঘৃণা করত। অতি আশ্চর্যের বিষয় হলো, আকীদাগত চরম অধঃপতন সত্ত্বেও সে এই গর্বিত আসনে (খেলাফতে) অধিষ্ঠিত হয়েছিল। সুন্নী সাম্রাজ্য আমলে সে খলীফা নাম ধারণ করেছিল।

নিঃসন্দেহে এটি খলিফা মুসতা'সিম বিল্লাহর অদূরদর্শিতা ও স্থূল চিন্তার ফল, যিনি এই ফেতনাবাজ ওযীরকে এই গুরুত্বপূর্ণ পদ প্রদান করেছেন। এই মন্ত্রীকে হাদীসের ভাষায় بطانة السوء [দুষ্ট বন্ধু] বলা হয়। আর বিবেকবানদের কাছে একথা অস্পষ্ট নয় যে, দেশ ও দেশবাসীর বিপর্যয়ে দুষ্টবন্ধুর চক্রান্ত কতটা নিকৃষ্ট হয়।

ইমাম বুখারী রহ. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَا اسْتُخْلِفَ خَلِيفَةٌ إِلَّا لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ

"প্রত্যেক খলিফার দুইজন বন্ধু থাকে। একবন্ধু তাকে সৎকাজের আদেশ দেয় এবং সৎকাজের প্রতি উৎসাহিত করে। আরেক বন্ধু তাকে অসৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজের প্রতি তাকে প্ররোচিত করে। সেই খলিফা নিরাপদে থাকে, আল্লাহ তা'আলা যাকে নিরাপদ রাখেন।"[৪৩]

আরও নিকৃষ্ট হলো, এক মাস দুই মাস নয়, এক বছর দুই বছর নয়, মুআইয়িদ উদ্দীন পূর্ণ ৬৪২ হিজরী থেকে ৬৫৬ হিজরী তথা বাগদাদ অধঃপতন পর্যন্ত ক্ষমতাসীন ছিল। এই চেদ্দো বছরেও যখন খলিফা তার চক্রান্ত বুঝতে পারেন নি, তখন খলিফার আকল-বিবেক অবশ্যই প্রশ্নবিদ্ধ?

হালাকু খান মুআইয়িদ উদ্দীনের ফেতনা-ফ্যাসাদ ও সুন্নতের প্রতি ঘৃণাবোধের ফায়েদা উঠাতে তার সঙ্গে মিলিত হন এবং তাতারী বাহিনী বাগদাদে অনুপ্রবেশের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন বিষয়ে তার সঙ্গে একমত হন। খেলাফত পতনের পর বাগদাদ নগরী পরিচালনার জন্য বিচারালয়ে তার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুআইয়িদ উদ্দীন তাকে অসাধু পরামর্শ এবং খলিফা মুসতা'সিম বিল্লাহর কাছে মুসলিম উম্মাহর জন্য ক্ষতিকর আবেদন নিয়ে যাওয়ার জন্য সহযোগিতা প্রদান করে। এ উদ্দেশ্য সাধনে মন্ত্রী কোনোরূপ অবহেলা করেনি। খেলাফত পতন ও তৎকালে বাগদাদের সংঘটিত সকল দুর্ঘটনার পেছনে এই অসাধু মন্ত্রী অনস্বীকার্য হাত ছিল।

---

[৪৩] *বুখারী : ৬৬১১।*

মানকু খান ও হালাকু খানের কূটনৈতিক প্রচেষ্টার আলোকে এ কথা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এই ভয়ংকর আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণে তারা সামান্যতম অবহেলা করেনি এবং এমন ভয়ংকর পদক্ষেপ পৃথিবীর ইতিহাসে আর একবারও ঘটেনি। তা হলো, আব্বাসী খেলাফতের পতন ঘটানো।

তাতারীদের কূটনৈতিক প্রচেষ্টার সারমর্ম হলো, তাতারীরা আর্মেনিয়া, জুজিয়া ও আন্তাকিয়ার পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতাপ্রাপ্ত হয়েছে। তারা সিরিয়ার বহুসংখ্যক ক্রুশেডনেতাকে নিরপেক্ষ করে রেখেছিল। সিরিয়া ও ইরাকের খ্রিস্টানদের সঙ্গে গোপন সমঝোতা স্থাপন করেছিল। অনুরূপ কতিপয় মুসলিম নেতৃবর্গ ও উযীর মুআইয়িদ উদ্দীন আলকামীর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছিল। অবলীলায় বলা যায় যে, এ সকল কূটনৈতিক প্রচেষ্টা তাতারীদের সফলতার নেপথ্যে বড় ভূমিকা রেখেছিল।

উল্লেখ্য, এহেন দুর্যোগপূর্ণ ভয়াবহ পরিস্থিতিতে দু-চারজন ব্যতীত সাধারণ মুসলমানরা দূর থেকে এ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিল। যেন এটি ছিল তাদের কাছে অতি সাধারণ ঘটনা। অথবা তারা কোনো অপ্রতিরোধ্য গুপ্ত ঘাতকের সন্ধান পেয়ে ঘাপটি মেরে বসেছিল, যার বিপক্ষে দাঁড়াবার ক্ষমতা তাদের নেই। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

তৃতীয় পদক্ষেপ : মুসলমানদের বিরুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ

ইসলামী খেলাফতের পতন ঘটাতে সড়ক প্রস্তুতি, প্রচারাভিযানের সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও তাতারীদের কূটনৈতিক প্রচেষ্টার বাস্তবায়ন ছাড়াও হালাকু খান একটি ভয়াবহ যুদ্ধের আশ্রয় নেয়। তা হলো, মুসলমানদের বিরুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ। এই মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ পরিচালনার জন্য হালাকু খানের সম্মুখে বহু পথ উন্মুক্ত ছিল। উদাহরণস্বরূপ—

এক.

ইরাকের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে কিছু সন্ত্রাসী প্রচারণা চালানো। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, চেঙ্গিজ খান ও উকিতাইয়ের যুগের তাতারী হামলার ভয়াবহতা স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং আতঙ্ক সৃষ্টি করা। কারণ, তাতারীদের প্রথম আক্রমণ—যা চেঙ্গিজখানের যুগে সংঘটিত হয়েছিল—ত্রিশ উর্ধ্ব বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। তাই হালাকু খানের যুগের (বর্তমান সময়ের) বহু মুসলমান তাতারীদের সেই ভয়াবহতা ও নিষ্ঠুরতা পর্যবেক্ষণ করেনি। তারা সেসব ঘটনা

তাদের বাপ-দাদাদের মুখে কল্পকাহিনির মতো শুনেছে মাত্র। শ্রবণকারী তো প্রত্যক্ষদর্শীর মতো নয়। আর জ্বালাও পোড়াও ও ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি উকিতাই এর যুগে সংঘটিত তাতারীদের দ্বিতীয় আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল না। কারণ, এ যুগে তাতারীরা কেবল রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপ অভিমুখে ব্যস্ত ছিল। ফলে এই দ্বিতীয় আক্রমণে মুসলমানরা ততটা প্রভাবিত হয়নি।

এ কারণেই হালাকু খান কতিপয় ধ্বংসাত্মক ও সন্ত্রাসবাদী সামরিক কার্যকলাপ পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যাতে মুসলমানরা জানতে পারে যে, আজও তাতারীরা দুর্বার, অপ্রতিরোধ্য, ক্ষমতাশালী ও দাপুটে।

উদাহরণস্বরূপ, ৬৫০ হিজরীতে তাতারী বাহিনী আলজেরিয়া ও উত্তর ইরাকে অবস্থিত সারুজ ও সাঞ্জার অঞ্চলে আক্রমণ করে। ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ, লুটতরাজ চালায় ও অঞ্চলবাসীকে গ্রেপ্তার করে। এক বাণিজ্যিক কাফেলার ছয় লক্ষ স্বর্ণমুদ্রারও বেশি অর্থ আত্মসাৎ করে। [বর্তমান যুগে সম্পদ বাজেয়াপ্তের নামে যে আত্মসাৎ চলে, তা এরই প্রতিচ্ছবি।]

নিঃসন্দেহে এটি আব্বাসী খেলাফতের জন্য ছিল বড় ক্ষতি এবং তাতারী বাহিনীর জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি। উপরন্তু এ সকল আক্রমণের ফলে তাতারীদের কাছে ইরাকের পথ-ঘাট তথা ভৌগলিক অবস্থান সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছিল। এসব কিছুর উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের অন্তরে ভীতি-সঞ্চার করা। সুতরাং বলা যায়, এসব কোনো সাধারণ যুদ্ধ ছিল না; বরং এসব ছিল অস্তিত্বের যুদ্ধ। ফলে মুসলমানদের চেয়ে তাতারীদের শক্তি বহুকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। সবাই একটি আশু মহাযুদ্ধের অপেক্ষা করছিল। ইতিহাসে এমন যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি ঘটতেই থাকে।

দুই.

অশুভ-মিডিয়া যুদ্ধ। তাতারীদের কতিপয় অনুসারী মুসলিম দেশসমূহে তাতারীদের অস্বাভাবিক শক্তি, সামর্থ্য ও অলৌকিক দক্ষতার কথা প্রচার করত। মুসলমান ও তাতারীদের শক্তির মাঝে পার্থক্য তুলে ধরত। সে যুগে তাদের এই প্রচারণা কৌশল মিডিয়ার কাজ দেয়। মূলত তৎকালে প্রচারণার মাধ্যম ছিল কবি, সাহিত্যিক ও ইতিহাসবিদগণ। তৎকালীন কবি, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকদের লিখনী ও রচনায় তাতারী আক্রমণে মুসলিমনিধনের ঘটনা বিবৃত হয়। যেমন—

• তাতারীদের কাছে গোটা বিশ্বের খবরাখবর পৌঁছত। কিন্তু তাদের সব খবর বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছত না। [লেখক বোঝাতে চেয়েছেন যে, তাতারী গুপ্তচর খুবই শক্তিশালী ছিল।]

• তাতারীরা নিজেদের অভিপ্রায় গোপন রাখত। কোথাও আক্রমণ করতে হলে একযোগে আক্রমণ করত। ফলে শহরবাসীর অজ্ঞাতসারে তারা শহরে প্রবেশ করত।

• তাতারী মহিলারা পুরুষের মতো লড়াই করত। [ফলে মুসলিম পুরুষরা তাতারী মহিলাদের পর্যন্ত ভয় করত।]

• তাতারীদের ঘোড়াগুলো খুর দ্বারা মাটি খুঁড়ে গাছের শেকড় ভক্ষণ করত। সেগুলো বার্লি করার দরকার হতো না।

• তাতারীদের আসবাপত্র, খাদ্যদ্রব্য ও খবরাদি সরবরাহ করার প্রয়োজন পড়ত না। কারণ তারা মেষ, ঘোড়া, গবাদি পশু সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণ করত।

• তাতারীরা সকল প্রকার গোশত ভক্ষণ করত ... তারা মানুষ ভক্ষণ করত।

নিঃসন্দেহে এ জাতীয় লেখালেখি সাধারণ মানুষের মাঝে ভীতি বিস্তার করত। এমনকি কখনো কখনো তা বিশেষ ব্যক্তিবর্গের মাঝেও প্রভাব সৃষ্টি করত। এটি জাতির নিজ হাতে অর্জিত বিপদ। এমন বিপদ কেউ কোনোদিন ডেকে আনেনি।

তিন.

বিশ্বের রাজা-বাদশা ও মুসলিম আমীর-উমারাদের নিকট সতর্কবাণী সম্বলিত চিঠি-পত্র প্রেরণ। সে সকল আমীর ওমারাদের নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হলো, তারা সে সকল চিঠি-পত্র সাধারণ মানুষের মাঝে প্রকাশ করত। ফলে জনসাধারণের মাঝে 'তাতারীত্রাস' ছড়িয়ে পড়ত। আর তাতারীরা এভাবে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিল যে, তারা মুনাফিক মুসলিম সাহিত্যিকদের মাধ্যমে এসব চিঠি-পত্র লিখাত। তারা সে যুগের উপযুক্ত ভাষাশৈলীর মাধ্যমে চিঠিগুলো লিখত, যা সহজেই মুসলমানদের বোধগম্য হতো। নিঃসন্দেহে এ পদ্ধতিটি অধিক ক্রিয়াশীল ছিল ভাষান্তর পদ্ধতি অবলম্বনের চেয়ে। যেমন তাতারীরা তাদের চিঠিতে একথা বুঝাবার চেষ্টা করেছে যে, তারা মুসলমান, কাফের নয়। তারা কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। তাদের পূর্বপুরুষগণ মুসলমান এবং তারা মুসলিমবিশ্বের অত্যাচারী জালেম শাসকদের ধ্বংসের জন্য আগমন

করেছে [তারা কেবল ইরাক স্বাধীনতার জন্যই এসেছে!]। তাতারীদের অত্যাচার ও অবিচারের কথা সুপ্রসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এসব কথাবার্তা দুর্বল রোগাক্রান্ত ভীত হৃদয়ের অধিকারীদের মাঝে প্রভাব সৃষ্টি করত। ফলে তারা মুসলিমবিশ্বের ওপর তাতারী আক্রমণকে সহজে মেনে নিত এবং তাদের স্বাধীনতাকামী বিজয়ীদের সংবর্ধনা প্রদান করত।

তাতারীদের এসব চিঠিপত্র সুস্পষ্ট বাস্তবতা বিরোধী ছিল। কিন্তু যে ব্যক্তি আত্মিক অধঃপতনে নিমজ্জিত, তার হাতে এসব চিঠি পড়লে সে যারপরনাই প্রভাবিত হতো।

সেসব চিঠি-পত্রের মধ্য হতে হালাকু খান কর্তৃক জনৈক মুসলিম নেতার নিকট প্রেরিত একটি চিঠি নিম্নে উল্লেখ করছি। হালাকু খান লিখেছে—

"আমরা আল্লাহর সৈন্য।

যে জুলুম ও অত্যাচার করে, সীমালঙ্ঘন ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে এবং আল্লাহর নির্দেশমতো ক্ষমতা পরিচালনা করে না, তার সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করি।

আমরা বহু দেশ ও জনপদ ধ্বংস করেছি। বহু মানুষ হত্যা করেছি। অসংখ্য নারী-শিশু গ্রেপ্তার করেছি।

সুতরাং হে জীবিতরা, তোমরাও পূর্ববর্তীদের পথেই ধাবিত হতে যাচ্ছ। হে উদাসীনরা, তোমাদেরও সে পথে ধাবিত করা হবে।

আমাদের মূল লক্ষ্য শাস্তি প্রদান। রাজত্ব আমাদের উদ্দেশ্য নয়। অত্যাচার অবিচার আমাদের গন্তব্য নয়।

তাতারী সাম্রাজ্যে আমাদের ন্যায়-শাসন সুপ্রসিদ্ধ। আমাদের তলোয়ার থেকে বেঁচে কোথায় পালাবে?

আমরা বহু দেশ বিধ্বস্ত করেছি। সন্তানদের ছিনিয়ে নিয়েছি। ধ্বংস করেছি জনপদবাসী। তাদের আস্বাদন করিয়েছি নির্মম আজাব। তাদের বড়দের ছোট করেছি। রাজাকে প্রজা বানিয়েছি।

তোমরা ভাবছ, আমাদের হাত থেকে রক্ষা পাবে। শীঘ্রই জানবে যে, কোন পথে তোমরা অগ্রসর হচ্ছ।

অনুগত ব্যক্তিই মুক্তি পাবে।"

একথা নিশ্চিত যে, এ জাতীয় চিঠি কোনো ভীত লোক পাঠ করলে সে যুদ্ধের শক্তি হারিয়ে ফেলবে। আর এটাই ছিল এ জাতীয় চিঠি প্রেরণের মূল লক্ষ্য।

চার.

মুসলমানদের বিরুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ সৃষ্টির আরেকটি উপায় ছিল, তাতার, জুর্জিয়া, আর্মেনিয়া ও অন্যান্য দেশসমূহের মধ্যবর্তী সংঘটিত গোপন চুক্তিপত্রগুলো প্রকাশ করা এবং ইউরোপের ক্রুশেড নেতৃবর্গ কর্তৃক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস ব্যক্ত করা। এসব চুক্তিনামা প্রকাশ পাওয়ার পর মুসলমানরা একথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছিল যে, তাতারীরা বিশ্ববাসীকে ধ্বংস করে ফেলবে। তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি কারও নেই। অথচ মুসলমানদের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস একথার সাক্ষ্য প্রদান করে যে, তাতারীদের বিরুদ্ধে মুসলমানরা জয়লাভ করেছিল। আফসোস! মুসলমানরা নিজেদের ইতিহাস ভুলে গিয়েছিল। শত্রুপক্ষ ও তাদের দোসরদের ভয়ে তারা ভীতিবিহ্বল হয়েছিল।

পাঁচ.

মুসলমানদের বিরুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ সৃষ্টির আরেকটি পথ ছিল, কতিপয় মুসলিম নেতৃবর্গের পক্ষ থেকে সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস, যা আমরা তাতারীদের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছি। একথা সুস্পষ্ট যে, যখন কোনো মুসলিম জনপদ তাদের নেতাকে তাতারীদের পক্ষাবলম্বন করতে দেখবে, দেখবে সে তার রাজ্য রক্ষার স্বার্থে নিরাপদ পথ অবলম্বন করছে, সে তাতারীদের সঙ্গে চুক্তি আবদ্ধ হচ্ছে, তাদের সহযোগিতা প্রদান করছে, স্বাভাবিকভাবেই তখন তারা মনোবল হারিয়ে ফেলবে, দেশ রক্ষার সাহসিকতা ও উদ্যম হারিয়ে ফেলবে।

এ সকল উপায় ও আরও কতিপয় পদ্ধতি অবলম্বন করে তাতারীরা মুসলমানদের অন্তরে 'তাতারীত্রাস' সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। এভাবেই অপরাজেয় তাতারীশক্তি মুসলিম ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল।

চতুর্থ পদক্ষেপ আব্বাসী সৈন্যবাহিনীকে দুর্বলকরণ

হালাকু খান ওযীর মুআইয়িদ উদ্দীন আলকামীর কাছে এই প্রস্তাব পেশ করে যে, আব্বাসী খলীফা মুসতা'সিম বিল্লাহ যেন সামরিক বাহিনীর বাজেট কিছুটা কমিয়ে দেন ও সৈন্যসংখ্যাও কমিয়ে দেন এবং রাষ্ট্রের মানসিকতা যেন যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে ফিরিয়ে নেন; এমনকি তিনি যেন সামরিক শক্তিকে পরিবেশ পরিকল্পনা ও শহরের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড যেমন চাষাবাদ, শিল্প-কারখানা

ইত্যাদিতে ব্যয় করেন। যেমন : বর্তমানে আমরা কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্রে সেনাবাহিনীকে শাক-সব্জি বপন, পুল-ব্রিজ নির্মাণ ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত দেখতে পাই। যুদ্ধ-জিহাদ, লড়াই ইত্যাদি দেশ রক্ষামূলক কাজে তারা ততটা গুরুত্ব প্রদান করে না।

উযীর মুআইয়িদ উদ্দীন আলকামী হালাকু খানের এই প্রস্তাব যথাযথ বাস্তবায়ন করে। তার পক্ষ থেকে এ জাতীয় কাজ সংঘটিত হওয়া ছিল খুব স্বাভাবিক। তবে খলিফা মুসতা'সিম বিল্লাহর পক্ষে এই প্রস্তাব গ্রহণ ছিল বড়ই আশ্চর্যের! যেন তিনি একজন শান্তিকামী মানব; যিনি যুদ্ধ-বিগ্রহ পছন্দ করেন না। কার্যত খলিফা মুসতা'সিম বিল্লাহ্ সামরিক বাজেট কমিয়ে দেন। সৈন্যসংখ্যাও কমিয়ে দেন। এমনকি যেখানে খলিফা মুসতা'সিমের পিতা মুসতানসির বিল্লাহর শেষ যুগে ৬৪০ হিজরীতে সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় এক লাখ, সেখানে ৬৪৫ হিজরীতে সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র দশ হাজার। এর দ্বারাই তৎকালে সামরিক শক্তির অবস্থান ফুটে ওঠে। শুধু এতটুকুই নয়; বরং সৈন্যবাহিনী চরম সংকটাপন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। তারা বাজারে বাজারে মানুষের দ্বারস্থ হয়। মোটকথা, সামরিক অবকাঠামো ভেঙে পড়ে। সেনাপতিরা নিজেদের অবস্থান ভুলে যায়। তাদের মধ্য হতে এমন কোনো ব্যক্তির আলোচনা হয় না, যে সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারে। মুসলমানরা সমর-বিজ্ঞান ভুলে যায়। তাদের মস্তিষ্ক থেকে জিহাদের অর্থ দূর হয়ে যায়।

আল্লাহর শপথ! এটি ছিল বিরাট খেয়ানত! বড় অন্যায়!!

উযীর মুআইয়িদ উদ্দীন আলকামী খলিফা মুসত'াসিম বিল্লাহকে আলোচ্য বিষয়ে উপদেশ প্রদানের কারণে ইবনে কাছীর রহ. তার ঘোর নিন্দা জ্ঞাপন করেন। কিন্তু আমি খোদ খলিফার নিন্দা জ্ঞাপন করি, যিনি এই অপমান-অপদস্থতাকে মেনে নিয়েছেন। নিজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ জনসাধারণের নিরাপত্তা প্রদান করা, নিজের দেশ ও মাটি থেকে শত্রুকে তাড়িয়ে দেওয়া, সৈন্যবাহিনী সুসংগঠিত করা এবং গোটা জাতিকে, কেবল সৈন্যবাহিনীকেই নয়, জিহাদ ও মউত ফি সাবিলিল্লাহর চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলেন।

খলিফা মুসত'াসিম বিল্লাহ সাহেব এসবের কিছুই করেননি। তাকে অপারগ ভাবার কোনো সুযোগ পাই না। তিনি কেবল সেই কাজ করার ক্ষমতা রাখতেন, যা করলে তার রাজত্ব সিংহাসন টিকে থাকবে। কিন্তু হায়! দুর্বল হৃদয়ের অধিকারী ক্ষমতা নিষ্কলুষ ধরে রাখতে পারে না।

এ পর্যায়ে আসন্ন মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের পাঁচ বছর পর ৬৪৫ হিজরীর অবস্থা নিয়ে আলোকপাত করা জরুরি মনে করছি—

এক.

চীন থেকে ইরাক পর্যন্ত সুদীর্ঘ মহাসড়ক অসংখ্য বাহিনী দ্বারা বেষ্টিত ছিল। ভারী যন্ত্রপাতি বহনের জন্য ঠেলাগাড়ি বানানো হয়েছিল। সমতল ভূমি ও রাস্তাঘাট তাতারী ঘোড়ার জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছিল, যাতে ঘোড়ার খাদ্য বহন করতে না হয় [এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।]

দুই.

তাতারীরা চীন ও ইরাকের মধ্যবর্তী গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলসমূহে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এর মাধ্যমে সফরকালে তাতারী বাহিনীর নিরাপত্তা বাস্তবায়িত হয়েছিল।

তিন.

প্রয়োজনীয় কতিপয় বিষয়ে হালাকু খানের পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জিত হয়েছিল। যথা—

১. ইরাক ভূখণ্ড।

২. বাগদাদের দুর্গ।

৩. আব্বাসী সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ও তাদের সামরিক শক্তির কৌশল।

৪. এর মাধ্যমে তিনি মুসলিমবিশ্বের অর্থনৈতিক উৎস ও আব্বাসী সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের মূল কারণ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন। পাশাপাশি তিনি মানুষের আগ্রহ-অনাগ্রহ সম্পর্কিত আত্মিক অবস্থারও জ্ঞানলাভ করেন।

এ সকল জ্ঞান তিনি বিভিন্ন মাধ্যমে অর্জন করেন। যথা : প্রচুর গুপ্তচর, মুসলিম সাম্রাজ্যের সঙ্গে ওঠাবসা ও তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে [এ বিষয়ে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।]

চার.

তাতারীরা আর্মেনিয়া, জুজিয়া ও আন্তাকিয়ার খ্রিস্টানদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়। তারা তাদের কাছে সামরিক সহযোগিতা ও আসন্ন যুদ্ধে গুপ্ত সংবাদ আদান-প্রদান বিষয়ক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে।

পাঁচ.

পশ্চিম ইউরোপের রাজা-বাদশাদের নিরপেক্ষ রাখার পদক্ষেপও সফল হয়েছিল। প্রথমত এটি রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা ছিল না। এটি ছিল বল প্রয়োগমূলক সিদ্ধান্ত।

ছয়.

ইরাকের পশ্চিম-উত্তরের মুসলিম দেশগুলোর (তুরস্ক ও সিরিয়ার) রাজা-বাদশাদের সঙ্গে এ বিষয়ে তারা ঐকমত্য হয়েছিল যে, তারা হালাকু খানকে শর্তহীন সহযোগিতা প্রদান করবে। হায়! আফসোস! সে সকল রাজা বাদশাদের অধিকাংশ কুর্দী, যারা সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর বংশধর ছিল।

সাত.

হালাকু খান ইরাক ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের মুসলমানদের মনোবলে পতন ঘটিয়েছিল। চির ধরিয়েছিল। এক্ষেত্রে শাসক-শাসিত উভয়ে বরাবর ছিল।

আট.

হালাকু খান উযীর মুআইয়িদ উদ্দীনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক সৃষ্টি করেছিল এবং তাকে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তির পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করেছিল।

নয়.

হালাকু খান আব্বাসী সৈন্যবাহিনীর দুর্বলতা ও যুদ্ধনীতির অপ্রতুলতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিল। সে একথা বুঝতে পেরেছিল যে, বাগদাদ তো দূরের কথা, তারা নিজেদেরই রক্ষা করতে পারবে না।

দশ.

হালাকু খান খলিফাতুল মুসলিমীন মুসতা'সিম বিল্লাহর থেকে সবকিছু লাভ করেছিল। জানতে পেরেছিল তার মান-অবস্থান, শক্তি-সামর্থ্য এবং তার দুর্বল দিকগুলোও নির্ণয় করতে পেরেছিল।

এভাবেই ৬৫৪ হিজরীর সমাপ্তি ঘটে।

পাঁচ বছর পর হালাকু খান দেখল যে, আব্বাসী খেলাফতের ওপর আক্রমণ করার এবং বাগদাদ পতনের এটাই উপযুক্ত মুহূর্ত। তাই সে লক্ষ্যে তাতারী

বাহিনীদের একত্রিত করতে শুরু করে। যাতে তাতারী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর থেকে সার্বিক বিবেচনা এটাই হয় তাতারী বাহিনীর বড় সমাবেশ। অবস্থা এমন দাঁড়িয়ে ছিল যে, যাদের বাগদাদ অবরোধের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, তাদের সংখ্যা ছিল দুই লাখের বেশি। এছাড়াও উত্তর ইরাকে সড়ক ও মালামাল নিরাপত্তায় বহুসংখ্যক সৈন্য নিয়োজিত ছিল। আর সহযোগী দল উপদলগুলোর সংখ্যা তো আছেই।

নিম্নে তাতারী বাহিনীর বিন্যাস উল্লেখ করা হলো—

এক.

মূল তাতারী বাহিনী ও দীর্ঘদিন ধরে পারস্য ও আযারবাইজানের নিয়োজিত বাহিনী ইরাকের পূর্বে নিয়োজিত ছিল।

দুই.

হালাকু খান ভলগা নদীর তীরে অবস্থিত তাতারী বাহিনীর মধ্য হতে একটি ক্ষুদ্র দল তলব করে। যারা প্রসিদ্ধ তাতারী নেতা (ইউরোপ বিজেতা) পাতোর অধীনস্থ ছিল। তবে পাতো নিজে না এসে তার তিন ভাতিজাকে পাঠায়। পাতো ও তার বংশধররা ভলগা নদীর তীরে একটি স্বতন্ত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে এবং নিজেদের 'স্বর্ণগোত্র' উপাধিতে ভূষিত করে। তবে তারা মূলত তাতারী সম্রাট চেঙ্গিজ খানেরই অনুসরণ করত।

তিন.

হালাকু খান ইউরোপ বিজয়কার্যে আলাতোলিয়া (উত্তর তুরস্কে) নিয়োজিত একটি দলকে ডেকে পাঠায়। মঙ্গোল নেতা পোয়গেয়টের নেতৃত্বে একদল তাতারী তার ডাকে সাড়া দেয়। পথিমধ্যে তারা আলাতোলিয়া, উত্তর ইরাক ও বাগদাদ অতিক্রম করে। কিন্তু এই দীর্ঘ পথে কোনোরূপ বাধাপ্রাপ্ত হয় না। কারণ, এসব অঞ্চলের শাসকবর্গ তাতারীশক্তির সম্মুখে নতজানু হয়েছিল। ফলে আলাতোলিয়া, মসুল, আলেপ্পো ও হিমস তাদের জন্য উন্মুক্ত প্রান্তরে পরিণত হয়।

চার.

হালাকু খান স্বীয় বন্ধু আর্মেনিয়ার রাজার কাছে সহযোগিতা কামনা করে চিঠি প্রেরণ করে। এতে স্বয়ং আর্মেনিয়ার রাজা হাইতুম একদল যোদ্ধাসহ আগমন করে।

পাঁচ.

হালাকু খান জুজিয়ার রাজার কাছে ইরাক অবরোধের জন্য চিঠি প্রেরণ করে। সে তৎক্ষণাৎ হালাকু খানের ডাকে সাড়া দেয়।

ছয়.

হালাকু খান এক হাজার প্রসিদ্ধ দক্ষ চীনা তীরন্দাজ চেয়ে পাঠায়, যারা অগ্নিতীর নিক্ষেপে বিশ্ববিখ্যাত ছিল।

সাত.

হালাকু খান তার শ্রেষ্ঠ সেনাপতিকে সৈন্যবাহিনীর প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়। তার নাম ছিল কাতবুগা নওয়েন। সে ছিল খ্রিস্টান। ফলে সে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বৃহৎ সংখ্যক খ্রিস্টান বাহিনীর সঙ্গে সহজে মিশতে সক্ষম হয়। মোটকথা, পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ তিন সেনাপতির নেতৃত্বে (১. হালাকু ২. কাতবুগা ৩. পোয়গেয়ট) তাতারী বাহিনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

আট.

হালাকু খান আন্তাকিয়ার আমীর বুহমন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করে। কিন্তু যুদ্ধের পূর্ণ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সে ইরাক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করে। তবে ইরাক পতনশেষে সিরিয়া পতনে অংশগ্রহণ করবে বলে আশা ব্যক্ত করে।

নয়.

দামেস্কের আমীর নাছের ইউসুফের ছেলে আযীযকে হালাকু খানের দলে শরিক হওয়ার জন্য প্রেরণ করে।

দশ.

মসুলের আমীর বদর উদ্দীন লুলু একটি বাহিনী পাঠায়।

শেষোক্ত দল দুটি যদিও খুব দুর্বল শীর্ণকায় ছিল, তবে তারা অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিত। এ যুদ্ধে তাতারী বাহিনীর মাঝে বহু মুসলমানও শরিক ছিল। যারা তাতারীদের পক্ষে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। এমনকি ইরাক পতনযুদ্ধে বহু ইরাকবাসী তাতারীদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। ইরাকবাসী সামান্য ক্ষমতা কিংবা ভুয়া রাজত্ব বা সামান্য কিছু অর্থে অথবা জীবনের মায়ার বিনিময়ে তাতারীদের কাছে সবকিছু বিক্রি করেছিল!!

বন্ধুরা!

যে ব্যক্তি কেবল একত্ববাদী হওয়ার ওপর ভরসা করে আর কোনো প্রস্তুতি গ্রহণ করে না, পথ-পন্থা অবলম্বন করে না, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে সহযোগিতা লাভ করতে পারে না।

মনে রাখবেন, তাতারীরা আল্লাহর নিকট সম্মানী, এজন্য তারা বিজয়ী হয়নি; তারা তো ভূপৃষ্ঠের সবচেয়ে জঘন্য জাতি, সবচেয়ে নিকৃষ্ট। তবে তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল, উপায়-উপকরণ অবলম্বন করেছিল। এ কারণেই তারা ফলাফল ভোগ করেছে, জয়লাভ করেছে।

এটাই চিরন্তন নীতি! আমরা ইহুদী, খ্রিস্টান ও বিধর্মীদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে দেখি। তারা যত্রতত্র মুসলমানদের অপমান অপদস্থ করে। এর কারণ হলো, তারা বৈষয়িক আসবাব অবলম্বন করে। আর মুসলমানরা তা বর্জন করে।

এর অর্থ এই নয় যে, মুসলমানরা বস্তুবাদী হয়ে যাবে, আর সবকিছুর নিয়ন্তা আল্লাহকে বর্জন করবে; বরং এর অর্থ হলো, আল্লাহর কাছে তাওফিক ও সহযোগিতা কামনা করার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এরপর সহযোগিতা লাভ হলে, জয়লাভ হলে আমরা একথা বিশ্বাস করব যে, বিজয় আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে। এতে আমরা অহংকার করব না, ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করব না, আল্লাহর গণ্ডি থেকে বের হয়ে আসব না।

والتاريخ- يا اخواني- يتكرر

'বন্ধুরা, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে।'

মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাতারীরা যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল, পরবর্তীতে অন্যরা তা করবে। আর মুসলমানরা যে অবহেলা ও গাফলতি প্রদর্শন করেছে, পরবর্তী মুসলমানরাও তা-ই করবে।

তাতারীদের যুগে যে ফলাফল দাঁড়িয়েছিল, বর্তমান মুসলমানরা যদি সেই ইতিহাস থেকে শিক্ষা লাভ না করে, তবে সেই ফলাফলের পুনরাবৃত্তি হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী?!

বাগদাদ পতন

হালাকু খান তার বিশিষ্ট উপদেষ্টাবৃন্দের সঙ্গে যুদ্ধ বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। তাতারীদের ইতিহাসে সেই সভাটিকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সভা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এতে বাগদাদ আক্রমণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। হালাকু খান আকস্মিক কোন ভয়ে আতঙ্কিত ছিল। বিশেষত মুসলিম আমীর-উমারা যারা তার বাহিনীতে এসে যোগ দিয়েছিল। তাই সে মুসলিম দলগুলোর ওপর কঠোর নজরদারি রাখে। কিন্তু এই আশঙ্কা তাকে সম্মুখপানে অগ্রসর হতে বাধা দেয়নি। যেন তার এই আশঙ্কা বাস্তবসম্মত ছিল না। কারণ, মুসলিম আমীর-উমারাগণ—যারা তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে—হালাকু খানের সঙ্গে প্রতারণা করার কোনো ইচ্ছা তাদের ছিল না। তাদের দৃঢ়সংকল্প ছিল বাগদাদ নগরীর সঙ্গে প্রতারণা করার!!

এই মতবিনিময় সভাটি (বর্তমান ইরানের) হামদান নগরীতে সংঘটিত হয়েছিল। শহরটি বাগদাদ থেকে ৪৫৪ কিলোমিটার পূর্ব-উত্তরে অবস্থিত। হালাকু খান এই সভায় তার সৈন্যবাহিনীকে তিন দলে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

প্রথম দল

এটিই প্রধান দল। এর নেতৃত্বে ছিল স্বয়ং হালাকু খান। স্বর্ণগোত্রের প্রধান পাতো ও আর্মেনিয়া এবং জুজিয়া থেকে সেসব সৈন্য এসেছিল, তারা এই দলের সঙ্গে মিলিত হয়। কিরমান শহর সংলগ্ন বাগদাদের গা ঘেঁষে পারস্যের পশ্চিমে যেসব পাহাড় অবস্থিত, প্রধান দলটি সেই সব পাহাড় জ্বালিয়ে দেবে। এই দলের প্রধান কাজ হলো পশ্চিম দিক থেকে বাগদাদ নগরী অবরোধ করা।

দ্বিতীয় দল

এটি প্রথম দলের সহযোগী দল ছিল। হালাকু খানের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি কাতবুগা এ দলের নেতৃত্ব প্রদান করেছিল। এদলটি স্বতন্ত্রভাবে বাগদাদ অভিমুখী ছিল। তবে এরা প্রথম দলের দক্ষিণ দিক থেকে অগ্রসর হচ্ছিল। একপর্যায়ে উভয় দল

একত্রিত হয়েছিল। তাতারীরা এত বিপুলসংখ্যক ছিল যে, মুসলিম যোদ্ধারাও তাতারী বাহিনীর সঠিক সংখ্যার জ্ঞান প্রদানে সক্ষম হয়নি। এমনকি রাস্তা ঘাটেও তাদের সংকুলান হচ্ছিল না। এই দ্বিতীয় দলের বিশেষ দায়িত্ব ছিল ইরাকের সমতল ভূমি পাড়ি দিয়ে দক্ষিণ দিক থেকে অগ্রসর হওয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে বাগদাদ অবরোধ করা। হামদান ও বাগদাদ নগরীর মাঝে ৪৫০ কিলোমিটারের দূরত্ব থাকলেও হালাকু খান যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছিল, যদি সেখানে কোনো গোয়েন্দা থেকে থাকে! যাতে তাতারী বাহিনী আব্বাসী গোয়েন্দাদের চোখ থেকে গোপন থাকে।

তৃতীয় দল

তৃতীয় দলটি (বর্তমান তুরস্কের উত্তরে অবস্থিত) আলাতোলিয়ার সীমান্ত এলাকায় নিয়োজিত ছিল। ইতিপূর্বে যেই দলটি ইউরোপ জয়ের দায়িত্ব পালন করেছিল। তাতারী নেতা পাতো ছিল এই দলের প্রধান। এ দলের দায়িত্ব ছিল উত্তরাঞ্চল থেকে দক্ষিণমুখী হয়ে বাগদাদের উত্তর থেকে বাগদাদ পৌঁছা। অতঃপর পশ্চিম দিক থেকে বাগদাদ অবরোধ করা। এভাবেই বাগদাদ চারদিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে; পূর্বে হালাকু খান, পূর্ব দক্ষিণে কাতবুগা ও পশ্চিমে পাতোর মাধ্যমে।

তৃতীয় দলের সম্মুখে বড় দুটি বাধা

কিন্তু তৃতীয় দলটির সম্মুখে বড় দুটি বাধা ছিল।

প্রথম বাধা

তাদের জন্য সময় নিয়ন্ত্রণ ছিল অত্যন্ত জরুরি অর্থাৎ হালাকু বাহিনী যে সময় বাগদাদ পৌঁছবে ঠিক সে সময়েই তাদেরও বাগদাদে পৌঁছতে হবে। অন্যথায় তারা যদি দ্রুত বাগদাদ পৌঁছে, তবে আব্বাসীদের হাতে ধরা পড়ে যাবে। আর যদি পৌঁছতে বিলম্ব করে, তবে হালাকু বাহিনী একাকী ধরা পড়ে যাবে! মুহূর্তের মাঝে দ্রুত সংবাদ পৌঁছাবার কোনো মাধ্যম তখন ছিল না। ঘোড়া বা বাহন ব্যতীত দ্রুত পৌঁছাবার কোনো উপায় ছিল না; তখন বর্তমান সময়ের মতো মসৃণ পথও ছিল না। যদি আমরা এসব বিষয় পর্যালোচনা করে দেখি, তবে জানতে পারব, একই মুহূর্তে উভয় দলের বাগদাদ পৌঁছা ছিল অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। বিষয়টি অতি দুরূহ হওয়া সত্ত্বেও পাতো তার হিসাববিদ্যার সূক্ষ্মতা ও সময়জ্ঞানের নিপুণতার দরুন উপযুক্ত সময়ে বাগদাদ পৌঁছে!

দ্বিতীয় বাধা

এটি প্রথম বাধার চেয়ে জটিল ও কঠিন ছিল। দ্বিতীয় বাধাটি হলো, তৃতীয় দলটিকে বাগদাদ পৌঁছতে হলে প্রথমত তুরস্কের পাঁচশো কিলোমিটার, অতঃপর ইরাকের পাঁচশো কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হবে। এই সুদীর্ঘ এক হাজার কিলোমিটার পথ হলো মুসলিম অধ্যুষিত!! অর্থাৎ বাগদাদ পৌঁছতে হলে মুসলিমবিশ্বের এক হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হবে। ভুলবেন না, আমরা এমন যুগের আলোচনা করছি, যখন কোনো যাত্রীবাহী জাহাজ ছিল না এবং আকাশপথে নিরাপদ ভ্রমণের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এই দলটি সর্বনিম্ন যে বিপদের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে, তা হলো, তাদের গোপন দুরভিসন্ধি প্রকাশ পেয়ে যাবে। ফলে তারা আকস্মিক আক্রমণের সুযোগ হারিয়ে ফেলবে এবং আব্বাসী বাহিনী তাদের পৌঁছার পূর্বে মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। আর বৃহত্তর যে বিপদ তাদের সামনে অপেক্ষা করছিল তা হলো, সুবিশাল মুসলিম জনপদসমূহ তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। কারণ, পথিমধ্যে অবস্থিত সকল জনগোষ্ঠী হলো মুসলিম সম্প্রদায়। অথবা আক্রমণের জন্য গোপন ফাঁদ আঁটবে। ভেবে দেখুন, তারা এমন ভূমিতে প্রবেশ করছে, ইতিপূর্বে যেখানে তারা একবারের জন্যও আসেনি। কিন্তু সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর কী মহিমা! এর কোনোটিই ঘটেনি। পোয়গেয়ট তার দলবলসহ প্রায় ৯৫ ভাগ রাস্তা (তথা প্রায় ৯৫০ কিলোমিটার পথ) অতিক্রম করে চলে এসেছে। কিন্তু আব্বাসী সাম্রাজ্য টেরও পায়নি। পোয়গেয়ট বাগদাদের উত্তর-পশ্চিমে মাত্র ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে। যখন হালাকু ও পোয়গেয়ট উভয় দল বাগদাদ পৌঁছতে মাত্র একদিনের পথ বাকি, তখন আব্বাসীরা বিষয়টি অনুধাবন করে!!

আমরা যদি বলি যে, হালাকু খানের দল পাহাড়-পর্বতের আড়ালে আত্মগোপন করে তাতারী অধ্যুষিত অঞ্চল অতিক্রম করেছে, তাহলে পোয়গেয়টের আকস্মিক বাগদাদ আগমনের কী ব্যাখ্যা দেব?!

পোয়গেয়টের দল নিরাপদে মুসলিম ভূখণ্ড পাড়ি দেওয়া দুটি মহা বিপদের বার্তা বহন করে—

প্রথম বিপদ : মুসলিমবিশ্ব সম্পূর্ণরূপে গোয়েন্দামুক্ত হয়ে পড়েছে। একথা সুস্পষ্ট যে, রণশাস্ত্র ও সমরবিদ্যা সম্পর্কে আব্বাসী বাহিনীর ন্যূনতম জ্ঞান ছিল না।

দ্বিতীয় বিপদ : আলাতোলিয়া ও মসুলের নেতৃবর্গের পক্ষ থেকে বড় ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা হয়েছে। আর তাদের এই বিশ্বাসঘাতকতা তাতারী বাহিনীর দ্বার খুলে দিয়েছে। ফলে কোনো প্রতিরোধ দানা বাধেনি। তাতারীরা ধীরশান্ত মনে বাগদাদে অনুপ্রবেশ করে। যেন তারা বনভোজনের যাত্রা করছে। বাগদাদ খেলাফতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকায় পথিমধ্যে তারা কোনো হত্যাকাণ্ড ঘটায়নি। আর তাদের অনিষ্ট থেকে সাময়িকভাবে বাঁচতে পেরেই সবাই সন্তুষ্ট থাকে। পরবর্তী বিপদের আশঙ্কায় কেউ তাদের বিরুদ্ধে সাহসী ভূমিকা রাখে না।

এটি ছিল আলাতোলিয়ার আমীর কেকেভাস ছানী ও কালাজ আরাসলান রাবে' এর পক্ষ থেকে চরম বিশ্বাসঘাতকতা এবং মসুলের আমীর বদর উদ্দীনের পক্ষ থেকে জঘন্য প্রতারণা।

বদর উদ্দীন লুলু কেবল তাতারীদের সম্মান প্রদর্শনই করেনি, কেবল দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে তাদের সেবাযত্নই করেনি, বরং আব্বাসী শাসন থেকে ইরাকমুক্ত করার জন্য তাতারীদের সঙ্গে একদল সেনাও পাঠিয়েছে!!

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা অতি গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি। তা হলো, যখন বদর উদ্দীন লুলু এই বিশ্বাসঘাতকতা করে, তখন তার বয়স ছিল আশি বছর। কেউ কেউ বলেন একশো বছর!! আরও উল্লেখের বিষয় হলো, এই বিশ্বাসঘাতকতার কয়েক মাস পরই সে ইন্তেকাল করে!!!

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে শুভ সমাপ্তি দান করুন।

এই ছিল তাতারী বাহিনীর বাগদাদ আক্রমণের পূর্বপ্রস্তুতি।

বাগদাদ অধঃপতনের কারণ

তৎযুগে বাগদাদ ছিল পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী সুরক্ষিত শহর। এর প্রাচীর ছিল ইস্পাতকঠিন। তা ছিল পাঁচ যুগ পূর্বেকার মুসলিম খেলাফতের রাজধানী। শহরের সুরক্ষার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়। কিন্তু হায় আফসোস! শত আফসোস এই সুরক্ষিত শহরটির প্রতি!!

শহরের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন ছিল শক্তিশালী কিছু লৌহমানব। কিন্তু সেই যুগে লৌহমানবের স্বল্পতা দেখা দিয়েছিল! আব্বাসী খেলাফত আমলে কে এই সুবিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিল? তিনি ছিলেন বনী আব্বাসের শেষ ও সাইত্রিশতম খলিফা। তিনি ছিলেন মুসতা'সিম বিল্লাহ!

কী মহান তার নাম 'মুসতা'সিম বিল্লাহ' (আল্লাহর আশ্রয়গ্রহণকারী) কী মহান তার উপাধি 'খলিফাতুল মুসলিমীন' (মুসলমানদের প্রতিনিধি)।

কোথায় খলিফা মুস্তাসিম বিল্লাহর খেলাফতের (প্রতিনিধিত্বের) প্রতিফলন?

আপনি যদি সীরাতের কিতাবাদি—যেমন : সুয়ূতী রহ. রচিত *তারীখুল খুলাফা*, ইবনে কাছীর রহ. রচিত *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* ইত্যাদি কিতাবাদিতে—খলিফার গুণাবলি পাঠ করেন, তাহলে একটি অদ্ভুত বিষয় জানতে পারবেন। দেখতে পাবেন, তারা ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবনে একজন শ্রেষ্ঠ মানুষের বিবরণ তুলে ধরেন। (যেমন : তারা বলেন, উত্তম গুণাবলি সম্পন্ন একজন মানুষ।)

আল্লামা ইবনে কাছীর রহ. বলেন, খলিফা মুসতা'সিম বিল্লাহ ছিলেন সুদর্শন, চরিত্রবান, বিশুদ্ধ আকীদাসম্পন্ন, ন্যায় প্রতিষ্ঠার পিতা মুসতানছির বিল্লাহর অনুসারী, তিনি প্রচুর দান-সদকা করতেন। উলামা মাশায়েখ ও সাধারণ মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন। মাযহাবগত দিক থেকে তিনি সালাফী ছিলেন।

আমি জানি না সালাফী বলে ইবনে কাছীর রহ. কী বুঝাতে চেয়েছেন?!

সলফের (পূর্বসূরিদের) ধর্মে কি জিহাদ ছিল না?

সলফের (পূর্বসূরিদের) ধর্মে কি জিহাদের প্রস্তুতির নির্দেশ ছিল না?

সলফের (পূর্বসূরিদের) ধর্মে কি ভৌগলিক জ্ঞানের পাঠ হতো না?

ইরাক, পারস্য, আযারবাইজান ইত্যাদি অঞ্চলে মুসলিম-নিধন দেখে, মুসলমানদের রক্তপাত হতে দেখে কি সলফের (পূর্ববর্তীদের) গায়ে জ্বলন সৃষ্টি হতো না? তারা কি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হতেন না?

সলফের ধর্মে কি ঐক্য, ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব, শ্রদ্ধা ছিল না?

খলিফা মুসতা'সিম বিল্লাহ ব্যক্তিগতভাবে সৎ ও মার্জিত ছিলেন। তবে তার মাঝে কতিপয় গুণাবলির অভাব ছিল। মুসলিম শাসকের মাঝে সেসব গুণাবলির অভাব থাকতে পারে না।

তারা মাঝে রাজনৈতিক সংকট ও জটিলতা নিরসনশক্তির অভাব ছিল।

তার মাঝে যথাযথ নেতৃত্বের অভাব ছিল।

তার মাঝে উঁচু মনোবল ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাব ছিল।

অভাব ছিল দ্বীন প্রচারের ও শত্রুর ওপর জয়লাভের।

তার মাঝে উপযুক্ত সময়ে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার অভাব ছিল।

তার মাঝে অনৈক্য দূরীকরণ, ইসলামী ঐক্যের পতাকা উত্তোলন এবং সকলকে এক কাতারে দাঁড় করানোর ক্ষমতা ছিল না।

তার মাঝে সৎসঙ্গী নির্বাচনের অভাব ছিল। ফলে তার চারপাশে অসৎ সঙ্গের ভিড় জমেছিল। মন্ত্রীরা চুরি করত। পুলিশরা অত্যাচার করত। আর সেনাপতিরা ছিল ভীরু।

তার মাঝে দুর্যোগ ও বিপর্যয় রোধ করার ক্ষমতা ছিল না। ফলে ফেতনা-ফ্যাসাদ ব্যাপক হয়েছিল। সরকারি সম্পত্তি লুট হতো। সুদ ও ঘুষের প্রচলন বৃদ্ধি পেয়েছিল। গান-বাদ্য, খেলতামাশা ও আড্ডাখানা বৃদ্ধি পেয়েছিল; এমনকি প্রকাশ্যে এসবের ঘোষণা দেওয়া হতো।

হ্যাঁ! দ্বীনের রুকন আরকান তথা নামাজ, রোজা, যাকাত আদায়ে তিনি ছিলেন সৎপরায়ণ। তার ভাষা ছিল সুমিষ্ট। তিনি গরিব-গুরাবা ও আলেম-উলামাদের ভালোবাসতেন। এসব কিছু তার দায়িত্ব পরায়ণতার পরিচায়ক ছিল। তবে দেশ জাতি ও উম্মাহর প্রশ্নে তার দায়িত্বপরায়ণতা কোথায় ছিল?!

দেশ ও জাতির প্রশ্নে খলিফা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

তখনো ইরাকে সাধারণ জনগণ ছাড়াই এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য অবস্থানরত ছিল। বাগদাদ অবরোধকারী তাতারীদের সৈন্য সংখ্যা ছিল দুই লক্ষ। তখন তাতারীদের মুকাবেলায় রুখে দাঁড়ানো খুবই সহজ ছিল। কিন্তু খলিফার হৃদয় ছিল পরাজিত। সেই প্রাণ তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন, যা শত্রুর মুকাবেলায় রুখে দাঁড়াতে শক্তি জোগায়। তাই তিনি তার জাতিকে জিহাদের শিক্ষা দেননি এবং সমরবিদ্যায় পারদর্শী করেননি।

কোথায় আজ ট্রেনিং-ক্যাম্প, যা বর্তমান যুবক সমাজকে প্রস্তুত করবে?!

কেন আজ সাঁতার কাটা, তীর নিক্ষেপ ও ঘোড়া-দৌড়ের প্রতিযোগিতা হয় না?!

কোথায় জাতির নৈতিক সংগ্রামের জীবনযাপনের প্রস্তুতি?!

আমি খলিফার পক্ষাবলম্বন করছি না।

খলিফা মুসতা'সিম বিল্লাহ প্রায় ষোলো বছর স্বদেশ শাসন করেছেন।

তিনি হঠাৎ কোনো নির্দেশ দেননি। তড়িদ্‌গতিতেও কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি।

তিনি লালিত-পালিত হয়েছেন খলিফা হওয়ার জন্য। তিনি রাজত্বভার গ্রহণ করেছিলেন একত্রিশ বছর বয়সে। তখন তিনি ছিলেন টগবগে পরিপক্ব সচেতন যুবক। দেশ পরিচালনার জন্য তিনি পূর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন। পূর্ণ ষোলো বছর

তিনি দেশ শাসন করেন। সুতরাং যদি তিনি যোগ্য হন তাহলে তার দায়িত্ব হলো প্রতিশ্রুতি দেওয়া, দেশকে শক্তিশালী করা, দেশের ভাবগাম্ভীর্য তুলে ধরা, মর্যাদা উন্নত করা, সৈন্যদলকে প্রস্তুত করা, দেশের পতাকা উত্তোলন করা। আর যদি তিনি যোগ্য না হন, যদি তিনি সৎ হয়ে থাকেন তাহলে তার উচিত হলো, যোগ্য লোকের জন্য ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া। এটা কোনো পরিবার বা গোত্রের বিষয় নয়, এটা এক জাতির প্রশ্ন, ...বিশাল জাতির বিষয়! এমন এক জাতির বিষয়, মানবকল্যাণে যাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু খলিফা এই দুই কাজের কোনো একটিও করেননি। নিজে যোগ্যতার পরিচয় দেননি। আবার ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াননি। এ কারণেই তাকে মূল্য দিতে হয়েছে। আর যে জাতি তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল, আবশ্যম্ভাবীরূপে তাদেরও মূল্য দিতে হয়েছে।

যে পরিমাণ আমানত নষ্ট হয়েছে, খলিফা ও তার জাতিকে সে পরিমাণ মূল্য দিতে হবে? আপনারা দেখবেন সেই মূল্য কত বৃহদকার হয়!!

দেশে অস্ত্র কেনার বা তৈরি করার জন্য অর্থের কোনো অভাব ছিল না। এমনকি গুদাম গুদাম অস্ত্র পড়ে ছিল। তবে হয়তো তা পুরোনো ক্ষয়প্রাপ্ত অস্ত্র, যা বহুদিন ধরে পড়ে আছে, যা আর শান দেওয়া হয়নি। অথবা নতুন অস্ত্র, যা একবারও ব্যবহার করা হয়নি, আফসোস! (চরম আক্ষেপ) কেউ অস্ত্র প্রশিক্ষণ নেয়ইনি!!

ফলে আব্বাসী সৈন্যবাহিনী দুর্বল ক্ষীণকায় হয়ে পড়েছে। যারা ছোট কোনো রাজত্ব সুরক্ষিত রাখার যোগ্য ছিল না; সুবিশাল খেলাফত তো বহু দূরের কথা!

এই ছিল বাগদাদ নগরীর খলিফার অবস্থা!!

আর বাগদাদের অবস্থা কী ছিল? বাগদাদের রাজত্ব কেমন ছিল?

বাগদাদের হুকুমত সৈন্যবাহিনীর মতই দুর্বল রুগ্ন ও শীর্ণকায় ছিল।

মন্ত্রী পরিষদের মনমতো পরিচালিত হতো। তাদের লক্ষ্যই ছিল ধন-সম্পদ ও অর্থ-কড়ি সঞ্চয় করা, ক্ষমতার বাগডোর সর্বত্র ছড়িয়ে রাখা, সাধারণের গলায় রাজত্বের রশি ঝুলিয়ে রাখা, তাদের সঙ্গে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করা এবং অট্টালিকা, ক্ষমতা কিংবা নারীর জন্য লড়াই করা। এই অধঃপতিত মন্ত্রীসভার প্রধান ছিলেন বিশ্বাসঘাতক প্রধানমন্ত্রী, যিনি দেশ ও জাতিকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। যিনি উম্মাহর শত্রুদের বন্ধু, পরবর্তী প্রজন্মের শত্রুদের বন্ধু। মন্ত্রীদের সঙ্গে সাধারণ মুসলমান, যারা তাদের জান-মাল দিয়ে রক্ষা করে,

তাদের সুসম্পর্ক ছিল না। তাদের সঙ্গে ভাইয়ের মতো সম্পর্ক ছিল না; বরং গোলাম মুনিবের সম্পর্ক ছিল।

বাগদাদের নাগরিকদের অবস্থা কী ছিল?

তাদের স্বভাব-প্রকৃতি কেমন ছিল? তাদের উচ্চাভিলাষ কেমন ছিল?

আপনারা ভাববেন না, তারা এক দুর্বল বা পরাজিত খলিফার মাজলুম প্রজা ছিল।

প্রজাদের আমল অনুযায়ী শাসক নিযুক্ত হয়

তৎকালে বাগদাদে অসংখ্য জনগণ বাস করত। তাদের সংখ্যা ছিল কমপক্ষে তিন কোটি। এ কারণেই তৎকালে বাগদাদ ঘনবসতিসম্পন্ন বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হিসেবে গণ্য করা হতো। সুতরাং বোঝা গেল, বাগদাদে জনশক্তির কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু তারা ছিল বিলাসপ্রিয়। তারা শান্তশিষ্ঠ ও আরামপ্রিয় জীবনযাপন করত। দ্বীনদারিত্বের অবস্থা এই ছিল যে, তারা ইলমে দ্বীন অর্জন করত, মসজিদে নামাজ আদায় করত, কুরআন তেলাওয়াত করত। তবে 'এ'লায়ে কালিমাতুল্লাহ' তথা আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ফরিজা নির্ধারণ করেছেন তথা জিহাদকে তারা ভুলে গিয়েছিল। পক্ষান্তরে দ্বীনদারির সঙ্গে যাদের সম্পর্ক ছিল না, তাদের অবস্থা ছিল, তারা মনচাহে জীবনযাপন করত। ভোগ বিলাসে মত্ত ছিল। খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, দাস-দাসী, ঘর-বাড়ি ইত্যাদিতে তারা ডুবে ছিল। কেউ কেউ তো কুরআন হাদীস ছেড়ে গান-বাজনা শ্রবণ করত। কেউ মদ পান করত, কেউ চুরি করত, কেউ অপরের প্রতি জুলুম করত। এর চেয়ে জঘন্য বিষয় হলো, তারা দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে পার্শ্ববর্তী দেশ আফগানিস্তান, উজবেকিস্তান, তুরমিনিস্তান, পারস্য, আযারবাইজান ও শিসানবাসীর গগন জাগানিয়া আর্তনাদ শুনে একটুও সহানুভূতি প্রকাশ করেনি; তাদের আত্মমর্যাদায় একটুও আঘাত হানেনি। তারা মুসলিম অবলা হাজার হাজার নারীদের বন্দীর আওয়াজ শুনে একটুও নড়ে চড়ে বসেনি। মুসলমান সন্তানদের ছিনিয়ে নিতে দেখে তাদের হৃদয়াত্মা একটুও ব্যথিত হয়নি। ধন-সম্পত্তি চুরি হতে দেখে, ঘর-বাড়ি ধ্বংস হতে দেখে, মসজিদ জ্বালিয়ে দিতে দেখে তাদের ভেতরে 'আহ!' শব্দও উচ্চারিত হয়নি; এমনকি তারা তাদের খলিফা

মুসতা'সিম বিল্লাহকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাতারীদের সহযোগিতা করতে দেখে নীরব ভূমিকা পালন করেছিল। তার এসব কিছু দেখে-শুনে, বরং এরচেয়ে বহু গুণ বেশি অত্যাচার জুলুম দেখে একটুও হরকত করেনি; পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

সুতরাং যেমন কর্ম ফল তেমনই হওয়া আবশ্যক ছিল!!

যেমন কর্ম তেমন ফল

শীঘ্রই এমন এক সময় আসবে, যখন এই জনপদবাসী অন্যান্য মুসলিম জাতি যে আজাব ভোগ করেছে, হুবহু তা-ই ভোগ করবে। তখন তাদের জন্য একজন মুসলমানও সহানুভূতি প্রদর্শন করবে না। এমনকি তাতারীরা তাদের বিরুদ্ধে সহযোগিতা প্রদান করবে, যেমন আজ তারা তাদের ভাইদের বিরুদ্ধে তাতারীদের সহযোগিতা করছে। এভাবেই চলতে থাকবে।

কেউ বলবে না, তারা নিজেদের কারণে পরাজিত হয়েছে; বরং বিষয় হলো, যেই জনপদ শরীয়ত বিরুদ্ধ কাজ মেনে নিতে পারে, তাদের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার থাকে না। যেই জাতি কেবল জীবন ভোগ করতে জানে, এই উদ্দেশ্যেই বেঁচে থাকে, সমাজে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াবার কোনো অধিকার তাদের থাকে না।

কোথায় উলামা-মাশায়েখের জামাত?
কোথায় বীর যোদ্ধারা?
কোথায় যুবক-সমাজ?
কোথায় মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ?
কোথায় সৎকাজের আদেশ দাতারা?
কোথায় অন্যায় কাজে বাধা প্রদানকারী?
কোথায় ঘুণেই ধরা সমাজের সংশোধনী পদক্ষেপ?
কোথায় দ্বীনের সঠিক বুঝ?
বাগদাদে কি কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি ছিল না?

এই ছিল বাগদদের অধঃপতন। আর বাগদাদের বাইরের অবস্থা আপনারা জানেন। সেথায় তাতারী বাহিনী মুসলমানদের শাস্তি প্রদানের জন্য অগ্নি প্রজ্বলন করছিল। আর মুসলমানরা নীরবে শাস্তি ভোগ করছিল!!

অবরোধের সূচনা!!

১২ মুহাররম ৬৫৬ হিজরীতে হালাকু খানের দল আকস্মিক বাগদাদ নগরীর পূর্ব প্রাচীরের সামনাসামনি এসে দাঁড়ায়। হালাকু খান শহরের চারপাশে অবরোধের সরঞ্জামাদি স্থাপন শুরু করে। অপর দিকে পূর্ব-দক্ষিণ দিক থেকে কাতবুগা দলবল নিয়ে এসে উপস্থিত হয়।

তাতারী বাহিনীর দুর্ধর্ষ দুই দলের আকস্মিক আগমন দেখে খলিফাতুল মুসলিমীন আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। দ্রুত বিশিষ্ট উপদেষ্টাবৃন্দকে একত্রিত করেন। যাদের প্রধান ছিলেন বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী মুআইয়িদ উদ্দীন আলকামী।

এমন দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে আমরা কী করব?

মুক্তির পথ কী?

কোথায় পালাবার স্থান?

فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ

> “তারা আর্তচিৎকার করেছিল। কিন্তু তখন পালাবার কোনো পথ ছিল না।”[৪৪]

উযীর মুআইয়িদ উদ্দীন আলকামী ও তার সহোদররা তাতারীদের পক্ষ সমর্থন করে তাদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাকিদ প্রদান করে। সামান্য পতন কিংবা সামগ্রিক পতন ঘটলেও তাদের বাধা দেওয়ার মতো কিছু ছিল না। মুআইয়িদ উদ্দীন তাতার ও মুসলমানদের ভেতর সুযোগ সন্ধান করছিল, যাতে তাতারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কিংবা রুখে দাঁড়াবার কোনো চিন্তা অবশিষ্ট না থাকে।

শর্তহীন শান্তিচুক্তি ছিল তাদের পরামর্শ।

একথা অনস্বীকার্য সে, মুসলিম উম্মাহ কখনো কল্যাণশূন্য হবে না। দু'জন মন্ত্রী দাঁড়িয়ে খলিফাকে জিহাদের ইঙ্গিত প্রদান করে। ‘জিহাদ’ শব্দটি আব্বাসী সাম্রাজ্যের এই প্রজন্মের কাছে ছিল একটি নতুন শব্দ। কিন্তু তাদের কাছে জিহাদ শব্দটি নতুন ও অদ্ভুত হলেও তা প্রত্যাখ্যান করার কোনো উপায় ছিল না।

মুজাহিদ উদ্দীন আইবেক ও সুলাইমান শাহ প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য উৎসাহিত করেন। কিন্তু সময় ফুরিয়ে যাওয়ার পর তারা এই ইঙ্গিত প্রদান

---

[৪৪] সূরা সাদ : ৩।

করেছেন। শুধু সময় ফুরিয়ে বললে ভুল হবে, বরং বহু পরে তারা এই উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। কারণ, জিহাদের প্রস্তুতির সময় অনেক পূর্বেই শেষ হয়ে গেছে। সামনে পরীক্ষার সময় অত্যাসন্ন। হতে পারে, হয়তো তারা অনেক দিন থেকে জিহাদের পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু কেউ তাদের কথায় কর্ণপাত করেনি। মুআইয়িদ উদ্দীন ও মুজাহিদ উদ্দীন আইবেকের মধ্যকার সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধরে টানাপোড়া চলছিল। বিশ্বাসঘাতকের সম্পর্কে টানাপোড়া থাকাই আবশ্যক। কিন্তু আফসোস! খলিফা বিশ্বাসঘাতকদের কথা দীর্ঘদিন ধরে মেনে আসছে!!

খলিফা হতভম্ব!!

মুআইয়িদ উদ্দীনের কথার প্রতি সে দুর্বল।

তার অন্তর যুদ্ধ করতে শক্তি পাচ্ছিল না।

কিন্তু বিবেক মুজাহিদ উদ্দীন আইবেকের কথার প্রতি সায় দিচ্ছে। কারণ, তাতারীদের ইতিহাস শান্তির ইতিহাস নয়। যেমন কখনো শোনা যায়নি, তাতারীরা অধিকার প্রদান করে; বরং তারা অধিকার ছিনিয়ে নেয়।

খলিফা বিবেকশূন্য হয়ে পড়েন। শেষমেশ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আলহামদুলিল্লাহ! তিনি বিবেকের কথা শুনেছেন। তিনি জিহাদের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু দ্বন্দ্বপূর্ণ .... দুর্বল .... মনোবলহীন!!

এভাবে জিহাদ কোনো উপকারে আসে না।

জিহাদ কখনো অপরিকল্পিতভাবে হয় না।

হঠাৎ করে মুজাহিদ সৃষ্টি হয় না!!

জিহাদ হলো প্রস্তুতির নাম। পরিচর্যার নাম, আত্মবিসর্জনের নাম এবং ঈমানের পথে দীর্ঘদিনের পরামর্শ ও পর্যালোচনার নাম।

জিহাদ সম্মুখপানে অগ্রসর ... ঊর্ধ্বগামী ... ঊর্ধ্বগামী ... ঊর্ধ্বগামী। ইসলামের স্বর্ণশিখরে পৌঁছা পর্যন্ত। তবে আমরা সর্বাবস্থায় জিহাদ করব (অভিজ্ঞতার আলোকে)। খলিফা জীবনে একবারের জন্য হলেও সেনাবাহিনীর খেদমত করার ইচ্ছা করল!

এরপর মুজাহিদ উদ্দীন আইবেকের নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র দুর্বল দল হালাকু খানের সঙ্গে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে বের হলো। আব্বাসী বাহিনী বের হতে না হতেই এবং হালাকু খানের মুখোমুখি হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ না করতেই সংবাদ এল, উত্তর দিক থেকে আরেকটি তাতারী বাহিনী আগমন করছে। সেটি হলো

তাতারী সেনাপতি পোয়গেয়টের দল, যারা ইউরোপ থেকে তুরস্ক ও উত্তর ইরাক পাড়ি দিয়ে এসেছে। এই দলটি দাজলা নদীর পূর্বাঞ্চলীয় ইরাকভূমি পাড়ি দিয়ে দাজলা নদীর পশ্চিমাঞ্চল মসুল পৌঁছেছে। এরপর সেখান থেকে দাজলা ও ফুরাত নদীর মধ্যবর্তী অবরুদ্ধ অঞ্চল থেকে মাত্র পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে। তারা যখন উত্তর বাগদাদে অবস্থান করছিল, তখন মুজাহিদ উদ্দীন আইবেক তাদের আগমন-সংবাদ পান।

মুজাহিদ উদ্দীন আইবেক অনুধাবন করেন, যদি এই দলটি বাগদাদ পৌঁছে, তাহলে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণ করবে এবং এর মাধ্যমে মুসলিম প্রাচীন রাজধানী চারদিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে। তাই তৎক্ষণাৎ মুজাহিদ উদ্দীন আইবেক পোয়গেয়টকে প্রতিহত করতে দাজলা ও ফুরাত নদীর উত্তর দিকে যাত্রা শুরু করেন। আম্বার নামক স্থানে তারা মুখোমুখি হয়। এটি সেই স্থান যেখানে পাঁচশ বছর পূর্বে মুসলিম সেনাপতি খালেদ বিন ওয়ালিদ রা. বিজয় লাভ করেছিলেন। কিন্তু আফসোস! এবার মুসলিম নেতা জয় লাভ করতে পারেনি।

পোয়গেয়ট প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে। সে মুসলমানদের সামনে থেকে ফিরে যেতে উদ্যত হয়। মুসলমানরা পিছু ধাওয়া করে। একসময় তারা ফুরাত নদীর নিকটবর্তী এক জলাভূমিতে গিয়ে উপস্থিত হয়। এরপর পোয়গেয়ট তাতারী প্রকৌশলীদের নদীর বাঁধ কেটে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। যাতে আব্বাসী বাহিনী ফিরে যেতে না পারে। এরপর পোয়গেয়ট ইরাকী বাহিনীকে অবরোধ করে এবং ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। মুজাহিদ উদ্দীন আইবেক সামান্য কয়েকজন সৈন্যবাহিনী নিয়ে নদীর পাড় দিয়ে বাগদাদ ফিরে যেতে সক্ষম হন। কিন্তু আফসোস! অসংখ্য সৈন্য আম্বার অঞ্চলে নিহত হয়।

১৯ শে মুহাররম এই অপূরণীয় ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হয়। অর্থাৎ হালাকু খান বাগদাদ পৌঁছার এক সপ্তাহ পর এই দুর্ঘটনা ঘটে। এদিকে পোয়গেয়ট কালক্ষেপণ না করে তৎক্ষণাৎ পরের দিনই উত্তর দিক থেকে বাগদাদ পৌঁছে যায়। অতঃপর বাগদাদের পশ্চিম দিক থেকে অবরোধ শুরু করে। বাগদাদ নগরী পূর্বে হালাকু খান ও পশ্চিমে পোয়গেয়ট; এই দুই বাহিনীর মাধ্যমে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। অবরুদ্ধ হয় ইসলামী খেলাফতের ঐতিহ্যবাহী রাজধানী।

খলিফাতুল মুসলিমীন কল্পনাও করেননি যে, এভাবে অবরোধের শিকার হবেন। তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন, বিবেক বিস্মৃত হন!!

সুযোগ-সন্ধানী উযীর মুআইয়িদ উদ্দীন এটাকে বড় সুযোগ মনে করে। সে খলিফাকে সম্বোধন করে বলে, খলিফাতুল মুসলিমীন! আমাদের তাতারীদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সংলাপে বসা উচিত। কিন্তু খলিফা জানতেন, তাদের সঙ্গে সংলাপে বসা মানে হলো, শক্তিশালীর সঙ্গে অতি দুর্বলের বৈঠক। তা কোনো ফল বয়ে আনবে না। কারণ, মুআইয়িদ উদ্দীনের উদ্দেশ্য সংলাপ নয়; বরং আত্মসমর্পণ। আর আত্মসমর্পণ অর্থ হলো প্রশ্নাতীতভাবে বিজয়ীর যাবতীয় শর্ত মেনে নিয়ে পরাজয় মেনে নেওয়া।

এতদ্‌সত্ত্বেও নিরুপায় হয়ে অসহায় খলিফা মাথানত করে আত্মসমর্পণকেই মেনে নিলেন। তিনি সংলাপে একমত হলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, তার পক্ষ থেকে সংলাপের জন্য দুজনকে পাঠাবেন। কোন দুজনকে পাঠাবেন?

তিনি শীয়া মতালম্বী মুআইয়িদ উদ্দীন আলকামীকে পাঠালেন, যে অন্তরে আব্বাসী সাম্রাজ্যের প্রতি ঘোর বিদ্বেষ লালন করে এবং বাগদাদের খ্রিস্টান কুলপতি মাকিকাকে পাঠান। এভাবে ইসলামী সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সংলাপের জন্য প্রতিনিধি হিসেবে দুজনকে নিয়োগ করা হয়। তাদের একজন শীয়া, অন্যজন খ্রিস্টান!!

হালাকু খান ও দুই মুসলিম প্রতিনিধির মাঝে গোপন সংলাপ সংঘটিত হয়। হালাকু খান তাদের বাগদাদ পতনে সহযোগিতা প্রদানের শর্তে নানান প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। তন্মধ্যে অন্যতম প্রতিশ্রুতি হলো, তারা দুজন নতুন গভর্নর বডির সদস্যপদ প্রাপ্ত হবে এবং তাদের অন্যতম বিবেচিত হবে, যারা পরবর্তীতে ইরাক শাসন করবে। একথা সুস্পষ্ট যে, এগুলো মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বৈ কিছুই নয়।

এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি পেয়ে তারা আব্বাসী সাম্রাজ্য পতনের জন্য পাগলপারা হয়ে ওঠে। যদিও এর বিনিময়ে তারা কিছুই পাবে না। একটু ভেবে দেখুন, যদি আপনাকে এ জাতীয় লোভনীয় প্রতিশ্রুতি (যেমন ক্ষমতা, পদ, সম্পদ) দেওয়া হতো, তবে আপনি কী করতেন? নিঃসন্দেহে তাতারী সম্রাট হালাকু খান স্থান-কাল-পাত্রের চাহিদা খুব ভালো বুঝত!

প্রতিনিধি দুজন হালাকু খানের কাছ থেকে অদ্ভুত আবেদন নিয়ে ফিরে এল। বাগদাদের অভ্যন্তরীণ কট্টর মুসলমান, যারা জিহাদের চেতনায় উজ্জীবিত, জিহাদের হুঙ্কার দেয়, তাদের বিষয়ে ইতিপূর্বেই হালাকু খান শুনেছে। জিহাদের ডাক নিঃসন্দেহে তাদের শান্তিচুক্তিকে ভেঙে চুরমার করে দেবে। তারা ভাবল,

খলিফাতুল মুসলিমীনের আত্মসমর্পণ করা অত্যন্ত জরুরি এবং জিহাদী চেতনায় উজ্জীবিত মুজাহিদ উদ্দীন আইবেক ও সুলাইমান শাহকে আত্মসমর্পণ করা দরকার।

এখানে বর্ণনার বৈপরীত্য পাওয়া যায়। আমি (লেখক) জানি না, তারা বাস্তবে আত্মসমর্পণ করেছিল, না করেনি? তবে সবার সামনে তাতারীদের মতলব সুস্পষ্ট হয়েছে। সবার সামনে শত্রুদের দ্বীন ইসলামকে মিটিয়ে দেওয়ার অভিলাষ প্রতিভাত হয়েছে। হ্যাঁ, খলিফা ক্ষমতার আসনে উপবিষ্ট থাকবে!! যদি হালাকু সত্য বলে থাকে!!

এটা তো জোরজবরদস্তি, অনধিকার চর্চা। খলিফা কি এটি গ্রহণ করবেন? আর কেনই বা গ্রহণ করবেন না। তার পরামর্শদাতারা তাকে বলছে, এটাকে রাজনৈতিক ভাষায় 'বাস্তবতা' বলা হয়। যদি আপনি আত্মসমর্পণ না করেন, তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তবে নিশ্চিত বাগদাদের পতন ঘটবে। বাগদাদবাসীর অপমৃত্যু ঘটবে। পক্ষান্তরে যদি আপনি আত্মসমর্পণ করেন। তবে দূরবর্তী হলেও সম্ভাবনা রয়েছে আমরা প্রাণে বাঁচব!!

হ্যাঁ! তিনি লাঞ্ছিত অবস্থায় বেঁচে থাকবেন! তবুও তো বেঁচে থাকবেন!!

হ্যাঁ! তিনি নতজানু হয়ে বেঁচে থাকবেন! তবুও তো বেঁচে থাকবেন!!

হ্যাঁ! তিনি সবকিছু সস্তায় বিক্রি করে দেবেন! তবুও তো জীবন ফিরে পাবেন!!

খলিফাতুল মুসলিমীন সর্বদাই দ্বিধান্বিত ছিলেন।

আর লক্ষ কোটি জনতা তার পেছনে দ্বন্দ্বে ভুগছিল।

জিহাদের ডাক খুব কম মানুষের মুখ থেকেই বের হয়! আর সাধারণ মানুষের অন্তর তাতারী অবরোধের শিকল পায়ে পরার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল।

পার্থিব জগৎ তাদের চোখের সামনে বৃহদাকার মনে হয়েছিল। তাই পার্থিব জগৎকে বলিদান দেওয়া তাদের ভাগ্যে জুটল না।

বস্তুত বাগদাদে অন্যায় অপকর্ম বৃদ্ধি পেয়েছিল। আর কোনো জনপদে যখন অন্যায় অপকর্ম ছড়িয়ে পড়ে, ধ্বংস তখন নিকটবর্তী হয়ে পড়ে।

বিষয়টি নিয়ে ভাববার জন্য খলিফার কিছু সময়ের প্রয়োজন ছিল। সিদ্ধান্ত বড়ই কঠিন। তিনি পরামর্শের প্রয়োজন অনুভব করলেন। কিন্তু অপরদিকে হালাকু খানের হাতে নষ্ট করার মতো সময় ছিল না। কারণ, বাগদাদ অবরুদ্ধকারী তাতারী বাহিনীর পেছনে প্রতিদিন হাজার হাজার স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় হচ্ছিল। তখন

ছিল ৬৫৬ হিজরী মুহাররম মাস মোতাবেক ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাস। তখন তীব্র শীত। তা ছাড়া বড় কথা হলো, তাতারী বাহিনী ভেতর থেকে বাগদাদ অবলোকন করার জন্য অস্থির হয়ে ছিল।

অবস্থা ক্রমেই কঠিন ও তীব্রতর হচ্ছে। হালাকু খান ও খলিফার মাঝে দূতের আনাগোনা চলতেই থাকে। এসব দূত মুআইয়িদ উদ্দীন ও মাকিকার কাছে খুব আস্থাভাজন ছিল।

সংলাপের ফলাফল খুবই মনঃপূত হয়েছে বলে ইবনে আলকামী খলিফার সম্মুখে প্রকাশ করেছে। ইবনে আলকামী হালাকু খানের পক্ষ থেকে কতিপয় (মিথ্যা) প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিল। তিনি এসব প্রতিশ্রুতিকে রাজনীতির জন্য কল্যাণকর মনে করেন। তবে কিছু শর্ত ছিল, যা তৎক্ষণাৎ পূরণ করা খলিফার জন্য আবশ্যকীয় ছিল।

প্রতিশ্রুতি ছিল—

১. তাতারীরা দুই সাম্রাজ্যের মাঝে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে।

২. লক্ষ লক্ষ মুসলমান হত্যাকারী হালাকু খানের মেয়ের সঙ্গে খলিফাতুল মুসলিমীন মুসতা'সিম বিল্লাহর ছেলে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হবে।

৩. খলিফা মুসতা'সিম বিল্লাহ নিজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবেন।

৪. তাতারীরা গোটা বাগদাদবাসীকে নিরাপত্তা প্রদান করবে।

এসব প্রতিশ্রুতি নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে বাস্তবায়িত হবে—

১. ইরাকের দুর্গসমূহ ধ্বংস করতে হবে।

২. খন্দকসমূহ ভরাট করতে হবে।

৩. অস্ত্র তাতারীদের হাতে অর্পণ করতে হবে।

৪. বাগদাদের রাজত্ব তাতারীদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

হালাকু খান প্রেরিত দুই প্রতিনিধির সঙ্গে সংলাপ সমাপ্ত করে। যেন সে এ দেশে ন্যায়-ইনসাফ, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা প্রদানের উদ্দেশ্যে আগমন করেছে এবং এসব কল্যাণকর উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হলে সে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করবে। তখন ইরাকবাসী নিজেদের মতো জীবনযাপন করবে এবং নিজেরাই নিজেদের জন্মভূমি পরিচালনা করবে।

এসব প্রতিশ্রুতি ও শর্ত শুনে খলিফার মনে নতুন করে স্বপ্ন জাগে!!
হালাকু খান কি প্রতিশ্রুতি প্রদানে সত্যবাদী?!
নাকি খলিফার মনে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল?!

উপরন্তু শর্তগুলো ছিল খুবই কঠোর। নিঃসন্দেহে এসব শর্ত যুদ্ধের সকল সম্ভাবনাকে বিলুপ্ত করে দেবে। কিন্তু অপরদিকে হালাকু খান খলিফার সামনে স্বপ্নের প্রদীপ জ্বালিয়েছিল। তা হলো, দেশের রাজত্বে তারা হস্তক্ষেপ করবে না। খলিফার রাজত্ব বহাল থাকবে। তবে তাতারীদের তত্ত্বাবধানে।

বাঁদি আরাফার মৃত্যু

হালাকু খান দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেনি এবং তার বন্ধু 'খলিফা' গভীর চিন্তা-ভাবনার জন্য যে সময় চেয়েছিলেন, তাও দেয়নি; বরং তৎকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাগদাদের ওপর পাথর ও আগুন নিক্ষেপ করে সে তাকে দ্রুত চিন্তা-ভাবনা করতে বাধ্য করেছে।

শুরু হয় বাগদাদের ঘর-বাড়ি, প্রাসাদ-অট্টালিকা, দুর্গ-ক্যান্টনমেন্ট ও প্রাচীরের ওপর ভয়াবহ গোলাবর্ষণ। নিরাপদ ও শান্ত শহর (বাগদাদ) তার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো প্রকম্পিত হয়।

সর্বপ্রথম গোলাবর্ষণ শুরু হয় ৬৫৬ হিজরীর সফর মাসে। টানা চারদিন গোলাবর্ষণ চলতে থাকে। উল্লেখযোগ্য কোনো প্রতিবাদ সেখানে দেখা যায় নি। আল্লামা ইবনে কাছীর রহ. *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* গ্রন্থে এ অবস্থার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অতি সংক্ষেপে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন। কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করাননি। তবে তিনি বহু অর্থবহ কথা উল্লেখ করেছেন। ইবনে কাছীর রহ. বলেন—

“তাতারী বাহিনী খেলাফত সাম্রাজ্যকে ঘিরে ফেলেছে। চতুর্দিক থেকে তীর নিক্ষেপ করছে। এমন সময় খলিফার সম্মুখে এক বাঁদি নগ্নগায়ে খলিফার মনোরঞ্জন করছিল। তার গায়েও তীর বিদ্ধ হয়। এটি খলিফার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত ছিল। বাঁদিটির নাম ছিল আরাফা। জানালার ফাঁক দিয়ে তীর এসে বাঁদিকে আঘাত করে। এতে বাঁদিটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সেই তীরটিকে খলিফার সামনে এসে দাঁড় করানো হয়। তাতে লেখা ছিল—

"إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره، أذهب من ذوي العقول عقولهم"

যখন আল্লাহ তা'আলা নিজ ফায়সালা বাস্তবায়িত করতে চান, তখন জ্ঞানীদের বিবেক-বুদ্ধি ছিনিয়ে নেন।"

আশ্চর্য! ইবনে কাছীর রহ. এই ঘটনাটি কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই উল্লেখ করলেন!!

বাহ্যদৃষ্টিতে ঘটনাটি খুব স্বাভাবিক মনে হলেও এতে লুকিয়ে আছে বহু মর্মবাণী!!

প্রত্যেক বাগদাদবাসীর হৃদয়ের পার্থিব দুনিয়ার গভীর লোভ গেড়ে বসেছিল। আর সবার পূর্বে যার অন্তরে দুনিয়া চেপে বসেছিল, সেই মহান ব্যক্তি হলেন খলিফাতুল মুসলিমীন। এই হলেন সেই মহান খলিফা, যার স্কন্ধে এহেন ভয়াবহ মুহূর্তে মুসলিম উম্মাহর ঈমান-আমল ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার গুরুদায়িত্ব অর্পিত ছিল। হ্যাঁ, অবশ্যই! বাঁদিটি খলিফার মালিকানাধীন। সে তার জন্য হালাল। বাঁদি খলিফার মনোরঞ্জন করবে, খলিফা একাকী বাঁদিকে ভোগ করবেন, তার নাচ উপভোগ করবেন, এতে কোনো বাধা নেই; কিন্তু খলিফাতুল মুসলিমীনের বিবেক-বুদ্ধি কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল!! ইসলামী খেলাফতের রাজধানী অবরুদ্ধ। কয়েক হাত দূরে মৃত্যুর হাতছানি। মোঙ্গলী গোলাবর্ষণ হচ্ছে। তীরাগ্নি বর্ষিত হচ্ছে। জনমানব চরম সংকটে নিপতিত। এমতাবস্থায় খলিফা বাঁদির নাচ উপভোগ করছেন!!!

কোথায় বিবেক?! কোথায় বুদ্ধি?! কোথায় প্রজ্ঞা?!

বাঁদিভোগ তার রক্ত-মাংসে মিশে গিয়েছিল। আহার পানীয়ের মতো তা মৌলিক চাহিদায় পরিণত হয়েছিল। তাই তো যুদ্ধের মুহূর্তে তা অত্যাবশ্যকীয় ছিল!! আমি (লেখক) অনুধাবন করতে পারছি না, কীভাবে তিনি এসব কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখলেন; অথচ দেশ-শহর, জনগণ সবাই, এমনকি তিনি নিজেও সংকটাপন্ন।

রাজভবনে নিক্ষেপিত তীর, যেই তীরের আঘাতে অসহায় বাঁদিটি মারা যায়। তার গায়ে তাতারীরা কী চমৎকার অর্থবহ বাণী লিখেছিল। তাতে লিখা ছিল—

"যখন আল্লাহ তা'আলা নিজ ফায়সালা বাস্তবায়িত করতে চান, জ্ঞানীদের বিবেক-বুদ্ধি ছিনিয়ে নেন।"

সে সময় আল্লাহ তা'আলা বাগদাদ পতনের ফায়সালা করেছিলেন। তাই তো খলিফা, উপদেষ্টামণ্ডলী ও জনগণ; সকলের বিবেক কেড়ে নিয়েছিলেন।

নিঃসন্দেহে এই নির্বাচিত বাণীটি যুদ্ধের অংশ ছিল; তাতারীরা বাগদাদবাসীকে নিয়ে গবেষণা করে তা বুঝতে পেরেছিল।

এই ঘটনাটি খলিফার বিবেকহীনতা কিংবা বিবেক-স্বল্পতার প্রমাণ বহন করে। কারণ, তিনি এই দুঃখজনক ঘটনার (বাঁদির মৃত্যুর) পরও জনগণকে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেননি। বিপদ-আতঙ্ক রাজভবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। আর তিনি কেবল হেফাজতে থাকার নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

সর্বশেষ পর্যালোচনা

তাতারী বাহিনী ৬৫৬ হিজরীর ১ লা সফর থেকে চারদিন ৪ই সফর পর্যন্ত গোলাবর্ষণ করতে থাকে। ৪ই সফরে পশ্চিমের প্রাচীর ভাঙতে শুরু করে। প্রাচীর ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে খলিফাও সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েন।

জীবনের মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত অবশিষ্ট ছিল।

এমন দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে খলিফা তার বিশ্বাসঘাতক বন্ধু মুআইয়িদ উদ্দীন আলকামীর শরণাপন্ন হন। এহেন পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করেন। সে তাকে সশরীরে হালাকু খানের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেয়, যাতে সংলাপের দ্বার উন্মুক্ত হয়।

দূত হালাকু খানের কাছে গিয়ে খলিফার আগমন সম্পর্কে সংবাদ দেয়। হালাকু খান খলিফাকে আসার নির্দেশ দেয়। কিন্তু একাকী নয়; বরং তার সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট উপদেষ্টাবৃন্দ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ, মন্ত্রী পরিষদ, ফুকাহা, উলামা ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ আসার নির্দেশ দেয়। নির্দেশমতো তারা সবাই হালাকু খানের তাঁবুতে উপস্থিত হন। হালাকু খানের কথামতো সবার উপস্থিতিতে সংলাপ সংঘটিত হবে।

খলিফার সম্মুখে কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না। খলিফা জাতির শ্রেষ্ঠজ্ঞানীদের একত্রিত করেছেন এবং নিজে সশরীরে বাগদাদের প্রাচীর থেকে বের হয়ে হালাকু খানের তাঁবুতে উপস্থিত হয়েছেন। খলিফার দু-চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল, ধমনিতে রক্ত জমাট বেঁধেছিল, হৃদয়ের স্পন্দন থেমে গেয়েছিল, দীর্ঘশ্বাস বের হচ্ছিল।

খলিফা অপমানিত অপদস্থ হয়ে বের হয়েছেন। তিনি তো সেই খলিফাতুল মুসলিমীন, যাকে তার রাজপ্রাসাদে দেশ-বিদেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সংবর্ধনা

জানায়। যার পূর্বপুরুষরা এই প্রাসাদ থেকে সারা পৃথিবী শাসন করতেন। যে প্রাসাদ থেকে আজ তিনি অপমানিত হয়ে বের হয়েছেন।

খলিফার সঙ্গে প্রায় সাতশোজন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের এক মহতি জামাত ছিল। এতে মন্ত্রী মুআইয়িদ উদ্দীন আলকামীও ছিল। দলটি হালাকু খানের তাঁবুর নিকটবর্তী হলে একদল তাতারী পাহারাদার তাদের বাধা প্রদান করে। তারা কাউকে হালাকু খানের তাঁবুতে প্রবেশের অনুমতি দেয় না; বরং তারা বলে, খলিফার সঙ্গে মাত্র সতেরোজন প্রবেশ করবে। পাহারাদারদের ভাষ্যমতে অবশিষ্টদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। খলিফা সতেরো জনকে নিয়ে প্রবেশ করেন। অবশিষ্টদের কোনো কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় না; বরং সকলকে হত্যা করার জন্য বন্দী করা হয়!!

খলিফা ও তার সঙ্গীরা ছাড়া সবাইকে হত্যা করা হয়। নিহত হয় জাতির নের্তৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, মন্ত্রী পরিষদ, জ্ঞানীগুণীরা, বিশিষ্ট ফুকাহায়ে কেরাম ও উলামায়ে কেরাম।

খলিফাকে হত্যা করা হয়নি। কারণ, হালাকু খান তার মাধ্যমে কিছু স্বার্থ উদ্ধার করার ইচ্ছা করেছিল।

হালাকু খান গর্বভরে অহংকারবশত বিষয়গুলো প্রকাশ করতে থাকে।

খলিফা বুঝতে পারেন, দলের সবাইকে হত্যা করা হয়েছে। এতদিনে খলিফার কাছে তাতারীদের স্বভাব প্রকাশ পায়। তিনি বুঝতে পারেন, তাতারীদের কোনো প্রতিশ্রুতি নেই, তাদের নিরাপত্তা প্রদান মূলত বিপদের কারণ।

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً

> "তারা কোনো মুমিনের সঙ্গে আত্মীয়তা ও অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষা করে না।"[৪৫]

খলিফা একথাও বুঝতে পেরেছিলেন যে, অধিকার রক্ষার জন্য এমন শক্তি সঞ্চয় করা উচিত, যা অধিকারকে সুরক্ষিত রাখবে। সুতরাং যদি আপনি শক্তি সঞ্চয় না করার কারণে অধিকার খর্ব হয়, তবে নিজেকেই ধিক্কার দিন। কিন্তু আফসোস! খলিফা অনেক পরে তা বুঝতে পেরেছেন।

---

[৪৫] সুরা তাওবা : ১০।

হালাকু খানের পক্ষ থেকে কড়া আদেশাবলি

খলিফা বাগদাদবাসীকে নির্দেশ দেবেন, যেন তারা সকল অস্ত্র অর্পণ করে এবং কোনো প্রকার আন্দোলন বা প্রতিরোধ না করে। এটি একটি সহজ বিষয় ছিল। কারণ, বাগদাদবাসী অস্ত্রবহন করতে পারত না এবং তাতারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না।

খলিফাকে বন্দী করে বাগদাদ নিয়ে যাওয়া হবে। যেন তিনি তাতারীদেরকে আব্বাসীদের ধন-সম্পত্তির সন্ধান দেন। স্বর্ণ, রুপা, মূল্যবান আসবাবপত্র এবং রাজপ্রাসাদ ও বাইতুল মালের দামি জিনিসপত্রের সংবাদ দেন।

খলিফার চোখের সামনে তার দুই সন্তানকে হত্যা করা হবে। নির্দেশমতো তা-ই করা হয়। তার চোখের সামনে তার বড় ছেলে আহমদ আবুল আব্বাস ও মেঝো ছেলে আবদুর রহমান আবুল ফাজায়েলকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। আর তৃতীয় ছেলে মুবারক আবুল মানাকেবকে বন্দী করা হয়। অনুরূপ তিন কন্যা ফাতেমা, খাদিজা ও মারয়ামকেও বন্দী করা হয়।

বাগদাদ থেকে নির্দিষ্ট কতিপয় লোককে ডেকে আনা হয়। ইবনে আলকামী এদের নামের তালিকা হালাকু খানকে দিয়েছিলেন। তারা ছিল হাদীস বিশারদ। ভেতরে ভেতরে ইবনে আলকামী তাদের প্রচণ্ড ঘৃণা করত। বাস্তবেই তাদের সবাইকে ডেকে আনা হয়। তারা এক এক করে ঘর থেকে বের হয়। সঙ্গে তাদের সন্তান ও স্ত্রীরাও বের হয়। বাগদাদের বাইরে কবরস্থানের পাশে তাদের নিয়ে ছাগল জবাই করার মত জবাই করা হয়। আর তাদের স্ত্রী-সন্তানদের বন্দী কিংবা হত্যা করার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়। আপনি যেভাবেই দেখুন না কেন, এটি ছিল হৃদয়বিদারক মর্মন্তুদ ঘটনা।

এই প্রক্রিয়ায় বিশ্বের অন্যতম আলেমে দ্বীন, দারুল খেলাফতের উস্তাদ শায়েখ মুহিউদ্দীন ইউসুফ ইবনে শায়েখ আবুল ফরজ ইবনে জাওযী রহ. এবং তার তিন সন্তান আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান ও আবদুল করীমকেও জবাই করা হয়। মুজাহিদ উদ্দীন আইবেক ও তার সঙ্গী সুলাইমান শাহকে জবাই করা হয়, যে দুইজন বাগদাদে সর্বপ্রথম জিহাদের ডাক দিয়েছিলেন। জবাই করা হয় খলিফাতুল মুসলিমীনের উস্তাদ ও অভিভাবক সদর উদ্দীন আলী ইবনে নায়ার রহ. কে। এরপর মসজিদের খতিব, ইমাম ও হাফেজে কুরআনদের জবাই করা হয়!!

এসব কিছু খলিফার চোখের সামনে সংঘটিত হয়। খলিফা নিথর চোখে নির্মম জবাইযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করছিলেন। আমি জানি না, খলিফা ব্যথা, লজ্জা, লাঞ্ছনা ও ভয় কি গোপন করেছিলেন? নিঃসন্দেহে রাজ্য পরিচালনার রূপরেখা ভিন্ন হতো, যদি খলিফা জানতেন যে, শেষ পরিণাম এমন হবে। কিন্তু আল্লাহর অবধারিত নীতি—'অতীত কখনো ফিরে আসে না'। এরপর খলিফা দেখতে পান যে, হালাকু খান ইবনে আলকামীর সঙ্গে সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করছে। তাদের মাঝে গভীর বন্ধুত্ব। এতক্ষণে খলিফার সামনে এসব কিছুর রহস্য দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়। অযোগ্যকে দায়িত্ব প্রদানের ফলাফল তিনি জানতে পারেন। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে যায়!!

বাগদাদ দখল

বাগদাদবাসী অস্ত্র অর্পণ করা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সুবিশাল জামাত নিহত হওয়া এবং হালাকু বাহিনী বাগদাদের রাস্তা-ঘাট সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার পর হালাকু খান তার মূল টার্গেট বাস্তবায়ন শুরু করে। তা হলো, 'মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী বাগদাদ দখল।' বাগদাদ দখল অর্থ হলো, তাতারী বাহিনী বাগদাদে যা ইচ্ছা করতে থাকে। হত্যা, বন্দী, চুরি, অশ্লীল কর্ম, ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। মোটকথা তাতারী বাহিনীর পক্ষে যা যা করা শোভনীয় তারা তা-ই করে!!

বর্বর তাতারী বাহিনীর কীটপতঙ্গ মুসলমানদের শরীরে অনুপ্রবেশ করে।

সুবিশাল বাগদাদ নগরী তাতারীদের দখলে চলে যায়।

আল্লাহুম্মা লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

এই নগরী থেকে কত বাহিনী আল্লাহর পথে জিহাদ করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল!!

কত শত উলামায়ে কেরাম দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই নগরীতে দরসগাহ বানিয়েছিলেন!!

কত তালেবুল ইলম (ছাত্র) পৃথিবীর আনাচে-কানাচে থেকে ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে এই নগরীতে এসেছিলেন!!

আহ! হায় বাগদাদ! আজ তোমার জন্য কেউ বেঁচে নেই!
কোথায় খালেদ ইবনে ওয়ালিদ?
কোথায় মুছান্না ইবনে হারেছা?

কোথায় কা'কা' ইবনে আমর?
কোথায় নুমান ইবনে মুকরিন?
কোথায় সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস?
কোথায় সে মানবতার বাহাদুরী?
কোথায় মুসলিম প্রজন্মের বিবেক-বুদ্ধি?
কোথায় ইজ্জত-সম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ?
কোথায় জান্নাতাকাঙ্ক্ষী পবিত্র জামাত?
কোথায় আল্লাহর পথের যোদ্ধারা?
কোথায় তারা, যারা নিজেদের ইজ্জত-সম্মান, স্ত্রী-সন্তান, ঘর-বাড়ি ও ধন-সম্পত্তি রক্ষায় লড়াই করে?
কোথায়? কোথায়?!
কেউ নেই!!
আজ বাগদাদ মৃত লাশের জন্য উন্মুক্ত।
কোনো যুদ্ধ নেই, কোনো প্রতিবাদ নেই।

বাগদাদে কোনো পুরুষ বেঁচে নেই। আছে কেবল পুরুষরূপী কিছু কাপুরুষ!! সুবিশাল বাগদাদ নগরী দখল হয়ে যায়।

ইমাম আবু হানীফার শহর, ইমাম শাফেয়ীর শহর, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের শহর আজ তাতারীদের দখলে।

খলিফা মামুনুর রশিদের শহর আজ অন্যের দখলে, যিনি এক বছর হজ্ব করতেন, আরেক বছর জিহাদ করতেন।

দখল হলো রোমের অঞ্চল আমুরিয়ার বিজেতা খলিফা মু'তাসিম বিল্লাহর শহর।

পাঁচ যুগ পূর্বেকার ইসলামের প্রাণকেন্দ্র (রাজধানী) আজ বিজাতিদের দখলে!! তাতারীরা বাগদাদ নগরীতে এমন কাজ করেছে, যা কল্পনাও করা সম্ভব নয়।

তাতারীরা ঘরে ঘরে, বাগানে বাগানে, রাস্তা-ঘাটে, শহর-বন্দরে, মসজিদে মসজিদে মুসলমানদের খুঁজতে থাকে। মুসলমানদের ব্যাপকভাবে হত্যা করতে থাকে। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! মুসলমানরা পালাতে থাকে। ঘরের দরজা বন্ধ করে দরজা ধাক্কা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তাতারীরা দরজায় আগুন লাগিয়ে দেয় কিংবা দরজা ভেঙে ফেলে। এরপর ঘরে প্রবেশ করে। মুসলমানরা ভয়ে দৌড়ে বাড়ির ছাদে আশ্রয় নেয়। তাতারীরা পিছে পিছে ছাদে

ওঠে। এরপর সেখানেই মুসলমানদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। মুসলমানদের রক্তে শহরের ড্রেন-নালা ভেসে যায়।

তাতারীরা শক্তিশালী পুরুষদের হত্যা করেই ক্ষান্ত থাকে নি, বরং বৃদ্ধ ও অচলদেরও হত্যা করেছে। তারা মহিলাদেরও হত্যা করেছে। তবে কোনো মহিলাকে তাদের ভালো লাগলে বন্দী করে নিয়ে যেত। তাদের হত্যাকাণ্ড থেকে ছোটরাও রেহায় পায়নি—এমনকি দুগ্ধপোষ্য শিশুও। মোটকথা নারী-পুরুষ ও শিশু-বৃদ্ধ কারো প্রতিই এই পশুরা কোনো দয়া করে নি। যাকে পেয়েছে তাকেই খুন করেছে; পেট ফেড়ে গর্ভের সন্তান পর্যন্ত।

একদল তাতারী চল্লিশজন ছোট্ট শিশুকে রাস্তার কিনারা পড়ে থাকে দেখে। তাদের মায়েদের খুন করা হয়েছিল। এই পশুরা তাদেরও হত্যা করে!!

তাদের অন্তর ছিল পাথরের মতো। না, পাথরের চেয়েও কঠোর!!

নিহতের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে।

এক, দুই, তিন এভাবে দশদিন অতিবাহিত হলো। খুন, হত্যা বন্ধ হচ্ছিল না। অবিরাম ধ্বংসযজ্ঞ চলছিল। কিন্তু কোনো প্রতিরোধ কিংবা প্রতিবাদ নেই। মানুষের অন্তরে একথা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, তাতারীরা অপরাজেয়। তাদের পরাজিত করা সম্ভব নয়। তাদেরকে আঘাত করা সম্ভব নয়। হয়তো তারা কখনো মারা যাবে না।

এসব কিছু খলিফার উপস্থিতিতে সংঘটিত হচ্ছিল। খলিফা স্বচক্ষে এ আজাব প্রত্যক্ষ করছিলেন।

আপনি একটু ভেবে দেখুন, খলিফার উপস্থিতিতে এসব ঘটনা ঘটছে?!

একটু ভেবে দেখুন, খলিফা ইবনুল খুলাফা (খলিফার সন্তান খলিফা) আযীম ইবনুল উজামা (বাদশার ছেলে বাদশা) বন্দী অবস্থায় এসব মর্মন্তুদ ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিলেন!!

১. তার দুই সন্তানকে খুন করা হয়েছে।
২. তৃতীয় সন্তানকে বন্দী করা হয়েছে।
৩. তিন মেয়েকে বন্দী করা হয়েছে।
৪. রাজসভার মন্ত্রীদের হত্যা করা হয়েছে।
৫. শহরের সকল উলামায়ে কেরাম, খতিব ও হাফেজে কুরআনদের খুন করা হয়েছে।

৬. সবচেয়ে নিকটবর্তী মানুষ মুআইয়িদ উদ্দীন আলকামীর বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ পেয়েছে।

৭. তার সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে।

৮. তার ধন-সম্পত্তি, অর্থ-সম্পদ সবকিছু ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। শহর দখল হয়েছে।

৯. চোখের সামনে লক্ষ লক্ষ শহরবাসীকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে।

১০. আব্বাসী সাম্রাজ্যের রাজধানী জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিল্ডিং-প্রাসাদ বিধ্বস্ত করা হয়েছে।

১১. তাতারীরা নির্মম, নিষ্ঠুর, অকৃতজ্ঞ, কালো চেহারা নিয়ে গোটা বাগদাদে ছড়িয়ে পড়েছে। শস্যখেতে পঙ্গপাল ছড়িয়ে পড়ে শস্যখেত যেমন ধ্বংস করে ফেলে অনুরূপ তারা বাগদাদে ছড়িয়ে পড়ে বাগদাদকে ধ্বংস করে ছেড়েছে।

১২. শিকল পরানো হয়েছে তার গর্দানে, হাতে ও পায়ে এবং উটকে যেভাবে হাঁকিয়ে নেওয়া হয় তাকেও সেভাবে টেনে-হেঁচড়ে হাঁকিয়ে নেওয়া হয়েছে।

এসব কিছু খলিফা নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করছিলেন।

আফসোস আর আক্ষেপের কোনো অন্ত ছিল না।

নিঃসন্দেহে তিনি বার বার বলেছিলেন—

يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا

> "হায়! আমি যদি এর আগেই মারা যেতাম এবং সম্পূর্ণ বিস্মৃত বিলুপ্ত হয়ে যেতাম।"[৪৬]

নিঃসন্দেহে তিনি অনুতপ্ত হয়ে বলেছিলেন—

مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ

> "আমার অর্থ-সম্পদ আমার কোনো কাজে আসল না। আমার থেকে আমার সব ক্ষমতা লুপ্ত হয়ে গেল।"[৪৭]

নিঃসন্দেহে তিনি মনে মনে বলেছিলেন এবং তার অবস্থাও একথার সাক্ষ্য দিচ্ছিল—

---

[৪৬] সুরা মারইয়াম : ২৩।

[৪৭] সুরা হাক্কাহ : ২৭-২৮।

رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ

"হে আমার প্রতিপালক, আমাকে পুনরায় প্রেরণ করো। যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি পূর্বে করিনি।"[৪৮]

হায়! যদি আমি সৈন্যবাহিনীকে প্রস্তুত করতাম। তাদের শক্তিশালী বানাতাম!!

হায়! দ্বীনের শত্রুরা চারদিক থেকে যখন দ্বীনকে ঘিরে ফেলেছিল, তখন যদি আমি এ জাতিকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করতাম!!

হায়! যদি আমি মানুষের সামনে; বরং অন্তরে ইসলামকে সমুন্নত করতাম এবং ইসলাম তাদের জান-মালের চেয়ে তাদের কাছে অধিক মূল্যবান হতো!!
হায়! যদি আমি খেল-তামাশা, রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে দিতাম!!
হায়! যদি আমি সম্পদ সঞ্চয়ের জন্য বেঁচে না থাকতাম!!
হায়! যদি আমি প্রচুর বাঁদি না রাখতাম।
হায়! যদি আমি গানবাদ্য না শুনতাম।
হায়! যদি আমি উত্তম সঙ্গী নির্বাচন করতাম!!
হায়! যদি আমি উলামায়ে কেরামকে সম্মান করতাম, শত্রুদের বর্জন করতাম!!
হায়! আফসোস! হায়! আফসোস! হায়! আক্ষেপ!!

কিন্তু শিকলাবদ্ধ গর্দান, হাত, পা তাকে বাস্তবতার মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে। তিনি যেন একথা জানতে পারেন যে, অতীত কখনো ফিরে আসে না। সময় কখনো পেছনের দিকে ফিরে যায় না!

ইমাম আবু দাউদ ও আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

إذا تبايعتم بالعين، وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم.

"তোমরা যখন সুদি লেনদেন করবে, গরুর লেজ ধরবে (চতুষ্পদ জন্তু লালন করবে) চাষাবাদে সন্তুষ্ট থাকবে (অর্থাৎ জিহাদের সময় দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত থাকবে) এবং জিহাদ ছেড়ে দেবে, তখন আল্লাহ রব্বুল আলামীন তোমাদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন। যতক্ষণ তোমরা

---

[৪৮] সুরা মুমিনুন : ৯৯-১০০।

দ্বীনের দিকে ফিরে না আসবে, ততক্ষণ আল্লাহ এই লাঞ্ছনা দূর করবেন না।"[৪৯]

বাগদাদবাসী কৃষিকাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, রচনা-সংকলন এবং বিভিন্ন শিল্পকর্ম ইত্যাদি পেশায় জড়িত ছিল। এমনকি ইলম অর্জন ও বিতরণও তাদের পেশা ছিল। কিন্তু তারা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ বর্জন করেছিল। ফলে এর ফলাফল ছিল লাঞ্ছনা আর অপমান। যা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।

এটি প্রত্যেক মুসলমান নর-নারী, শাসক-শাসিত, ছাত্র-উস্তাদ, ছোট-বড় সকলের জন্য মূল্যবান শিক্ষণীয় বিষয়।

—সত্য প্রতিষ্ঠা ও হক আদায়ের জন্য শক্তি প্রয়োজন।

—অধিকার সহজলভ্য নয়; অধিকার আদায় করতে হয়। অধিকার আদায়ের পথে মূল্য ব্যয় করতে হয়।

—যারাই জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে, তারাই লাঞ্ছিত হয়েছে।

—মুসলমানদের শত্রুরা কখনো প্রতিশ্রুতি পূরণ করে না।

পদাঘাতে মৃত্যু

এবার খলিফাকে হত্যা করার পালা। হালাকু খান অসহায় খলিফাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। এমন সময় হালাকু খানের কতিপয় সহযোগী তাকে এক অদ্ভুত পরামর্শ প্রদান করে। তারা তাঁকে বলে, যদি মুসলিম খলিফার রক্ত মাটিতে প্রবাহিত হয়, তবে পরবর্তীতে মুসলমানরা বদলা নিতে চাবে; দীর্ঘদিন পরে হলেও। তাই খলিফাকে এমন পন্থায় হত্যা করা হোক, যাতে রক্ত মাটিতে প্রবাহিত না হয়। তলোয়ার ব্যবহারের কোনো প্রয়োজন নেই।

এটি এক ধরনের প্রতারণা। কারণ, মুসলমানরা শুধু খলিফা হত্যার নয়; বরং হালাকু খান ও তার বাহিনী যত মুসলমানকে হত্যা করেছে, তাদের প্রতিশোধ অবশ্যই গ্রহণ করবে। চাই যে পন্থায়ই তাদের হত্যা করা হোক। তবুও হালাকু খান তাদের কথায় কান দিল। সুবহানাল্লাহ! যেন আল্লাহর অভিপ্রায় এমনই ছিল। খলিফা এমন লাঞ্ছনাকর পন্থায় নিহত হলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো খলিফা এভাবে মৃত্যুবরণ করেননি। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে পৃথিবীর কোনো রাজা-বাদশার ব্যাপারে এমন লাঞ্ছনাকর ঘটনা শোনা যায়নি।

---

[৪৯] *আবু দাউদ : ৩৪৬২।*

হালাকু খান খলিফাকে 'পদাঘাতে খুন' করার নির্দেশ দিল!!

কার্যত খলিফাকে মাটিতে শোয়ানো হয়। আর তাতারী বাহিনী খলিফাকে লাথি মারতে শুরু করে।

পদাঘাত খলিফাকে মৃত্যুর কোলে পৌঁছে দেয়!!

আহ! কী ব্যথা! আহ! কী লাঞ্ছনা! আহ কী অপমান অপদস্থতা!

শরীর থেক রুহ পৃথক হওয়া পর্যন্ত তারা তাকে লাথি মারতে থাকে।

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

শুধু বাগদাদের পতন ঘটেনি!!

বাগদাদে আব্বাস গোত্রের সর্বশেষ খলিফারও পতন ঘটে।

সাথে সাথে গোটা বাগদাদবাসীর পতন হলো।

এটি ছিল ১৪ই সফর ৬৫৬ হিজরী তথা তাতারীদের বাগদাদ প্রবেশের দশম দিন।

খলিফা হত্যার পরও হত্যাকাণ্ড শেষ হয়নি। হালাকু খান (তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ নাজিল হোক) লাগাতার হত্যাকাণ্ড চলিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। বাগদাদ ছিল তৎকালীন বিশ্বের সর্ববৃহৎ শহর। তাই তাতারীরা এই শহরটিকে পরবর্তীদের জন্য 'শিক্ষণীয় শহর' বানাতে চাইল।

বাগদাদ পতনের পর আরও চল্লিশদিন অবিরাম হত্যাকাণ্ড চলল।

একটু ভেবে দেখুন! বাগদাদে নিহতের সংখ্যা কত হতে পারে?!

পুরুষ, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ মুসলমান নির্মম হত্যা করা হয়। মাত্র চল্লিশ দিনে লক্ষ লক্ষ মুসলমান খুন হয়!!

মাত্র চল্লিশদিনের মাঝে বাগদাদ লক্ষ লক্ষ অধিবাসী হারিয়েছে। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক ভয়াবহ ঘটনা।

একথা এজন্য উল্লেখ করছি যে, বর্তমানে মুসলমানগণ যেসব বিপদাপদ ও বালা-মসিবতের সম্মুখীন হয়, তা যত কঠিনই হোক না কেন তা পূর্ববর্তীদের বিপদ তুলনায় খুবই হালকা। আপনি দেখবেন, আল্লাহর ইচ্ছায় মুসলমানরা আবার ঘুরে দাঁড়াবে। এ থেকে বোঝা যায়, আল্লাহর ইচ্ছায় কোমর ভেঙে গেলেও আমরা আবার কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারি।

বাগদাদে কেবল খ্রিস্টানরাই খুনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল!!

সংখ্যাগরিষ্ঠ তাতারী যখন মুসলিম-নিধনে ব্যস্ত, নির্মম হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত, তখন একদল তাতারী ভিন্ন অপরাধকর্মে জড়িয়ে পড়ে। তারা এই অপরাধের মাধ্যমে মুসলিম জাতির অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করেছে, যা কোনো দিন পূরণ হওয়ার নয়। মুসলমানদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চা দেখে তাতারীদের গা জ্বলে যাচ্ছিল। তারা দেখল সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে মুসলমানরা তাদের চেয়ে বহুধাপ এগিয়ে। কারণ, মুসলমানদের জ্ঞানচর্চা, শিক্ষা-দীক্ষার রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। মুসলমানদের মাঝে জাগতিক ও পারলৌকিক বিভিন্ন শাস্ত্রে প্রায় দশ হাজার আলেম গুণীজন রয়েছেন। এ সকল বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ হাজার হাজার কিতাবাদি রচনার মাধ্যমে ইসলামী সভ্যতার বিশ্বময় বিস্তার ঘটিয়েছেন। অথচ তাতারীদের নেই কোনো সভ্যতা, না আছে কোনো সংস্কৃতি। তাদের মূল ভিত্তি বলতে কিছুই নেই। তারা তো হঠাৎ গজে ওঠা পরগাছা। যারা চীনের উত্তর মরুভূমিতে বেড়ে উঠেছে। তারা তো জংলি সভ্যতায় লালিত হয়েছে। তাই তো তারা জীবজন্তুর মতো লড়াই করে। এমনকি তারা জীবজন্তুর মতোই জীবনযাপন করে। এই পৃথিবীকে আবাদ করা কিংবা পৃথিবীর কল্যাণসাধনের কোনো ইচ্ছা তাদের নেই। তাদের বেঁচে থাকার মূল উদ্দেশ্য হলো জ্বালাও, পোড়াও, ধ্বংসযজ্ঞ ও হত্যাকাণ্ড। তাদের মাঝে ও উম্মতে মুসলিমার মাঝে বিস্তর ব্যবধান। এমনকি পৃথিবীর অন্য যেকোনো জাতি থেকে তারা বহুগুণ পিছিয়ে।

বাগদাদের ইতিহাসে যে ধ্বংসলীলা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, তা পৃথিবীর ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা মুশকিল নয়; বরং অসম্ভব।

পাপিষ্ঠ তাতারী বাহিনীর জঘন্য অভিপ্রায়

এই মানবরূপী পশুরা যেই জঘন্য অপরাধের ইচ্ছা করেছিল, তা হলো, বাগদাদের সুবিশাল গণপাঠাগারকে ধ্বংস করা। তা ছিল তৎকালীন বিশ্বের সর্ববৃহৎ পাঠাগার। এই পাঠাগারটি ছয়শো বছর যাবৎ মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার নির্যাস বহন করত। সকল বিষয়ের সকল শাস্ত্রের সব কিতাবাদি এই পাঠাগারে সংগ্রহ করা হয়েছিল—শরয়ী জ্ঞানশাস্ত্র যেমন : তাফসীর, হাদীস, ফেকাহ, আকীদা, আখলাক ইত্যাদি, সাধারণবিদ্যা যেমন : চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রকৌশলবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, ভূগোল ইত্যাদি শাস্ত্রের বহু মূল্যবান বইপত্র এই পাঠাগারে সংরক্ষিত ছিল। তা ছাড়া অসংখ্য

কবিতার কবিতাগুচ্ছ এবং দশ হাজারের মতো গল্প ও গদ্য সংগৃহিত ছিল। উল্লেখিত শাস্ত্রের যাবতীয় বইপত্রের সঙ্গে যদি আপনি গ্রিক, ফার্সি, হিন্দি বিভিন্ন ভাষায় রচিত কিতাবাদির অনুবাদগ্রন্থগুলোকেও মিলান, তাহলে সত্যিই আপনি তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম অলৌকিক বিষয় বলে এই পাঠাগারকে মূল্যায়ন করবেন।

যেকোনো দিক থেকে তুলনা করুন না কেন, বাগদাদ-পাঠাগার ছিল সুবিশাল বিশ্ববিখ্যাত পাঠাগার। স্পেনের কর্ডোভার পাঠাগারই একমাত্র পাঠাগার, যেটি বাগদাদের পাঠাগারের কিছুটা সাদৃশ্য রাখত। সুবহানাল্লাহ! বাগদাদের পাঠাগারের ওপর দিয়ে যে মহাপ্রলয় বয়ে গেছে, তা কার্ডোভার পাঠাগারের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল।

স্পেনের খ্রিস্টানদের হাতে ৬৩৬ হিজরীতে বাগদাদ পতনের বিশ বছর পূর্বে যখন কর্ডোভার পতন ঘটে, তখন তারা কর্ডোভার সম্পূর্ণ পাঠাগার জ্বালিয়ে দেয়। কামবিস নামক জনৈক হতভাগা খ্রিস্টান এই কাজ সম্পন্ন করে। হাজার হাজার মানুষ সারাজীবন ব্যয় করে যেসব বইপত্র কিতাবাদি রচনা করেছিল, যেসব বইপত্র-কিতাবাদি রচনা করতে গিয়ে প্রচুর ধন-সম্পত্তি, পরিশ্রম-মুজাহাদা ব্যয় হয়, সে মুহূর্তে সেসব বইপত্র-কিতাবাদি জ্বালিয়ে দেয়!! হায় এই তো হলো খ্রিস্টান ও তাতারীদের স্বভাব-চরিত্র।

তাতারীদের যুদ্ধ সভ্যতার বিরুদ্ধে, শহরের বিরুদ্ধে, ইসলামের বিরুদ্ধে; এমনকি সুস্থ মানবতার বিরুদ্ধে।

তাতারীরা বাগদাদের পাঠাগারকে কীভাবে ধ্বংস করেছিল, তা আলোচনা করার পূর্বে আসুন আমরা বাগদাদের পাঠাগার সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করি—

সুবিশাল বাগদাদ পাঠাগার

এই পাঠাগারটিকে প্রায় পাঁচ শতক ধরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পাঠাগার বলা হলে অত্যুক্তি হবে না।

আব্বাসী খলিফা হারুন-উর-রশীদ এই পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যিনি ১৭০ হিজরী থেকে ১৯৩ হিজরী পর্যন্ত মুসলিম সাম্রাজ্য শাসন করেছিলেন। অতঃপর খলিফাতুল মুসলিমীন মামুনুর রশীদের খেলাফতকালে [১৯৮-২১৮ হি.] বইপত্র কিতাবাদি বর্ধিত হয়। ধীরে ধীরে একপর্যায়ে এটি দারুল ইলম [জ্ঞানকেন্দ্র]-এ পরিণত হয়। এর ভেতরে কত কিতাবাদি আছে কেউ কল্পনা করতে পারবে না!!

আমরা আজ থেকে হাজার বছর পূর্বেকার জ্ঞানকেন্দ্রের কথা আলোচনা করছি, তখন সেখানে লক্ষ লক্ষ কিতাবাদি ছিল।

আমরা সেই যুগের আলোচনা করছি, যখন কোনো ছাপাখানা ছিল না। সে যুগে পাঠাগারে লক্ষ লক্ষ কিতাব থাকা সত্যিই আশ্চর্যতম বিষয়!! বর্তমান যুগের জন্য এটি খুব স্বাভাবিক ও সম্ভবপর বিষয়।

বাগদাদের পাঠাগারের কিতাবাদির নির্দিষ্ট সংখ্যা আমার জানা নেই। তবে অঙ্ক টানলে অবশ্যই কয়েক মিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে। কারণ, লেবাননের ত্রিপোলি পাঠাগারের—সেটা কখনো বাগদাদের পাঠাগারের সাদৃশ হবে না—তিন মিলিয়ন খণ্ড কিতাব ইউরোপের খ্রিস্টানরা জ্বালিয়ে দিয়েছিল। সুতরাং ভেবে দেখুন! বাগদাদের পাঠাগারের কিতাবাদির সংখ্যা কত বেশি হতে পারে!!

বাগদাদের পাঠাগারে বহুসংখ্যক কামরা ছিল। কয়েকটি কামরায় এক এক শাস্ত্রের কিতাবাদি রাখা হতো। ফিকাহ্‌শাস্ত্রের কিতাবাদি রাখার জন্য কয়েকটি নির্দিষ্ট কামরা ছিল। কয়েকটি কামরা ছিল চিকিৎসাশাস্ত্রের কিতাবাদির জন্য। অনুরূপ রসায়নশাস্ত্র, রাজনীতি ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের কিতাবাদির জন্য নির্দিষ্ট কামরা ছিল।

পাঠাগারটিতে বেতনভুক্ত কয়েকশো কর্মচারী ছিল, যারা পাঠাগারটি দেখাশোনা করত এবং সর্বদা এটি সংস্কারের কাজ করত। সেখানে একদল লিপিকার ছিলেন, যারা প্রত্যেকটি কিতাবের একাধিক কপি তৈরি করতেন। আরও ছিলেন একদল অনুবাদক, যারা অন্যভাষায় রচিত কিতাবাদি আরবি ভাষায় রূপান্তরিত করতেন। এছাড়াও একদল গবেষক ছিলেন, যারা পাঠকদের পাঠাগারের বিভিন্ন কিতাবাদির পরিচয়, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করতেন।

পড়াশোনার জন্য কয়েকটি নির্দিষ্ট কামরা ছিল। কয়েকটি নির্দিষ্ট কামরা ছিল ইলমী পর্যালোচনা ও সেমিনারের জন্য। কয়েকটি কামরা ছিল বিশ্রাম ও পানাহারের জন্য। এমনকি দূরবর্তী স্থান থেকে আগত ছাত্রদের জন্য অবস্থান করার জন্য কয়েকটি কামরা ছিল!!

এতক্ষণ আমরা যা আলোচনা করলাম, তা কেবল একটি সুসম্মৃদ্ধ পাঠাগারই নয়, বরং সুসমৃদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়!!

এই পাঠাগারটি তৎকালীন বিশ্বমানবতার চিন্তা-চেতনাকে লালন করত!!

খলিফা মামুনুর রশীদ রোমান সম্রাটের বিপক্ষে বিখ্যাত জয়লাভ করার পর সন্ধিচুক্তির সময় এই প্রস্তাব পেশ করেছিলেন যে, ইস্তাম্বুলের পাঠাগারে যেসব

কিতাবাদি রয়েছে, মুসলিম অনুবাদকদের যেনো সেসব কিতাবাদি অনুবাদের সুযোগ দেওয়া হয়। আব্বাসী খেলাফতের পক্ষ থেকে বেশ কিছু বেতনভুক্ত কর্মচারী ছিলেন, যাদের কাজ ছিল, সারা পৃথিবী ভ্রমণ করে জ্ঞানগর্ভ কিতাবাদি অনুবাদের উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করা, তা যে ভাষায়ই রচিত হোক না কেন। এরপর মুসলিম উলামায়ে কেরাম দেখে-শুনে সেই কিতাবগুলোকে পাঠাগারে রেজিষ্ট্রিভুক্ত করতেন। বাগদাদ পাঠাগারে গ্রিক, সুরিয়ানি, হিন্দি, ফার্সি, লেটিন, সংস্কৃত ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষার কিতাবাদি অনুবাদ করা হয়।

এই হলো বাগদাদ পাঠাগার!!

যেই পাঠাগারে তৎকালীন বিশ্বের সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিতাবাদি সংগৃহীত ছিল।

সুবিশাল বাগদাদ পাঠাগার : পাপিষ্ঠ তাতারী বাহিনীর জঘন্য হামলা

তাতারীরা এই মূল্যবান কিতাবসমূহ দাজলা [টাইগ্রিস] নদীতে নিক্ষেপ করে। কোটি কোটি কিতাব! তাতারীদের মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার কোনো অন্ত নেই। ধারণা করা হয়েছিল, তাতারীরা কিতাবাদিগুলো তুলে নিয়ে মঙ্গোলের রাজধানী করাকুরামে এই মূল্যবান জ্ঞানসমুদ্র থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য হেফাজত করবে। কিন্তু আজীবন সভ্যতার প্রাইমারি লেভেলেই রয়ে গেল। তারা তো বর্বর জাতি। পড়াশুনা জানে না। শিখতেও চায় না। ভোগ-বিলাস ও আনন্দ-উল্লাসই তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য।

গোটা বিশ্বকে ধ্বংস করা তাদের টার্গেট।

বিগত কয়েক শতাব্দীর পরিশ্রমকে তাতারীরা দাজলা [টাইগ্রিস] নদীতে ভাসিয়ে দিল। কিতাবের দোয়াতের কালি পানিতে মিশে গোটা দাজলা [টাইগ্রিস] নদীর পানি কালো হয়ে গিয়েছিল। [কথিত আছে, হালাকু খান মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পাঠাগারটি পুড়ে ছাই করে দেয়। সেই ছাই বাগদাদ নদীতে নিক্ষেপ করা হলে দীর্ঘ ছয় মাস দাজলা নদীর পানি কালো রঙ ধারণ করে।]

পাঠাগার ধ্বংস করে কেবল মুসলমানদের সঙ্গেই অপরাধ করা হয়নি; বরং গোটা মানবতার সঙ্গে অমার্জনীয় অপরাধ করা হয়েছে।

ইতিহাসে এই অপরাধ বার বার ঘটতে থাকে।

খ্রিস্টান ক্রুশেডাররা স্পেনের কর্ডোভার লাইব্রেরিতে এমন ঘটনাই ঘটিয়েছিল, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

খ্রিস্টান ক্রুশেডাররা গ্রানাডার গণপাঠাগারও ধ্বংস করেছিল। গ্রানাডা অধঃপতনের সময় তারা কয়েক মিলিয়ন কিতাব জ্বালিয়ে দেয়।

এভাবে স্পেনে খ্রিস্টানরা প্রায় দশবার বিভিন্ন পাঠাগার জ্বালিয়ে দেয়। যেমন টলেডো, ভ্যালেন্সিয়া, জারাগোজার ইত্যাদি পাঠাগার।

খ্রিস্টানরা ফিলিস্তিনের গাজা, কুদস ও আসকালানের পাঠাগারও ধ্বংস করেছিল।

ইউরোপীয় নব উপনিবেশবাদী, যারা উনিশ শতকে মুসলিমবিশ্বে অবতরণ করেছে, তারাও এই কাজ করেছিল। তবে তারা ছিল অত্যন্ত মেধাবী। তারা বই-পত্র চুরি করে ইউরোপে পাঠিয়ে দেয়। জ্বালিয়ে দেয় না। ধ্বংস করে না। ফলে আজ ইউরোপের পাঠাগারসমূহ পৃথিবীর মহামূল্যবান কিতাবাদি ও বই-পত্রে ভরপুর। যা মুসলিম পণ্ডিতগণ দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী যাবৎ রচনা করেছেন। এতে কেউ সন্দেহ পোষণ করে না যে, ইউরোপের পাঠাগারসমূহে সংরক্ষিত ইসলামী বই-পত্রের সংখ্যা মুসলিম দেশসমূহে সংরক্ষিত বইপত্রের চেয়ে বহুগুণ বেশি।

ইসলামের শত্রুদের ইচ্ছা ছিল, মুসলিম উম্মাহকে দ্বীনী জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করা। চাই কিতাবাদি জ্বালিয়ে কিংবা নদীতে ভাসিয়ে বা চুরি করে হোক অথবা (বর্তমান সময়ের মতো) পাঠদান পদ্ধতির মাঝে পরিবর্তন সৃষ্টি করে। কারণ ইসলামের শত্রুরা দ্বীন ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল্য খুব ভালোভাবে জানে। তারা জানে, জ্ঞান-বিজ্ঞানই হলো মুসলমানদের মূল শক্তি। সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে কোনো জাতিকে দূরে ঠেলে দিলে সে জাতির মেরুদণ্ড এমনিতে ভেঙে যায়।

চলুন, আমরা আবার তাতারীদের আলোচনায় ফিরে যাই—

তাতারীরা বাগদাদের সুবিশাল পাঠাগার ধ্বংস করে দৃষ্টিনন্দন ও চোখজুড়ানো প্রাসাদগুলোর দিকে দৃষ্টি দেয়। অধিকাংশ প্রাসাদ জ্বালিয়ে দেয় এবং ভেঙে ফেলে। মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি করে। আর যেসব বস্তু তারা বহন করতে পারেনি, সেগুলো জ্বালিয়ে দেয়!! এভাবে একপর্যায় অধিকাংশ ঘর-বাড়ি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ধ্বংসাবশেষ থেকে আগুনের লেলিহান শিখা ও ধোঁয়া উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে। টানা চল্লিশদিন পর্যন্ত এই ধ্বংসযজ্ঞ চলতে থাকে। বাগদাদের প্রধান সড়কগুলো মৃতলাশে ভরে যায়। শহরময় লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাস্তাঘাট রক্তে রঞ্জিত লালবর্ণ ধারণ করে। গোটা শহর নীরব নিস্তব্ধ পড়ে

থাকে। কেবল উন্মাদ তাতারীদের হাস্যধ্বনি কিংবা অবলা নারী-শিশুদের বুকফাটা আর্তনাদ শোনা যায়।

হালাকু খান লাশের দুর্গন্ধে মহামারি ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করে। (কারণ, লক্ষ লক্ষ লাশ দাফনহীন রাস্তায় পচে-গলে গিয়েছিল।) তাই হালাকু সৈন্যবাহিনীকে মহামারির হাত থেকে বাঁচার জন্য নিম্নবর্তী পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করে—

এক.

তাতারী বাহিনী বাগদাদ থেকে বের হয়ে উত্তর ইরাকের অন্য শহরে আশ্রয় নেবে। বাগদাদের আশপাশে ছোট্ট একটি বাহিনী থাকবে, যেখানে মহামারি ছড়াবার আশঙ্কা নেই।

দুই.

হালাকু খান বাগদাদে সাধারণ নিরাপত্তা ঘোষণা করে। সুতরাং এই চল্লিশদিন পর আর কোনো মুসলিমকে এলোপাতাড়িভাবে হত্যা করা হবে না। তাতারীরা এই নিরাপত্তা প্রদানের পর অবশিষ্ট আত্মগোপনকারী মুসলমানরা নিহত মুসলমানদের দাফন করার জন্য বের হয়ে আসে। কিন্তু এদ্‌সংখ্যক লাশ দাফন করা বিরাট সময়সাপেক্ষ ছিল। যদি সময়মতো এই কাজ সম্পন্ন না হয়, তবে আবহাওয়া নষ্ট হয়ে যাবে। কেবল বাগদাদ নয়, বরং গোটা ইরাক ও সিরিয়া—এমনকি সর্বত্র দুরারোগ্য ব্যাধি তথা মহামারি ছড়িয়ে পড়বে। মুসলমান তাতারী—কেউ এই মহামারির হাত থেকে রক্ষা পাবে না। তাই হালাকু খান মুসলমানদের মাধ্যমে লাশগুলো দাফন করাতে ইচ্ছা করল।

বাস্তবেই যারা খন্দক, কবর ও গোপন কূপে লুকিয়েছিল, তারা বের হয়ে আসেন। তাদের চেহারা, রঙ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল, শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এমনকি নিজেরাই নিজেদের চিনতে পারছিল না!!

সবাই পচা লাশের মাঝে ছড়িয়ে পরে আপনজনদের লাশ খুঁজতে শুরু করে। কেউ ছেলে, কেউ ভাই, কেউ বাবা আবার কেউ নিজের মাকে খুঁজতে থাকে!!

মহা বিপদ!

মুসলমানরা লাশ দাফন করতে শুরু করে। কিন্তু হালাকু খান যে মহামারির আশঙ্কা করেছিল তা-ই ছড়িয়ে পড়ল। ফলে এই দুরারোগ্য মহামারিতে অসংখ্য মুসলমান মৃত্যুবরণ করল। ইবনে কাছীর রহ. এর ভাষায়—

'যারা طعن [তআন : মার] থেকে রক্ষা পেয়েছিল, তারা طعون [তউন : মহামাারি] থেকে রক্ষা পায়নি।'

এটি ছিল বাগদাদের নতুন আরেক দুর্ঘটনা। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

তিন.

মুআইয়িদ উদ্দীন আলকামীকে তাতারীদের পক্ষ থেকে বাগদাদের গভর্নিং কাউন্সিলের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত হালাকু খান প্রদান করেছিল, তা বাস্তবায়ন করা হলো। তবে মুআইয়িদ উদ্দীন কেবল বাহ্যিকভাবেই বাগদাদের শাসক নিযুক্ত হয়। প্রকৃত ক্ষমতা ও নেতৃত্ব মূলত তাতারীদেরই ছিল। এমনকি সে শাসক হওয়ার পর তাতারীদের কর্তৃত্ব বহুগুণে বেড়ে যায়। নবনিযুক্ত বাগদাদ-প্রধান লাঞ্ছনার শিকার হয়। তবে এই লাঞ্ছনা ও অপমান হালাকু খানের পক্ষ থেকে ছিল না। এসব ছিল তাতারী বাহিনীর পক্ষ থেকে। মুআইয়িদ উদ্দীন শাসক হয়েও তাতারীদের অনুসারী হয়ে বেঁচে থাকে।

জনৈক মুসলিম মহিলা তাকে অশ্বারোহী অবস্থায় দেখতে পেল, তাতারী বাহিনী দ্রুত ঘোড়া চালানোর জন্য তাকে ধমক দিচ্ছে এবং ঘোড়াকে চাবুক মারছে। এটি অবশ্যই বাগদাদ শাসকের জন্য অতি লাঞ্ছনাকর। এদেখে মুসলিম মেধাবী মহিলা তাকে সম্বোধন করে বলল, 'বনু আব্বাস কি তোমার সঙ্গে এমন আচরণ করত?

মুসলিম মহিলা এই বক্তব্যের মাধ্যমে তার সম্বিত ফিরিয়ে দিল। তাকে ফিরে তাকাতে বাধ্য করল তার কৃতকর্মের প্রতি এবং তার গোত্রের প্রতি। বনু আব্বাসের শাসনামলে সে ছিল সম্মানের পাত্র। অন্যের চেয়ে সে অগ্রগামী ছিল। বাগদাদের সকলে তার কথা মান্য করত। এমনকি খলিফাতুল মুসলিমীন পর্যন্ত।

আর এখন! হায় হতভাগ্য! তাতারী বাহিনীর সাধারণ সদস্য, যাদের নাম পর্যন্ত কেউ জানে না, এমনকি হালাকু খানও যাদের চেনে না, তারাও তাকে লাঞ্ছিত করছে। হে বন্ধুরা, যারা নিজেদের দ্বীন, দেশ এবং নিজেকে বিক্রি করে দেয়, শত্রুদের কাছে তারা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। এটাই পৃথিবীর নীতি। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে শত্রুদের কাছে কারও কোনো মূল্য থাকে না। শত্রুদের উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেলে আপনি তাদের কাছে মূল্যহীন। তাই সাবধান! শত্রুদের পক্ষাবলম্বন ভারি ভয়ংকর!

মুসলিম মহিলার এই কথাটি মুআইয়িদ উদ্দীনের মনে রেখাপাত করে। সে বিষণ্ন অবস্থায় ঘরে ফিরে আসে। নীরবে ঘরে অবস্থান করে। দুশ্চিন্তা, পেরেশানি ও বিষণ্নতা তাকে ঘিরে ফেলে। সে ভেবে দেখল, তাতারীদের আগমনে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে তাদের অন্যতম। হতে পারে সে এখন বাগদাদের শাসক। কিন্তু সে ক্ষমতাহীন শাসক। সে একটি বিধ্বস্ত শহরের শাসক। সে মৃত ও অসুস্থদের শাসক!!

বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী মুআইয়িদ উদ্দীন এই নব লাঞ্ছনাকে সহ্য করতে পারছিল না। তাই শ্বাসরুদ্ধকর ও বেদনাকাতর কয়েকদিন পর সে নিজ ঘরে ইন্তেকাল করে।

তাতারীরা বাগদাদে অনুপ্রবেশের মাত্র কয়েক মাস পর সে ইন্তেকাল করে। এটি ৬৫৬ হিজরীর ঘটনা। সে তার শাসনক্ষমতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যা রাজত্বের মাধ্যমে কোনোরূপ উপকৃত হতে পারে না। মুআইয়িদ উদ্দীন পরবর্তী সকল বিশ্বাসঘাতকদের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে থাকে।

وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

"যে সকল জনপদ জুলুমে লিপ্ত হয়, তোমার প্রতিপালক যখন তাদের ধরেন, তখন তাঁর ধরা এমনই হয়ে থাকে। বাস্তবিকই তার ধরা অতি মর্মন্তুদ, অতি কঠিন।"[৫০]

তারপর তাতারীরা তার ছেলেকে বাগদাদের শাসক নিযুক্ত করে। ছেলে বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকারস্বরূপ বিশ্বাসঘাতকতা লাভ করেছিল। সুবহানাল্লাহ! যেন এই পদটি পরবর্তীদের জন্য অশুভ হয়েছে। এর অল্প কিছুদিন পরই সেও ইন্তেকাল করে। সে বাগদাদ পতনের বছর তথা ৬৫৬ হিজরীতেই ইন্তেকাল করে।

আশ্চর্যিত হবেন না!

যারাই দুনিয়াকে আঁকড়ে ধরেছে, দুনিয়া তাদের ধ্বংস করে ছেড়েছে। খলিফা দুনিয়াকে আঁকড়ে ধরেছিলেন, ফলে তিনি ধ্বংস হয়েছেন।

বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী দুনিয়াকে আঁকড়ে ধরেছিল, সেও ধ্বংস হয়েছে।

মন্ত্রীর ছেলে দুনিয়া আঁকড়ে ধরেছিল, সেও ধ্বংস হয়েছে।

---

[৫০] সুরা হুদ : ১০২।

বাগদাদবাসী দুনিয়াকে আঁকড়ে ধরেছিল বিধায় তারা সবাই ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতইনা চমৎকার বলেছেন! ইমাম তিরমিযী রহ. হযরত আমর ইবনে আউফ রা. সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> فو الله ما الفقر أخشى علي كم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم
>
> "আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের জন্য দরিদ্রতার আশঙ্কা করি না। আমি আশঙ্কা করি দুনিয়া তোমাদের ওপর এমনভাবে ছেয়ে যাবে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ছেয়ে গিয়েছিল। ফলে পূর্ববর্তীদের মতো তোমরাও দুনিয়া নিয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে। ফলশ্রুতিতে পূর্ববর্তীদের ন্যায় দুনিয়া তোমাদের ধ্বংস করবে।"[৫১]

ইতিমধ্যে বাগদাদ পতনের সংবাদ সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

তবে মুসলিমবিশ্বের জন্য বাগদাদ পতন ছিল চরম দুঃসংবাদ, যা সহ্য করা ছিল খুবই কঠিন। বাগদাদ কোনো সাধারণ শহর ছিল না। তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ শহর ছিল বাগদাদ। সেখানে তিন কোটিরও বেশিসংখ্যক মুসলমান বসবাস করত। তা ছিল তৎকালীন বিশ্বের শিক্ষা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা ও আধুনিকতার প্রধান কেন্দ্র। তা ছিল ইসলামের প্রাচীন সুরক্ষিত সীমান্ত শহর। সবচেয়ে বড় কথা হলো, তা ছিল ইসলামী খেলাফতের রাজধানী।

বাগদাদ পতনের অর্থ কী?

বাগদাদ পতন কী অশুভ বার্তা প্রদান করে?

সবাই নিজেদের এই কঠিন প্রশ্নটি করত।

খলিফা নিহত হওয়া, অন্য কোনো খলিফা নির্ধারণ না হওয়া, কিসের সংবাদ প্রদান করে?

---

[৫১] *মুসলিম* : ২৯৬৫, *তিরমিযী*: ২৪৬২।

এটি আরেকটি কঠিন প্রশ্ন।

খেলাফত ও খলিফা ব্যতীত দুনিয়া মুসলমানদের কিছুই দেয়নি। আব্বাসী খেলাফতের শেষ বছরেও খেলাফত সাম্রাজ্য দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও কেবল বাগদাদ ও ইরাকের কিছু অংশের ওপর খেলাফত টিকে থাকা সত্ত্বেও খেলাফতই মুসলমানদের শক্তি ছিল। কারণ, খেলাফত মুসলমানদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

যদি খেলাফত টিকে থাকে, নিভু নিভু হলেও অবশ্যই এমন সময় আসবে যখন খেলাফত স্বীয় মহিমায় জাগ্রত হবে, মুসলমানগণ খেলাফতের পতাকাতলে এসে একত্রিত হবে। পক্ষান্তরে খেলাফত টিকে না থাকলে মুসলমানদের একত্রিত হওয়া খুবই কঠিন; বরং অতি দুরূহ ব্যাপার।

খেলাফত টিকে না থাকা বড় বিপদ! খলিফা না থাকা মহা বিপদ!

খলিফাশূন্য পৃথিবী!!

আমরা আল্লাহর দরবারে এই মুনাজাত করি, যেন তিনি মুসলমানদের খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়ার উপর টিকিয়ে রাখেন।

বাগদাদ পতনের পর মুসলমানদের মাঝে এক অদ্ভুত আকীদা ছড়িয়ে পড়ে। চতুর্দিকে একটি গুঞ্জরন ছড়িয়ে পড়ে। খুব দ্রুত এই ভ্রান্ত আকীদাটি ছড়িয়ে পড়ে। মানবস্বভাব হলো, অদ্ভুদ বস্তুর প্রতি তারা দ্রুত কান দেয়!

তাদের মাছে ছড়িয়ে পড়ে যে, তাতারী আগমন, মুসলমানদের পরাজয় ও বাগদাদ পতন হলো কেয়ামতের নিদর্শন এবং অতি শীঘ্রই তাতারীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সহযোগিতা ও নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য হযরত মাহদী আ. এর আবির্ভাব ঘটবে!!

আমি [লেখক] বলব, অবশ্যই কোনো একদিন হযরত মাহদী আ. এর আবির্ভাব ঘটবে। অবশ্যই একদিন হযরত ঈসা আ. এর শুভাগমন ঘটবে। একদিন অবশ্যই কেয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে। এ সবকিছুই এমন বিষয়, যা অবশ্যই সংঘটিত হবে, অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু নির্দিষ্ট করে কি কেউ বলতে পারে যে, কখন এসব ঘটবে? কেউ তা জানে না।

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا

"লোক তোমাকে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, বলে দাও, এর জ্ঞান কেবলই আল্লাহরই কাছে আছে। তোমার কী করে জানা থাকবে? হয়তো কেয়ামত নিকটেই এসে পড়েছে।"[৫২]

পরাজয় ও বিপদের মুহূর্তে এসব অবান্তর ভিত্তিহীন কথা ছড়ানোর কারণ কী? এর কারণ একটাই। তা হলো, মানুষ যখন পুরোপুরি ভেঙে পড়ে, তখন আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য কামনা করে। তখন মানুষের এই একীন হয়েছিল যে, হালাকু খান ও তার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে মুসলমানদের লড়াই করার ক্ষমতা নেই। তাই তারা আরেকটি সমাধানের পথ (পরিত্রাণের পথ) অবলম্বন করে। তাই তারা হযরত মাহদী আ. এর আবির্ভাবের প্রত্যাশায় দিন কাটায়। তাঁর আগমনকালে তারাও তার সঙ্গে মিলে লড়াই করবে। এর পূর্বে লড়াই করার ক্ষমতা তাদের নেই।

কিছুক্ষণ পরই আমরা এ বিষয়ে পর্যালোচনা করব।

আমরা অলৌকিক কিছু প্রত্যক্ষের জন্য অপেক্ষা করছি।

অধঃপতন, হতাশা, নিরাশা; এর কোনোটিই মুমিনদের গুণাবলি নয়।

إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

"তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হোয়ো না। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহর রহমত থেকে কেবল তারাই নিরাশ হয়, যারা কাফের।"[৫৩]

কেউ যদি আপনাকে এই সংবাদ প্রদান করে যে, আপনি হযরত মাহদী আ. এর আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন। তাহলে আপনার একথাও জেনে রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ তা'আলা আপনার আমল অনুযায়ী আপনাকে প্রতিদান দান করবেন। মাহদী আ. এর যুগে বেঁচে থাকলেই খাতেমা বিল খায়ের হবে না। কেউ যদি আপনাকে সংবাদ প্রেরণ করে যে, হযরত মাহদী আ. আগমন করেছেন, তাহলেই আপনি হযরত মাহদী আ. এর দলভুক্ত হতে পারবেনা। কারণ, তাঁর দলবলও মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন কর্তৃক নির্বাচিত। এই নির্বাচন এলোপাতাড়ি কোনো নির্বাচন নয়। এই নির্বাচন হবে ঈমান ও আমল অনুযায়ী। আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদের তার দ্বীনের কাজে ব্যবহার করেন।

---

[৫২] সূরা আহযাব : ৬৩।

[৫৩] সূরা ইউসুফ : ৮৭।

এই ছিল বাগদাদ পতনের পর সামগ্রিক ইসলামী মননশীলতার অবক্ষয়।

তাহলে একটু ভেবে দেখুন, খ্রিস্টান বিশ্বের পতন কীরূপ ছিল?

মুসলিমবিশ্বের পতনে খ্রিস্টানবিশ্ব আনন্দে-উল্লাসে মেতে ওঠেছিল। এটি খুবই স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। যেমনটি বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের প্রারম্ভে বর্ণিত হয়েছে, হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে প্রধান বিশ্ব পরাশক্তি তিন ভাগে বিভক্ত ছিল—

১. মুসলিম পরাশক্তি
২. খ্রিস্টান পরাশক্তি
৩. তাতারী পরাশক্তি।

মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যকার যুদ্ধ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছিল। অপর দিকে তাতার বাহিনী মুসলিম পরাশক্তির কারণে খুব ব্যথিত ছিল।

উপরন্তু সর্বশেষ আক্রমণে খ্রিস্টানরা তাতারীদের সহযোগিতা প্রদান করেছে বিধায় তারা যারপরনাই আনন্দিত ছিল। আর্মেনিয়া, জুর্জিয়া ও আন্তাকিয়া তাতারী অধ্যুষিত এলাকায় পরিণত হয়েছিল। তাদের আনন্দের আরেকটি বড় কারণ ছিল, তাতারীরা প্রথমবারের মতো তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিল। কারণ তাতারীরা তাদের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিল যে, বাগদাদে তারা তাদের কোনো কষ্ট দিবে না। তাতারীরা এই প্রতিশ্রুতি যথাযথভাবে রক্ষা করেছিল। এমনকি হালাকু খান খ্রিস্টানকুল নেতা মাকিকাকে উপহার উপঢৌকন দিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছিল। দাজলা [টাইগ্রিস] নদীর তীরে তাকে আব্বাসী রাজপ্রাসাদের মধ্য থেকে একটি শাহী মহল প্রদান করেছিল। তাকে তার ব্যক্তিগত উপদেষ্টা ও গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য বানিয়েছিল।

হালাকু খানের এই সদাচরণের কারণে খ্রিস্টানরা উৎফুল্লচিত্তে বলেছিল, তাতারীরা আল্লাহর সৈন্য, যারা মাসীহের শত্রুদের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আবির্ভূত হয়েছে। মাসীহের শত্রু বলে তারা মুসলমানদের বুঝিয়েছে। অথচ কিছুদিন পূর্বে তাতারীরা ইউরোপ খ্রিস্টানদের হত্যা করেছে। বোঝা গেল, খ্রিস্টানদের উক্তি মিথ্যা ও অবান্তর। তাতারীরা যখন মুসলমানদের খুন করছিল, তখন খ্রিস্টানরা পুরোপুরি ভুলে গিয়েছিল, ইতিপূর্বে তাতারীরা তাদের সঙ্গে কী আচরণ করেছিল। যেমন বর্তমানে ইহুদীরা মুসলমানদের হত্যা করার সময় খ্রিস্টানরা ভুলে গিয়েছে, ইতিপূর্বে তাদের সঙ্গে ইহুদীরা কী করেছে?

মনে রাখবেন, সর্বদা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতেই থাকবে।

তাতারীদের সম্পর্কে খ্রিস্টানদের প্রশংসাবাণী এবং মুসলমানদের সম্পর্কে তাদের যে বিদ্বেষবাণী তা কথার কথা, মিথ্যা ও অবান্তর। এটা সেই বিদ্বেষ, যা স্পেনের গ্রানাডা পতনের পর সৃষ্টি হয়েছিল। সুবহানাল্লাহ! যে ব্যক্তি 'গ্রানাডার পতন' অধ্যয়ন করবে, সে ব্যক্তি গ্রানাডা পতন ও বাগদাদ পতনের মাঝে আশ্চর্য মিল খুঁজে পাবে, যা ইতিহাস অধ্যয়নের অধিক গুরুত্ব প্রদান করে। কারণ, ইতিহাস বারংবার পুনরাবৃত্ত হতে থাকে। কখনো কখনো মানুষ তা বুঝতে পারে না!!

সিরিয়া আক্রমণ

বাগদাদ পতনের গল্প এখানেই শেষ। এরপর বাগদাদ থেকে তাতারীরা বেরিয়ে পড়ে। বাগদাদ পতনের ফলাফলকে সামনে রেখে খ্রিস্টান-মুসলমান, তাতার সকলেই নিজেদের জীবনপাতা সাজাতে থাকে।

কিন্তু হালাকু খান বাগদাদ থেকে পারস্যের হামাদান শহরে ফিরে আসে। এরপর (বর্তমান ইরানের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত) উরসিয়া নদীর তীরে অবস্থিত শাহা নামক দুর্গের দিকে মনোনিবেশ করে। আব্বাসী রাজমহল, মুসলমানদের ধন-সম্পদ, ব্যবসায়ীদের ঘর-বাড়ি ও অর্থবানদের থেকে যা কিছু লুণ্ঠন করেছিল, সেগুলো সে এই দুর্গের ভেতরে রাখে।

স্বাভাবিকভাবেই বাগদাদ পতন শেষে হালাকু খান পরবর্তী আক্রমণ নিয়ে ভাবতে থাকে। ইরাকের পর তাতারীদের নিশানা হলো সিরিয়া। এতে কোনো সন্দেহ নেই। ফলে হালাকু খান সিরিয়ার ভৌগলিক অবস্থান নিয়ে পড়াশুনা শুরু করে।

যে সময় হালাকু খান সিরিয়ার ভৌগলিক অবস্থান নিয়ে গবেষণা করছিল এবং এ সমস্ত মুসলিম এলাকার দুর্বল ও শক্তিশালী দিকগুলো নির্ণয় করছিল, সে সময় কতিপয় মুসলিম নেতৃবর্গ তাদের যাবতীয় সহায়-সম্পত্তি তাতারীদেরকে প্রদান করে। নামধারী মুসলিম বাহিনীগুলো নতুন বন্ধু তাতারী সম্রাট হালাকু খানের সঙ্গে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়। তারা স্লোগান দিতে শুরু করে 'হালাকু খান শান্তিকামী বিশ্বনেতা'।

তখনো বাগদাদে নিহত মুসলমানদের রক্ত শুকায়নি। তারা এমন কোনো ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়নি যে, হালাকু খানের সঙ্গে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হতে হবে। তাহলে কী কারণে তারা এ পথ বেছে নিল? তাদের মুখ থেকেই শুনুন—

'হালাকু খান ও আমাদের মাঝে বিরাট দূরত্ব বিরাজ করছিল। তাই নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। (তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলে তো প্রাণে বাঁচা যাবে, অন্যথায় প্রাণ হারাতে হবে।) কমপক্ষে তাদের অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকা যাবে।

وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا

"নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে এমন কেউ থাকবে, যে জিহাদে বের হতে গড়িমসি করবে। তারপর জিহাদকালে তোমাদের কোনো মসিবত দেখা দিলে বলবে, আল্লাহ আমার ওপর বড় অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম না।"[৫৪]

নিঃসন্দেহে এসকল নেতৃবর্গ খুব সৌভাগ্যবান ছিলেন। কারণ, তারা আব্বাসীদের সঙ্গে 'বাগদাদ বাঁচাও' যুদ্ধে শরিক ছিলেন না এবং এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে, তারা নিজ নিজ প্রজাদের সামনে নিজেদের বিজ্ঞজন হিসেবে জাহির করেছে। কারণ, তারা প্রজাদের যুদ্ধের বিভীষিকাময় পরিস্থিতি থেকে দূরে রেখেছেন! আর নিশ্চয়ই তাদের বক্তব্য ছিল খুবই শক্তিশালী, জ্বালাময়ী ও দুঃসাহসী।

وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ

"তারা যখন কথা বলে, তুমি তাদের কথা শুনতে থাকো। তারা যেন কোনো কিছুতে হেলান দেওয়া কাঠ।"[৫৫]

নিশ্চয়ই তৎকালীন বহু আলেম তাদের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তাদের কর্মসূচিকে বরকতময় বলে ব্যক্ত করেছেন এবং প্রজাদের তাদের অনুসরণ করতে উৎসাহিত করেছেন। তাদের সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে বলেছেন!

নিশ্চয়ই তারা তাদের সামনে হাদীসের ভাণ্ডার থেকে মনঃপূত বহু উপমা পেশ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ তারা তাদের বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদায়বিয়ার মুশরিকদের সঙ্গে সন্ধি করেছেন। তাহলে এখন আমরা কেন তাতারদের সঙ্গে সন্ধি করব না? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় ইহুদীদের সঙ্গে সন্ধি করেছেন। তাহলে আমরা বাগদাদে কেন তাতারদের সঙ্গে সন্ধি করব না... ইত্যাদি। উপরন্তু তাতাররা আমাদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করতে চাচ্ছে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে বলেন—

---

[৫৪] সুরা নিসা : ৭২।

[৫৫] সুরা মুনাফিকুন : ৪।

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"আর তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে তোমরাও সেদিকে ঝুঁকে পড়বে এবং আল্লাহর ওপর নির্ভর করবে। নিশ্চয়ই তিনি সকল কথা শুনেন। সকল কিছু জানেন।"[৫৬]

আর তাতারীরা তো সন্ধির জন্য আমাদের দিকে ঝুঁকছে!

তোমরা কি শরীয়তসম্মত বিরোধ করতে চাও!?

তোমরা কি রক্তপাত ঘটাতে চাও!?

তোমরা কি দেশকে বিরান করতে চাও!?

তোমরা কি দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু বানাতে চাও!?

পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার কাজ সেটাই, যা আমাদের নেতা করেছেন তথা তাতারীদের সঙ্গে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া।

যেন আমরা মানবপ্রেমের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারি!! সুবহানাল্লাহ!

يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

"তাদেরই মধ্যে একদল লোক এমন আছে, যারা কিতাব পড়ার সময় নিজেদের জিহ্বাকে পেঁচায়, যাতে তোমরা (তাদের পেঁচিয়ে তৈরি করা) সে কথাকে কিতাবের অংশ মনে করো। অথচ তা কিতাবের অংশ নয় এবং তারা বলে এটা আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ। অথচ তা আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ নয় এবং এভাবে তারা জেনেশুনে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে।"[৫৭]

যে সকল নের্তৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ দুরু দুরু বুকে কোমল হৃদয় নিয়ে এসেছিল। তাতারী সম্রাট হালাকু খান কি তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল?! এবং দুঃসাহসী নেতৃবৃন্দ বন্ধুবর হালাকু খানের সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করতে এসেছিল?

মসুলের আমীর বদর উদ্দীন লুলু।

---

[৫৬] সুরা আনফাল : ৬১।

[৫৭] আল ইমরান : ৭৮

আলাতোলিয়া অঞ্চল বর্তমান মধ্য ও পশ্চিম থেকে কালাজ আরসালান রাবে' ও কেকেভাস ছানী।

দামেস্ক ও আলেপ্পোর আমীর (সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর নাতি) নাছের ইউসুফ।

আলেপ্পোর আমীর আশরাফ আইয়ূবী।

এই সকল আমীর-উমারাগণ হালাকু খানের সামনে উত্তর ইরাক, সিরিয়া ও তুরস্কের বিশালতা ও গুরুত্ব তুলে ধরেন। ফলে হালাকু খানের সমস্যা নিমেষেই সমাধান হয়ে যায়। কোনোরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ ব্যতীতই তাতারীদের হাতে মুসলিম দেশসমূহ বিজিত হয়।

হালাকু খানের সামনে দুটি বাধা

প্রথম বাধা

প্রথম বাধা ছিল জনৈক আইয়ূবী নেতা। যদিও তিনি হালাকু খানের সঙ্গে শান্তিচুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং সবশেষে তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। হালাকু খান তাকে জঙ্গিগোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে গণ্য করে। যে এই অঞ্চলের অস্তিত্বকে বিনাশ করতে চায়। নিশ্চয়ই হালাকু খান বলেছিল, এই লোক ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করে না। কারণ, ইসলাম হলো ক্ষমা, সমবেদনা, দয়া, ভালোবাসা ও শান্তির ধর্ম।

এই মহান মুসলিম নেতা, যিনি নিজ ব্যক্তিত্ব, আত্মমর্যাদা ও দ্বীনদারীর মাধ্যমে দ্বীন হেফাজতে অকুণ্ঠচিত্ত ছিলেন, তিনি হলেন 'মিয়াফারিকীন' অঞ্চলের আমীর কামেল মুহাম্মদ আইয়ূবী রহ.।

মিয়াফারেকীন শহরটি বর্তমানে তুরস্কের পূর্বে 'ওয়ান' নদীর পূর্বে অবস্থিত। তুরস্কের পূর্বাঞ্চল, পাশাপাশি দাজলা [টাইগ্রিস] ও ফুরাত নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত আলজেরিয়া অঞ্চল আমীর কামেল আইয়ূবীর সৈন্যবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ছিল। অর্থাৎ কামেল আইয়ূবী রহ. ইরাকের উত্তর পশ্চিম ও সিরিয়ার উত্তর পূর্ব অঞ্চল শাসন করতেন। সুতরাং সিরিয়ার ভৌগলিক অবকাঠামোর আলোকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, সিরিয়ায় আক্রমণের জন্য অবশ্যই আমীর কামেল রহ. এর কর্তৃত্বধীন অঞ্চল দখল করতে হবে। এছাড়া হালাকু খানের সম্মুখে দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। তাই এর জন্য প্রয়োজন হলো এ অঞ্চলের আমীর-উমারাদের আনুগত্য প্রদর্শনে (প্রয়োজনে) বলপ্রয়োগে বাধ্য করা।

এই ছিল হালাকু খানের সামনে প্রথম বাধা। বাস্তবিকই এটি একটি বড় বাধা ছিল। উপরন্তু মিয়াফারেকীন শহরটি হলো অত্যন্ত সুরক্ষিত ও শক্তিশালী শহর, যা মৃতসাগরের পর্বতশ্রেণির মধ্যখানে অবস্থিত। অধিকন্তু মুসলিম গোত্ররা বিদ্রোহী কামেল আইয়ূবীর সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করেছিল।

দ্বিতীয় বাধা :

এটি অপেক্ষাকৃত সহজ ও হালকা বাধা। তা হলো, সে সকল মুসলিম আমীর-উমারা হালাকু খানের সঙ্গে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছে, তাদের কামনা ছিল তারা স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করবে, নিজ দেশে স্বায়ত্তশাসন করবে, যদিও তারা তাতারীদের ছত্রছায়ায় থাকবে। অথচ হালাকু খানের ইচ্ছা ছিল, সে নিজের মতো করে পরিপূর্ণভাবে এই অঞ্চল শাসন করবে। যাকে ইচ্ছা প্রশাসনে নিয়োগ দেবে, যাকে ইচ্ছা বরখাস্ত করবে। এক্ষেত্রে হালাকু খান কাউকে নিজের সহযোগী পায়নি।

কিন্তু হালাকু খান সম্পর্কে একথা সুপ্রসিদ্ধ রয়েছে যে, সে যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিকে উত্তম পন্থায় নিজের মতো করে নিতে পারে। সে সর্বপ্রথম কামেল মুহাম্মদ আইয়ূবীর পদক্ষেপকে ধূলিসাৎ করাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করল। এরপর সিরিয়ার দিকে মনোনিবেশ করবে। তখন যদি কোনো সংগ্রামী নেতা তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তবে সে তার প্রতি অতি সহজ স্বভাবসুলভ আচরণ প্রদর্শন করবে!!

এই সংকট থেকে মুক্তি পেতে হালাকু খানের প্রয়াস

মিয়াফারেকীন অবরোধ

হালাকু খান অতি সহজভাবে কামেল মোহাম্মদ আইয়ূবীর বিদ্রোহ দমন করতে শুরু করল। সে তার জিহাদী প্রেরণাকে দমিত করার লক্ষ্যে শর্তহীন আত্মসমর্পণ করার এবং অন্যান্য মুসলিম আমীরদের দলভুক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে দূত পাঠাল। দূত নির্বাচনে হালাকু খান ছিল খুবই বিচক্ষণ। সে কোনো তাতারী দূত পাঠায়নি। সে 'কাসীস ইয়াকুবী' নামক জনৈক আরবী খ্রিষ্টানকে দূত হিসেবে পাঠায়। কারণ, খ্রিষ্টান দূত এক দিক থেকে কামেল মোহাম্মদকে তার গোত্রীয় ভাষায় বোঝাতে সক্ষম হবে, হালাকু খানের সংবাদ, তার ক্ষমতা ও শক্তি সহজেই বোঝাতে পারবে। অন্যদিকে, যেহেতু সে একজন খ্রিস্টান,

তাই কামেল মোহাম্মদ সহজেই বুঝতে পারবে যে, খ্রিষ্টানরা তাতারীদের সহযোগিতা প্রদান করছে। এটি ছিল হালাকু খানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রণকৌশল। কারণ, আপনি যদি তৎকালীন মিয়াফারেকীন সাম্রাজ্যের ভৌগলিক অবস্থান প্রত্যক্ষ করেন, তাহলে দেখতে পাবেন, মিয়াফারেকীনের চতুর্দিক থেকে খ্রিস্টান দ্বারা পরিবেষ্টিত। পূর্বদিকে আর্মেনিয়া (খ্রিস্টান) সাম্রাজ্য, যা তাতারীদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। উত্তর পূর্বাঞ্চলে জুজিয়া সাম্রাজ্য। তারা খ্রিস্টান ও তাতারীদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ।

সুতরাং ভৌগলিক অবস্থানের দিক থেকে মিয়াফারেকীন মুনাফিক ও মুশরিক সাম্রাজ্যবেষ্টিত একটি ছোট্ট উপত্যকা।
পূর্বে খ্রিস্টান আর্মেনিয়া সাম্রাজ্য।
উত্তরপূর্বে খ্রিস্টান জর্জিয়া সাম্রাজ্য।
দক্ষিণপূর্বে তাতারীদের সহোদর মসুল সাম্রাজ্য।
পশ্চিমে তাতার প্রতিনিধি সেলজুকী সাম্রাজ্য।
দক্ষিণ পশ্চিমে তাতার প্রতিনিধি আলেপ্পো সাম্রাজ্য।
সুতরাং মিয়াফারেকীন সাম্রাজ্য ভৌগলিক দিক থেকে বড় ভয়াবহ!!

হালাকু খানের খ্রিস্টান দূতের সঙ্গে কামেল মোহাম্মদ রহ. কী করলেন

তিনি দূতকে বন্দী করে হত্যা করলেন!

দূতহত্যা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। তবুও কামেল আইয়ূবী রহ. হালাকু খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়ার জন্য এবং বাগদাদের নির্মম হত্যাযজ্ঞের প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতি মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য এ কাজ করেছেন। তা ছাড়া তাতারীরা কখনোই আইনের কোনো তোয়াক্কা করেনি।

তাতারদূত কাসীস ইয়াকুবের হত্যা কামেল মোহাম্মদ রহ. এর পক্ষ থেকে হালাকু খানের প্রতি খোলা চিঠি ছিল। এতে হালাকু খান বুঝতে পেরেছিল কামেল মোহাম্মদ রহ. কে ধ্বংস করা ব্যতীত সিরিয়ায় প্রবেশ করা যাবে না। [দূতহত্যার নীতিমালা সামনে আসবে—ইনশাআল্লাহ!]

হালাকু খান এই বিষয়টির প্রতি খুব গুরুত্বারোপ করেন। এটি ছিল হালাকু খানের মোক্ষম সুযোগ। তাই সে কালক্ষেপণ না করে দ্রুত বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করে। নিজ সন্তান আশমুত ইবনে হালাকুকে সেনাপতি নিযুক্ত করে।

মসুলের আমীর তার দেশ দিয়ে অতিক্রমের সুযোগ করে দিলে তারা প্রকাশ্যে মিয়াফারেকীনের উদ্দেশে রওনা হয়।

আশমুত ইবনে হালাকু বিশাল বাহিনী নিয়ে মিয়াফারেকীন সাম্রাজ্যের প্রধান ঘাঁটির দিকে রওয়ানা হয়, যা মিয়াফারেকীনেই অবস্থিত। যে ঘাঁটিতে কামেল মোহাম্মদ রহ. নিজেও অবস্থান করতেন। কামেল মোহাম্মদ আইয়ূবী রহ. তার সকল বাহিনীকে এই ঘাঁটিতে একত্রিত করেছিলেন। কারণ, যদি সৈন্যবাহিনীকে চতুর্দিক ছড়িয়ে দেন, তাহলে বিপুলসংখ্যক তাতারী বাহিনীর মোকাবেলা করা সম্ভব হবে না।

যা ঘটার ছিল তা-ই ঘটল। তাতারীরা মিয়াফারেকীন অবরোধ করল এবং পূর্বদিক থেকে আর্মেনিয়া ও জর্জিয়া সাম্রাজ্যও মিয়াফারেকীন অবরোধ করার জন্য এগিয়ে এল। এটি ছিল বাগদাদ পতনের চার মাস পর ৬৫৬ হিজরীর রজব মাসে সংঘটিত ঘটনা।

অপরাজেয় মিয়াফারেকীন শহর প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। শহরের আনাচে কানাচে প্রতিবাদের তীব্র দাবানল দাউ দাউ করে। মোহাম্মদ আইয়ূবী রহ. প্রাণপণ লড়াইয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন।

তিনি ছিলেন নিকৃষ্টের মাঝে উৎকৃষ্টতর (গোবরে পদ্মফুল)!!

কাপুরুষদের মাঝে বীরপুরুষ!!

মূর্খদের বস্তিতে সঠিক চিন্তার ধারক-বাহক! ... যদি বলি গণ্ডমূর্খদের মাঝে, তবুও অত্যুক্তি হবে না।

অবরোধকালে পার্শ্ববর্তী মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর পক্ষ থেকে সাহায্য সহযোগিতা আসা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এমন হয়নি। কোনো রকম খাবার-দাবার, অস্ত্র-শস্ত্র বা চিকিৎসাসামগ্রী তাদের কাছে আসেনি। মুসলিম নেতৃবর্গগণ নিজ ভাই-বোন, ছেলে-সন্তান, বাপ-দাদা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে নব পরাশক্তি তথা তাতারীশক্তির প্রতি নতজানু হয়েছিল।

জাতির এই মানসিক বিপর্যয় দেখে আমি সত্যিই অভিভূত হই!! সেদিন জাতি কোথায় ছিল? কোথায় ছিল জাতির মনুষ্যত্ব?!

যখন শাসকবর্গ নৈতিক অবক্ষয়ে নিমজ্জিত, তখন জাতি কেন নীরব ছিল?! কেন তারা নিজেদের ভাইদের দ্বীন-ধর্ম কিংবা রক্ত-বংশ রক্ষার্থে জেগে ওঠেনি?!

জাতি নীরব ছিল। তাদের নীরবতা তাদেরকে ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছে—

এক.

ফলশ্রুতিতে জনগণ কোনোভাবে বেঁচে থাকতে চেয়েছিল। বেঁচে থাকাই ছিল মূল লক্ষ্য।

দুই.

সকল অঞ্চলের মানুষের মগজধোলাই প্রক্রিয়া চলমান ছিল। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, শাসকবর্গ, মন্ত্রীপরিষদ ও তাদের দরবারি আলেমগণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জনগণকে সান্ত্বনা প্রদান করেছিল এবং তাদের দমিয়ে রেখেছিল। এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে, তারা মোহাম্মদ আইয়ূবী রহ. এর নিন্দা জ্ঞাপন করে বেড়াত, যিনি নিজ মর্যাদা, জাতির মর্যাদা এমনকি মুসলমানদের মর্যাদা রক্ষায় লড়ে গেছেন।

নিঃসন্দেহে অনেক বক্তার আবির্ভাব ঘটেছিল, যারা বলত—

"জাতিকে ধ্বংস করার চেয়ে কামেল মোহাম্মদের উচিত সরে দাঁড়ানো।"!

অথবা কেউ বলত, "কামেলা মোহাম্মদ যদি অস্ত্র অর্পণ করতেন, তাহলে সকল সমস্যার সমাধান হতো। কিন্তু তিনি পৃথিবীর পরাশক্তি তাতারীদের থেকে অস্ত্র গোপন করছেন। তিনি এমন এক ভুলের শিকার, যা মিয়াফারেকীনবাসীকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে।"

এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে, হালাকু খান চিঠি পাঠিয়ে একথা বলেছিল, হালাকু কামেল মোহাম্মদকে অপসারণের জন্য আগমন করেছে। মিয়াফারেকীনবাসীর সঙ্গে তার কোনো শক্রুতা নেই। হালাকু খান সবার সঙ্গে মিলে-মিশে থাকতে চায়।

এই ছিল মগজধোলাই পদ্ধতি, যা জাতির বীরত্বকে অবদমিত করেছে। সাহসিকতা ও ব্যক্তিত্বকে গলা টিপে হত্যা করেছে।

তিন.

আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ, কথা-বার্তা, চিঠি-পত্র ইত্যাদির মাধ্যমে সে দমিত হবে না। তার দমন-প্রক্রিয়া হবে তরবারি।

জনগণ শাসকদের পক্ষ থেকে জুলুম-অত্যাচার, নিপীড়ন ও দুঃশাসনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। মানুষ শাসক ও শাসিত শ্রেণির মধ্যকার ঘৃণাবোধের মাঝে বসবাস করছে।

এই লজ্জাজনক ও বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে আমরা বুঝতে পারি, কেন মিয়াফারেকীন সাম্রাজ্য পূর্ণতা পাবে? কেন মুসলিম জাতি মৃত্যুর উপকণ্ঠে দাঁড়িয়ে থাকলেও শাসক ও পার্শ্ববর্তী মুসলিম সাম্রাজ্যগুলো কোনো হরকত করে না?!

তখন আমরা বুঝতে পারব, মসুলের আমীর বদর উদ্দীন লুলু, সেলজুকী আমীর কেকেভাস ছানী ও কালাজ আরসালান রাবে' কী লাঞ্ছনাকর পরিস্থিতে দিনাতিপাত করছিল! আর আলেপ্পো ও দামেস্কের আমীর নাছের ইউসুফ আইয়ূবী লাঞ্ছনা ও অপমানের যে চরম শিখায় সময় পার করছিলেন, তা বুঝে উঠা বড়ই কঠিন!!

কামেল মোহাম্মদ আইয়ূবীর সঙ্গে নাছের ইউসুফ আইয়ূবীর গভীর সম্পর্ক ছিল। দ্বীন-ধর্মের সম্পর্ক, প্রতিবেশীর সম্পর্ক, আলেপ্পোর রাজনৈতিক সম্পর্কের উর্ধ্বে। কারণ, মিয়াফারেকীন আলেপ্পোর উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। সুতরাং যদি মিয়াফারেকীনের পতন ঘটে, তাহলে এর পরই হবে আলেপ্পোর পালা। তাদের মাঝে ছিল রক্তের সম্পর্ক, বংশের সম্পর্ক। কারণ, তারা উভয়ই আইয়ূবী (তথা তারা উভয়ই আইয়ূব বংশদ্ভূদ)। তাদের দাদা ইসলামী বীরসেনা সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর যুগ বেশি দিন পূর্বে অতিবাহিত হয়নি। সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর ইন্তেকালের এখনো সত্তর বছর অতিবাহিত হয়নি। [সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী ৫৮৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন] মুসলমানদের শত্রুদের বিরুদ্ধে তার শক্ত অবস্থানের কথা জাতি এখনো ভোলেনি। তথাপি তার নাতি নাছের ইউসুফের অবস্থা এতটা লাঞ্ছনাকর হলো কী করে?!

এটি একটি জটিল প্রশ্ন? নাছের ইউসুফের পক্ষে এই প্রশ্নের সন্তোষজনক কোনো উত্তর নেই; না শরীয়তসম্মত, না যুক্তিসঙ্গত।

কামেল মোহাম্মদ রহ. নাছের ইউসুফ আইয়ূবীর কাছে সাহায্য কামনা করলে তিনি কোনোরূপ চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই সম্পূর্ণরূপে তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি সবকিছু বিক্রি করে বিনিময়ে তাতারীদের ভালোবাসা ক্রয় করেছেন। একাজ করার মুহূর্তে তিনি জানতেন না যে, তাতারীদের কথার কোনো মূল্য নেই। তারা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না। তা ছাড়া তাতারীরা প্রতিশ্রুতিপরায়ণ হলেও কি

তিনি মুসলমানদের তাতারীদের কাছে বিক্রি করতে পারেন? বিনিময়ে তারা সারা দুনিয়া প্রদান করলেও?!

নাছের ইউসুফ কামেল মোহাম্মদ রহ. কে সহযোগিতা প্রদান না করেই ক্ষান্ত হননি, মিয়াফারেকীন অবরোধে অংশগ্রহণ করেই ক্ষান্ত হননি, বরং তার সন্তানের মাধ্যমে হালাকু খানের কাছে এই মর্মে চিঠি প্রেরণ করেন যে, সে যেন তাকে মিশর আক্রমণে এবং দাস বংশের হাত থেকে মিশর দখল করার ক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা প্রদান করে!!

পাঠকবৃন্দ, একটু ভেবে দেখুন, মুসলিমবিশ্বের এহেন বিপর্যস্ত মুহূর্তে নাছের ইউসুফ তাতারীদের কাছে মিশর আক্রমণের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করছেন!!

নাছের ইউসুফ চিঠি প্রেরণের সময় নববন্ধু হালাকু খানের জন্য মূল্যবান হাদিয়া-তোহফা, উপহার-উপঢৌকন পাঠাতে ভোলেননি।

আল্লাহর কী মহিমা! নাছের ইউসুফ খাল কেটে কুমির আনলেন!!

অন্যান্য সকল আমীরগণ নিজেরাই সশরীরে হালাকু খানের দরবারে এসেছে। কিন্তু নাছের ইউসুফ সশরীরে গমন না করে ছেলেকে পাঠিয়েছেন। হালাকু খান এটিকে তার পক্ষ থেকে এক প্রকার ঔদ্ধত্য মনে করে। পাশাপাশি মিশর আক্রমণের জন্য সাহায্য কামনা করাকে হালাকু খান তার পক্ষ থেকে অহংকার বোধ করে। কারণ, হালাকু খান সিরিয়া ও মিশর উভয় অঞ্চলকে তার সাম্রাজ্যভুক্ত করার ইচ্ছা করেছিল। নাছের ইউসুফের এই অহমিকা ও দুঃসাহস দেখে হালাকু খান অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে। নাছের ইউসুফের কাছে জ্বালাময়ী ভাষায় একটি চিঠি প্রেরণ করে। এতকিছুর পরেও আযীয ইবনে নাছের ইউসুফ হালাকু খানের দলে থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে!!

এটি আশ্চর্যের কিছুই নয়!! কারণ, এ তো নাছের ইউসুফ নামক সিংহের সিংহশাবক!!

হালাকু খান কর্তৃক দামেস্ক ও আলেপ্পোর শাসক নাছের ইউসুফের নিকট প্রেরিত চিঠিটি পাঠ করলে একথা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, হালাকু খানের দরবারে এমন কতিপয় মুসলিম সাহিত্যিক ছিলেন, যারা হালাকু খানের চিন্তা-ভাবনাকে বিশুদ্ধ আরবি ও উৎকৃষ্ট যুগোপযোগী ভাষাশৈলীর মাধ্যমে পত্রস্থ করত।

হালাকু খান তার চিঠিতে লেখে—

“আলেপ্পোর অধিপতি নাছের ইউসুফের জানা উচিত, আমি আল্লাহর মদদে বাগদাদ জয় করেছি, সেখানকার যোদ্ধাদের হত্যা করেছি, ঘর-বাড়ি, প্রাসাদ-অট্টালিকাসমূহ বিধ্বস্ত করেছি, জনগণকে বন্দী করেছি। যেমন মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে বলেন—

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ

‘রানি বলল, প্রকৃত ব্যাপার হলো, রাজা-বাদশাগণ যখন কোনো জনপদে ঢুকে পড়ে, তখন তাকে ধ্বংস করে ফেলে এবং তার মর্যদাবান বাসিন্দাদের লাঞ্ছিত করে ছাড়ে। এরাও তো তা-ই করবে।’[৫৮]

আমি তথাকার খলিফাকে উপস্থিত করে কিছু কাজ করতে বললে সে তা অস্বীকার করে। ফলে সে লজ্জিত হয় এবং আমি তাকে নির্মূল করে দিই। সে অনেক মূল্যবান সম্পত্তি সঞ্চয় করেছিল। সে ছিল নিকৃষ্ট। তাই সম্পদ জমা করেছিল। অথচ অন্যদের কোনো খোঁজ-খবর রাখত না। সে খ্যাতি লাভ করেছিল। সর্বত্র তার নাম-ধাম ছড়িয়ে পড়েছিল। আমি পূর্ণাঙ্গতা ও পরিপূর্ণতা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

إذا تم أمر دنا نقصه توقع زوالاً إذا قيل تم

إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعم

وكم من فتى بات في نعمة فلم يدر بالموت حتى هجم

“পূর্ণতা লাভ করলে ধ্বংস নিকটবর্তী হয়।

ধ্বংসের অপেক্ষা করো যখন বলা হবে তুমি পূর্ণতা লাভ করেছ।

নেয়ামত থাকতে যত্ন নাও। পাপকর্ম নেয়ামত ধ্বংস করে দেয়।

কমবখতরা বিলাসিতায় মত্ত ছিল। আকস্মিক মৃত্যুতে ধ্বংস হয়েছে, বুঝতে পারেনি।”

আমার এই চিঠি হাতে পাওয়ামাত্রই লোকজন, ধন-সম্পত্তি সবকিছু নিয়ে ভূপৃষ্ঠের সুলতান, যাকে রাজাধিরাজ বলা হয়, তার পানে দ্রুত রওয়ানা করবে।

---

[৫৮] সুরা নামল : ৩৪।

তাহলে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পারবে এবং কল্যাণের নিকটবর্তী হবে। যেমন আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন বলেন—

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى

"আর এই যে, মানুষ নিজের প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য কোনো কিছুর (বিনিময় লাভের) হকদার হয় না এবং এই যে তার চেষ্টা অচিরেই দেখা যাবে। তারপর তার প্রতিফল তাকে পুরোপুরি দেওয়া হবে।"[৫৯]

আর আমার দূতদের বাধাগ্রস্ত করবে না যেমন ইতিপূর্বে করেছিলে। ন্যায়সঙ্গত পন্থায় আটকে রাখবে নতুবা উত্তম পন্থায় ছেড়ে দেবে। আমি সংবাদ পেয়েছি সিরিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলে অনেক ব্যবসায়ী মিশর অভিমুখে পলায়ন করেছে (বাস্তবেই তা-ই ঘটেছিল, তাতারীদের আগমনবার্তা শুনে অনেক ব্যবসায়ী মিশরের দিকে পলায়ন করেছিল) যদি তারা পাহাড়ে আরোহণরত হয়, তবে তাদের নিক্ষেপ করে হত্যা করব। আর যদি তারা জমিনে চলমান হয়, তবে ভূমিধসে তাদের ধ্বংস করব।

أين النجاة ولا مناص لهارب ولي البسيطان الندى والماء

ذلت لهيبتنا الأسود وأصبحت في قبضتي الأمراء والوزراء

"মুক্তি কোথায়? পলায়নকারীর কোনো পরিত্রাণ নেই।
বাগানের নিকটবর্তী হয়েছে শিশির বিন্দু ও জলরাশি।
আমার ভয়ে তারা হতবিহ্বল হয়ে ধরা পড়েছে।
আমীর-উমারা ও শাসকবর্গদের হাতে।"

এই ছিল হালাকু খানের কম্পন সৃষ্টিকারী চিঠি!!

চিঠি পড়ে নাছের ইউসুফ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন!! এখন তিনি কী করবেন?!

নাছের ইউসুফ কর্তৃক জিহাদের ঘোষণা

নাছের ইউসুফ হালাকু খানের চক্রান্ত বুঝতে পারলেন। সে তার কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ কামনা করছিল এবং তাকে এ সংবাদ প্রদান করেছিল যে, যেসব ব্যবসায়ী ও সাধারণ জনগণ পালিয়েছে, সে তাদেরও ধরে আনবে। হালাকু খান

---

[৫৯] সুরা নাজম : ৩৯-৪১।

তাকে হতভাগা আব্বাসী খলিফার নির্মম পরিণতির কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। তাহলে কি তিনি সবকিছু হালাকু খানকে অর্পণ করবেন? পরবর্তীতে তার জন্য কী অবশিষ্ট থাকবে? ক্ষমতা ও রাজত্বের নেশা হালাকু খানের শিরা-উপশিরায় ধাবমান। যদি হালাকু খান তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে, তাহলে তাঁর কী বাকি থাকবে?!

তাই নাছের ইউসুফ রহ. দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তিনি অনন্যোপায় হয়ে তাতারীদের বিরুদ্ধে জীবনের মায়া ভুলে জিহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

অথচ সবাই জানত, নাছের ইউসুফ জিহাদের উপযুক্ত নন। জিহাদ করার জন্য যে দ্বীন-ধর্ম, আকীদা-বিশ্বাস, ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যদার প্রয়োজন, তা তার মাঝে নেই। তবুও তিনি তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দিলেন!!

এটি ছিল এমন ব্যক্তির হাস্যকর প্রত্যাবর্তন, যিনি দুই-এক মুহূর্তের ক্ষমতার জন্য সবকিছু বিক্রি করে দিতে অভ্যস্ত ছিলেন!

এটা কী ঘটল?!!

নাছের ইউসুফ দেশের পতাকা উত্তোলন করলেন। পতাকার গায়ে 'আল্লাহু আকবার' লিখলেন। তার বাহিনীকে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করলেন!!

নাছের ইউসুফ জিহাদের ঘোষণা দিচ্ছেন?!

নাছের ইউসুফ যিনি ইতিপূর্বে লুইস তাসে' ফ্রান্সের রাজাকে বাইতুল মাকদিস অর্পণের শর্তে মিশর যুদ্ধে সহযোগিতা কামনা করেছিলেন, তিনি জিহাদের ঘোষণা দিচ্ছেন!!

নাছের ইউসুফ যিনি তাতারীদের বাগদাদ প্রবেশে সহযোগিতা করেছেন, তিনি জিহাদের ঘোষণা দিচ্ছেন!!

নাছের ইউসুফ যিনি মিয়াফারেকীনের আমীর কামেল মোহাম্মদ আইয়ূবী রহ. থেকে পৃথক হয়েছেন। খাবার দিয়েও তাকে সহযোগিতা করেননি, তিনি জিহাদের ঘোষণা দিচ্ছেন!!

নাছের ইউসুফ যিনি কয়েকদিন পূর্বেও হালাকু খানের কাছে মিশর যুদ্ধের জন্য সহযোগিতা কামনা করেছিলেন, তিনি জিহাদের ঘোষণা দিচ্ছেন!!

নাছের ইউসুফ এসব পচা ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও জিহাদের ঘোষণা দিচ্ছেন!!

হায়! হাস্যকর ঘটনা!!

বন্ধুরা! আল্লাহ্ ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজ সফল হতে দেন না

إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ

"আল্লাহ্ ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজ সফল হতে দেন না।"[৬০]

নাছের ইউসুফ জনগণের আবেগ নিয়ে খেলতামাশা করত। তার অসৎ চরিত্র, বিভ্রান্ত আকীদা ও অদূরদর্শিতা সম্পর্কে জনগণ সম্যক অবগত ছিল। কতিপয় মুসলমানের চরম নির্বুদ্ধিতা ছিল, তারা বিশ্বাস করেছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তার হাতে ইসলামের জয় ঘটাবেন।

তিনি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ নয়, বরং ক্ষমতা ও অস্তিত্ব রক্ষার পথে জিহাদের ডাক দিয়েছিলেন।

কতিপয় অতি উৎসাহী নাছের ইউসুফের ডাকে সাড়া দেয়। তারা তার পতাকাতলে জিহাদ করতে আসে। কিন্তু ইতিহাস ও বাস্তবতা একথার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে যে, যুদ্ধের মুখোমুখি মুহূর্তে নাছের ইউসুফ পলায়ন করবেন। রণভূমিতে নাছের ইউসুফ বেশিক্ষণ অবস্থান করতে পারবেন না; বরং যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেই তিনি পলায়ন করবেন। সেই মুহূর্তটি অতিউৎসাহী লোকদের ব্যথিত করবে। তারা কঠিন অধঃপতনের শিকার হবে। তাদের উচিত নিজেদের মাঝে একটু বোঝাপড়া করা। আমীরের পলায়নের পর পরাজয় মেনে নেওয়া তাদের বড় ভুল নয়। তাদের বড় ভুল হলো নাছের ইউসুফের প্রতি এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, তিনি জিহাদের পতাকা বহন করতে পারবেন!!

বন্ধুরা, আপনারা জিহাদের ডাক শুনলে, কে ডাক দিচ্ছে তাকে ভালোভাবে পরখ করবেন। কারণ, জিহাদ ইসলামের শীর্ষস্থানীয় আমল। সর্বমহৎ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ জিহাদের সত্য ডাক দিতে পারেন না।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, নাছের ইউসুফ জিহাদের ডাক দিয়ে দামেস্কের উত্তরে বারযা নামক গ্রামে তাঁবু গেড়েছেন। অথচ উচিত ছিল সেনাবাহিনী নিয়ে আলেপ্পো নগরীর দিকে অগ্রসর হওয়া। আলেপ্পো তার সাম্রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং হালাকু খানের মুখোমুখি হওয়ার জন্য সিরিয়ায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। অথবা উচিত ছিল মিয়াফারেকীনের উদ্দেশে সদলবলে রওনা হওয়া। যাতে কামেল মোহাম্মদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়ে মুসলিম শক্তি বৃদ্ধি

---

[৬০] সূরা ইউনুস : ৮১।

করতে পারেন। কিন্তু নাছের ইউসুফ এ দুইয়ের কোনোটাই করেননি; বরং তিনি দামেস্কে তাঁবু গেড়েছেন। যাতে হালাকু খান আসলে পালাবার সুযোগ পান। তিনি তার মূল্যবান জীবনকে সামান্যতম ক্ষতির মুখোমুখি হতে দিতে চাননি!

এরপর নাছের ইউসুফ পার্শ্ববর্তী আমীরদের তার দলে যোগ দেওয়ার জন্য পত্র প্রেরণ শুরু করেন। তিনি মরু সাগরের পূর্বে অবস্থিত (বর্তমান জর্ডানে অবস্থিত) কারাক অঞ্চলের নেতাকে চিঠি লেখেন। তার নাম ছিল 'মুগীছ ফাতাহুদ্দীন ওমর' (তার নামের অর্থ হলো আশ্রয়দাতা দ্বীন বিজেতা ওমর)। তিনি অন্যকে আশ্রয় দিতেন না। কেবল নিজেকেই আশ্রয় দিতেন। তিনি দ্বীন বিজেতা ছিলেন না। তিনি ওমর রা. এর সদৃশও ছিলেন না। তিনি নাছের ইউসুফের মতোই ছিলেন। তিনি কখনো তাতারীদের বিপক্ষে যুদ্ধ করতেন। আবার কখনো তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতেন!!

নাছের ইউসুফ আরেক আমীরের কাছে চিঠি প্রেরণ করেন। কেউ ভাবতেও পারেননি যে, তিনি তার কাছে চিঠি প্রেরণ করবেন। তিনি মিশরের আমীরের কাছে তাতারীদের বিরুদ্ধে সহযোগিতা চেয়ে চিঠি প্রেরণ করেন।

সুবহানাল্লাহ! যিনি দীর্ঘদিন ধরে মিশরের আমীরের শত্রু। যিনি তাতারীদের কাছে তার বিপক্ষে যুদ্ধ করার জন্য সাহায্য কামনা করেছেন। বর্তমানে তাতারীদের শত্রু। এখন তিনি মিশরের আমীরের কাছে তাতারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সহযোগিতা চাইছেন!

তার সামনে কোনো মূলনীতি ছিল না। ছিল না কোনো নীতিমালা। ব্যক্তিগত স্বার্থই ছিল তার প্রধান প্রেরণা।

নাছের ইউসুফ ও তার সৈন্যবাহিনীর কথা রাখুন। চলুন হালাকু খানের দিকে ফিরে যাওয়া যাক। সে শাহী দুর্গ থেকে হামাদান নগরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, যেটি মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিচালনার প্রধান কেন্দ্র ছিল। হালাকু খান পুনরায় পরিকল্পনা শুরু করল, যা এই উদ্দীপ্ত অঞ্চল (মধ্যপ্রাচ্যের) এর জন্য অধিক উপযোগী।

এক.

খ্রিস্টানদের সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধির জোর দিল। বিশেষত তাতারীদের অস্তিত্বের জন্য হুমকি মুসলিম শক্তির কতিপয় নমুনা প্রকাশ পাওয়ার পর হালাকু খান খ্রিস্টানদের সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধির প্রতি জোর দিল। তখন খ্রিস্টশক্তির

সহযোগিতার প্রয়োজন দেখা দিল—

১. মুসলমানদের শোভা নির্বাপিত করার জন্য
২. গোপন সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য
৩. সিরিয়া পতন শেষে পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য।

তাই হালাকু খান খ্রিস্টান রাজাদের তথা আর্মেনিয়ার রাজা হাইতুম জর্জিয়ার রাজা ও আন্তাকিয়ার রাজা বুহমন্দকে মূল্যবান হাদিয়া-তোহফা পাঠায়।

দুই.

মিয়াফারেকীনের অবরোধ অব্যাহত থাকবে। অবরোধের নেতৃত্বে থাকবে হালাকু খানের ছেলে আশমুত। তবে কামেল মোহাম্মদের বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার সামনে অবরোধ চলমান রাখা বড়ই কঠিন কাজ। তাই আর্মেনিয়া ও জুর্জিয়া শক্তিও অবরোধে অংশগ্রহণ করবে। অবরোধ ভঙ্গে কোনো মুসলিম নেতা যেন সহযোগিতা না করে।

তিন.

দামেস্ক ও আলেপ্পোর আমীর নাছের ইউসুফ আইয়ূবীর বৈরী অবস্থান প্রকাশ পেয়েছে। সে দামেস্কের উত্তরে তাঁবু গেড়েছে এবং তাতারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। কিন্তু হালাকু খান এই বিষয়টি খুব আমলে নেয়নি। কারণ, সে নাছেরের মনোবল ও ক্ষমতা সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবগত। তাই নাছেরের বিদ্রোহের বিষয়টি হালাকু খানের চোখে অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ।

চার.

মধ্য ইরাক বিশেষত বাগদাদ নগরী প্রকাশ্যে তাতারীদের কাছে আত্মসমর্পণের ঘোষণা দিয়েছে। এখন বাগদাদ নিরাপদ নগরীতে পরিণত হয়েছে। অনুরূপ মসুলের আমীরও আত্মসমর্পণ করেছে। খুব শীঘ্রই উত্তর-পূর্ব ইরাকও নিরাপত্তার ছায়াতলে আশ্রয় নেবে।

পাঁচ.

সিরিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী শহর হলো আলেপ্পো ও দামেস্ক। এই শহর দুটির পতন হওয়া মানে গোটা সিরিয়ার পতন হওয়া। আলেপ্পো নগরী দামেস্কের তিনশ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত।

উল্লেখিত বিষয়াবলিকে সামনে রেখে হালাকু খান এই দুই শহরে যে কোনো একটির ওপর প্রথমত প্রকাশ্যে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু কোন শহরে আক্রমণ করবে হালাকু খান?

হালাকু খান গবেষণায় দেখতে পেল, যদি সে আলেপ্পো অভিমুখে রওয়ানা হয়, তাহলে প্রথমত উত্তর ইরাক পাড়ি দিয়ে তারপর তুরস্কের সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে উত্তর ইরাক হয়ে সিরিয়া প্রবেশ করতে হবে। অবশেষে সিরিয়ার উত্তর পশ্চিম অঞ্চল দিয়ে আলেপ্পো পৌঁছতে হবে। এসব অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে নদ-নদী থাকলেও যুদ্ধাভিযানে নদ-নদীকে বড় বাধা মনে করা হয়। বিশেষত যখন সৈন্যবাহিনী প্রচুর হয়। এখান থেকে মিয়াফারেকীন খুব নিকটবর্তী। সুতরাং যদি কোনো কারণে আশমুত ইবনে হালাকু প্রধান তাতারী দলের সহযোগিতার প্রয়োজন মনে করে, তাহলে সহজে সাহায্য পেতে পারে।

পক্ষান্তরে প্রথমত হালাকু খান যদি দামেস্ক অভিমুখে রওয়ানা হয়, এটি হালাকু খানের জন্য একটু কষ্টকর হবে। যদিও এটি দামেস্কবাসীর জন্য আকস্মিক ভয়ংকর আক্রমণ হবে। কারণ, হালাকু খান এমন দিক থেকে আগমন করবে, যা তারা বুঝতে পারবে না। কারণ, দামেস্কের পথে সিরিয়ার মরু অঞ্চল পাড়ি দিতে হয়। এই উপত্যকাটিতে পানির খুব অভাব। বিশাল বাহিনী নিয়ে এই উপত্যকা পাড়ি দেওয়া রীতিমতো ভয়ংকর। হালাকু খান এই ভয়াবহ পদক্ষেপ গ্রহণে সক্ষম হবে না। পাশাপাশি এ পথে নাছের ইউসুফ এমন দিক থেকে আকস্মিক আক্রমণ করতে পারে, যা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না।

সুবহানাল্লাহ! এরও ছয়শো বছর পূর্বে যখন যোগাযোগব্যবস্থা ছিল আরো শোচনীয়, আধুনিক রণকৌশল বলতে ছিল না, তখন হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রা. দামেস্কের নিকটবর্তী অঞ্চলে রোমানবাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য সৈন্যবাহিনী নিয়ে ইরাক থেকে এই ভয়াবহ দুর্গম মরুভূমি পাড়ি দিয়েছিলেন। যুদ্ধে হযরত খালেদ রা. অভাবনীয় জয় লাভ করেন। হায় কোথায় সাহাবী খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রা. আর কোথায় মানুষ হত্যাকারী হালাকু খান! [তার ওপর আল্লাহর লা'নত]

এসব কিছু বিবেচনাকরত হালাকু খান প্রথমত সদলবলে আলেপ্পো অভিমুখে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নিল। ততদিন পর্যন্ত ছেলে আশমুত মিয়াফারেকীন অবরোধ করে রাখবে।

আলেপ্পো অভিমুখে তাতারী বাহিনী

বর্বর তাতারী বাহিনী গৃহীত নীতিমালা অনুসারে ইরানের পশ্চিমে পাহাড় অতিক্রম করতে শুরু করে। এরপর ইরাকের সীমান্তে উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবেশ করে। এরপর আর্বিল শহর অতিক্রম করে নিকটবর্তী মসুল শহরে পৌঁছে যায়, যা তাদের জন্য ছিল সহযোগী। মসুলের পাশে দাজলা [টাইগ্রিস] নদী পাড়ি দেওয়া ছিল আবশ্যক। অত্র অঞ্চলে মসুল শহরের চেয়ে তাদের জন্য অধিক উপযোগী কোনো শহর ছিল না!! এরপর (বর্তমান তুরস্কের) নুসাইবিন শহরে পৌঁছার জন্য তাতারী বাহিনী দাজলা নদীর পশ্চিম তীর ঘেঁষে যাত্রা শুরু করে। এই শহরটি মিয়াফারেকীন থেকে ১৭০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। এভাবেই হালাকু খান ছেলে আশমুতের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। তবে ছেলের প্রতি পূর্ণ আস্থা থাকায় সে তার কাছে যায়নি।

উল্লেখযোগ্য বাধা ছাড়া হালাকু খান নুসাইবিন শহর আক্রমণ করে। এরপর ক্রমান্বয়ে হারান, এডেসা ও এলবিয়া আক্রমণ করে। এসব ক'টি শহর তুরস্কের দক্ষিণে অবস্থিত। আলেপ্পো পৌঁছার জন্য তুরস্কের সব ক'টি শহর অতিক্রম করার প্রয়োজন ছিল। ইসলামী কোনো সাম্রাজ্য তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি বলে হালাকু খান নিশ্চিন্ত মনে এ দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়।

এলবিয়া শহরের কাছে হালাকু খান মহানদী ফুরাত (ইউফ্রেটিস) পূর্ব থেকে পশ্চিমে পাড়ি দেয়।

এভাবেই হালাকু খান উল্লেখযোগ্য কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই পানিপথের দ্বিতীয় বাধা পাড়ি দেয়। এরপর আলেপ্পো নগরী অভিমুখী হয়ে তুরস্ক ও সিরিয়ার সীমান্ত অঞ্চল পাড়ি দেওয়ার জন্য ফুরাত (ইউফ্রেটিস) নদীর পশ্চিম দিকে রওনা হয়। তুরস্কের সীমান্ত অঞ্চল থেকে আলেপ্পো নগরীর দূরত্ব হলো মাত্র পঞ্চাশ কিলোমিটার।

তাতারী বাহিনীর অবিরাম সফর পূর্ণ বছর চলতে থাকে। এই সফরে তারা পারস্য, ইরাক, তুরস্ক ও সিরিয়া ভূমি পাড়ি দেয়। এটি ৬৫৭ হিজরীর ঘটনা। হালাকু খান ৬৫৮ হিজরীর মহররম মাসে আলেপ্পো নগরীতে পৌঁছে। তাতারীরা চতুর্দিক থেকে আলেপ্পো নগরী ঘিরে ফেলে। তবুও আলেপ্পোবাসী মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আত্মসমর্পণ করে না। নাছের ইউসুফ আইয়ূবীর চাচা তাওরান শাহ এই প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তিনি ছিলেন সত্যিকার অর্থে এক বীর মুজাহিদ। তিনি ভাতিজা নাছের ইউসুফের মতো ছিলেন না। তাতারীরা শহরের

চারপাশে কামান স্থাপন করে। লাগাতার গোলাবর্ষণ করতে থাকে। তখন নাছের ইউসুফ আইয়ূবী তিনশো কিলোমিটার দূরে দামেস্কের দক্ষিণে অবস্থান করছিল!!

মিয়াফারেকীন পতন

এই সময়ের মধ্যে একটি মর্মন্তুদ ও হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে। তা হলো, দেড় বছরের দীর্ঘ অবরোধের পর তাতারীদের পায়ের নিচে মিয়াফারেকীনের পতন ঘটে।

টানা আঠারো মাস জিহাদ ও সংগ্রাম চলতে থাকে। তবুও পৃথিবীর অন্য কোনো আমীর-উমারা কিংবা রাজা-বাদশার হৃদয় বিগলিত হয় না। নাছের, আশরাফ, মুগীস ইত্যাদি বিখ্যাত উপাধিধারী ব্যক্তিরা দূর থেকে নাটক প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে না।

মিয়াফারেকীন শহরের পতন ঘটে। শহরের সবকিছু ছিনিয়ে নেওয়া হয়। আশমুত ইবনে হালাকু এই অঞ্চলের প্রতিবাদমুখর সব শহরের জন্য এটিকে শিক্ষণীয় ঘটনা বানায়। শহরবাসীর সবাইকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ঘর-বাড়ি আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। সবকিছু ধ্বংস করে ফেলা হয়। আশমুত কামেল মোহাম্মদ আইয়ূবী রহ. কে আরও কঠোর আজাব প্রদানের জন্য জীবিত রাখে। তাকে নিয়ে পিতা হালাকু খানের কাছে যায়। সে তখন আলেপ্পো নগরীর অবরোধ কাজে ব্যস্ত ছিল।

হালাকু খান ইসলামী বীরসেনানী কামেল মোহাম্মদ আইয়ূবীর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তার সকল অনিষ্টকে সুসমন্বিত করে। তাকে বন্দী করে জীবিত অবস্থায় তার হাত পা কাটতে শুরু করে। এমনকি হালাকু খান তার গোশত ভক্ষণের হুঙ্কারও দেয়!! এমন নির্মম শাস্তি ভোগ করতে করতেই এই মরদে মুজাহিদের প্রাণ আল্লাহর দরবারে হাজিরা দেয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি শাহাদাতের অমীয় সুধাপানে ধন্য হন।

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ
خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ
وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ

"এবং যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদের কখনোই মৃত মনে কোরো না; বরং তারা জীবিত। তাদের তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রিজিক দেওয়া হয়। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা কিছু দিয়েছেন, তারা তাতে প্রফুল্ল। আর তাদের পরে এখনো যারা তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি, তাদের ব্যাপারে এ কারণে তারা আনন্দবোধ করে যে, (তারা যখন তাদের সঙ্গে এসে মিলিত হবে, তখন) তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না। তারা আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহের কারণেও আনন্দ উদ্‌যাপন করবে এবং এ কারণেও যে, আল্লাহ মুমিনদের কর্মফল নষ্ট করেন না।"[৬১]

ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. হযরত আনাস রা. সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ، لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ، يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، إِلَّا الشَّهِيدَ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى

"বান্দা মৃত্যুবরণ করলে শহীদ ব্যতীত অন্য কেউ দুনিয়ায় ফিরে আসার কামনা রাখে না। কারণ, মৃত্যুর পর শহীদ ব্যক্তি আল্লাহর পথে শাহাদাতের মর্যাদা ও ফজিলত প্রত্যক্ষ করে। সে দুনিয়ায় এসে পুনরায় শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখে।"[৬২]

জনৈক ব্যক্তি বলেন, কামেল মোহাম্মদ যিনি প্রতিবাদ করেছিলেন, তাকে হত্যা করা হয়েছিল যেমন হত্যা করা হয়েছিল খলিফা মুসতা'সিম বিল্লাহকে। যিনি প্রতিবাদ করেননি। কিন্তু বন্ধুরা, আমি আপনাদের মাঝে এই দুই মহান ব্যক্তির মাঝে পার্থক্য দেখিয়ে দিচ্ছি ...!!

একজন মাথা উঁচিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। অপরজন মাথানত করে অপমানিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।

একজন তলোয়ার হাতে বীরবেশে শাহাদাতবরণ করেছে। আরেকজন হাত উঁচিয়ে প্রাণভিক্ষা চেয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।

---

[৬১] সুরা ইমরান : ১৬৯-১৭১।

[৬২] *বুখারী* : ২৭৯৫।

একজন সম্মুখপানে এগিয়ে গিয়ে বুকে বর্শার আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। আরেকজন পলায়নপর অবস্থায় পিঠে তীর নিক্ষেপিত হয়ে মারা গেছেন।

কামেল মোহাম্মদ সেই মৃত্যুক্ষণে নিহত হয়েছেন, যা আল্লাহ রব্বুল আলামীন নির্ধারণ করেছিলেন। সামান্য পূর্বে বা পরে নয়। অনুরূপ খলিফা মুসতা'সিম বিল্লাহ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত মৃত্যুক্ষণে ইন্তেকাল করেছেন। সামান্য পূর্বে বা পরে নয়।

বন্ধুরা, আল্লাহর কসম!

কাপুরুষতা সামান্য হায়াত বৃদ্ধি করতে পারে না।
আর বীরত্ব সামান্য হায়াত হ্রাস করতে পারে না।

এই বাক্যটি খুব ভালোভাবে মুখস্থ করে নিন!!

সত্যিই ... কাপুরুষতা সামান্য হায়াত বৃদ্ধি করতে পারে না। আর বীরত্ব সামান্য হায়াত হ্রাস করতে পারে না।

কিন্তু কোথায় এ একীন ও বিশ্বাস?!

আমীর কামেল মোহাম্মদ আইয়ূবী, যিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীকে আলোকিতকারী মোমবাতি ছিলেন, তিনি শাহাদাতবরণ করলেন। খুনি হালাকু খান তার মাথা ধর থেকে আলাদা করে ফেলল এবং সিরিয়ার সব শহরে তার কর্তিত মাথা প্রদর্শন করানোর জন্য নির্দেশ দিল। যাতে সকল মুসলমান দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে।

সবশেষে দামেস্কে কর্তিত মাথা প্রদর্শনের পর দামেস্কের এক ফটকে কিছুক্ষণ সময়ের জন্য মাথাটি ঝুলিয়ে রাখা হয়। সেই ফটকটির নাম হলো ফারাদিস। এরপর এক মসজিদে তাকে দাফন করা হয়। পরবর্তীতে সেই মসজিদটি 'মাসজিদুর রাস' (মাথার মসজিদ) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন জান্নাতবাসী হন।

আলেপ্পোর পতন

আলেপ্পো নগরীর ওপর তাতারীদের গোলাবর্ষণ প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। মিয়াফারেকীনের পতন ও কামেল মোহাম্মদ নিহত হওয়ার পর তাতারীদের স্পর্ধা আরও বেড়ে যায়। কামেল মোহাম্মদের মৃত্যু ও মিয়াফারেকীনের পতনে মুসলমানদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি হারিয়ে যায়।

মাত্র সাতদিন আলেপ্পো নগরী অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকে। আলেপ্পোবাসী কোনো প্রতিবাদ ছাড়া শহরের ফটক খুলে দিলে তাতারীরা তাদের নিরাপত্তা প্রদান করে। কিন্তু সেনাপতি তাওরান শাহ তাদের বলেন, এটাও ধোঁকা। তাতারীরা কোনোদিন নিরাপত্তা প্রদান করে না। তারা কখনো প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না। কিন্তু তারা মিয়াফারেকীনের পতন ও তাদের আমীর নাছের ইউসুফের সাহায্য না পেয়ে মনোবল হারিয়ে ফেলেছিল। তখন নাছের ইউসুফ দামেস্কে অবস্থান করছিল। যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। নাছের ইউসুফ আলেপ্পোবাসীকে তাতারীদের অবরোধে ফেলে চলে গেল। এই পতন জাতিকে আত্মসমর্পণের দিকে ঠেলে দেয়। জনসাধারণ হালাকু খানের জন্য ফটক খুলে দেয়। কিন্তু তাদের নেতা তাওরান শাহ ও কতিপয় মুজাহিদ প্রতিবাদ করে এবং শহরের অভ্যন্তরীণ দুর্গে আশ্রয় নেয়।

আলেপ্পোবাসী নিরাপত্তা পেয়ে তাতারীদের জন্য দরজা উন্মুক্ত করে দেয়। তাতারী বাহিনী আলেপ্পো শহরের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। শহরের ঘাঁটি ও দুর্গগুলো দখল করতেই তাতারীদের প্রকৃত চেহারা ফুটে ওঠে। আলেপ্পোবাসীর সম্মুখে সেই সব বিষয় স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, যা পূর্বে মুজাহিদ তাওরান শাহের সামনে পরিষ্কার ছিল। কিন্তু আফসোস! সময় ফুরিয়ে তারা বুঝতে পারল! আলেপ্পোর মুসলমানদের হত্যা করে এবং খ্রিস্টানদের ছেড়ে দিয়ে হালাকু খান বিষয়টি আরও পরিষ্কার করে!! এটি নিঃসন্দেহে প্রতিক্ষিত বিশ্বাসঘাতকতা ছিল। এটি সেই জাতির ভুলের প্রায়শ্চিত্ত, যে জাতির বালুর প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল! আলেপ্পোর নারী-পুরুষ ও শিশুদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। গোটা শহর বিরানভূমিতে পরিণত হয়। এরপর তাতারীরা শহরের প্রাচীরগুলো ভেঙে দেয়, যাতে পরবর্তীতে কেউ প্রতিরোধ গড়তে না পারে। এরপর হালাকু খান আলেপ্পোর অভ্যন্তরীণ দুর্গ, যেই দুর্গে তাওরান শাহ ও কতিপয় মুজাহিদ আশ্রয় নিয়েছিল, সেই দুর্গ ধ্বংসে মনোনিবেশ করে। দুর্গের উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করে। চতুর্দিক থেকে অগণিত তীর বর্ষণ করে। কিন্তু দুর্গটি ছিল অপ্রতিরোধ্য ও অনির্বাণ। চার সপ্তাহব্যাপী গোলাবর্ষণ ও তীর বর্ষণ চলতে থাকল। অবশেষে হালাকু খানের হাতে দুর্গের পতন ঘটে। দুর্গের দরজাসমূহ ভেঙে ফেলা হয়। দুর্গে আশ্রয়গ্রহণকারী সবাইকে হত্যা করে। সেটা ছিল প্রত্যাশিত। কিন্তু সে তাওরান শাহকে হত্যা করে না! কতিপয় ইতিহাসবিদ উল্লেখ করেন, তাওরান

শাহের বীরত্বে অভিভূত হয়ে হালাকু খান এই কাজ করেছেন। (তথা তাকে না মেরে জীবিত রেখেছেন।) এটি হালাকু খানের বীরত্ব ও মহানুভবতা। কিন্তু এসব গুণাবলি হালাকু খানের সঙ্গে যায় না। আর হালাকু খান এমন ব্যক্তিও নয়, যে প্রতিরোধকারীকে দেখে অভিভূত হবে। সে এমনও নয় যে, যাকে বীর বা মহানুভব বলে ব্যক্ত করা যায়। আমার [লেখক] কাছে মনে হয়, সে তাকে অন্য কোনো নিকৃষ্ট স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে বাঁচিয়ে রেখেছিল। তার এই ক্ষমাপ্রদর্শন একদিক থেকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, যার মাধ্যমে সে সিরিয়া অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আইয়ূবী বংশোদ্ভূতদের প্রেরণাকে উত্তেজিত করতে চায়। তা ছাড়া সে কিছুদিন পূর্বে কামেল মোহাম্মদ আইয়ূবীকে হত্যা করেছে। সুতরাং আইয়ূবী সেনাপতিরা যখন প্রতিশোধমুখর হয়ে উঠবে, তখন হালাকু খানের এই উদারতা দেখে তাদের প্রতিশোধ-স্পৃহা নির্বাপিত হবে। আপনি ভুলে যাবেন না, বহু আইয়ূবী হালাকু খানের সঙ্গে শান্তিচুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। তাদের মাঝে অন্যতম হলো, হিমসের আমীর আশরাফ আইয়ূবী। সে সিরিয়ায় তার অবস্থান নষ্ট করতে চায়নি। এটা ছিল তার এক দৃষ্টিভঙ্গি। অন্য দৃষ্টিতে সে চেয়েছিল, মুসলিম আমীররা প্রতিবাদ ব্যতীতই হালাকুর সামনে আত্মসমর্পণ করুক।

সুবহানাল্লাহ! হালাকু খান তো অত্যন্ত আমানতদার বিশ্বস্ত ব্যক্তি। কোমল হৃদয়ের অধিকারী। শান্তিকামী। সে সকল সেনাপতি তার মোকাবেলা করতে চায়, এমন লোকদের সে নিরাপত্তা প্রদান করবে!! আপনার কী মনে হয়, যারা তার সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে, তাদের পরিণাম কী হবে?

তৃতীয় আরেক কারণ এও হতে পারে যে, আমরা জানি তাওরান শাহ দামেস্কের আমীর নাছের ইউসুফের চাচা। তাই তাওরান শাহকে বাঁচিয়ে রাখা নাছের ইউসুফের সাক্ষাতের একটি অসিলা হতে পারে। অথবা এতে নাছের ইউসুফের ওজরখাহী করার পথ উন্মুক্ত হতে পারে। এর মাধ্যমে হালাকু খান সম্ভাব্য যুদ্ধ থেকে নিজেকে বিরত রেখে সৈন্যসংখ্যা অক্ষত রাখতে চেয়েছিল।

আমি [লেখক] বিশ্বাস করি, রক্তপিপাসু হালাকু খানের চরিত্রের সঙ্গে শেষোক্ত ব্যাখ্যা দুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু হালাকু খান উদারতা প্রদর্শন করেছেন, তাওরান শাহের বীরত্ব দেখে অভিভূত হয়েছেন, তার ক্ষেত্রে এজাতীয় ব্যাখ্যা দাঁড় করানো অযাচিত বৈ কিছু নয়!!

এভাবেই হালাকু খান আলেপ্পো নগরীতে খুঁটি গেড়ে বসে। সকল প্রতিবাদ প্রতিরোধ থেমে যায়। ভেঙে পড়ে সব দুর্গ ও প্রাচীর। এরপর হালাকু খান সিরিয়ার অন্যত্র গমনের ইচ্ছা করে। হিমসের আমীর আশরাফ আইয়ূবী এগিয়ে আসে। সে সেই সব বিশ্বাসঘাতক আমীরদের অন্যতম, যারা তাতারীদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। হালাকু খান আশরাফ আইয়ূবীকে স্বভাববিরুদ্ধ সম্মানপ্রদর্শন করে!! সে তাকে আলেপ্পো থেকে হিমস পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নেতৃত্ব দান করে, তার পূর্ণ আনুগত্য নিশ্চিত করতে এবং তাকে এ কথায় নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করতে যে, হালাকু খান কোনো অঞ্চল দখল করে সেই অঞ্চল প্রধানকেই শাসক নিযুক্ত করে। তবে কতিপয় তাতারী বাহিনীর তত্ত্বাবধানে সেটি পরিচালিত হয়। তাই আশরাফ আইয়ূবী আমীর হিসেবে নিযুক্ত হয়। যেন সে শহরের প্রশাসনিক শাসক। তবে রাজত্ব ও ক্ষমতার যাবতীয় চাবিকাঠি হালাকু খানের হাতে!

আলেপ্পো পতনের পর হালাকু খান পশ্চিমে মুসলমানদের 'হারেম' দুর্গের দিকে দৃষ্টি দেয়। দুর্গটি আলেপ্পো থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। সেখানে কতিপয় মুসলিম মুজাহিদ আশ্রয় নিয়েছিল, যারা হালাকু খানের সামনে আত্মসমর্পণ করেনি। বেশ কিছুদিন হামলার পর হালাকু খান তাদের প্রত্যেককে জবাই করে হত্যা করে।

পশ্চিমে পথ উন্মুক্ত হতে হতে একপর্যায়ে হালাকু খান আন্তাকিয়া সাম্রাজ্যে পৌঁছে যায়। এটি হালাকু খানের মিত্র খ্রিস্টান আমীর বুহমন্দের সাম্রাজ্য। হালাকু খান শহরের বাইরে তাঁবু ফেলে। তারপর নতুন মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করার জন্য একটি সম্মেলনের আহ্বান করে। হালাকু খানের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রদর্শনার্থে তার সকল মিত্ররা সদলবলে আগমন করে। আর্মেনিয়ার রাজা হাইতুম, আন্তাকিয়ার রাজা বুহমন্দ, অনুরূপ সেলজুকী মুসলিম আমীরবৃন্দ তথা কেকেভাস ছানী, কালাজ আরসালান রাবে' আগমন করে। মুসলিম আমীরদ্বয়ের সাম্রাজ্য আন্তাকিয়া সাম্রাজ্যের খুব কাছে ছিল।

এরপর হালাকু খান কতিপয় সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনাবলি জারি করে

এক.

বাগদাদ, মিয়াফারেকীন ও আলেপ্পো পতনে সামরিক সহযোগিতা প্রদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আর্মেনিয়ার রাজা হাইতুমকে একটি বড় পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হবে।

দুই.

কেকেভাস ছানী ও কালাজ আরসালান রাবে'; এই দুই সেলজুকী সুলতান ইতিপূর্বে মুসলমানরা যেসব দুর্গ ও শহর জয় করেছিল, তন্মধ্যে কয়েকটি শহর ও দুর্গ আর্মেনিয়া সাম্রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া হবে আর্মেনিয়া সাম্রাজ্যের শক্তিবর্ধনের জন্য। এই অঞ্চলে তার ক্ষমতা আরও মজবুত ও দৃঢ়করণের জন্য হালাকু খান এই নির্দেশ জারি করে। যেন আর্মেনিয়ার রাজা হালাকু খানের স্থায়ী মিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। সেলজুকি মুসলিম দুই সুলতানের কোনো আপত্তি করারও সুযোগ ছিল না!

তিন.

হালাকু খানকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য আন্তাকিয়ার আমীর বুহমন্দকে পুরস্কৃত করা হবে। আন্তাকিয়ার আমীর নিজ সাম্রাজ্যের সঙ্গে এই শহরটিকে মিলিয়ে নেবেন। লাতাকিয়া শহরটিকে সুলতান সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবীর আমলে খ্রিস্টানদের থেকে জয় করা হয়েছিল। অথচ এক বাক্যে এই শহরটিকে খ্রিস্টানদের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়!! 'অন্যায় দখলকারী নিজে যে বস্তুর মালিক নয়; এমন বস্তু অযোগ্যকে প্রদান করে' এই ধ্বংসাত্মক মূলনীতির বাস্তবায়নস্বরূপ দ্বিতীয় ও তৃতীয় নির্দেশ দেওয়া হয়।

চার.

চতুর্থ সিদ্ধান্তটি ছিল অদ্ভুত এক সিদ্ধান্ত। এটি না আন্তাকিয়ার রাজার কল্যাণে গ্রহণ করা হয়, না আর্মেনিয়ার রাজার কল্যাণে। এটি এই জন্য গ্রহণ করা হয় যে, আজ থেকে প্রত্যেক বস্তুর একক কর্তৃত্ব থাকবে হালাকু খানের। আর এসব রাজা-বাদশা কেবল বাহ্যিক রাজা-বাদশা বৈ কিছু নয়। এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তের দাবি ছিল আন্তাকিয়া চার্চের নতুন কুলপতি খ্রিস্টান নিযুক্ত করা! আলেপ্পো ও

বাগদাদের বিষয় কিছুটা ভিন্ন। কিন্তু আমরা জানি যে, হালাকু খান নিজেও খ্রিস্টান ছিল না। সুতরাং এসব সিদ্ধান্ত এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে দেওয়া হচ্ছে, যে নিজেই খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে কিছুই জানে না। উপরন্তু নবকুলপতি আন্তাকিয়ার বংশোদ্ভূত নয়! এত আরও ক্ষতিকর। সুতরাং চার্চের নবকুলপতি নিজেও খ্রিস্টধর্মাবলম্বী নয়, বুহমন্দ ও হাইতুম যে ধর্মের অনুসারী!! খ্রিস্টানদের ইতিহাসে এমন বিপজ্জনক ঘটনা নেই।

গির্জার গালে চড়!!

হালাকু খান ল্যাটিন কুলপতির স্থানে 'ইউমনেমিউস' নামক গ্রিক কুলপতি নির্ধারিত করে। আমরা জানি তৎকালীন সিরিয়ার খ্রিস্ট সাম্রাজ্য মূলত পশ্চিম ইউরোপীয় খ্রিস্ট সাম্রাজ্য ছিল। তারা সকলে ক্যাথলিক মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অথচ নবনিয়োজিত গ্রিক কুলপতি অর্থডক্স মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থডক্স হলো পূর্ব ইউরোপের মতবাদ। এই দুই মতবাদের ওপর বিস্তর ব্যবধান বিরাজমান। এমনকি দুই মতাদর্শের মাঝে দীর্ঘদিন ধরে চরম সংঘর্ষ চলছে। এতে বোঝা যায়, হালাকু খানের এই পদক্ষেপের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রথমত সে আন্তাকিয়া ও আর্মেনিয়ার রাজাদ্বয়কে অপমানিত অবস্থায় রাখতে চেয়েছিল। যেন তারা বুঝতে পারে তারা কেবল হালাকু খানের তাবে। তাদের নিজস্ব রায় বাস্তবায়নের কোনো অধিকার তাদের নেই এবং তাদের মাথায় যেন কখনো এ কথা না আসে যে, তারা হালাকু খানের সঙ্গে মিত্রের ন্যায় চলাফেরা করবে। দ্বিতীয়ত হালাকু খান চায়নি এই অঞ্চলে স্থিতিশীলতা বিরাজমান হোক। অন্যথায় তার অজ্ঞাতে আঞ্চলিক আমির বা রাজা ক্ষমতাশীল হয়ে উঠতে পারে। তাই সে তার মিত্রদের একজনের ওপর আরেকজনের মাধ্যমে নজরদারি করত। তৃতীয়ত হালাকু খান গ্রিক সাম্রাজ্যের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টির ইচ্ছা করেছিল। এর মাধ্যমে সিরিয়া ও আলাতোনিয়ায় (তুরস্ক অঞ্চলসমূহে) তার ক্ষমতার স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে চেয়েছিল। কারণ, সিরিয়া ও আলাতোলিয়া গ্রিক সাম্রাজ্যের পার্শ্ববর্তী দেশ।

স্বাভাবিকভাবে এটি আন্তাকিয়ার আমীরের জন্য ছিল বিরাট অপমান। কিন্তু এটাই বাস্তব ছিল। নিজের ইজ্জত সম্মান হারিয়েও সে কোনো প্রতিবাদ করেনি। কিন্তু তার উপদেষ্টামণ্ডলী ও মন্ত্রিপরিষদ আপত্তি প্রকাশ করে। কিন্তু

আমীর বুহমন্দ হালাকু খানের সামনে বিনয়াবত। সে তাতারীদের প্রকৃত মর্যাদা প্রদান করে। সে সময় তাতারীরা এত বড় সাম্রাজ্য শাসন করত, পৃথিবীর মানচিত্রে এতবড় সাম্রাজ্য কখনো স্থান পায় নি। পূর্বে কোরিয়া পশ্চিমে পোল্যাণ্ড। মধ্যবর্তী সকল ক্রুশেডযুদ্ধ এবং গত দশ বছরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইউরোপ যেসব যুদ্ধ করেছে—এসব যুদ্ধে লেবানন, ফিলিস্তিন, সিরিয়া ও তুরস্কের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল ব্যতীত কিছুই তারা জয়লাভ করতে পারেনি। সাধারণত কয়েকটি গ্রাম সম্বলিত একটি শহর ছিল তাদের সাম্রাজ্য।

এভাবেই উত্তর সিরিয়া ও দক্ষিণ তুরস্কে হালাকু খানের ক্ষমতা নিষ্কণ্টক হয়। এরপর সে নতুন করে দক্ষিণের হামতি নগরী আক্রমণের চিন্তা-ভাবনা শুরু করে। এরপরের পালা হলো হিমস শহর। হিমসের আমীর হলো বিশ্বাসঘাতক তাতারীদের সহযোগী আশরাফ আইয়ূবী। এর মাধ্যমে হালাকু খান দামেস্কে উত্তরে অবস্থিত মুজাহিদ (!) নাছের ইউসুফ আইয়ূবীর কাছে পৌঁছতে চায়।

হামাতবাসীর আত্মসমর্পণ

তাতারী বাহিনী হামাত আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, এমন সময় হামাতের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবর্গের একটি দল হালাকু খানের কাছে এসে শহরের চাবি হস্তান্তর করে। নিঃশর্তে শহরকে হালাকু খানের হাতে অর্পণ করে। স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়ে! হালাকু খানের পক্ষ থেকে কোনো চাপ কিংবা আহ্বানে নয়!! হালাকু খান শহরের চাবি গ্রহণ করে এবং তাদের নিরাপত্তা প্রদান করে। এবার সে সত্যি সত্যিই নিরাপত্তা প্রদান করেছিল, যাতে অন্যরা তাদের দেখে আত্মসমর্পণের প্রতি উৎসাহিত হয়।

হালাকু খান তার বর্বর বাহিনী নিয়ে দক্ষিণ অভিমুখে রওয়ানা হয়। হামাত নগরীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করে। তবে হামাত প্রবেশ করে না। বন্ধু আশরাফ আইয়ূবীর শহর হিমসও অতিক্রম করে। তাতেও প্রবেশ করে না। এরপর দামেস্ক অভিমুখে রওয়ানা হয়। দামেস্ক হিমস থেকে ১২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

আসুন হালাকু খানের আলোচনা রেখে আমরা সে সময়ের দামেস্কে অবস্থান নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করি—

নাছের ইউসুফ তখন দামেস্কের বাইরে সৈন্যবাহিনীসহ অবস্থান করছিল। ইতিমধ্যে ক্রমান্বয়ে তার কাছে মিয়াফারেকীনের পতন, নিকৃষ্ট পন্থায় মোহাম্মদ

আইয়ূবীর হত্যা, আলেপ্পো নগরীর পতন, হারেম দুর্গের পতন এবং হামাত ও হিমসের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের সংবাদ পৌঁছেছে। নিঃসন্দেহে তাতারীদের সামনের লক্ষ্য হলো দামেস্ক!!

ভীরু সম্রাট নাছের ইউসুফ কী করবে? শক্তি নেই, ক্ষমতা নেই, অথচ যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে বসেছে? তার দুর্বলতা ও ভীরুতা আপেক্ষিক কোনো বিষয় নয় যে, সে তাতারীদের অপেক্ষা দুর্বল; বরং ভীরুতা ও দুর্বলতা তার রক্ত-মাংসে মিশ্রিত।

নাছের ইউসুফ তার সেনাপতিদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শসভার আয়োজন করল।

... আমি কী করতে পারি?

ভীরুদের জলাশয়ে এক বীর বাহাদুরের আত্মপ্রকাশ

সভায় গুরুত্বপূর্ণ সেনাপতিগণ উপস্থিত ছিলেন। তাদের প্রধান ছিল আমীর যাইনুদ্দীন হাফেজী। আরও ছিলেন সেনাপতি রুকন উদ্দীন বাইবার্স বান্দকাদারী। ইতিপূর্বে মিশরে যুদ্ধ চলাকালে যেসব আমীর পলায়ন করেছিল, সে তাদের অন্যতম ছিল। নাছের ইউসুফ তাকে আশ্রয় দেয় এবং রণদক্ষতা ও নেতৃত্ব-গুণ দেখে তাকে নিজের অন্যতম সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ দেয়।

সভা শুরু হয়। কিন্তু উপস্থিত সভাসদবৃন্দের মাঝে নাছের ইউসুফ ও পরবর্তীতে অন্যান্যদের মাঝে যে তাতারীত্রাস সংক্রমিত হয়েছে, তা গোপন থাকে না।

একথাও সুস্পষ্ট হয় যে, নাছের ইউসুফ ও তার সেনাপতিদের মাঝে যুদ্ধের ক্ষমতা নেই। তাই তারা প্রথমত নিজেদের হীনতা, দুর্বলতা, অক্ষমতা ও তাতারীদের সঙ্গে নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যগত বিস্তর ফারাকের আলোচনা করতে শুরু করল। সেনাপতি যাইনুদ্দীন হাফেজীর পালা এলে সে তাতারীদের বিশালতা ও মুসলমানদের ক্ষুদ্রতার প্রসঙ্গ তুলে ধরে নাছের ইউসুফকে যুদ্ধবিরতির পরামর্শ প্রদান করে।

সভায় এসব কাপুরুষতাপূর্ণ বক্তব্য শুনে হুংকার দিয়ে ওঠেন সেনাপতি রুকন উদ্দীন বাইবার্স। তিনি ছিলেন দ্বীনী চেতনায় উদ্দীপ্ত এক মহাপুরুষ। তাতারীদের বিরুদ্ধে আক্রমণে দুঃসাহসী। আফসোস! তিনি উপস্থিত সবাইকে ভীরু কাপুরুষ ও বিশ্বাসঘাতক দেখতে পান।

তিনি যাইনুদ্দিন হাফেজীর সামনে চিৎকার করে ওঠেন। তার বক্তব্যের প্রতি তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন; এমনকি তিনি নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে তাকে প্রহার করেন। তাকে লক্ষ্য করে বলেন, তুমিই মুসলমান ধ্বংসের কারণ।

বাইবার্স যদিও যাইনুদ্দীন হাফেজীকে লক্ষ্য করে কথাগুলো বলেন, তবে তার বক্তব্যের প্রধান সম্বোধিত ব্যক্তি হলো নাছের ইউসুফ। কারণ, সেই মুসলমান ধ্বংসের অন্যতম প্রধান কারণ। কিন্তু বাইবার্স তো একদল লাশের সামনে বক্তব্য দিচ্ছিলেন। আর লাশ তো শুনতে পায় না। তাই তার হৃদয়বিদারক বক্তব্য কারও মনে আঘাত হানে নি।

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ

"স্মরণ রেখো! তুমি মৃতদের তোমার কথা শোনাতে পারবে না এবং বধিরকেও তোমার ডাক শোনাতে সক্ষম নও! যখন তারা পেছন ফিরে চলে যায়।"[৬৩]

এরা সবাই মৃত ... বধির ... পেছন ফিরে পলায়নকারী! তারা সকলে মিলে পরামর্শসভায় উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাদের উক্তযুক্ত সিদ্ধান্ত .... পলায়ন করা!!

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

রুকন উদ্দীন বাইবার্স কোনো সমাধান খুঁজে না পেয়ে ফিলিস্তিনের গাজা অভিমুখে রওনা হন। ইতিপূর্বে মিশর সম্রাট তাকে তাতারীদের মোকাবেলা করার আশা ব্যক্ত করে তাকে তার কাছে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। বাস্তবেও মিশর সম্রাট তাকে সাদর অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

সামনে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব—ইনশাআল্লাহ!

দামেস্ক নেতাহীন পাহারাহীন এতিম পড়ে রয়!

দামেস্ক একটি বিখ্যাত ও সুরক্ষিত শহর। পতনের পূর্বে আশা করা হতো দামেস্ক দীর্ঘদিন টিকে থাকবে। কিন্তু নাছের ইউসুফের মতো আমীরগণ যতক্ষণ শত্রুপক্ষ দূরে থাকবে, ততক্ষণ প্রতিরোধের ও জিহাদের ঘোষণা দেয়। কিন্তু যখনই শত্রুপক্ষ নিকটবর্তী হয়, তখন সব সময় তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ হয় পলায়ন করা।

---

[৬৩] সূরা নামল : ৮০।

এমন ঘটনা আজ দামেস্কে ঘটেছে। এখানেই শেষ নয়, নাছের ইউসুফের মতো কাপুরুষ, মুনাফিক আমীর যতদিন এই ভূপৃষ্ঠে থাকবে, ততদিন বারংবার এমন ঘটনা ঘটতে থাকবে।

দামেস্কবাসীর আত্মসমর্পণ!!

দামেস্কবাসী চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কী করবে তারা? খুব অল্প সময়ের মাঝে তাতারী বাহিনী চলে আসবে। তাতারী বাহিনী সবকিছু জ্বালিয়ে দেয়। কাঁচা-পাকা কোন কিছুই অবশিষ্ট রাখে না। দামেস্কবাসী পূর্বে জিহাদের অনুশীলন গ্রহণ করেনি। যুদ্ধশাস্ত্র সম্পর্কে তাদের তেমন কোনো-জানা শোনা নেই। অভিজ্ঞ সৈন্যবাহিনী ও সেনাপতিগণ তো রণভূমি থেকে পলায়ন করেছে। দামেস্ক অধঃপতনের শেষসীমায় উপনীত ছিল।

দামেস্কের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও জ্ঞানীগুণীজন একত্রিত হয়ে হামাতবাসীর ন্যায় আত্মসমর্পণ করতে একমত হন। তারা সিদ্ধান্ত নেন শহরের চাবি হালাকু খানের কাছে হস্তান্তর করবেন। এরপর তার কাছে নিরাপত্তা কামনা করবেন। হাতে গোনা কয়েকজন মুজাহিদ ব্যতীত সকলেই এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন। তারা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করার এবং শরীরের শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেয়।

হালাকু খান হামাতবাসীকে নিরাপত্তা প্রদানের সময় সত্যবাদিতার পরিচয় দিয়েছিল। কারণ, তখন সে অন্যদেরও আত্মসমর্পণের প্রতি উৎসাহিত করেছিল। দামেস্কের জ্ঞানীগুণী একদল হালাকু বাহিনীর সাক্ষাৎ এবং শহর ও রাজভাণ্ডারের চাবি অর্পণের উদ্দেশ্যে বের হন।

মানকু খানের মৃত্যু

এরই মাঝে এমন একটি দুর্ঘটনা ঘটে, যা হালাকু খানের হিসাব-নিকাশে গোলমাল সৃষ্টি করে। তাতারী সাম্রাজ্যের মহাসম্রাট মানকু খানের মৃত্যু ঘটে। দামেস্ক পৌছার পূর্বেই হালাকু খানের কাছে এই সংবাদ পৌছে। সত্যিই মানকু খানের মৃত্যু হালাকু খানের জন্য ছিল একটি বড় পরীক্ষা। মানকু খান পৃথিবীর ইতিহাসের সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্য শাসন করত। আকস্মিক যেকোনো ভাঙন এই সাম্রাজ্যের জন্য ভয়াবহ হতে পারে। নিঃসন্দেহে হালাকু খানও তাতারী সাম্রাজ্যের অন্যতম স্থপতি ছিল। সে মানকু খানের ভাই। চেঙ্গিজ খানের

পৌত্র। তার হাতে অসংখ্য অঞ্চল বিজিত হয়েছে। তার বীরত্ব বর্ণনার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, ইতিহাসে সেই প্রথম মুসলিম খেলাফতের পতন ঘটায়। এ সকল কীর্তি ও যোগ্যতার বলে হালাকু খান মধ্যপ্রাচ্যের তাতারী সাম্রাজ্য ব্যতীতই মূল তাতারী সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান স্থপতির আসনে সমাসীন হয়েছে।

তাই মানকু খানের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ামাত্রই সৈন্যবাহিনী ছেড়ে কালক্ষেপণ না করে 'পরবর্তী খলিফা নির্বাচন সভায়' যোগ দিতে তাতারী সাম্রাজ্যের রাজধানী কারাকুরামে ফিরে আসে। তার অন্যতম প্রধান ও বিচক্ষণ সেনাপতি কাতবুগা নবীনকে সৈন্যবাহিনীর দায়িত্ব অর্পণ করে। সে (আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি) খ্রিস্টান ছিল।

হালাকু খান খুব দ্রুত প্রত্যাবর্তন করছিল। পারস্য অঞ্চলে পৌঁছলে কারাকুরাম থেকে কয়েকজন দূত তার নিকট এই সংবাদ নিয়ে আগমন করে যে, খলিফা নির্বাচনের বিষয়টি পূর্ণ হয়েছে। নব নির্বাচিত তাতার খলিফা হলো তার ভাই 'কাবিলা খাকান'। এটি তার প্রত্যাশাবিরুদ্ধ ছিল; এমনকি চেঙ্গিজ খান কর্তৃক খলিফা নির্বাচনের নীতিমালা পরিপন্থী ছিল। যদিও বিষয়টি হালাকু খানের স্বপ্নের ওপর বড় আঘাত হানে, তথাপি সে বিষয়টি শান্তভাবে মেনে নেয় এবং মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থান করাকেই প্রাধান্য দেয়। সে এসব অঞ্চলে বহু কল্যাণ দেখতে পায়। তাই পুনরায় সিরিয়ায় প্রত্যাবর্তন না করে (বর্তমান ইরানের) তিবরিয শহরে গমন করে এবং তিবরিয অঞ্চলকে মধ্যপ্রাচ্যের সুবিশাল অঞ্চলের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করে। তিবরিয একদিক থেকে সুরক্ষিত শহর। অন্যদিক থেকে এর আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। অঞ্চলটি হালাকু খান পরিচালিত সাম্রাজ্যের মধ্যখানে অবস্থিত। তার সাম্রাজ্য খাওয়ারেযম, কাজাকিস্তান, তুরমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, পারস্য, আযারবাইজান, ইরাক, তুরস্ক ও সিরিয়াব্যাপী বিস্তৃত। হালাকু খানকে সিরিয়ায় প্রত্যাবর্তন না করার প্রতি যে বিষয়টি অধিক প্রেরণা দিয়েছে, তা হলো, সিরিয়ার যেসব অঞ্চল এখনো বিজিত হয়নি, তা খুবই সামান্য। সেখানে খুব বেশি শহর নেই। উপরন্তু সে ফিরে যাওয়ার পূর্বে নাছের ইউসুফ বাহিনীর দামেস্ক অরক্ষিত রেখে ফিলিস্তিন পালিয়ে যাওয়ার সংবাদ পায়। তবে হালাকু খান কাতবুগার কাছে নাছের ইউসুফকে বন্দী করার নির্দেশ দিয়ে চিঠি পাঠাতে ভোলেনি।

পতন শেষে দামেস্কের অবস্থা

চলুন! আবার আমরা দামেস্কের আলোচনায় ফিরে যাই—

দামেস্কের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও জ্ঞানীগুণীজনরা শহরের চাবি বহন করে তাতারী বাহিনীর কাছে নিয়ে যায়। নতুন সেনাপতি কাতবুগা তাদের সংবর্ধনা জানায়। তাদের আত্মসমর্পণ মেনে নিয়ে তাদের নিরাপত্তা প্রদান করে এবং সৈন্যবাহিনীসহ দামেস্কে প্রবেশের জন্য অগ্রসর হয়।

হায়! উমাইয়া খেলাফতের রাজধানী দামেস্কের আজ পতন ঘটছে, যেমনটি ইতিপূর্বে আব্বাসী খেলাফতের রাজধানী বাগদাদের পতন ঘটেছিল!!

তৎকালীন বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান সুসমৃদ্ধ নগরী, জিহাদের প্রাণকেন্দ্র, মুসলিমবিশ্বের শ্রেষ্ঠ শহর দামেস্কের পতন হলো!!

তাতারী বাহিনী অবলীলায় অকুণ্ঠচিত্তে দামেস্কের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, ঢুকে পড়েছে অভ্যন্তরে। কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করেনি; কেউ বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি!!

আহ! শত আক্ষেপ!! হায়রে দামেস্ক!!!

হে সিরিয়ার রাজধানী, হে মুসলিমবিশ্বের প্রাণ!!

কোথায় আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ, খালেদ ইবনে ওয়ালীদ, ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ান, আমর ইবনে আস ও শুরাহবিল ইবনে হাসানা রা.; যারা ছয়শো বছরের অধিক সময় ব্যয়ে এই শহর জয় করেছিলেন!

কোথায় মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান, যিনি এখানে বসে দুনিয়া শাসন করেছিলেন?

কোথায় ওমর ইবনে আবদুল আযীয রহ. যিনি এই শহরে বসে সারা পৃথিবীতে ন্যায়-ইনসাফ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন!

কোথায় উমাইয়া বংশের খলিফাবর্গ, যারা সুবিশাল বিস্তৃত ভূমি জয় করেছিলেন, যা আজ তাতারীদের হাতে পরাজিত?

কোথায় ইমাদুদ্দীন জঙ্গী ও নুরুদ্দীন মাহমুদ রহ., যারা জিহাদ করে ইজ্জত-সম্মান ও গর্ব অর্জন করেছিলেন?

কোথায় সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী রহ., যিনি দামেস্কের ভূমিতে শুয়ে আছেন?

দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়েছে এবং মুসলমানগণ দামেস্কে ক্রমশ সব বস্তু প্রত্যক্ষ করেছে, যা কেউ কোনোদিন কল্পনাও করেনি।

মুসলমানগণ তিনজন খ্রিস্টান আমীর প্রত্যক্ষ করেছে, যারা দলের সম্মুখ ভাগে ঘোড়া হাঁকিয়ে গর্ব প্রকাশ করছিল। তারা দামেস্কের প্রধান ফটক ভেঙে প্রধান সড়কগুলোতে হইহুল্লোড় করছিল। তাতারী বাহিনীর অগ্রে ছিল তাতারী সেনাপতি কাতবুগা নবীন। আর তার দু-পাশে ছিল আর্মেনিয়ার রাজা হাইতুম ও আন্তাকিয়ার রাজা বুহমন্দ। তারা সকলে মুসলমানদের পবিত্র নগরীতে প্রবেশ করে। ১৪ হিজরীতে রোমসম্রাট কায়সার হিরাক্লিয়াসের যুদ্ধে রোমান বাহিনী দামেস্ক ছেড়ে পালাবার পর এই প্রথম কোনো খ্রিস্টান আমীর দামেস্কে প্রবেশ করল।

লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

তাতারীরা দামেস্কাবাসীকে কার্যত নিরাপত্তা প্রদান করেছিল। তারা কাউকে হত্যা করেনি। তবে যারা দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের কয়েক সপ্তাহ অবরোধ করে রাখার পর দুর্গ ভেঙে হত্যা করে।

৬৫৮ হিজরীর শেষদিকে দামেস্কের পতন ঘটে। এটি বাগদাদ পতনের পূর্ণ দুই বছর পরের ঘটনা। এটি তাতারী কর্তৃক নির্ধারিত সময়। কারণ, এ সময়ে তারা বহু অঞ্চল দখল করেছে এবং ইরাক, তুরস্ক ও সিরিয়ায় অগণিত শহর ধ্বংস করেছে। হ্যাঁ! অধঃপতিত প্রধান তিনটি শহর হলো বাগদাদ, আলেপ্পো ও দামেস্ক। কিন্তু অন্য শহরগুলো যেনতেন শহর ছিলনা। কারণ এসব শহরের উর্বরতা, প্রাচীনতা, ঐতিহ্য, জীবনযাত্রার মান, উন্নত ও আধুনিক সভ্যতা-সংস্কৃতির কারণে প্রচুর জনগণ বাস করত।

স্বাভাবিকভাবেই গোটা মুসলিমবিশ্বের মনোবল ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান একথা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে, তাতারীরা অপরাজেয়। তাদের পরাজয় করা সম্ভব নয় এবং অধিকাংশ একথা ভাবতে শুরু করেছিল যে, মুসলিম উম্মাহর অবশিষ্ট হায়াত খুবই সামান্য।

শহরের প্রাচীর ও দুর্গগুলো ভেঙে ফেলার পর তাতারীরা খ্রিস্টানদের মাধ্যমে দামেস্ক পরিচালনা শুরু করে। তারা 'আপেল সিয়ান' নামক তাতারীকে শহর পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করে। সে খ্রিস্টান না হলেও খ্রিস্টানদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। তাদের পক্ষপাতিত্ব করত। দামেস্ক শহর তার ইতিহাসের সবচেয়ে আশ্চর্য সময় পার করতে থাকে!

ইবনে কাছীর রহ. আপেল সিয়ান দামেস্ক পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণের সময়কার দামেস্কের পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে যে বক্তব্য পেশ করেছেন, এ পর্যায়ে আমি তা উল্লেখ করছি। ইবনে কাছীর রহ. বলেন—

“আপেল সিয়ান (তার ওপর আল্লাহর লা‘নত নাজিল হোক) খ্রিস্টান যাজক ও গির্জাপ্রধানদের একত্রিত করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে এবং তাদের গির্জাসমূহ পরিদর্শন করে। একদল খ্রিস্টান হালাকু খানের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তিবরিয গমন করে। সঙ্গে বহু মূল্যবান হাদিয়া-তোহফাও নিয়ে যায়। তাদের সঙ্গে হালাকু খান কর্তৃক নিরাপত্তানামা ছিল। তারা তাওমা দরজা (দামেস্কের একটি ফটক) দিয়ে প্রবেশ করে। তারা সঙ্গে একটি লম্বা ক্রুশ বহন করে নিয়েছিল। তারা তাদের ধর্মীয় প্রতিটি বার্তা সমস্বরে উচ্চারণ করছিল। তারা বলছিল, ‘সঠিক দ্বীন তথা দ্বীনে মাসীহ জয়লাভ করেছে।’ তারা ইসলাম ধর্ম ও ইসলামধর্মের অনুসারীদের নিন্দা গাইছিল। তাদের সঙ্গে মদভর্তি অনেক মটকা ছিল। কোনো মসজিদ অতিক্রম করলে মসজিদে মদ ছিটাত। আর কিছু মদভর্তি পাতিল ছিল, সেগুলো মানুষের চেহারা ও কাপড়ের ওপর ছিটাত। বাজার ও পথ-ঘাটে কেউ তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে ক্রুশ বহনের নির্দেশ দিত। বাজারের এক দোকানের উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে তাদের বক্তা খ্রিস্টধর্মের প্রশংসা জ্ঞাপন এবং ইসলামধর্ম ও মুসলমানদের নিন্দা জ্ঞাপন করছিল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

এরপর তারা মদ নিয়ে জামে মসজিদে প্রবেশ করে। এই ঘটনা ঘটার পর মুসলিম বিচারক ও উলামা-ফুকাহাগণ একত্রিত হয়ে তাতারী-প্রধান আপেল সিয়ানের কাছে এগিয়ে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানান। কিন্তু তাদের কথা প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং তাদের অপমানিত করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদের কথা প্রাধান্য দেওয়া হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।”

এটি ছিল দামেস্কবাসী মুসলমানদের জন্য দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্ত। মুসলমানগণ উভয় সংকটে পড়েছিল। একদিকে তাতারী অন্যদিকে খ্রিস্টান। একথা সকলেরই জানত যে, তাতারী ও খ্রিস্টানদের মাঝে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজমান। একে অপরের জন্য সহযোগী। বিশেষত সিরিয়ার তাতারী সেনাপতি কাতবুগা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। আর যে সকল খ্রিস্টান সিরিয়ায় বাস করে তারা সিরিয়ার সকল গোপন ভেদ জানত। সুতরাং নিঃসন্দেহে খ্রিস্টানরা তাতারীদের সহযোগিতা করলে তা মুসলমানদের জন্য বড়ই দুঃখজনক ও আক্ষেপের বিষয় হবে।

ফিলিস্তিন দখল

এরপর কাতবুগা ফিলিস্তিন দখলের সিদ্ধান্ত নেয়। সে একদল সৈন্যবাহিনী পাঠায়। তারা নাবলুস অতঃপর গাজা দখল করে। তবে তাতারীরা ফিলিস্তিনে ছড়িয়ে থাকা ইউরোপীয় খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের ধারেকাছেও যায় না। যেমন তারা লেবানন ও সিরিয়ার খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের নিকটবর্তী হয়নি। এভাবে ফিলিস্তিন তাতারী ও খ্রিস্টানদের মাঝে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

খ্রিস্টান ও তাতারীদের পরস্পর সহযোগিতার বিষয়টি সুস্পষ্ট হলেও কাতবুগা হালাকু খানের পদাঙ্ক অনুসরণ করত। সে খ্রিস্টান হলেও ইউরোপের হোক বা সিরিয়ার কোনো খ্রিস্টানকে তার সাম্রাজ্য ও রাজত্ব থেকে বহিষ্কৃত করতে সমীহ করত না।

উদাহরণস্বরূপ এমন একটি ঘটনা সীদোনের আমীর জুলিয়ানের সঙ্গে ঘটে। সীদোন অঞ্চলটি ইউরোপীয় খ্রিস্টানরা দখল করেছিল। জুলিয়ান যখন তাতারী ও মুসলমানদের মধ্যকার বিরোধ দেখতে পেল, এটাকে নিজ সাম্রাজ্য বৃদ্ধির সুবর্ণ সুযোগ মনে করল এবং একখণ্ড উর্বর সমতল ভূমি দখল করে ফেলল। কাতবুগা লোক পাঠিয়ে তাকে বাধা প্রদান করলে সে বিরত হয় না। ফলে কাতবুগা সীদোন বিধ্বংস করার নির্দেশ দিয়ে একটি বিশাল দল পাঠায় এবং বাস্তবেই সীদোন অঞ্চলকে ধ্বংস করে ফেলা হয়। জুলিয়ান সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পলায়ন করে। এমন আরেকটি ঘটনা বাইরূতের আমীর ইউহান্না ছানীর সঙ্গে ঘটে। যখন সে জালীল নামক অঞ্চল দখল করেছিল।

এ সকল ঘটনা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, তাতারী মানচিত্রের প্রতিটি ইঞ্চি নিজেদের করায়ত্তে রাখতে চাইত। কেউ তাদের সহযোগিতা করতে চাইলে কিংবা তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে চাইলে তাদের অনুসারী হয়ে আসতে হত; বন্ধু কিংবা মিত্র হয়ে নয়। এটি ভূপৃষ্ঠে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নীতি, যে নীতি অন্য কোনো শক্তিকে দাঁড়াতে দেয় না।

নিঃসন্দেহে কাতবুগা ও এরও পূর্বে হালাকু খানের খ্রিস্টানদের ওপর তাতারীদের প্রাধান্যপ্রদান নীতিমালা (এমনকি খ্রিস্টানদের গির্জা প্রধান নিয়োগের বেলাও) সিরিয়ার খ্রিস্টান আমীরদের অন্তরকে ক্ষীপ্ত করে তুলেছিল। এর আরেকটি অন্যতম কারণ হলো, তাতারী আগমনের পূর্বে খ্রিস্টানরা ছিল

প্রতিষ্ঠিত। কারণ, তারা মুসলামনদের দুর্বলতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল। পাশাপাশি মুসলমানদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল। কারণ, মুসলমানরা বিশ্বাসঘাতকতা করেনা। পক্ষান্তরে তাতারীরা সম্পূর্ণ উল্টো। উপরন্তু তাতারী কর্তৃক আন্তাকিয়ার আমীর, সীদোনের আমীর এরপর বাইরূতের আমীর অপমানিত হওয়ার পর অন্যান্য খ্রিস্টান আমীররা তটস্থ হয়ে পড়েছে। একথার একীন তাদের মাঝে বদ্ধমূল হয়েছে যে, এ অঞ্চলে তাতারীদের ক্ষমতা চিরপ্রতিষ্ঠিত। তারা সিরিয়ার সাধারণ খ্রিস্টান ও খ্রিস্টান আমীরদের সঙ্গে তা-ই করবে, যা ইতিপূর্বে উকিতাই ইবনে চেঙ্গিজ খানের রাজত্বকালে পূর্ব ইউরোপের খ্রিস্টানদের সঙ্গে করা হয়েছিল।

যাই হোক, এই অন্তর্নিহিত অস্থিরতা ও চরম হতাশা সত্ত্বেও খ্রিস্টান আমীরগণ প্রতিবাদ না করে কেবল দূর থেকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। আগামী দিনগুলোতে কী ঘটতে যাচ্ছে, তাদের কেউই জানত না।

সর্বশেষ ফিলিস্তিন দখলের মাধ্যমে তাতারীরা গোটা ইরাক, তুরস্কের অধিকাংশ অঞ্চল এবং গোটা সিরিয়ার পতন ঘটাল। অনুরূপ লেবানন ও ফিলিস্তিনেরও পতন ঘটাল!! এ সবকিছু মাত্র দুই বছরে সংঘটিত হয়!!

তাতারীরা ফিলিস্তিনের গাজা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। (যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি) তারা সিনা পর্বত থেকে মাত্র পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থান করছিল। সবাই জানত, তাতারীদের পরবর্তী পদক্ষেপ মিশর আক্রমণ!!

মিশর তাতারীদের চারণভূমিতে পরিণত হওয়া ছিল স্বাভাবিক

এই বিষয়টি নিয়ে অধিক গবেষণা করার কোনো প্রয়োজন নেই। তাতারীদের দুর্বার গতি একথার একীন প্রদান করে যে, খুব শীঘ্রই মিশর তাদের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হবে। এর অনেকগুলো কারণ ছিল। তন্মধ্যে—

১. তাতারীদের সম্প্রসারণমূলক রাজনীতি। তারা এক অঞ্চল শেষে পরবর্তী অঞ্চলের খোঁজে থাকে। আর মিশর তো ফিলিস্তিনের গা ঘেঁষে অবস্থিত।

২. তৎকালীন মুসলিমবিশ্বে মিশর ব্যতীত কোনো শক্তি অবশিষ্ট ছিল না, যে তাতারীদের ঘুম কেড়ে নিতে পারে। বাকি সব মুসলিমশক্তি, দুর্গ, ইসলামী শহরের পতন ঘটেছে। শুধু মিশরই রয়ে গেছে।

৩. মিশর যুদ্ধের উপযুক্ত ভূমি। তা বিশ্বমানচিত্রের মধ্যভাগে অবস্থিত। আর মিশরের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির বিষয়টি কারোর অজানা নয়।

৪. মিশর আফ্রিকার মুখোমুখি অবস্থিত। তাতারীরা যদি মিশরের পতন ঘটাতে পারে, তাহলে উত্তর আফ্রিকা দখল করা তাদের জন্য খুবই সহজ হবে। ইতিপূর্বে উত্তর আফ্রিকা দখল করার জন্য তারা কোনো প্রচেষ্টা করেনি। কারণ, সিরিয়া পর্যন্ত পৌঁছতে তাদের পশ্চিমা মুসলিম সাম্রাজ্যের পতন ঘটাতে হয়েছে। উত্তর আফ্রিকার ঝুঁকি নেওয়া হতো বাড়তি ঝুঁকি। যদি মিশরের পতন ঘটে তবে স্বল্প প্রচেষ্টায় উত্তর আফ্রিকা দখল করা যাবে।

৫. মিশরের জনসংখ্যা অন্যান্য মুসলিম অঞ্চলের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি। তাই মিশর পতন ঘটানো তাতারীদের জন্য জরুরি ছিল।

৬. মিশরবাসী ইসলামী জাগরণ ও দ্বীনী চেতনায় ছিল উজ্জীবিত। তাতারীরা এই আশঙ্কা করছিল যে, যদি কোনো প্রচুর জনসংখ্যা সম্বলিত, দীনি চেতনায় উজ্জীবিত সৎ মুজাহিদ-ব্যক্তি মিশরের নেতৃত্ব গ্রহণ করে, তাহলে প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। হতে পারে তাতারীদের আকস্মিক পতন ঘটবে!

এই সকল কারণ ও অন্যান্য আরও কিছু কারণে তাতারীরা ফিলিস্তিন থেকে মিশর দ্রুত গমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা খুব দ্রুত গমনের সিদ্ধান্ত এ জন্য গ্রহণ করে যে, যাতে তাদের আকস্মিক আগমনে মিশরবাসী যুদ্ধের কোনো প্রস্তুতি গ্রহণ না করতে পারে।

কিন্তু সিরিয়া ও ফিলিস্তিন আক্রমণের সময় মিশরের কী অবস্থা ছিল? সে সময় মিশরবাসী ধারাবহিক কঠোর সংকটে সময় পার করছিল। তারা রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সমান্তরালভাবে সংকটাপন্ন ছিল। এর অনেক কারণ ছিল। সামনে আমরা তা বিস্তারিত আলোচনা করব—ইনশাআল্লাহ।

এখানে একটি বিষয় আলোচনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তা হলো, ইতিমধ্যে দাসবংশ মিশর শাসন শুরু করেছিলেন। এ সময়ে মিশরের সিংহাসনে কুতয রহ. সমাসীন হয়েছিলেন।

তাতারীদের মিশর আক্রমণ, মিশর সাম্রাজ্যের প্রতিরোধ এবং তাদের রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা আলোচনার পূর্বে দাসবংশের উত্থান

সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করার চেষ্টা করব। কীভাবে তারা মিশরের রাজক্ষমতায় সমাসীন হলেন? কীভাবে কুতয রহ. এই পবিত্র ভূমির শাসনভার গ্রহণ করলেন? তৎকালীন সার্বিক পরিস্থিতি কীভাবে একথার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করে যে, দাসবংশের নেতৃত্বে তাতারী বাহিনী ও মিশরীয় বাহিনীর মাঝে অনিবার্য সংঘাত ঘটবে?

এ সবকিছু পর্যালোচনা করলে আমরা ঘটনার সঠিক কারণ খুঁজে বের করতে পারব। খুঁজে পাব বহু উপদেশ ও শিক্ষা এবং শেষ পরিণতি, যা আমরা প্রত্যক্ষ করব। ধ্বংসে উপনীত হওয়ার কারণসমূহ উদ্‌ঘাটন করতে পারব।

চলুন! এখন আমরা দাসবংশ নিয়ে আলোচনা করি!

দাস [মামলুক] বংশের উত্থান

দাসবংশের শাসনামল অনেক মুসলমানের কাছেই এক অজানা ইতিহাস। এমনকি অনেক সুশিক্ষিত মুসলমানের কাছেও অজানা। এর বেশ কয়েকটি কারণ হতে পারে। তবে অন্যতম কারণ হলো, সে সময় মুসলিম উম্মাহ বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল। এমনকি অসংখ্য অগণিত দেশ ও সাম্রাজ্য সৃষ্টি হয়েছিল। মুসলিম সাম্রাজ্যগুলোর পরিধি অতিমাত্রায় ক্ষুদ্রতা ধারণ করেছিল। কোনো কোনো সাম্রাজ্য ছিল মাত্র একটি শহরব্যাপী!! মোটকথা দাস/মামলুকবংশের শাসনামল সম্পর্কে জানতে হলে তৎকালীন মুসলিম সাম্রাজ্যগুলোর সঠিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ জরুরি। যার জন্য প্রয়োজন অক্লান্ত মেহনত ও পরিশ্রম।

যে সকল কারণে সে সময়কার ইতিহাস সম্পর্কে মুসলমানগণ অজ্ঞাত। এর আরেকটি কারণ, দাস সাম্রাজ্যের রাজা-বাদশার আধিক্যতা। দাস সাম্রাজ্য ১৪৪ বছর ক্ষমতাসীন ছিল। এই সাম্রাজ্যকে ‘দাওলাতুল মামালিকিল বাহরিয়া’ বলা হয়। (এই নামকরণের কারণ সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ) এই ১৪৪ বছরে তাদের মাঝে উনত্রিশজন রাজার আবির্ভাব ঘটেছিল!! এ থেকে বোঝা যায়, কোনো রাজার শাসনামল গড়ে পাঁচ বছরও ছিল না। যদিও কারও কারও শাসনামল দীর্ঘ ছিল। কারণ, তাদের অধিকাংশই মাত্র এক বা দুই বছর ক্ষমতায় ছিলেন!! পাশাপাশি দাসবংশের শাসনামলে প্রচুর পরিমাণে আন্দোলন ও সামরিক বিপর্যয় ঘটেছিল। উনত্রিশজন শাসকের মাঝে দশজনকে হত্যা করা হয়। আর বারোজনকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়!! অনুরূপ শক্তি-সামর্থ্য ও অস্ত্র-শস্ত্র ও ক্ষমতার রদবদলের অন্যতম কারণ ছিল দাস সাম্রাজ্য আইয়ূবী সাম্রাজ্যের এক রাজা কর্তৃক প্রণীত সংবিধান অনুযায়ী পরিচলিত হতো। সেই রাজা হলো ‘আদেল আইয়ূবী’। সেই সংবিধানকে আপনি ‘জোর যার মুল্লুক তার’ নামক সংবিধান বলতে পারেন!!

দাস সাম্রাজ্য সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষ অজ্ঞাত থাকার অন্যতম আরেকটি কারণ এও হতে পারে যে, ইসলামী ইতিহাসের মিথ্যা রচনা। এই জঘন্য কাজটি আঞ্জাম দিয়েছিল তথাকথিত প্রাচ্যবিদ (Orientalist) ও তাদের কতিপয় মুসলিম অনুসারী, যারা নিজেদের সফলতার জন্য দাসবংশের ইতিহাস বিকৃত

করেছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, দাসবংশ যেনো ইসলামের বিরুদ্ধ দুই পরাশক্তি তথা খ্রিস্টান ও তাতারদের বাধাগ্রস্ত না করতে পারে, যারা মুসলিম সাম্রাজ্যকে চিরতরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার পাঁয়তারা করছে। এই দুই শক্তির বিরুদ্ধে দাসবংশ দীর্ঘ দিন ধরে বিভিন্ন জিহাদ করছেন। দাস সাম্রাজ্য দীর্ঘ তিন শতাব্দী যাবৎ উসমানী সাম্রাজ্য মুসলিম উম্মাহর হাল ধরা পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠে ইসলামের পতাকা বহন করছে।

দাস সাম্রাজ্যের বিস্তারিত ইতিহাস আলোচনা করা আমার [লেখকের] উদ্দেশ্য নয়। কারণ, এটি একটি দীর্ঘ অধ্যায়। তবে দাস সাম্রাজ্যের উত্থান, সাম্রাজ্যের ইতিহাস ও তাদের জিহাদ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন দুটি গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা রইল ইনশাআল্লাহ।

প্রথম গ্রন্থটির বিষয়বস্তু হবে 'ক্রুশেড যুদ্ধ'। ইনশাআল্লাহ এতে আমি আলোচনা করব মুসলিমবিশ্বের ওপর ক্রুশেড আক্রমণের ইতিহাস। জঙ্গ পরিবারের শাসনামল, আইয়ূবী সাম্রাজ্য, দাসবংশের উত্থান এবং ক্রুশেড আক্রমণের বিরুদ্ধে তাদের পদক্ষেপ। আর দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে দাসবংশের শাসনামল (সূচনা-সমাপ্তি) নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ!

তবে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিতে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে সে সকল বিষয় উল্লেখ করার চেষ্টা করব, যা দাসবংশের উত্থানের কারণ হয়েছে। তাতারীরা সিরিয়া পৌঁছলে যারা অন্তর্বর্তী সময় মিশর শাসন করেছিল।

আইয়ূবী সাম্রাজ্য

এ বিষয়ে পরিষ্কার জ্ঞান অর্জনের জন্য আমাদের একটু পেছনের দিকে ফিরে যেতে হবে, যাতে ঘটনাগুলো শুরু করে পর্যবেক্ষণ করতে পারি—

ইসলামের মহানায়ক বীরপুরুষ সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী রহ. ৫৬৯ হিজরীতে আইয়ূবী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে এই সাম্রাজ্য ৫৮৯ হিজরী পর্যন্ত মোট বিশ বছর শাসন করে। আইয়ূবী সাম্রাজ্য পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে ক্রুশেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হতে চায়। এতে তারা অনেকবার জয়লাভ করে। সবচেয়ে বড় জয়লাভ করে ৫৮৩ হিজরীতে হিত্তিনের ভাগ্যনির্ধারণী যুদ্ধে। সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী রহ. এ যুদ্ধে ক্রুশেড বাহিনীকে এমনভাবে পরাজিত করেন যে, তাদের কোমর ভেঙে যায় এবং ভাগ্যবিপর্যয় অবধারিত হয়ে পড়ে। হিত্তিন জয়ের মাত্র তিন মাস পর সেই বছরেই তিনি ২৭ শে রজব ৫৮৩ হিজরী

(১১৮৭ ঈ.) বাইতুল মাকদিস আযাদ করেন। সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী রহ. এমন একটি শক্তিশালী ক্ষমতাধর সাম্রাজ্য রেখে যান, যা একই সময়ে মিশর, হেজাজ, ইয়েমেন, ইরাক, তুরস্কের কিয়দাংশ, লিবিয়া ও নুবিয়ার কিছু অংশ নিয়ে বিস্তৃত ছিল। সিরিয়ার ভূমধ্যসাগর কিনারে ক্রুশেডাররা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।[৬৪] কিন্তু সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী রহ. এর মৃত্যুর পর খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদ ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। মুসলমানগণ সম্পদের প্রাচুর্য, সাম্রাজ্যের বিশালতার কারণে ফেতনায় নিপতিত হয়। এসবের কারণে আইয়ূবী সাম্রাজ্য বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তারা ফিরে গিয়েছিল তাদের পুরোনো চরিত্রে; সেই বিভাজন-বিভক্তি, আত্মকলহ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং গাফলত ও তন্দ্রালুতায়। এসব বিভক্তি-বিভাজন বিস্তারিত আলোচনা করার স্থান এটি নয়। ইনশাআল্লাহ এ বিষয়ে 'ক্রুশেড আক্রমণ' কিতাবে সবিস্তার আলোচনা করব—ইনশাআল্লাহ! কিন্তু এখানে আমি যা উল্লেখ করব, তা হলো, আইয়ূবী সুলতানদের নিজেদের মাঝে প্রায় ষাট বছর যুদ্ধ চলতে থাকে। ৫৮৯ হিজরীতে সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর ইন্তেকালের পর থেকে ৬৪৮ হিজরী আইয়ূবী সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত। এই যুদ্ধ বাকযুদ্ধ, লিখনীযুদ্ধ বা গালমন্দের যুদ্ধ ছিল না, বরং তা তরবারি যুদ্ধ পর্যন্ত গড়ায়। মুসলমানদের হাতে অপর মুসলমান জীবন হারায়। ফলশ্রুতিতে এই বিরোধ মুসলমানদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদের সহযোগিতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে!! অথবা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাতারীদের সহযোগিতা করার প্রতি উস্কে দেয়!! এ সবকিছুর একমাত্র কারণ পার্থিব জগতের মোহ ও ভালোবাসা। যা থেকে সতর্ক থাকার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারংবার নির্দেশ দিয়েছেন।

ইমাম ইবনে মাজা, তবরানী ও ইবনে হিব্বান রহ. বিশুদ্ধ সনদে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রা. সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة

---

[৬৪] ইসলামের এই নিবেদিত প্রাণ মুজাহিদ ২৭ শে সফর ৫৮৯ হিজরিতে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। -অনুবাদক।

"যে ব্যক্তিকে দুনিয়া মোহগ্রস্ত করবে, আল্লাহ তার কাজকর্মে পেরেশানি সৃষ্টি করবেন। তার দুই চোখের সামনে দারিদ্র্য দাঁড় করিয়ে রাখবেন। অথচ পার্থিব সম্পদ সে ততটাই লাভ করবে, যতটা তার তাকদীরে লিপিবদ্ধ আছে। আর যে ব্যক্তির উদ্দেশ্য হবে আখেরাত। আল্লাহ তা'আলা তার সবকিছু সঠিক করে দেবেন। তার অন্তরে অমুখাপেক্ষিতা ঢেলে দেবেন। দুনিয়া বিনা শ্রমে তার কাছে আসবে।"[৬৫]

আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহর রাসূল, আপনি সত্য বলেছেন।

সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী রহ. চোখের সামনে 'জিহাদ' রেখেছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টানদের হত্যা করা ও আল্লাহর দ্বীনকে আল্লাহর জমিনে সমুন্নত করা। আল্লাহ তার সবকিছু সঠিক করে দিয়েছিলেন। তার অন্তরে অমুখাপেক্ষিতা ঢেলে দিয়েছিলেন। আর বাস্তবেই বিনা শ্রমে না চাইতেই দুনিয়া তার পদতলে এসেছিল।

পক্ষান্তরে পরবর্তীতে আগত সম্রাটগণ দুনিয়াকে নিজেদের মূল লক্ষ্য বানিয়েছিল। ফলে সবকিছু তাদের সামনে অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ফলে ভুল-সঠিক, হক-বাতিল নির্ণয়ের ক্ষমতা তারা হারিয়ে ফেলেছিল। ফলে কখনো তাতারীদের সঙ্গ দিয়েছে, কখনো খ্রিস্টানদের, আবার কখনো মুসলমানদের! আল্লাহ তা'আলা তাদের চোখের সামনে দারিদ্র্য দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে কেউ অপমানিত অবস্থায় মারা গেছে, কেউ দারিদ্র্য অবস্থায়, কেউ বিতাড়িত অবস্থায় আবার কেউ বন্দীদশায়। সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী রহ. এর ইন্তেকালের পর এই ছিল মুসলমানদের অবস্থা ।

ন্যায়পরায়ণ বাদশা নাজমুদ্দীন আইয়ূব

এখন আমরা বিরোধ ও বিভক্তির পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস ছেড়ে দিয়ে আইয়ূবী সাম্রাজ্যের শেষ দশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করব। যা শুরু হয়েছে ৬৩৭ হিজরী থেকে। এটা সে সময়ের কথা যখন মিশরের আইয়ূবী সাম্রাজ্যের সিংহাসনে নাজম উদ্দীন আইয়ূবী রহ. সমাসীন হয়েছিলেন, যাকে সুলতান সালাহ উদ্দীনের পর আইয়ূবী সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সুলতান মনে করা হয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হলো, অধিকাংশ মুসলমান, এমনকি মিশরীয় মুসলমানগণও, যা ছিল তার অবস্থানস্থল, এই মহান সুলতান সম্পর্কে কিছুই জানেন না!

---

[৬৫] *ইবনে মাজা : ৪১০৫।*

সুলতান নাজমুদ্দীন আইয়ূবী রহ. ৬৩৭ হিজরীতে মিশরের ক্ষমতা গ্রহণ করেন। সে সময়ের চলমান রীতি অনুযায়ী সিরিয়ায় আইয়ূবী নেতারা মিশর খেলাফতের বিরুদ্ধে তার সঙ্গে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করল। তাদের মাঝে বহু যুদ্ধ ও সংঘর্ষ ঘটল। ৬৪১ হিজরীতে যখন নাজমুদ্দীন আইয়ূবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সিরিয়ার সকল আইয়ূবী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হলো এবং খ্রিস্টানদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলো, তখন তাদের বিরোধ চূড়ান্ত রূপ ধারণ করল। বিনিময়ে সিরিয়ার আইয়ূবী নেতারা খ্রিস্টানদের জন্য বাইতুল মাকদিস ছেড়ে দেবে!! [যেই বাইতুল মাকদিস সালাহ উদ্দীন রহ. খ্রিস্টানদের হাত থেকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন]

সত্যিই কেউ কল্পনাও করতে পারবে না যে, কীভাবে তারা খ্রিস্টানদের বাইতুল মাকদিস ছেড়ে দিতে চাইল? সত্যিকার অর্থের মুসলমানরা নিজ ভূখণ্ড যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, তা অন্যকে ছেড়ে দিতে পারে না। সেখানে বাইতুল মাকদিস ছাড়বে কীভাবে? যেখানে রয়েছে মসজিদে আকসা, যা খ্রিস্টানদের হাত থেকে বীরসেনানী সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী আযাদ করেছিলেন। যা স্বাধীন করতে গিয়ে বহু প্রাণ বিসর্জিত হয়েছে এবং মুসলমানরা সহ্য করেছে বহু ঘাত-প্রতিঘাত, যুদ্ধ-সংগ্রাম। কিন্তু হায়!-এ কী ঘটছে?!

সিরিয়ার আইয়ূবী নেতারা খ্রিস্টানদের হাতে হাত মেলাল। মিশর অভিমুখে আক্রমণ শুরু করল। এদিকে মিশরে নাজমুদ্দীন আইয়ূব রহ. সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করেছেন। রুকন উদ্দীন বাইবার্সকে যুদ্ধের সেনাপতির দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। মূলত খ্রিস্টান ও সিরিয়ার বিশাল বাহিনীর সঙ্গে তুলনা করলে মিশরীয় বাহিনী খুব সামান্য ও অতি দুর্বল মনে হয়। তাই নাজমুদ্দীন রহ. যে সকল খাওয়ারেযম যোদ্ধা তাতারীদের হাতে খাওয়ারেযম পতনের পর পলায়ন করেছিল, তাদের কাছে সহযোগিতা চান। খাওয়ারেযম পতনের ইতিহাস পূর্বে আমরা সবিস্তার আলোচনা করেছি।

খাওয়ারেযমের সৈন্যবাহিনী মূলত ছিল ভাড়াটে সৈন্য। অর্থাৎ যারা তাদের অধিক পারিশ্রমিক দেয়, তাদের হয়েই তারা যুদ্ধ করে। সম্পদের বিনিময়ে তারা রণখেদমত আঞ্জাম দেয়। তাই নাজমুদ্দীন রহ. মজুরির বিনিময়ে তাদের কাছে সাহায্য কামনা করেন। নাজমুদ্দীন আইয়ূবী এবং খ্রিস্টান-আইয়ূবীদের যৌথশক্তির মাঝে এক বিরাট রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধটি গাজার

যুদ্ধ নামে পরিচিত। ৬৪২ হিজরীতে যুদ্ধটি সংঘটিত হয়। জায়গাটি ফিলিস্তিনের গাজার খুব কাছে অবস্থিত। আমরা গাজাসহ গোটা ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার জন্য দুআ করি।

যুদ্ধে নাজমুদ্দীন আইয়ূব রহ. বিশাল জয়লাভ করেন। খ্রিস্টানদের প্রায় ত্রিশ হাজার যোদ্ধা নিহত হয় এবং বিপুলসংখ্যক আমীর-উমারা ও রাজা-বাদশা বন্দী হয়। অনুরূপ আইয়ূবীদের বন্দী আমীর-উমারাদের সংখ্যা অনেক। নাজমুদ্দীন আইয়ূব রহ. এটাকে মোক্ষম সুযোগ মনে করে বাইতুল মাকদিস অভিমুখে রওয়ানা হন, সিরিয়ার আইয়ূবী নেতারা যা খ্রিস্টানদের অর্পণ করেছিল। খ্রিস্টানদের দুর্গসমূহে আক্রমণ করেন এবং খাওয়ারেযম বাহিনীর সহযোগিতায় এই পবিত্র নগরী ৬৪৩ হিজরীতে খ্রিস্টানদের হাত থেকে আযাদ করেন। এরপর থেকে দীর্ঘ সাতশ বছর পর্যন্ত খ্রিস্টানরা এই পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করতে পারে না। এরপর ব্রিটিশ সৈন্যরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে মুস্তফা কামাল আতাতুর্কের কুখ্যাত বিশ্বাসঘাতকতায় বাইতুল মাকদিসে প্রবেশ করে। দুআ করি আল্লাহ তা'আলা যেন আবার মাসজিদে আকসাকে ইসলাম ও মুসলমানদের কাছে ফিরিয়ে দেন!

অতঃপর নাজমুদ্দীন রহ. দামেস্ক প্রবেশ করেন এবং নতুনভাবে মিশর ও সিরিয়া তাওহীদের পতাকাতলে নিয়ে আসেন। শুধু এতটুকুই নয়, বরং খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের অধীনস্থ কতিপয় মুসলিম নগরী স্বাধীন করার প্রতি মনোযোগ দেন এবং তবারী, আসকালান ইত্যাদি শহরগুলো স্বাধীন করেন।

তবে নাজমুদ্দীন আইয়ূব রহ. এর দলে দ্রুত একটি দুর্ঘটনা ঘটে। তা হলো, ভাড়াকৃত খাওয়ারেযম বাহিনী তার দল থেকে পৃথক হয়ে যায়। সিরিয়ার জনৈক আইয়ূবী আমীর তাদের নাজমুদ্দীন আইয়ূবের চেয়ে অধিক অর্থ প্রদানের আশা প্রদান করলে তারা তার দল থেকে পৃথক হয়ে যায়। শুধু পৃথকই হয়নি, বরং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে যায়। এখন তার সঙ্গে মিশর থেকে আগত মৌলিক দল ব্যতীত কেউ থাকে না। নেতৃত্বে ছিল সেনাপতি রুকন উদ্দীন বাইবার্স। নাজমুদ্দীন আইয়ূব রহ. উপলব্ধি করেন যে, এমন দলের ওপরই ভরসা করতে হবে, যারা তার ব্যক্তিত্বের প্রতি আনুগত্যশীল, সম্পদের প্রতি নয়। তাই তিনি খাওয়ারেযমদের পরিবর্তে নতুন একটি দলের ওপর ভরসা করতে শুরু করেন। সেই দলটি ছিল 'দাস/মামলুক' দল।

দাস/মামলুক বংশের পরিচয়

আরবী ভাষায় 'মামলুক' বলা হয় গোলাম বা দাসকে। বিশেষত সেই সব লোককে 'মামলুক' বলা হয়, যারা যুদ্ধে বন্দী হয়েছে। তবে তাদের বাবা-মা বন্দী হয়নি। 'মামলুক' একবচন। এর বহুবচন হলো 'মামালিক'। মোটকথা, সেই গোলামকে মামলুক বলা হয়, যাকে কেনাবেচা করা হয়। [আর যেসব লোক বাবা-মাসহ বন্দী হয়, তাদের আরবী ভাষায় 'কিন' বলা হয়; মামলুক নয়।] তবে 'মামলুক' শব্দ উল্লেখিত সংজ্ঞা অনুযায়ী ব্যাপকার্থে সকল দাসের ওপরই প্রয়োগ হয়। তবে ইসলামী ইতিহাসের পরিভাষায় মামলুক শব্দটি বিশেষ অর্থ প্রদান করে। এটি পারিভাষিক রূপ লাভ করে প্রসিদ্ধ আব্বাসী খলিফা মামুনুর রশীদের আমল [১৯৮হি.-২১৮ হি.] ও তাঁর ভাই মু'তাসিম বিল্লাহের শাসনামল [২১৮-২২৮ হি.] থেকে। এই দুই মহান খলিফা তাদের শাসনামলে দাস ব্যবসায়ীদের বাজার থেকে তারা বহুসংখ্যক দাস/মামলুক ক্রয় করে আনেন এবং তাদের প্রভাব জোরদার করার জন্য সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তাদের যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করেন।

দিনে দিনে মামলুকরাই অধিকাংশ মুসলিম দেশে যুদ্ধের প্রধান শক্তি, কখনো কখনো একক শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। আইয়ূবী সাম্রাজ্যের আমীরগণ নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে দাসবংশের ওপর ভরসা করতেন। যুদ্ধে তাদের কাজে লাগাতেন। কিন্তু সংখ্যায় তারা খুবই কম ছিল। একসময় নাজমুদ্দীন রহ. শাসনামলে যখন খাওয়ারেযমরা তার দল থেকে বের হয়ে যায়, তখন নাজমুদ্দীন রহ.-এর তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে বাধ্য হন। এভাবেই বিশ্বমানচিত্রে দাসবংশের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, বিশেষত মিশরে।

দাসবংশের উৎস

দাসদের প্রধান উৎস ছিল—

১. হয়তো যুদ্ধে বন্দী হয়ে আসা

২. অথবা ক্রয় করা।

মা ওরাউন নাহার থেকে সবচেয়ে বেশি দাস আমদানী হতো। মাওরাউন নাহার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জাইহুন নদী, যা তুর্কেমেনিস্তান ও আফগানিস্তানে উত্তর এবং উজবেকিস্তান ও তজাকিস্তানের দক্ষিণে প্রবাহিত। এসব অঞ্চলের মূল অধিবাসীরা হলো তুর্কী। এসব এলাকা সর্বদা অস্থিতিশীল থাকত। একের পর

এক যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত। তাই এসব অঞ্চল থেকে আমদানিকৃত বন্দীদের সংখ্যা বেশি হতো। তৎকালে 'দাস শহর' হিসেবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ শহর ছিল সমরকন্দ, ফারগানা, খাওয়ারেযম ইত্যাদি। তাই তুর্কী বংশোদ্ভূত অধিকাংশই দাস। তা ছাড়াও এসব অঞ্চলে আর্মেনিয়া, মঙ্গোল ও ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত দাসরাও ছিল। এ সকল ইউরোপীয়রা সকালিয়া নামে পরিচিত ছিল। তারা বিশেষভাবে পূর্ব ইউরোপ থেকে আগমন করত।

এ ছিল শত বছরের নিত্য ঘটনা। তবে নাজমুদ্দীন আইয়ূবী রহ. ও তার অনুসরণে পরবর্তী মামলুক সাম্রাজ্যে সুলতানরাও অল্প বয়স্ক দাসদের ক্রয় করতেন। অর্থাৎ তারা উঠতি বয়সের দাসদের ক্রয় করতেন। অধিকাংশ দাস অমুসলিম রাষ্ট্র থেকে আগমন করত। যদিও মাঝে মাঝে আরবি বলতে পারে না এমন মুসলিম সন্তান বন্দী হওয়ার সংবাদ পাওয়া যেত। তবে তাদের চেনা যেত না। চেনা যেত না তাদের বংশ ও ধর্ম। ফলে তাদের সঙ্গেও দাসের ন্যায় আচরণ করা হতো।

দাসদের প্রতিপালন

নাজমুদ্দীন আইয়ূব ও অন্যান্য আমীরগণ মমলুকদের সঙ্গে দাসের ন্যায় আচরণ করতেন না; বরং সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করতেন। তাদের নিজেদের ঔরসজাত সন্তানের চেয়ে অধিক আপন মনে করতেন। কখনোই মালিক ও মমলুকের মধ্যকার সম্পর্ক মুনিব ও গোলামের মতো ছিল না; বরং শিক্ষক-ছাত্র কিংবা পিতা-পুত্রের সম্পর্ক ছিল। তাদের সম্পর্ক ছিল মহব্বত-ভালোবাসার সম্পর্ক। তাই মামলুকরা তাদের মুনিবকে 'উস্তাদ বা সাইয়িদ' উপাধিতে সম্বোধন করত। ক্রয়কৃত ছোট্ট দাসদের কীভাবে লালন-পালন করা হতো, এখনো যাদের শৈশবকাল অতিবাহিত হয়নি? মাক্রিজী রহ. এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন—

"তাদের প্রথমত আরবি ভাষায় লেখাপড়া শেখানো হতো। এরপর এমন কারও হাতে তাদেরকে সোপর্দ করা হতো, যিনি তাদেরকে কুরআনে কারীম শিক্ষা দিতেন। এরপর ফিকহে ইসলামীর প্রাথমিক জ্ঞান ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া হতো। নামাজ আদায়ের গুরুত্ব প্রদান করা হতো। অনুরূপ মাসনুন আমল ও দুআ শিক্ষা দেওয়া হতো। মামলুকরা দক্ষ তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠত। তারা কোনো ভুলের শিকার হলে ইসলামী বিধান শিক্ষা প্রদান করত। তাদের সতর্ক করা হত।"

উল্লেখিত বিশেষ পরিচর্যা ও লালন-পালনের কারণে মামলুক শিশুরা স্বাভাবিকভাবেই এমনভাবে বেড়ে উঠত যে, তারা ইসলামধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবনত থাকত। ইসলামের যোগ্য উত্তরসূরি হয়ে তারা বেড়ে উঠত। জীবনভর ইলম ও উলামাদের মর্যাদা ও ফজিলত তাদের মাঝে জাগ্রত থাকত। মাক্রিজী রহ.-এর বক্তব্য মামলুক যুগের ইসলামী শিক্ষার গণজাগরণের চিত্র ফুটিয়ে তোলে। এ কারণেই মমলুক সাম্রাজ্যের যুগে একদল ইসলামী জ্ঞানতাপসী বিরল ব্যক্তিত্ব বিশ্ববিখ্যাত উলামায়ে কেরাম জন্মলাভ করেন। যেমন ইজ ইবনে আবদুস সালাম, ইমাম নববী, ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাইয়িম জাওযিয়া, ইবনে হাজার আসকালানী, ইবনে কাছীর, মাক্রিজী, ইবনে জামাআহ, ইবনে কুদামা মাকদিসী, [রহিমাহুল্লাহ জামিয়ান]। এছাড়াও বহুসংখ্যক আলেম জন্মলাভ করেন, যাদের নির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করা খুব কঠিন।

এরপর তারা যখন প্রাপ্তবয়সে উপনীত হতো, তাদের রণশাস্ত্র, লড়াইবিদ্যা, অশ্বারোহণ, তীর নিক্ষেপ, তরবারি চালনা শিক্ষা দেওয়া হতো। এভাবে একসময় তারা দক্ষ তীরন্দাজ ও কষ্টসহিষ্ণু যোগ্য যোদ্ধায় পরিণত হতো।

এরপর তাদের নেতৃত্বজ্ঞান, পরিচালনা দক্ষতা, সামরিক সংকট থেকে উত্তরণ, কঠিন বিষয়ের সমাধান শিক্ষা দেওয়া হতো। এভাবেই এক এক জন মমলুক পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করত। পাশাপাশি তাদের মাঝে দ্বীনি চেতনা ও ইসলামী আত্মমর্যাদাবোধের কোনো ঘাটতি থাকত না। উপরোক্ত প্রশিক্ষণের ফলে রণক্ষেত্রে মামলুকদের কদম অবিচল থাকত।

মামলুকদের প্রতিপালন-নীতি থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সেই যুগটি ছিল দক্ষ ও আন্তরিক দায়ী ও অভিভাবকের যুগ। যারা ছোটদের সঠিক পন্থায় বেড়ে ওঠার প্রতি পূর্ণ গুরুত্বারোপ করতেন। এতে তারা খুব সহজেই কঠিন ও জটিল বিষয়গুলোকে মেনে নিতে পারত। কারণ, তাদের মেধা-মস্তিষ্কে কোনো বক্রতা ছিল না। তারা হৃদয়াত্মায় কোনো ভ্রান্ত মতবাদ লালন করত না। ফলে তারা যাবতীয় কঠিন দায়িত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ উত্তম পন্থায় আঞ্জাম দিত।

প্রতিপালনের এ সকল ধাপ মুনিবগণ নিজেরাই তত্ত্বাবধান করতেন। এমনকি কখনো কখনো সুলতান নাজমুদ্দীন আইয়ূব রহ. নিজেই তাদের থাকা-খাওয়া নিশ্চিত করতেন। অনেক সময় তাদের সঙ্গে খেতে বসতেন, তাদের সঙ্গে খোশ মেজাজে কথা বলতেন। মামলুকগণও তাকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসত। তার প্রতি ছিল পরিপূর্ণ আনুগত্য-পরায়ণ।

এটাই নিয়ম, যখন রাজা কিংবা নেতা প্রজা বা জনসাধারণের ব্যথায় ব্যথিত হবেন, তাদের সুখে আনন্দ প্রকাশ করবেন, তাদের খোঁজখবর নেবেন, তাদের সঙ্গে ওঠা-বসা করবেন, তারাও তাকে মনেপ্রাণে ভালোবাসবে, তার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করবে। নিঃসন্দেহে তার প্রতি তারা হবে আস্থাভাজন। যখন তিনি তাদের জিহাদের প্রতি আহ্বান করবেন, তারা সকলে দ্রুত তার ডাকে সাড়া দেবে। কোনো কিছুর নির্দেশ দিলে, তা পালনের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে। তা বাস্তবায়নের জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেবে। পক্ষান্তরে নেতা যখন জনসাধারণ থেকে দূরে থাকবেন, একাকী জীবনযাপন করবেন, ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকবেন, তাদের দুঃখের কোনো খোঁজখবর নিবেন না, তখন তারাও নেতার আদেশ নিষেধের পরোয়া করবে না। এমনকি অনেক সময় তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে।

দ্বীনদারী ও সামরিকবিদ্যায় কোন মমলুক উৎকৃষ্ট বিবেচিত হলে ধীরে ধীরে তার পদোন্নতি হতো। একপর্যায়ে সে অন্যান্য মামলুকদের নেতায় পরিণত হতো। এরপর আরও পারদর্শী হলে তাকে রাজ্যের বিশেষ পদ প্রদান করা হত। এভাবে সে এতোপর্যায়ে আঞ্চলিক আমীরের পদ লাভ করত, সেনাপতির আসনে আসীন হত।

সাধারণত মামলুকদের তাদের—সাইয়িদ যিনি তাদেরকে ক্রয় করেছেন—তার নামের দিকে সম্বন্ধ করে ডাকা হতো। সুতরাং যাদের মালিকুস সালেহ ক্রয় করেছেন, তাদের সালেহিয়া, যাদের মালিকুল কামেল ক্রয় করেছেন তাদের কামেলিয়া বলে ডাকা হতো ইত্যাদি।

সালেহিয়া মামলুকগণের সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পেয়েছিল। নাজমুদ্দীন আইয়ূব রহ. এর যুগে তাদের মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এমনকি নাজমুদ্দীন আইয়ূব রহ. নীলনদের তীরে নিজের জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করলে পাশেই সালেহিয়া মামলুকদের জন্য একটি পূর্ণ দুর্গ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাসাদ ও দুর্গটি কায়রোর পর্যটন অঞ্চলে নির্মাণ করা হয়েছিল। নীলনদ সে সময় 'বাহর' [সমুদ্র] নামে পরিচিত ছিল। এ কারণে সালেহিয়া মামলুকগণ 'বাহরিয়া মামলুক' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কারণ, তারা বাহর [সমুদ্র] পাড়ে বাস করত।

এভাবেই আল মালিকুস সালেহ নাজমুদ্দীন আইয়ূব রহ. যে সকল মামলুক সাম্রাজ্য ও সৈন্যবাহিনীর উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়েছে, তাদের সহযোগিতায় নিজ সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করেছেন। তার যুগে মামলুক 'ফারেসুদ্দীন আকতাই'

সেনাপ্রধানের পদের অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং সহকারী সেনা প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত হন মামলুক 'রুকন উদ্দীন বাইবার্স'। তারা উভয়েই বাহরিয়া মামলুক ছিলেন।

লুইস তাসে'র আক্রমণ

চলুন, ৬৪৭ হিজরীর দিকে একটু মনোনিবেশ করি—

৬৪৭ হিজরীতে মালিকুস সালেহ নাজমুদ্দীন আইয়ূব রহ. মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। বার্ধক্যে উপনীত হওয়া ছাড়াও যক্ষারোগে আক্রান্ত হন। এতে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। সে সময় ফ্রান্সের রাজা লুইস তাসে মুসলিমবিশ্বের পূর্বাঞ্চলে তাতারী আক্রমণ করার সুযোগ সন্ধান করছিল। নাজমুদ্দীন রহ. অসুস্থতার সুযোগে সে মুসলিম বিশ্বের মিশর ও সিরিয়ায় আক্রমণ করে বসে। আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, লুইস তাসে' পূর্বে তাতার সম্রাট কায়ুক ইবনে উকিতাই এর সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তবে লুইস তাসে' আক্রমণ অব্যাহত রাখে।

আক্রমণের জন্য সর্বপ্রথম মিশরের শহর দিময়াত নগরীকে বেছে নেয়। কারণ, দিময়াত নগরী তৎকালীন ভূমধ্যসাগরের পূর্বদিকের সবচেয়ে বড় বন্দর। এই আক্রমণকে মুসলিম ইতিহাসের 'সপ্তম ক্রুশেড আক্রমণ' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

এখানে আমরা এই আক্রমণের বিস্তারিত আলোচনা করব না। যদিও এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। 'ক্রুশেড আক্রমণ' কিতাবে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব—ইনশাআল্লাহ।

৬৪৭ হিজরীর ২০ শে সফর লুইস তাসে' দলবল নিয়ে দিময়াত নগরীতে অবতরণ করে। আফসোস! শহর প্রতিরক্ষাবাহিনী ভেবেছিল যে, তাদের সুলতান নাজমুদ্দীন আইয়ূব ইন্তেকাল করেছেন। ফলে তারা শহর ছেড়ে পলায়ন করে। আর খুব সহজে খ্রিস্টানদের হাতে দিময়াত নগরীর পতন ঘটে। এটি সেই শহর, যা ইতিপূর্বে খ্রিস্টানদের পঞ্চম আক্রমণের সময় ধোঁকা খেয়েছিল।

নাজমুদ্দীন আইয়ূব রহ. এ সংবাদ পেয়ে যারপরনাই ব্যথিত হন এবং দিময়াত পতনের কারণে দায়িত্বশীলদের শাস্তি প্রদান করেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান করেন, খ্রিস্টানরা মিশরের রাজধানী কায়রো আক্রমণের জন্য নীলনদ পাড়ি দিয়ে অগ্রসর হবে। এর মাধ্যমে তারা মিশর সাম্রাজ্য পতনের প্রয়াস চালাবে।

তিনি বিজ্ঞোচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, কায়রো ও দিময়াতের মাঝপথে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হোক। এ জন্য তিনি 'মানসুরা' শহর নির্বাচন করেন। কারণ, মানসুরা শহর নীলনদের পাড়ে অবস্থিত। বাস্তবেই খ্রিস্টানরা অসংখ্য জাহাজ নিয়ে সমুদ্রপথ পাড়ি দেওয়ার জন্য নীলনদকে বেছে নেয়।

মালিকুস সালেহ নাজমুদ্দীন রহ. নীলনদের তীরে অবস্থিত মানসুরা শহরে তাকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। কারণ, সেখানে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ চলছে। বাস্তবেই তিনি দুরারোগে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তাকে মানসুরা শহরে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে ফারেসুদ্দীন আকতাই ও রুকন উদ্দীন বাইবার্স যুদ্ধের সুষ্ঠু পরিকল্পনা করতে থাকেন।

আল মালিকুস সালেহ নাজমুদ্দীন আইয়ূব রহ. এর ইন্তেকাল

১২ই শাবান ৬৪৭ হিজরীতে খ্রিস্টানরা দিময়াত শহর থেকে কায়রোর উদ্দেশে নীলনদ পাড়ি দেওয়ার জন্য রওয়ানা হয়। নিশ্চিত ছিল যে, তারা মানসুরা নগরীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে। যেমনটি নাজমুদ্দীন আইয়ূব রহ. ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহর কী মহিমা! ১৫ ই শাবান দিবাগত রজনী ৬৪৭ হিজরীতে আল মালিকুস সালেহ নাজমুদ্দীন আইয়ূব রহ. ইন্তেকাল করেন। তখন তিনি কায়রো রক্ষার উদ্দেশ্যে মানসুরা শহরে সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করুন, তার প্রতি রহমত নাজিল করুন এবং তাকে শাহাদাতের মর্যাদায় ভূষিত করুন। আমীন।

আন নুজুমুয যাহেরা ফি মুলুকি মিশর ওয়াল কাহেরা নামক কিতাবের লেখক ইবনে তাগরী বারদী রহ. [মৃত্যু ৮৭৪ হি.] লেখেন—

'মুসলমানদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে মানসুরা নামক স্থানে দুরারোগে আক্রান্ত অবস্থায় যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ ব্যতীত মালিকুস সালেহ নাজমুদ্দীন আইয়ূব রহ. অন্য কোনো নেক আমল না থাকলেও তার নাজাতের জন্য এটিই যথেষ্ট।'

এরপর তিনি লেখেন, তিনি ছিলেন ধৈর্যের পাহাড় ও সুমহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

মুসলমানদের জন্য এ ছিল মহাসংকট! শুধু মুসলিম নেতার বিয়োগের কারণে নয়, বরং তৎকালীন সংকটময় মুহূর্তে মুসলিম খলিফার ইন্তেকালের কারণে, যখন দেশ ছিল বিপদসংকুল, দিময়াত বন্দর ছিল বেদখল। খ্রিস্টান বাহিনী ছিল মাঝপথে।

তখন সুলতান নাজমুদ্দীন রহ. এর স্ত্রী বিজ্ঞোচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার নাম ছিল ‘শাজারাতুদ দুর’। শাজারাতুদ দুর মূলত তুর্কী কিংবা আর্মেনিয়ার বাঁদি ছিলেন। সুলতান তাকে ক্রয় করে পরবর্তীতে আজাদ করে বিয়ে করেন। তাই তিনিও মূলত মমলুক ছিলেন।

নাজমুদ্দীনের মৃত্যুর পর স্ত্রী শাজারাতুদ দুর কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

স্ত্রী শাজারাতুদ দুর সুলতানের মৃত্যুর সংবাদ গোপন রেখে বললেন, ডাক্তারগণ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি সুলতানের ছেলে তাওরান শাহ ইবনে নাজমুদ্দীন আইয়ূব, [যিনি কিফা নামক শহরের গভর্নর ছিলেন]। তার নিকট খুব দ্রুত তার পিতার মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে এই মর্মে চিঠি প্রেরণ করেন যে, তিনি যেন ফিরে এসে মিশর ও সিরিয়ার রাজত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রী ফখরুদ্দীন ইউসুফের সঙ্গে তাকে যাবতীয় দায়িত্ব অর্পণের ব্যাপারে একমত হন এবং ফারেসুদ্দীন আকতাই ও রুকন উদ্দীন বাইবার্সকে মানসুরার যুদ্ধপ্রস্তুতি জারি রাখার নির্দেশ প্রদান করেন। শাজারাতুদ দুরের বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার কারণে সুলতানের মৃত্যুর পরও সবকিছু ঠিকঠাক চলতে থাকে। সুলতানের মৃত্যুর পর যে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করার কথা ছিল, তা আর হয় না।

শাজারাতুদ দুর কর্তৃক যাবতীয় সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও সুলতানের মৃত্যু সংবাদ ধীরে ধীরে জনগণের কাছে পৌঁছে যায়। এমনকি খ্রিস্টানদের পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এতে খ্রিস্টানদের সাহস বেড়ে যায় এবং মিশরীয় বাহিনীর মনোবল হ্রাস পায়। যদিও তারা মানসুরা ভূমিতে অবিচল থাকে।

ফারেসুদ্দীন আকতাই ও রুকন উদ্দীন বাইবার্স ফ্রান্স বাহিনীর মোকাবেলায় চমৎকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং তা শাজারাতুদ দুরের সামনে পেশ করেন। তাওরান শাহের আগমন পর্যন্ত শাজারাতুদ দুর ভারপ্রাপ্ত সুলতানের ভূমিকা পালন করেন। তিনি তাদের যুদ্ধকৌশলকে সমর্থন করেন এবং মিশরীয়বাহিনী যুদ্ধের চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

মানসুরার যুদ্ধ

৪ ই যিলকদ ৬৪৭ হিজরীতে মানসুরা নগরীতে এক মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে মুসলমানরা কল্পনাতীত জয়লাভ করেন। যুদ্ধের চমৎকার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে, তবে স্থান অনুপযোগী হওয়ায় তা ছেড়ে দেওয়া হলো।

৭ই যিলকদ ৬৪৭ হিজরীতে লুইস তাসে'র সৈন্যবাহিনীর ওপর মানসুরার বাইরে আরেক বার আক্রমণ হয়। তবে লুইস তাসে' কোনোমতে এই আক্রমণ প্রতিরোধ করে।

এই দ্বিতীয় আক্রমণের দশ দিন পর ১৭ই যিলকদ ৬৪৭ হিজরীতে তাওরান শাহ আগমন করেন এবং রাজত্বভার গ্রহণ করেন। এরপর তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে মালিকুস সালেহ নাজমুদ্দীন আইয়ূব রহ. এর ইন্তেকাল ও তার ক্ষমতাসীন হওয়ার ঘোষণা দেন। তিনি নতুনভাবে খ্রিস্টানদের আক্রমণ করার পরিকল্পনা করতে শুরু করেন। তখন খ্রিস্টান বাহিনী ছিল বিপর্যস্ত। দিময়াত নগরী ছেড়ে তারা পালাতে শুরু করেছিল। তারা বিগত পরাজয়সমূহ বিশেষত মানসুরার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ফলে এবং তাওরান শাহের আগমনসংবাদ পেয়ে মনোবল হারিয়ে ফেলেছিল।

সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ শেষে তাওরান শাহ ইবনে সালেহ আইয়ূব মানসুরার যুদ্ধের দুই মাস পর ৬৪৮ হিজরীর মহররম মাসের শুরুর দিকে দ্বিতীয়বার খ্রিস্টানদের ওপর আক্রমণ করার জন্য ফারেসকুর নামক শহরের কাছে মিশরীয় বাহিনীকে প্রস্তুত করেন। সেখানে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে খ্রিস্টান বাহিনী পিষ্ট হয়। লুইস তাসে' গ্রেপ্তার হয়। লুইস তাসে'কে বেড়ি পরিয়ে টেনে-হেঁচড়ে মানসুরা নগরীতে নিয়ে আসা হয় এবং ফখরুদ্দীন ইবরাহীম ইবনে লুকমানের ঘরে তাকে বন্দী করে রাখা হয়। খ্রিস্টান বাহিনী পালাবার কোনো সুযোগ পায়না। নিহত হয় অথবা বন্দী!

বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেতে লুইস তাসে'র সামনে কঠিন কয়েকটি শর্তারোপ করা হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য শর্ত হলো—

১. আট লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা অর্পণ করতে হবে। অর্থেক নগদ, অর্ধেক বাকি।
২. অবশিষ্ট স্বর্ণমুদ্রা প্রদান পর্যন্ত অন্যান্য সৈন্য বন্দী থাকবে।
৩. মুসলিম বন্দীদের ছেড়ে দিতে হবে।
৪. দিময়াত নগরী মুসলমানদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে।
৫. দুই দলের মাঝে দশ বছর যুদ্ধবিরতি থাকবে।

সার্বিক বিবেচনায় মুসলমানগণ অভাবনীয় বিজয় লাভ করেছিল।

লুইস তাসে' বহু কষ্টে চার লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ব্যবস্থা করে। এরপর তাকে তৎকালীন খ্রিস্টানদের প্রধান সাম্রাজ্য আক্কা নগরীতে ছেড়ে দেওয়া হয়। আল্লাহ যেন আক্কা নগরীকে ইহুদীদের অশুভ থাবা থেকে রক্ষা করেন। আমীন।

তাওরান শাহের মৃত্যু

যুদ্ধে বিপুল জয় লাভ হলেও এসব আক্রমণ প্রতিহত করার মতো মহান পুরুষ তাওরান শাহ ছিলেন না।

তাওরান ছিলেন অসার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তিনি অসৎ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। রাজনৈতিক শাস্ত্র সম্পর্কে তিনি ছিলেন অজ্ঞ। ফ্রান্সের রাজা লুইস তাসে'র বিপক্ষে জয়লাভ করে তিনি ধোঁকাগ্রস্ত হন। তিনি নিজেকে মহান ভাবতে শুরু করেন। একদিকে তিনি (সৎ মা) শাজারাতুদ দুরকে অবজ্ঞা করতে শুরু করেন। তাকে তার বাবার সম্পদ আত্মসাৎ করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। তাকে আত্মসাৎকৃত সম্পদ উপস্থিত করার নির্দেশ দেন এবং তাকে গুরুতর হুমকি প্রদান করেন। পিতার মৃত্যুর পর তাকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রদান থেকে বঞ্চিত করেন। অন্যদিকে রাজ্যের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রতিও অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। তাদের মাঝে পদমর্যাদা ও দায়িত্ব হ্রাস করতে থাকেন। আরেক দিকে যেসব মানুষ কিফা নগরী থেকে তার সঙ্গে আগমন করেছিল, তাদের পদোন্নতি প্রদান করেন। সবাই সুস্পষ্ট বুঝতে পারে যে, তিনি মিশরের রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করবেন। এসব ছিল মিশরে তার আগমনের তিন মাসে সংঘটিত হয় (ফারেসকুর যুদ্ধের পর)।

শাজারাতুদ দুর নিজের জানের আশঙ্কা করেন। বিধায় তিনি বাহরিয়া মামলুকদের কাছে আত্মগোপন করেন। ফারেসুদ্দীন আকতাই ও রুকন উদ্দীন বাইবার্সও। তিনি বাহরিয়া মামলুকদের সাইয়িদ পত্নী বিধায় তারা তার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে এবং আনুগত্য প্রদর্শন করে। তিনি তাদের আনুগত্য পরায়ণতা ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপনকে কাজে লাগান। তিনি তাদের সবাইকে নিয়ে তাওরান শাহ তাদের হত্যা করার পূর্বেই তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন!!

সাধারণত মামলুকদের নিকট হত্যা করা ছিল খুব সহজ কাজ। কারও প্রতি 'সন্দেহ' হলেই তারা তাকে হত্যা করে ফেলত। কারও প্রতি যদি তাদের এই সন্দেহ হয় যে, সে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, এটাকেই তারা হত্যা করার বৈধ কারণ মনে করত। আমি জানি না, মামলুকদের নিকট হত্যা করা এত সহজ হলো কী করে? মামলুক সাম্রাজ্যের প্রত্যেক যুগেই হত্যা করা ছিল সহজ কাজ। কেবল সন্দেহের ভিত্তিতে কত আমীর-উমারা, রাজা-বাদশাকে যে হত্যা করা হয়েছে, এর কোনো ইয়ত্তা নেই। নিরস সামরিক প্রশিক্ষণ যার ওপর মামলুকরা

বেড়ে উঠেছে, এর কারণ হতে পারে। তাদের মাঝে ছিল নির্মমতা ও কঠোরতা!! খুব সহজে তাদের অন্তর বিগলিত হতো না। যে কোনো বিষয় তারা তরবারির আঘাতে সমাধান করত, নখ শক্ত হওয়ার পরই যেই তরবারি তারা ধারণ করত। কিন্তু মামলুকরা তো দ্বীনি পরিবেশেও বেড়ে ওঠেছে। তাদের ফেকহি মাসআলা-মাসায়েলও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তাদের কোন ফেকহি সনদ যেকোনো মানুষকে হত্যার অনুমোদন দেয়? আপনি তাদের সম্মানহানী করবেন, প্রবল ধারণা নয়; বরং সন্দেহ হলেই তারা আপনাকে হত্যা করে ফেলবে!

উল্লেখ্য, ষড়যন্ত্রময় ফেতনা-ফ্যাসাদে ভরা সে যুগে অন্যকে হত্যা করার বিষয়টিকে খারাপ মনে করা হতো না। তাই হত্যাকারী প্রতিপক্ষকে হত্যা করে গর্ব করে বেড়াত। অন্তরে সামান্যতম দয়া সৃষ্টি হতো না। যেনো আল্লাহর কাছে প্রবাহিত রক্তের কোনো মূল্য নেই, নেই মানুষের কাছেও।

এটি তাওরান শাহ বা অন্য কোনো মানুষের জন্য প্রতিরক্ষা নয়। শাস্তি প্রদান কিংবা অন্যকে হত্যা করা ইসলামে নীতিমালা রয়েছে। এই নীতিমালা আমরা প্রণয়ন করিনি; বরং আসমান-জমিনের সৃষ্টিকর্তা তা প্রণয়ন করেছেন। এ কারণেই চোর যদিও অপরাধী, অসৎ ও নিকৃষ্ট, তবু শুধু চুরির অপরাধে তাকে হত্যা করা যাবে না, বরং তার হাত কেটে ফেলা হবে। অবিবাহিত ব্যভিচারী যদিও ভয়ানক ও নিকৃষ্ট কাজ করেছে, তথাপি তাকে বেত্রাঘাত করা হবে। পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা যাবে না ইত্যাদি।

সন্দেহ বা অপবাদ কাউকে হত্যার শরীয়ত সম্মত যুক্তি বা সঙ্গত কারণ নয়। হ্যাঁ! সন্দেহ বা অপবাদের কারণে বরখাস্ত করা যেতে পারে, বন্দী করা যেতে পারে বা অন্য শাস্তি প্রদান করা যেতে পারে। 'হত্যা' একটি গুরুতর বিষয় শরীয়তে এর স্বতন্ত্র নীতিমালা রয়েছে।

জনৈক অগ্নিপূজক গোলাম হযরত ওমর রা. কে হত্যা করবে, এ ব্যাপারে প্রবল ধারণা হওয়া সত্ত্বেও হযরত ওমর রা. তাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। সেই অগ্নিপূজকের নাম ছিল 'আবু লুলুয়া'। সে মদীনায় বাস করত। সে হযরত ওমর রা. কে প্রচণ্ড ঘৃণা করত। সে সময় হযরত ওমর রা. আমীরুল মুমিনীন। হযরত ওমর রা. তার ঘৃণার বিষয়ে অবগত ছিলেন। কিন্তু তিনি তাকে হত্যা, বন্দী কোনোরূপ জুলুম করার চিন্তাও করেননি। কারণ, বিষয়টি সন্দেহ প্রসূত—নিশ্চিত নয়।

তবকাতে ইবনে সা'দে হযরত ইবনে সা'দ রা. বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর রা. একদিন অগ্নিপূজককে বললেন, আমি শুনেছি, তুমি বলেছ, আমি চাইলে জাঁতাকল তৈরি করতে পারি, যা দিয়ে আপনি পেষণকর্ম করবেন। (অগ্নিপূজক জাঁতাকল তৈরির দক্ষ কারিগর ছিল) অগ্নিপূজক ভ্রু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি আপনার জন্য এমন এক জাঁতাকল তৈরি করব, চিরকাল লোকেরা যার আলোচনা করবে।

ওমর রা. তার বলার ভঙ্গিমা দেখে অন্যদের বললেন, গোলাম আমায় হুমকি দিচ্ছে!! অর্থাৎ ওমর রা.-এর প্রবল সন্দেহ হয়েছে যে, সে তাঁকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে। হযরত ওমর রা. সাধারণ কোনো মুসলমান নন। তাঁর সন্দেহ অন্যদের একীনের পর্যায়ের। তিনি সেই মত পোষণকারী, যার মতের স্বপক্ষে কুরআনে কারীমে বেশ কয়েকটি (১০টি) আয়াত নাজিল হয়েছে। তথাপি হযরত ওমর রা. সন্দেহের ভিত্তিতে কখনো তাকে হত্যা তো দূরের কথা, বন্দী করারও ইচ্ছা করেননি। অথচ সে ছিল বিধর্মী। কিন্তু জুলুম ও ইনসাফের মুআমালায় মুসলিম-অমুসলিম সবাই সমান। কুরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে—

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُو

"কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেনো তোমাদের ইনসাফ পরিত্যাগের প্রতি প্ররোচিত না করে।"[৬৬]

সুবহানাল্লাহ! কিছুদিন যেতে না-যেতেই হযরত ওমর রা. এর ধারণা সত্যে পরিণত হয়েছে। তখন তিনি গোলামকে হত্যা করেছেন। কিন্তু শরীয়তের নীতিমালায় কোনো পরিবর্তন সাধন করেননি। সুতরাং সুস্পষ্ট শক্তিশালী দলিল ব্যতীত কাউকে হত্যা করা, বন্দী করা কিংবা যেকোনো প্রকার শাস্তি প্রদান করা বৈধ নয়—চাই সে পুরুষ হোক বা নারী, স্বাধীন বা গোলাম ধনী বা গরিব। কুরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে—

إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

"এটা সত্য যে, সত্যের বিপরীতে অনুমান কোনো কাজে আসে না।"[৬৭]

হযরত ওমর রা.-এর চেয়ে আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে হযরত আলী ইবনে আবী তালেব রা. এর সঙ্গে। ওমর রা. তো তাকে হত্যার চেষ্টা করার পূর্বেই

---

[৬৬] সুরা মায়েদা : ০৮।

[৬৭] সুরা ইউনুস : ৩৬।

অগ্নিপূজক আবু লুলুয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করেছিলেন। কিন্তু হযরত আলী রা. তাকে বর্শা নিক্ষেপকারী আবদুর রহমান ইবনে মুলজিমকে (বর্শা নিক্ষেপ করা সত্ত্বেও) নিজের মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হত্যার নির্দেশ দেননি। হযরত আলী রা. মৃত্যুবরণ করার পর তাকে সাহাবায়ে কেরাম হত্যা করেন। যদি হযরত আলী রা. এর মৃত্যু না হতো, তাহলে তাকে হত্যা করা হতো না।

আবদুর রহমান ইবন মুলজিম হযরত আলী রা. কে বর্শা নিক্ষেপ করার পর হযরত আলী রা. বলেছিলেন, 'প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ'। সুতরাং যদি আমি মারা যাই, তাহলে সে যেভাবে আমাকে হত্যা করেছে, তোমরা তাকে সেভাবে হত্যা করবে। আর আমি যদি বেঁচে যাই, তাহলে আমি এ ব্যাপারে ভেবে দেখব, কী করা যায়। অতঃপর মৃত্যুর পূর্বে তিনি সন্তান-সন্ততি ও নিকটাত্মীয়গণকে অসিয়ত করে বলেন—

يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون في دماء المسلمين، تقولون: "قُتل أمير المؤمنين، قُتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتلن إلا قاتلي، انظر يا "حسن" إن أنا مت فاضربه ضرب ة بضربة، ولا تمثل بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "إياكم والمثلة، ولو بالكلب العقور

"হে বনী আবদুল মুত্তালিব, আমি তোমাদের যেনো মুসলমানদের রক্তপাত করতে না দেখি। তোমরা বলবে আমীরুল মুমিনীনকে হত্যা করা হয়েছে, আমীরুল মুমিনীনকে হত্যা করা হয়েছে। সাবধান! আমার হত্যাকারী ব্যতীত কাউকে যেন হত্যা না করা হয়। হাসান, মনোযোগ দিয়ে শোনো! আমি মারা গেলে তাকে প্রহার করে মারবে—বিকলাঙ্গ করে নয়। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, বিকলাঙ্গ করা থেকে বিরত থাকো। যদিও লোলুপ কুকুর দ্বারা হয়।"

এই হলো ইসলামী আদর্শ! হত্যাযোগ্য ব্যক্তিকে হত্যা করার সময়ও সীমালঙ্ঘন করা ইসলাম সমর্থন করে না। দেখুন ইসলাম কুকুরের মাধ্যমে বিকলাঙ্গ করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে!!

চলুন! আমরা মূল আলোচনায় ফিরে যাই।

শাজারাতুদ দুর ফারেসুদ্দীন আকতাই ও রুকন উদ্দীন বাইবার্স ও অন্যান্য সালেহিয়া মামলুকদের সঙ্গে তাওরান শাহকে হত্যা করার বিষয়ে একমত হলেন

এবং কার্যত ২৭শে মুহাররম ৬৪৮ হিজরী তথা কিফা নগরী থেকে ফিরে আসার মাত্র সত্তর দিন পর ও মিশরের ক্ষমতায় সমাসীন হওয়ার মাত্র সত্তর দিন পর তারা তাকে হত্যা করে ফেলে। যেন তিনি মিশর শাসন করার জন্য এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দেননি; যেন 'দাফন' হওয়ার জন্য পাড়ি দিয়েছেন!!

এভাবেই তাওরান শাহের মৃত্যুর মাধ্যমে মিশরে আইয়ূবী শাসনের পূর্ণ সমাপ্তি ঘটে। এরই মাধ্যমে ইসলামী ইতিহাসের এক দীর্ঘ অধ্যায় তালাবদ্ধ হয়।

মামলুক সাম্রাজ্য

তাওরান শাহের মৃত্যুতে চরম রাজনৈতিক শূন্যতা দেখা দেয়। তখন মিশরে রাজ্য পরিচালনার যোগ্য কোনো আইয়ূবী ছিল না। অন্যদিকে আইয়ূবীরা সিরিয়ায় থেকে মিশরের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করত। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মামলুকদের ব্যাপারে সিরিয়ার আইয়ূবীদের মাঝে ব্যাপক উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ, মামলুকরা আইয়ূবী সুলতান তাওরান শাহকে হত্যা করেছে। মামলুকরাও একথা নিশ্চিত জানত যে, আইয়ূবীরা প্রতিশোধ গ্রহণের পাঁয়তারা করছে। একথা নিশ্চিত, আইয়ূবীরা জানত, মিশরীয় বাহিনীতে আইয়ূবীদের মূল্য অসীম। মিশর সাম্রাজ্যের শক্তি এখন আইয়ূবী কিংবা অন্য কারও জন্য নয়, বরং তা এখন মামলুকদের অনুকূলে। তবে মামলুকরা মানসুরা ও ফারেসকুর যুদ্ধের পর অত্যাচারিত হয়েছে। কারণ, তারাই আইয়ূবীদেরর বিরুদ্ধে জয়ের কারণ ছিল।

এসকল কারণে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মামলুকরা মিশরের ক্ষমতা গ্রহণের কথা ভাবতে শুরু করে। 'জোর যার মুল্লুক তার' এই নীতি তো চিরন্তন। বর্তমানে মিশরে যেহেতু তাদের শক্তি প্রবল, তাহলে ক্ষমতা কেন তাদের হবে না?!

মামলুকগণ তুলুনিদের যুগ থেকে [শাসনামল ২৫৪-২৯২ হি.] মিশরের সেবা আঞ্জাম দিচ্ছে। অর্থাৎ মামলুক শাসনামলের পূর্ণ ৪০০ বছর পূর্ব থেকে। অনরূপ তারা আখশিদ সাম্রাজ্যের শাসনামলেও [শাসনামল ৩৩২-৩৫৮ হি.] মিশরে বিভিন্ন খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে এবং শীয়া মতাবলম্বী ফাতেমীদের যুগ ও সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী রহ. এর শাসনামলের শেষ তথা পূর্ণ দুইশো বছর [৩৫৮-৫৬৮ হি.] খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে। সর্বশেষ আইয়ূবীদের আমলে প্রচুর পরিমাণে খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে, যা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি।

এসব যুগে সৈন্যবাহিনী সাধারণত মামলুকদের ওপরই ভরসা করত। তবুও মামলুকরা কখনো রাজত্ব কিংবা নেতৃত্বের কথা ভাবেনি; বরং সর্বদা তারা ছিল রাজ্যের সহযোগী শক্তি। মামলুক হওয়ায় কখনোই তাদের মাথায় রাজত্ব ও ক্ষমতার কথা ভাবেনি। তারা বেচা-কেনা হতো। তাদের নিজস্ব কোনো বংশপরিচয় ছিল না, যেদিকে তাদের সম্বন্ধযুক্ত করা হবে। বংশহীনতার কারণে তারা মুসাফিরের মতো বাস করত। নিজেদের কখনোই তারা পূর্ণাঙ্গ মানুষ মনে করত না। তারা ছিল রাজা-বাদশাদের অনুসারী। তাদের নিজস্ব কোনো লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল না। পক্ষান্তরে এখন সময় হয়েছে ক্ষমতা হাতে তুলে নেওয়ার। কারণ, তারা ষড়যন্ত্রের শিকার। বিপদ তাদের তাড়া করছে। অন্য দিকে রাজা-বাদশারা দুর্বল। সকল শক্তি তাদের হাতের মুঠোয়! তাই কেন তারা রাজ্য পরিচালনায় নিজেদের সিদ্ধহস্ত করবে না?!

কিন্তু মিশরে মামলুক-বংশের শাসন ছিল খুবই ঘৃণিত। কারণ, জনসাধারণ ভুলে যায়নি যে, তারা জাতে গোলাম। তাদের কেউ ক্রয় করত, কেউ বিক্রয় করত। হুররিয়াত/স্বাধীন হওয়া মুসলিম শাসকের জন্য অন্যতম মৌলিক শর্ত। এমনকি যদি তারা আযাদকৃতও হয়, তথাপি জনগণের পক্ষে তাদের শাসক হিসেবে মেনে নেওয়া কষ্টকর। তাদের হাতে যদি অঢেল সম্পত্তি থাকে, তাদের ইতিহাস যদি হয় স্বর্ণোজ্জ্বল, যদি তারা বিভিন্ন অঞ্চল শাসন করে, তবুও তারা মূলে মামলুক। রাজ-ক্ষমতায় তাদের সমাসীন হওয়ার জন্য থাকতে হবে যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাসযোগ্য প্রয়োজনীয়তা। এ কারণেই তাওরান শাহের মৃত্যুর পর পরবর্তী সময় মামলুক শাসনের পথ নির্মাণ করছিল। তখন তাদের মিশরে কিংবা তাদের দুনিয়ায় পরিবর্তন এসেছিল।

এই ছিল বাহরিয়া সালেহিয়া মামলুকদের বিচার-বিবেচনা। কিন্তু শাজারাতুদ দুরের বিচার-বিশ্লেষণ কী ছিল?!

শাজারাতুদ দুর ছিলেন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এক মহীয়সী নারী। ইতিহাসে এমন নারীর পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। তিনি ছিলেন শক্তিশালী বীর, দুঃসাহসী। তীক্ষ্ণ মেধা ও বুদ্ধির অধিকারিণী। তিনি বিজ্ঞোচিত সিদ্ধান্তে কাজ করতেন। তার নেতৃত্ব ও পরিচালনার পূর্ণ ক্ষমতা ছিল (এটাই ছিল তার বড় সমস্যা)। তিনি নিজ সত্তার মাঝে এসব ক্ষমতা ও প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ দেখতে পেতেন, যা তাকে মুসলিমবিশ্ব নিয়ে নতুন ভাবে ভাবনায় ফেলে দেয়। বিশেষত মুসলিমউম্মাহর এই সুলতানহীন সংকটমুহূর্তে।

শাজারাতুদ দুর নিজেই ক্ষমতায় সমাসীন হওয়ার চিন্তা করলেন। এটি ছিল ব্যতিক্রমধর্মী সিদ্ধান্ত। স্রোতের বিপরীতে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন। কিন্তু তিনি নিজের মাঝে ওই সব যোগ্যতার সমন্বয় দেখেছিলেন, যা তাকে এই দুঃসাহসী চিন্তা বাস্তবায়নের প্রেরণা যোগায়। তিনি মনে মনে বলেন, মানসুরার যুদ্ধ চলাকালে আমি পরোক্ষভাবে মিশর শাসন করেছি। তাহলে তখন কেন প্রকাশ্যে শাসন করব না?

সে সময় তথা অন্তর্বর্তীকালে বাহরিয়া মামলুকগণ শাজারাতুদ দুরের মাঝে তাদের ভবিষ্যৎ সুলতানকে খুঁজে পায়। কারণ, তিনি তাদের মুনিবের স্ত্রী। পূর্ণ ওফাদার, শ্রদ্ধার, ভালোবাসার পাত্র আল মালিকুস সালেহ নাজমুদ্দীন আইয়ূব রহ.-এর পবিত্রা স্ত্রী। অথচ তিনি সে সময়ও নিজেকে মামলুক মনে করতেন। কারণ, তিনি তো মূলত একজন দাসী ছিলেন। পরবর্তীতে আযাদ হন।

তাই মামলুকদের চিন্তা-ভাবনা শাজারাতুদ দুরের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে মিলে যায়। তারা সকলে তাওরান শাহের ইন্তেকালের কিছুদিন পর মিশরের রানি হিসেবে শাজারাতুদ দুরের নাম ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এটি ৬৪৮ হিজরীর সফর মাসের প্রথম দিকের ঘটনা।

উত্তাল পৃথিবী : নির্ভীক শাজারাতুদ দুর

সর্বত্র প্রতিবাদের দাবালন দাউ দাউ করছে। গোটা মুসলিমবিশ্ব এই পদক্ষেপের প্রতি নিন্দাজ্ঞাপন করছে। শাজারাতুদ দুর যথাসাধ্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছেন। তাই কখনো তিনি নিজেকে স্বামীর দিকে নিসবত করে উপস্থাপন করেন, আমি 'মালিকাতুল মুসলিমীনাস সালেহিয়া'। কিন্তু দেখেন যে, এতে কোনো উপকার হচ্ছে না। তাই তিনি নিজেকে নাজমুদ্দীন রহ. ছোট ছেলের দিকে [যিনি খলীল নামে প্রসিদ্ধ] সম্বন্ধ করে বলেন, আমি 'মালিকাতুল মুসলিমিনাস সালেহিয়া ওয়ালিদাতুস সুলতান খলীল আমীরুল মুসলিমীন'। কিন্তু জনমনের ক্ষোভ নির্বাপিত করার জন্য এও যখন যথেষ্ট হলো না। তখন তিনি তৎকালের বাগদাদের আব্বাসী খলিফা, যার শাসনামলে তাতারীদের হাতে বাগদাদের পতন ঘটে, যার আলোচনা পূর্বে আমরা করেছি, তার দিকে নিসবত করে বলেন, আমি 'মালিকাতুল মুসলিমীনাল মুসতা'সিমিয়া সালেহিয়া ওয়ালিদাতুস সুলতান খলীল আমীরুল মুমিনীন'!!

জনসাধারণ ও আলেম-উলামাদের নিকট নিজেকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য এতসব প্রচেষ্টা ও দুরভিসন্ধি করার পরেও জনক্ষোভ প্রশমিত হয়নি; বরং

সর্বস্তরের জনগণের মাঝে ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। বিশেষত দেশ একটি গুরুতর সংকটে নিপতিত হয়। অন্যদিকে ক্রুশেড আক্রমণ এখনো থামেনি। ক্রুশেডশক্তি ফিলিস্তিনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ফিলিস্তিন মিশরের খুব নিকটে অবস্থিত। তৃতীয় আরেক সংকট হলো, মিশরের দিকে সিরিয়ার আইয়ূবী আমীরগণের লোলুপ দৃষ্টি ছিল। তাদের ও সুলতান নাজমুদ্দীন আইয়ূব রহ. মধ্যকার বিরোধ ছিল তুঙ্গে। পাশাপাশি মুসলিম সাম্রাজ্যের পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে তাতারী বাহিনীর আক্রমণ ক্রমাগত তীব্র হচ্ছিল। মুসলিম-নিধন চলছিল অবিরাম। বর্তমানে তাতাররা আব্বাসী খেলাফতের দরজায় শক্ত কড়াঘাত করছিল। মোটকথা, মুসলিম জাতি চতুর্দিক থেকে ভয়াবহ আগ্নেয়গিরির বেষ্টনে বেষ্টিত ছিল। কেউ জানে না এই আগ্নেয়াগিরি কবে থামবে!! বিস্ফোরিত হবে!!

মিশরের আনাচে-কানাচে সর্বস্তরের জনগণের মাঝে চলছিল বিক্ষোভ মিছিল। বিক্ষোভকারীরা বিক্ষোভ করতে করতে শহরের সীমানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ছিল। এতে সরকার কর্তৃপক্ষ শহরের দরজা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিল, যেনো বিক্ষোভ গ্রাম গঞ্জে পর্যন্ত ছড়িয়ে না পড়ে।

আলেম-উলামা ও খতিব-বক্তাগণ মসজিদে-মিম্বরে দরস-ক্লাসরুমে, সাধারণ জনসভা ও বিশেষ মতবিনিময় সভায় এ বিষয়ে বলিষ্ঠ বক্তব্য প্রদান করছিলেন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিলেন সে সময়ের শ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন ইজ ইবনে আবদুস সালাম রহ.।

সিরিয়ার আইয়ূবী নেতারাও চরম বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। মিশরের নারী ক্ষমতায়নের বিরুদ্ধে তারা অবজ্ঞা জ্ঞাপন করে।

আব্বাসী খলিফা মুসতা'সিম বিল্লাহর পক্ষ থেকেও নিন্দাজ্ঞাপন করা হয় এবং গোটা মিশরবাসীর পক্ষ থেকে বিদ্রুপ জানানো হয়। খলিফা চিঠিতে লেখেন—

'যদি আপনাদের মাঝে পুরুষশূন্যতা দেখা দেয়, তাহলে আমাদের অবহিত করবেন। আমরা আপনাদের কাছে পুরুষ প্রেরণ করব।'

প্রতিভাত হলো, নব রানির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দিনে দিনে বেড়েই চলছিল। রানি একদিনও আরামে কাটাতে পারছিলেন না। তিনি নিজের জীবনের আশঙ্কা করেন। এর বিশেষ কারণ, তৎকালে ক্ষমতাচ্যুত করা হতো তরবারির আঘাতে বা জবাই করে; বরখাস্ত বা দূরে সরিয়ে দিয়ে নয়। তাই তিনি দ্রুত ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু কার জন্য!! কোন পুরুষের জন্য!?

কার জন্য তিনি ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াবেন?!

তার মাঝে তো সর্বদা ক্ষমতা গ্রহণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা বিরাজ করছিল। নিজের মেধা, পরিচালনা ও নেতৃত্বের প্রতি তো তার পূর্ণ আস্থা ছিল। বাস্তবেই তার মাঝে অসংখ্য গুণের সুসমাবেশ ঘটেছিল। তাহলে এখন তিনি কী করবেন?!

রানি শাজারাতুদ দুর সিদ্ধান্ত নিলেন লাঠির মাঝখানে শক্ত হাতে পাকড়াও করবেন। বাহ্যত ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াবেন। কিন্তু পরোক্ষভাবে তিনি ক্ষমতা পরিচালনা করবেন। তিনি রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বনের চিন্তা করলেন। চিন্তা করলেন কাউকে বিয়ে করে স্বামীর হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে নিজে সরে দাঁড়াবেন। যাতে বাহ্যত স্বামী ক্ষমতার আসনে অলঙ্কৃত থাকবে। আর তিনি পরোক্ষভাবে রাজ্য পরিচালনা করবেন। বা বলা যেতে পারে, পর্দার আড়াল থেকে রাজনীতিতে এমন অনেক ঘটনাই ঘটে থাকে। অসংখ্য হাকেম এমন রয়েছেন, হাকেম নাম ব্যতীত হুকুমতের কিছুই পায়নি। অসংখ্য রাজা এমন রয়েছেন, যারা 'রাজা' নাম ব্যতীত রাজত্বের কোনো অংশই ভোগ করতে পারেনি। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন পুরুষের সংখ্যা অনেক, যাদের দেহটা কেবল ক্ষমতায় চেয়ারে সমাসীন ছিল, ক্ষমতা নয়।

এজন্যই শাজারাতুদ দুর বিবাহ-উপযুক্ত কাউকে খোঁজেননি। তিনি বাস্তবে কোনো পুরুষকেও তালাশ করেননি। তিনি কেবল পুরুষাকৃতির একজন মানুষকে খুঁজেছেন। কারণ, সেই পুরুষ যদি শক্তিশালী হয়, তাহলে সে রাজক্ষমতার চাবিকাঠি নিজের হাতে নিয়ে নেবে। তাই উচিত সেই পুরুষটি শক্তিশালী বংশের লোক না হওয়া। যাতে তার বংশের লোকের প্রভাব সৃষ্টি করতে না পারে। অন্যথায় শাজারাতুদ দুরের ক্ষমতা হাত থেকে ছুটে যাবে। তাই ভালো হয় যদি নির্বাচিত ব্যক্তি মামলুকদের মধ্য থেকে কেউ হয়। তাহলে মামলুকরা তার প্রতি অনুগত থাকবে। মামলুকদের আনুগত্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং নির্বাচিত ব্যক্তি যদি বৈধ রাজা হন, তাহলে রাজত্বের সামরিক শক্তি হবে মামলুকরা।

ইজ্জুদ্দীন আইবেক

শাজারাতুদ দুর এসব বিষয়কে সামনে রেখে মামলুকদের মধ্য থেকে এমন একজনকে নির্বাচন করলেন, যে শান্ত প্রকৃতির, বিবাদমুক্ত ও ভীরু। শাজারাতুদ দুরের দৃষ্টিতে এসব গুণ প্রশংসনীয়। তিনি ইজ্জুদ্দীন আইবেক তুর্কুমানী সালেহীর মাঝে তার কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে খুঁজে পান। ইজ্জুদ্দীন আকতাই সালেহিয়া মামলুকদের অন্তর্ভুক্ত। ক্ষমতাকে নিষ্কণ্টক রাখার জন্য শাজারাতুদ

দুর ফারেসুদ্দীন আকতাই অথবা রুকন উদ্দীন বাইবার্সের মতো শক্তিশালী মামলুকদের নির্বাচন করেননি।

বাস্তবেই শাজারাতুদ দুর ইজ্জুদ্দীন আইবেককে বিয়ে করেন। এরপর নকশা অনুযায়ী তিনি ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান। এটি তার ক্ষমতাগ্রহণের মাত্র আশি দিন পর সংঘটিত হয়। তিনি ৬৪৮ হিজরীর জুমাদাস সানীর শেষ দিকে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান। এভাবে এক বছরের ভেতরে মিশরের রাজ ক্ষমতায় চার সুলতানের আবির্ভাব ঘটে। তারা হলেন—

১. নাজমুদ্দীন আইয়ূব, তিনি ইন্তেকাল করেন।
২. নাজমুদ্দীন রহ. এর ছেলে তাওরান শাহ, তাকে হত্যা করা হয়।
৩. শাজারাতুদ দুর, তিনি ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান।
৪. ইজ্জুদ্দীন আইবেক তুর্কুমানী!

ইজ্জুদ্দীন আইবেক 'আল মালিকুল মুইজ্জ' উপাধি ধারণ করেন এবং সবাই তার হতে বায়াত গ্রহণ করে।

যেন আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা এসব ঘটনারা মাধ্যমে মিশরীয়দের মানসিকতা মমলুকদের ক্ষমতায়নের বিষয়টি গ্রহণ করার প্রতি প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন।

এতে মিশরবাসী নতুন আরেকটি অধঃপতনের শিকার হলো। যদিও ইজ্জুদ্দীন আইবেক অন্যান্যদের মতো শক্তিশালী ছিলেন না, তবে মহিলার ক্ষমতায়নের চেয়ে তার ক্ষমতায়ন ছিল অনেক উত্তম। যেমন আজ মিশরে আইয়ূবীদের স্থলাভিষিক্ত কেউ নেই এবং সিরিয়ায়ও আইয়ূবীদের স্থলাভিষিক্ত কেউ নেই। কারণ, সিরিয়ার আইয়ূবী নেতারা ছিল বিশ্বাসঘাতক, দুঃশ্চরিত্র, দুর্বল। তাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও তাতারীদের সহযোগিতা প্রদানের কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। অনুরূপ তাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও খ্রিস্টানদের সহযোগিতা করার কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

ইজ্জুদ্দীন আইবেকের ক্ষমতাগ্রহণের মাধ্যমে মিশরের অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল হয়, যাকে মিশরের প্রথম মামলুক বংশের শাসক মনে করা হয়। যদিও কতিপয় ইতিহাসবিদ শাজারাতুদ দুরকে মিশরের রাজত্বের প্রথম দাস শাসক গণ্য করেন। কারণ, তিনি মূলত মমলুক ছিলেন।

শাজারাতুদ দুর পর্দার আড়াল থেকে রাষ্ট্র পরিচালনা শুরু করলেন। যেমনটি তার অভিপ্রায় ছিল। শক্তিশালী মামলুক সম্প্রদায়ের সমর্থনে তিনি শক্তিশালী ছিলেন। বিশেষত ফারেসুদ্দীন আকতাই ও রুকন উদ্দীন বাইবার্সের।

কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, শাজারাতুদ দুরের মেধাশক্তি স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। শাজারাতুদ দুর যেমন ভেবেছিলেন, ইজ্জুদ্দীন আইবেক ততটা দুর্বল ছিলেন না। তিনি বাহরিয়া মামলুকও ছিলেন না। নবনিযুক্ত সুলতান প্রথম ধাপেই শাজারাতুদ দুরের গতিবিধি বুঝে ফেলেন। বুঝে ফেলেন মিশরের বাহরিয়া মামলুক ভাইদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও শক্তি-সামর্থ্য। তাই তিনি নতুন করে ছক আঁকতে শুরু করেন। তবে অতি সতর্কতার সঙ্গে।

আল মালিকুল মুইজ ইজ্জুদ্দীন আইবেক বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সামনে পা বাড়ান। প্রথমেই শাজারাতুদ দুর কিংবা বাহরিয়া মমলুকদের কোনো নেতার সঙ্গে বিবাদ বা সংঘর্ষে লিপ্ত হননি; বরং তিনি প্রথমে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকেন। ধীরে ধীরে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তিনি তার সঙ্গে সম্পৃক্ত দাসদের ক্রয় করতে থাকেন। মমলুকদের মাধ্যমে সামরিকশক্তি যোগাতে থাকেন। যারা তার কথা মতো চলবে। মিশরের দাসদের মধ্যে যাদের এ কাজের উপযুক্ত মনে হয়, তাদের বাছাই করেন। ইতিহাসে এসব মামলুকদের তার নামের দিকে নিসবত করে 'আল মামালিকুল মুইজ্জিয়া' বলা হয়। এই দলের প্রধান হিসেবে তার প্রধান আমীর, শক্তিশালী অশ্বারোহী, বীরপুরুষ সাইফুদ্দীন কুতয রহ. কে নিযুক্ত করেন।

মুসলিম বীর পুরুষদের ইতিহাসে সাইফুদ্দীন কুতয অন্যতম প্রধান পুরুষ। ইজ্জুদ্দীন আইবেকের অনুগত মমলুকদের পরিচালনা করা ছিল তার কাজ। কুতয রহ. সম্পর্কে যৎসামান্য আলোচনা সামনে আসবে—ইনশাআল্লাহ।

ইজ্জুদ্দীন আইবেক নিজে বাহরিয়া মামলুকদের অন্তর্ভুক্ত হলেও ধীরে ধীরে মামলুকদের সঙ্গে তার ঘৃণাবোধ জন্মাতে থাকে। তিনি মামলুকদের সামর্থ্য ও স্ত্রী শাজারাতুদ দুর—যিনি তার সঙ্গে রাজা নয়, বাহ্যিক রাজার ন্যায় আচরণ করেন—তার সঙ্গে তাদের গভীর সম্পর্ক সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান রাখেন। আর মামলুকগণের অন্তরে নিঃসন্দেহে নানা রকম হিংসা, বিদ্বেষ, ক্ষোভ, ক্রোধ উগলে উঠছিল মিশরের সিংহাসনে তাকে সমাসীন দেখে। তাকে আজ 'মালিক' (রাজা) উপাধিতে সম্বোধন করা হয়। পক্ষান্তরে তাদের মামলুক (দাস) উপাধিতে সম্বোধন করা হয়!!

কিন্তু ইজ্জুদ্দীন আইবেক দ্রুত না ঘাবড়িয়ে ধীর গতিতে নিজের কাজ করে যান এবং নীরবে নিজের মমলুক বাড়াতে থাকেন।

সময় গড়াতে থাকে। অন্যদিকে সিরিয়ার আইয়ূবী নেতারা আইয়ূবী সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের প্রস্তুতিস্বরূপ মিশর আক্রমণের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হতে থাকে। তাওরান শাহের মৃত্যুর পর মিশর সাম্রাজ্য থেকে সিরিয়া বের হয়ে যায়। ইজ্জুদ্দীন আইবেক নিজে 'আব্বাসিয়া' নামক দূরবর্তী স্থানে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। সেই স্থানটি বর্তমান জাগজিগ অঞ্চল থেকে বিশ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত। সেটি ছিল তার ক্ষমতায় আরোহণের চার মাস পর ১০ ই যিলকদ ৬৪৮ হিজরীর ঘটনা। ইজ্জুদ্দীন আইবেক তার প্রতিপক্ষের উপর বিশাল জয় লাভ করেন। নিঃসন্দেহে এই জয়ের ফলে তিনি মিশরবাসীর মাঝে সমুন্নত হয়েছেন এবং তার পাটাতন আরও সুদৃঢ় হয়েছে।

(ক্ষমতায় আরোহণের তিন বছর পর) ৬৫১ হিজরীতে সিরিয়ার আমীর-উমারা ও ইজ্জুদ্দীন আইবেক রহ.-এর মাঝে নতুন এক বিরোধ সৃষ্টি হয়। কিন্তু যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে আব্বাসী খলিফা মুসতা'সিম বিল্লাহ উভয়পক্ষের মধ্যকার বিরোধ নিরসনকল্পে স্বপ্রণোদিত হয়ে আগমন করেন। সন্ধির অন্যতম একটি শর্ত ছিল, গোটা ফিলিস্তিন, এমনকি উত্তরের জলিল অঞ্চল পর্যন্ত মিশর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে। এর মাধ্যমে ইজ্জুদ্দীন আইবেকের শক্তি বর্ধন হয়েছিল এবং তার ক্ষমতার জন্য একপ্রকার সুসমৃদ্ধি সাধিত হয়েছিল। তা হলো, আব্বাসী খলিফা কর্তৃক তার নেতৃত্বের স্বীকৃতি। আব্বাসী খলিফা মুসতা'সিম বিল্লাহ যদিও দুর্বল ছিলেন। কার্যত তার কোনো রাজত্ব ছিল না। তথাপি তার স্বীকৃতি ও সমর্থন ইজ্জুদ্দীন আইবেককে ক্ষমতার উপযুক্ততা ও বৈধতার এক নয়া রঙ দান করেছে।

আইবেক ও আকতাই-এর শত্রুতা

এসব ঘটনা ইজ্জুদ্দীন আইবেককে মিশরের রাজ্য পরিচালনার আসনে বসায়! এতে বাহরিয়া মামলুকদের ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পায়। বিশেষত ফারেসুদ্দীন আকতাই—যিনি প্রকাশ্যে তার বিরোধিতা করতেন—তিনিও ক্রোধান্বিত হন। এই অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে *আস সুলুক ফি মা'রিফাতি দুয়ালিল মুলুক* গ্রন্থে মক্রিজী রহ. লিখেন—

'ফারেসুদ্দীন আকতাই ইজ্জুদ্দীন আইবেকের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা প্রদর্শন করতেন। এমনকি তিনি তাকে উপাধি ছাড়া কেবল নাম ধরে ডাকতেন। তিনি তাকে আকার-আকৃতির রাজা মনে করতেন। মূল্যায়ন করতেন না। আপনি একটু

ভেবে দেখুন, সেনাপ্রধান রাষ্ট্রপ্রধানকে 'হে আইবেক' বলে ডাকছে। বা এরূপ তাচ্ছেল্যের ভাষায় ডাকছে।'

সেনাপ্রধান আকতাই এর এরূপ আচরণ দেখে সুলতান ইজ্জুদ্দীন আইবেকে অনুভব করেন যে, বাহরিয়া মামলুকগণ, কখনো কখনো মিশরবাসীও তাকে রানির পোষা স্বামী মনে করে। তার এই ভাবনা তাকে আকতাই এর হাত থেকে মুক্তি পাবার ভাবনায় ফেলে দেয়। অন্যথায় তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবেন। পৃথিবীর কোনো রাজা-বাদশাই তার পাশে এমন কোনো নেতার অস্তিত্ব সহ্য করেন না। জাতি যাকে রাজার চেয়ে শক্তিশালী মনে করে।

ইজ্জুদ্দীন আইবেক উপযুক্ত সুযোগ সন্ধান করছিলেন। কিছুদিন পর তিনি সংবাদ পান যে, সেনাপ্রধান আকতাই কোনো আইয়ূবী রানিকে বিয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এ দেখে তিনি উপলব্ধি করেন যে, আকতাই নিজেকে জাতির সামনে দরবেশ হিসেবে উপস্থাপন করছেন। অথচ সেই আইয়ূবী সাম্রাজ্য দীর্ঘ আশি বছর মিশর শাসন করেছে। তাদের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি করছে? যদি শাজারাতুদ দুর সালেহ আইয়ূবীর স্ত্রী হওয়ার কারণে মিশর শাসন করতে পারেন, তাহলে আকতাই কি আইয়ূবী রানির স্বামী হওয়ার কারণে মিশর শাসন করতে পারেন না? উপরন্তু আকতাইর রয়েছে উজ্জ্বল ইতিহাস, মানসুরার যুদ্ধে বিজয়ী নেতৃত্বের ইতিহাস। তার রয়েছে রণকৌশল ও শক্তি-সামর্থ্য!

তার আর বুঝতে বাকি রইল না যে, সামনে কঠিন বিপদ অপেক্ষা করছে। এসব বিপদ তার ওপরই আবর্তিত হবে। তলোয়ারের পিঠে ভর করেই এই বিপদ আসবে। তিনি বুঝে ফেলেন, পূর্বে আকতাই তাকে যে তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করতেন, এখন সে আইয়ূবী বংশে বিয়ে করছেন। এসব কিছুর উদ্দেশ্য তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা। তাই তিনি তাকে হত্যার সংকল্প করেন!!

বাস্তবেই ফারেসুদ্দীন আকতাইকে ইজ্জুদ্দীন আইবেকের নির্দেশে হত্যা করা হয়। এটি ৩ই শাবান ৬৫২ হিজরীর ঘটনা।

সেনাপ্রধান ফারেসুদ্দীন আকতাইকে হত্যার মাধ্যমে ইজ্জুদ্দীন আইবেকের ক্ষমতা নিষ্কলুষ হয়। এখন তিনি নিজের বীরত্ব জাহির করতে শুরু করেন। আর স্ত্রী শাজারাতুদ দুরের ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে।

ইতিমধ্যে তিনি প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করেন। মুইজ্জিয়া মমলুকদের ক্ষমতাও বৃদ্ধি করেন। দেশে স্থিতিশীলতা বিরাজ করে। জাতি তার দেশ পরিচালনায় সন্তুষ্ট। আব্বাসী খলিফা তার নেতৃত্বের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। সিরিয়ার আইয়ূবী আমীরগণ তার সঙ্গে সন্ধিতে আবদ্ধ হয়েছেন।

ফারেসুদ্দীন আকতাই এর মৃত্যুর পর মামলুকগণ দুটি শক্তিধর বিপরীত শক্তিতে পরিণত হয়। বাহরিয়া মামলুকগণ শাজারাতুদ দুরের পক্ষালবম্বন করে। আর মুইজ্জিয়া মামলুকগণ ইজ্জুদ্দীন আইবেকের পক্ষালম্বন করে।

ফারেসুদ্দীন আকতাই বাহরিয়া মামলুকদের প্রধান ও সম্মানের পাত্র হওয়া সত্ত্বেও যেখানে নিহত হলেন, সেখনে বাহরিয়া মামলুক নেতাদের হত্যা হওয়া ছিল সময়ের ব্যাপার। বাহরিয়া মামলুকগণ ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় দিন কাটাতে থাকে। শাজারাতুদ দুর তাদের কোনো নিরাপত্তা প্রদান করতে পারছিলেন না। তখন বাহরিয়া মামলুক নেতাগণ রুকন উদ্দীন বাইবার্সের নেতৃত্বে ইজ্জুদ্দীন আইবেকের ভয়ে সিরিয়া পালাবার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা আলেপ্পো ও দামেস্কের শাসনকর্তা বিশ্বাসঘাতক নাছের ইউসুফের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে। রুকন উদ্দীন বাইবার্স তার আনুগত্য মেনে নেন।

এভাবেই গোটা মিশর ভূমি ইজ্জুদ্দীন আইবেকের অনুকূলে চলে যায়। মিশর ও সিরিয়ার অস্থিতিশীল পরিবেশ দেখে আব্বাসী খলিফা মুমতা'সিম বিল্লাহ স্থিতিশীল পরিবেশ ফিরিয়ে আনার চিন্তা করেন। কার্যত তার চিন্তা ফলপ্রসু হয়। তারা সকলেই এই সিদ্ধান্তে একমত হন যে, বাহরিয়া মামলুকগণ ফিলিস্তিনে বসবাস করবে, যা ইজ্জুদ্দীন আইবেকের দখলে ছিল। আর ইজ্জুদ্দীন আইবেক মিশরেই থাকবেন। তবে ফারেসুদ্দীন আকতাই-এর ইন্তেকালের পর রুকন উদ্দীন বাইবার্স দামেস্কে নাছের ইউসুফ আইয়ূবের কাছে আশ্রয়ে থাকাকেই প্রাধান্য দেন।

শাজারাতুদ দুরের নিকৃষ্ট মৃত্যু

এভাবে বেশ কয়েক বছর কেটে যায়। ইজ্জুদ্দীন আইবেক মিশরের রাজ সিংহাসনে বলবৎ থাকেন। সেনাপ্রধান সাইফুদ্দীন কুতয সর্বসাধারণের কাছে সমাদর লাভ করেন। সাবেক রানি শাজারাতুদ দুর কিছুটা আত্মগোপন করেই থাকেন। কিন্তু ইজ্জুদ্দীন আইবেকের জয়ধ্বনি দেখে ক্রমান্বয়ে তার ক্রোধ বাড়তে থাকে। নিঃসন্দেহে ইজ্জুদ্দীন আইবেক তাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করেন। তিনি জানতেন, শাজারাতুদ দুর পর্দার আড়াল থেকে মিশর শাসন করার জন্যই তাকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু কখনো কখনো বাতাস স্রোতের বিপরীতে প্রবাহিত হয়।

শুরু হয় ৬৫৫ হিজরী। ইজ্জুদ্দীন আইবেক মিশরের রাজক্ষমতায় আরোহণের পূর্ণ সাত বছর কেটে যায়। এখন তার লোলুপ দৃষ্টি পার্শ্ববর্তী দেশ ফিলিস্তিন ও

সিরিয়ার ওপর পড়ে। তিনি তার ক্ষমতা সম্প্রসারণের জন্য পাগলপারা হন। কিন্তু একা তার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তিনি অত্র অঞ্চলের কোনো আমীরের সঙ্গে জোট বাঁধতে চাইলেন। সে সময় তো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ছিল খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই তিনি বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি মজবুত করতে চাইলেন!!

তিনি মসুলের আমীর বিশ্বাসঘাতক বদর উদ্দীন লুলুর মেয়েকে বিয়ে করার ইচ্ছা করলেন, যার সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করছি। যিনি তাতারীদের সহযোগিতা প্রদান করেছিলেন।

এই বিষয়টি শাজারাতুদ দুরের আত্মমর্যাদায় বড় আঘাত হানল। তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন। ভাবলেন, ইজ্জুদ্দীন আইবেক এই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলে তার ইতিহাসের পাতা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। রাজনৈতিক জটিলতা নিরসনে তিনি অপারগ হয়ে পড়েন। তিনি অনুমান করতে পারেননি যে, বাহরিয়া মামলুকগণ আত্মগোপন করেছে। বর্তমানে ক্ষমতা, শক্তি ইজ্জুদ্দীন আইবেকের অনুগত মুইজ্জিয়া মামলুকদের হাতে। এসব কিছু তার অনুমানে ছিল না। তাই আবেগপ্রবণ মহিলার মতোই অদূরদর্শী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কিন্তু তার কাছে এটি খুব স্বাভাবিক ছিল। তিনি তার পূর্বের স্বামীর সন্তান তাওরান শাহের সঙ্গে যা করেছে, বর্তমান স্বামীর সঙ্গে সে তা-ই করতে যাচ্ছে। পদক্ষেপটি হলো, 'ইজ্জুদ্দীন আইবেককে হত্যা করা'। তাকে হত্যা করবে, পরিণামে যা হয় হোক!!

বাস্তবেই তিনিস্বামী হত্যার নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং ৬৫৫ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে তার এই ষড়যন্ত্র বাস্তবে পরিণত হয়। এভাবেই মিশরের সিংহাসনে আরোহণের কয়েক বছর পর ইজ্জুদ্দীন আইবেকের শাসনামলের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং শাজারাতুদ দুর মিশরের দুই সম্রাটকে হত্যা করেন : ১. তাওরান শাহ। ২. ইজ্জুদ্দীন আইবেক।

হত্যাকাণ্ডের ঘটনা দ্রুত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। একদল মামলুকসহ সেনাপতি সাইফুদ্দীন কুতয ও [ইজ্জুদ্দীন আইবেকের পূর্বস্ত্রীর ছেলে] নূরুদ্দীন আলী ইবনে ইজ্জুদ্দীন আইবেক দ্রুত শাজারাতুদ দুরকে বন্দী করেন।

নূরুদ্দীন আলীর মা ও ইজ্জুদ্দীন আইবেকের পূর্ব স্ত্রী শাজারাতুদ দুরকে তার হাতে ছেড়ে দেওয়ার আবেদন করেন। শাজারাতুদ দুরের পরিণাম ছিল বড় নির্মম। নূরুদ্দীনের মা তার বাঁদিদের নির্দেশ দেন শাজারাতুদ দুরকে খড়ম আঘাতে মেরে ফেলার!!

নিঃসন্দেহে ইজ্জুদ্দীন আইবেককে হত্যার বিনিময়ে কিসাসস্বরূপ শাজারাতুদ দুরকে হত্যা করা ছিল শরীয়তসম্মত। তবে যেই পদ্ধতিতে তাকে হত্যা করা হয়েছে, তা না যুক্তিসঙ্গত, না শরীয়তসম্মত। বরং এটি ছিল 'নারীপ্রসূত পদ্ধতি'। এই পদ্ধতিতে হত্যার মূল উদ্দেশ্য শুধু হত্যা করাই নয়; বরং উদ্দেশ্য ছিল লাঞ্ছনা, তাচ্ছল্য প্রদর্শন । বাগদাদ পতনের পর যেমন খলিফা মুসতা'সিম বিল্লাহকে পদাঘাতে হত্যা করা হয়েছিল।

যে সকল রাজা-বাদশা আল্লাহর হক ও প্রজার হক যথাযথ আদায় করে না, দুনিয়াতে তাদের শেষ পরিণাম এমনই হয়ে থাকে।

ইজ্জুদ্দীন আইবেক ও শাজারাতুদ দুর নিহত হওয়ার পর ইজ্জুদ্দীন আইবেকের ছেলে নুরুদ্দীন আলীর বায়াত গ্রহণ করা হয়। যার বয়স তখনো পনেরো বছর হয়নি। এটি ছিল নিঃসন্দেহে বিরোধপূর্ণ পদক্ষেপ। তবে মামলুক আমীরদের মধ্যকার ক্ষমতাগ্রহণের লড়াই থামাতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। নাবালেগ সুলতান 'মানসুর' উপাধি ধারণ করেন এবং সেনাপতি সাইফুদ্দীন কুতযকে তার অভিভাবক নিযুক্ত করা হয়। যিনি মুইজ্জিয়া মামলুকদের প্রধান ছিলেন এবং ইজ্জুদ্দীন আইবেকের সবচেয়ে বড় অনুগত ছিলেন। এই নাবালেগ সুলতানের হাতে ৬৫৫ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে বায়াত গ্রহণ করা হয়।

এভাবেই সাইফুদ্দীন কুতয রহ. মিশরের কার্যকরী শাসক হয়ে যান!

সাইফুদ্দীন কুতয রহ.

মুসলিম ইতিহাসের এক মহান ব্যক্তিত্বের নাম হলো সাইফুদ্দীন কুতয। তার প্রকৃত নাম হলো 'মাহমুদ ইবনে মামদুদ'। তিনি মূলত ঐতিহাসিক মুসলিম রাজ-পরিবার বংশোদ্ভূত। সুবহানাল্লাহ! দুনিয়া কত ছোট। কুতয রহ. হলেন জালাল উদ্দীন খাওয়ারেযম-এর ভাগ্নে। আর জালালুদ্দীন হলেন খাওয়ারেযমের প্রসিদ্ধ রাজা। বক্ষ্যমাণ কিতাবের শুরুতে আমরা তার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। যিনি একবার তাতারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেন। এরপর আবার পরাজিত হন। পরাজিত হয়ে পালিয়ে হিন্দুস্তানে পালিয়ে যান। তিনি পালিয়ে যাওয়ার পর তাতারীরা তার বংশের বড়দের হত্যা করে এবং অবশিষ্টদের বন্দী করে। মাহমুদ ইবনে মামদুদ হলেন সেই বন্দীদের একজন। তাতারীরা তাদের নামকরণ করে 'কুতয'। কুতয অর্থ হলো 'জঘন্য কুত্তা'। ছোটবেলা থেকেই তার মাঝে বীরত্ব ও সাহসিকতার নিদর্শনাবলি প্রকাশ

পেতে থাকে। এরপর তাতারীরা তাকে দামেস্কের দাস-বাজারে বিক্রি করে দেয়। জনৈক আইয়ূবী ব্যক্তি তাকে ক্রয় করে মিশরে নিয়ে আসে। এরপর মুনিবের হাত বদলে তিনি ইজ্জুদ্দীন আইবেকের হাতে এসে পড়েন। এভাবেই কালের বিবর্তনে একসময় তিনি ইজ্জুদ্দীনের সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত হন।

আমরা সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এর বেড়ে ওঠার গল্পে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের বিশ্বপরিচালনায় অদ্ভুত কুদরত প্রত্যক্ষ করি। তাতারীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে মুসলিম সন্তানদের গোলাম বানিয়ে দামেস্কে বিক্রি করল। কালের বিবর্তনে মুনিবের হাত বদল হতে হতে তিনি এমন শহরে এসে পৌঁছেন, সে বয়সে হয়তো তিনি সেই শহরের নামও শুনেন নি। আল্লাহ তা'আলা এ কাজ এজন্য করেছেন, যেন তিনি একসময় তাতারীদের রাজা হন এবং তার হাতেই তাতারীদের পতন ঘটে!!

পবিত্র সেই সুমহান সত্তা, যিনি সূক্ষ্মভাবে কার্য পরিচালনা করেন এবং প্রজ্ঞোচিত কৌশল অবলম্বন করেন। যার কাছে আসমান-জমিনের কোনো কিছুই গোপন নয়।

ومكروا مكرًا ومكرنا مكرًا وهم لايشعرون

"তারা ষড়যন্ত্র করেছে, আর আমি কৌশল করেছি। তারা টেরও পায় নি।"

কুতয রহ. অন্যান্য মমলুকদের মতোই দ্বীনি পরিবেশে বেড়ে ওঠেন। ঈমানী দৃপ্ত চেতনায় শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। ছোট থেকেই অশ্বচালনা, যুদ্ধকৌশল, নেতৃত্ব ও পরিচালনার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠেন। এমন এক যুবকে পরিণত হন, যিনি টগবগে সুঠাম দেহের অধিকারী ও দ্বীনি চেতনায় উজ্জীবিত। কুতয রহ. ছিলেন শক্তিশালী ধৈর্যশীল বীর বাহাদুর।

এছাড়াও তিনি রাজ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং তার শৈশব ছিল রাজার শৈশব। এতে তিনি নিজের মাঝে আস্থা খুঁজে পেতেন। তাই তিনি নেতৃত্ব, পরিচালনা ও শাসনবিদ্যা সম্পর্কে মূর্খ ছিলেন না। উপরন্তু তার বংশের সবাই তাতারীদের পদতলে ধ্বংস হয়। নিঃসন্দেহে এতে তিনি তাতারীদের পরিচয় সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন। প্রত্যক্ষদর্শী তো শ্রবণকারীর মতো নয়।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর সুসমন্বয়ে তিনি এমন ব্যক্তিত্বে পরিণত হন, যিনি শত্রুপক্ষকে ভয় পান না (চাই শত্রুপক্ষের সংখ্যা যত বেশিই হোক না কেন), যিনি বিপদাপদে ভীতিবিহ্বল হন না। ইসলামী সামরিক প্রতিপালন ও আল্লাহর

প্রতি দ্বীনের প্রতি ও নিজের প্রতি পূর্ণ আস্থা অর্জনের শিক্ষা তার জীবনে বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করে।

চলুন, আমরা পুনরায় মিশর পতনের আলোচনায় ফিরে যাই—

সুলতান ইজ্জুদ্দীন আইবেক ও সম্রাজ্ঞী শাজারাতুদ দুর নিহত হওয়ার পর নাবালেগ নূরুদ্দীন আলী ইবনে ইজ্জুদ্দীন আইবেক রাজক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন এবং সাইফুদ্দীন কুতয রহ. নাবালেগ সুলতানের অভিভাবক নিযুক্ত হন।

ইতিপূর্বে মিশর ও ইসলামী বিশ্বে শাজারাতুদ দুরের ক্ষমতায়নের বিষয়টি যেমন অস্থিরতা সৃষ্টি করে, অনুরূপ নাবালেগ নূরুদ্দীনের ক্ষমতায়নের বিষয়টিও ব্যাপক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে। অধিকাংশ অস্থিরতা আপত্তি, অভিযোগ ও অনুযোগ আসত মিশরে অবস্থিত কতিপয় বাহরিয়া মামলুক, যারা ইজ্জুদ্দীন আইবেকের ক্ষমতাগ্রহণের সময় পলায়ন করেনি, তাদের পক্ষ থেকে। 'সাঞ্জার হালবী' নামক জনৈক বাহরিয়া মামলুক নিজেকে নেতৃত্বের উপযোগী মনে করত এবং ইজ্জুদ্দীন আইবেক নিহত হওযার পর ক্ষমতায় আরোহণের লোভ করেছিল। সাইফুদ্দীন কুতয রহ. তাকে বন্দী করেন। অনুরূপ কতিপয় সম্পদশালী নেতাকে তিনি গ্রেপ্তার করেন। অবশিষ্ট বাহরিয়া মামলুকগণ ইজ্জুদ্দীনের আমলে পলায়নকারী বাহরিয়া মামলুকদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য দ্রুত সিরিয়ার দিকে পলায়ন করে। বাহরিয়া মামলুকগণ সিরিয়ায় পৌঁছে আইয়ূবী নেতাদের মিশর আক্রমণের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। বাস্তবে কতিপয় আইয়ূবী আমীর তাদের আহ্বানে সাড়া দেয়। তন্মধ্যে অন্যতম হলেন (বর্তমান জর্ডানের) কারাক অঞ্চলের আমীর মুগীছ উদ্দীন ওমর। তিনি মিশর আক্রমণের জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন। শক্তি-সামর্থ্যে তিনি খুব দুর্বল ছিলেন। তবে তিনি সীমাহীন লোভী ছিলেন।

মুগীছ উদ্দীন সদলবলে মিশর পৌঁছলে সাইফুদ্দীন কুতয রহ. মিশরের ভেতরে তাকে বাধা প্রদান করেন। এটি যিলকদ ৬৫৫ হিজরীর ঘটনা। অতঃপর মুগীছ উদ্দীন মিশর আক্রমণের নতুন স্বপ্ন নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। তবে ৬৫৬ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে দ্বিতীয় বারও সাইফুদ্দীন কুতয রহ. তাকে বাধা প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, মুগীছ উদ্দীন কর্তৃক দ্বিতীয় বার মিশর আক্রমণ ছিল ৬৫৬ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে, যেমনটি আমি ইঙ্গিত করেছি। অর্থাৎ ইসলামী খেলাফতের রাজধানী বাগদাদ পতনের মাত্র দুই মাস পরে!! আইয়ূবী নেতা

মুগীছ উদ্দীন সর্বশক্তি ব্যয় করে তাতারীদের প্রতিহত করার পরিবর্তে মুসলমানদের বিরুদ্ধ যুদ্ধ করার দিকে মনোনিবেশ করেছেন!! বস্তুত তিনি রাজনৈতিক ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন, যে ব্যাধি সে সময় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল এবং যে সময় মুসলমান নিজ রব থেকে দূরে সরে গিয়েছিল!

৬৫৬ হিজরীর সফর মাসে বাগদাদের পতন ঘটে, যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। হালাকু খান সিরিয়া আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। তার ছেলে আশমুত ৬৫৬ হিজরীর রজব মাসের শুরুতে মিয়াফারেকীন অবরোধ করেছে। হালাকু খান ৬৫৭ হিজরীতে উত্তর ইরাকের পাশ হয়ে পারস্য থেকে সিরিয়া গমন শুরু করেন। সে নাসিবিন, এডেসা ও আলবিয়া অঞ্চল দখল করে এবং আলেপ্পোর খুব কাছাকাছি পৌঁছে যায়। এ থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, পূর্ণ সিরিয়ার পতন ঘটানোর পূর্বে হালাকু খান শান্ত হবে না এবং সিরিয়ার পর তার লোলুপ দৃষ্টি অবশ্যম্ভাবীরূপে মিশরের ওপর পড়বে।

কার্যত সাইফুদ্দীন কুতয রহ. মিশরের যাবতীয় বিষয়াবলি পরিচালনা করলেও সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন নাবালেগ সুলতান। এতে নিঃসন্দেহে মিশরে রাজক্ষমতার প্রভাব হ্রাস পায়। মিশরের রাজক্ষমতার প্রতি মানুষের আস্থা হারিয়ে যায় এবং শত্রুদের সংকল্প দৃঢ় হয়।

বর্বর তাতারীদের পৈশাচিক আগ্রাসন, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহ, বাহরিয়া মামলুকগণ কর্তৃক অস্থিতিশীলতা এবং সিরিয়ার আইয়ূবী নেতাদের লোলুপ দৃষ্টির কারণে সাইফুদ্দীন কুতয রহ. নাবালেগ সুলতান নূরুদ্দীন আলীকে মিশরের সুলতান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রাখার কোনো অর্থ খুঁজে পেলেন না।

তখন সাইফুদ্দীন কুতয রহ. একটি সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। তা হলো, ক্ষমতাসীন নাবালেগ সুলতান নূরুদ্দীন আলীকে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং নিজে রাজ সিংহাসনে আরোহণ করা। এই সিদ্ধান্তটি কোনো অদ্ভুত সিদ্ধান্ত ছিল না। কারণ, সাইফুদ্দীন কুতযই মিশরের কার্যকরী সুলতান একথা সকলেই জানত; এমনকি নাবালেগ সুলতানকে তারা হাস্যকর দুর্বল মূর্তি হিসেবে সত্যায়িত করেছিল। সেই হাস্যকর মূর্তি হলেন নাবালেগ সুলতান নূরুদ্দীন আলী! দুর্বল মূর্তির পর্দা সরিয়ে বীর সিংহের আকৃতি প্রকাশ করাই ছিল সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এর কাজ, যার মাধ্যমে বিশ্বমানচিত্রের পরিবর্তন সাধিত হবে এবং ইতিহাসের পাতারও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটবে।

এই ঘটনাটি ২৪ শে যিলকদ ৬৫৭ হিজরীতে সংঘটিত হয় অর্থাৎ হালাকু খান আলেপ্পো নগরীতে পৌঁছার কয়েক দিন পূর্বে। সাইফুদ্দীন কুতয রহ. রাজ সিংহাসনে আরোহণের পর থেকে তাতারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করেন।

খুব শীঘ্রই মিশর ভূমিতে বড় বড় ঘটনা ঘটবে।

সে সময় নতুন অনেক দ্বার উন্মোচিত হবে।

নতুন অনেক পতাকা উত্তোলন হবে, যা বহুদিন থেকে উত্তোলন হয় না।

নতুন অসংখ্য সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত হবে, যা দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তুত হয় না।

শীঘ্র এমন একদিন আসবে, যে দিনের আবির্ভাব খুব কমই ঘটে।

কীভাবে এত কিছু ঘটল?!!

এটি দীর্ঘ আলোচনাসাাপেক্ষ বিষয়। সামনের অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে—ইনশাআল্লাহ।

আইনে জালুতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ

মিশর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের যুদ্ধপূর্ব অবস্থা

যখন তাতারীরা সিরিয়া আক্রমণ শুরু করেছিল এবং মিশরের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল, তখন মিশরের অবস্থা ছিল বড়ই সংকটাপন্ন। মিশরে রাজনৈতিক চরম অস্থিতিশীলতা ও সংকট বিরাজ করছিল। [বিশেষত শেষ দশ বছর] তীব্রাকারে ক্ষমতা ভাগাভাগির লড়াই চলছিল। তবে সম্রাট ইজ্জুদ্দীন আইবেক ক্ষমতা গ্রহণের পর তুলনামূলক পরিস্থিতি শান্ত হয়। এই শান্ত পরিবেশ টানা সাত বছর অক্ষুণ্ন ছিল। কিন্তু ইজ্জুদ্দীন আইবেক এবং তার পর শাজারাতুদ দুরের ইন্তেকালের পর পরিবেশ পরিস্থিতি পূর্বাকার ধারণ করে। এরপর নাবালেগ সুলতান নূরুদ্দীন ক্ষমতায় আরোহণ করলে পরিস্থিতি আরও অশান্ত হয়ে ওঠে। এরপর সাইফুদ্দীন কুতয রহ. নূরুদ্দীনকে অপসারণের মাধ্যমে ক্ষমতায় আরোহণ করেন। সাইফুদ্দীন কুতয রহ. ক্ষমতায় আরোহণ করলেও নিঃসন্দেহে রাজক্ষমতার প্রতি অসংখ্য লোভাতুর লোলুপ দৃষ্টি ছিল। এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে, সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এর প্রতি অনেক মানুষ ব্যক্তিগত বিদ্বেষ পোষণ করত। এ থেকে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, উক্ত দুই শ্রেণির মানুষ অবশ্যই সাইফুদ্দীন কুতয রহ. কে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য আন্দোলন গড়ে তুলবে অথবা আন্দোলন করার চেষ্টা করবে। অথবা তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করবে। মামলুকগণ যে কাজ করতে সিদ্ধহস্ত।

আমরা জানি, বাহরিয়া মামলুক, যারা সম্রাজ্ঞী শাজারাতুদ দুরের সহযোগী ছিল এবং মুইজ্জিয়া মামলুক, যারা বর্তমান সম্রাট সাইফুদ্দীন কুতযের সহযোগী; এই উভয় দলের মাঝে বিরোধ ও বিবাদ দীর্ঘদিনের এবং ইতিপূর্বে বহুসংখ্যক বাহরিয়া মামলুক সিরিয়ার মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে পলায়ন করেছে। আর যারা মিশর-ভূমি ছেড়ে পালায়নি, তাদের মাঝে সর্বদা আতঙ্ক বিরাজ করত। এই বিভাজন নিঃসন্দেহে মিশরের সামরিকশক্তিকে দুর্বল করে ফেলেছে। কারণ, সে সময় বাহরিয়া মামলুকরাই মিশরের সামরিকশক্তির উৎস ছিল।

মিশরের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির অধঃপতনের চিত্র যখন এই, তখন মিশরের বাইরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। মিশরের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী সকল দেশের সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। মিশরের সঙ্গে সিরিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না বললেই চলে। বরং উভয় সাম্রাজ্যের মাঝে মনস্তাত্ত্বিক শত্রুতা বিরাজ করছিল। অনুরূপ উত্তর আফ্রিকা ও সুদানের সঙ্গেও মিশরের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এর অর্থ হলো, মিশরের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক অরাজকতার সুযোগে বর্বর তাতারী আগ্রাসন মিশরকে গিলে ফেলে—যেমন ইতিপূর্বে অন্যান্য সাম্রাজ্যকে গিলে ফেলেছে।

রাজনৈতিক অবস্থা কিংবা সামগ্রিক অবস্থার চেয়ে মিশরের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব ভালো ছিল না। একের পর এক ক্রুশেড আক্রমণ মিশর ও প্রতিবেশী সিরিয়ার মধ্যকার যুদ্ধ এবং নিজেদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহে সেখানকার অর্থনৈতিক অবস্থা নাজেহাল হয়ে পড়েছিল। যেমন : মানুষ নিজেদের এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত ফেতনায় লিপ্ত ছিল। ফলে মিশরের অর্থনৈতিক অবস্থা অধঃপতনের গহীন গর্তে নিপতিত ছিল।

এসবের পাশাপাশি জাতির শত্রুরাও ছিল সঙ্ঘবদ্ধ। ক্রুশেড বাহিনী সুযোগ সন্ধানে ব্যস্ত ছিল। যারা মানসুরা ও ফারেসকুর যুদ্ধের প্রায় দশ বছর পূর্বে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিল। নিঃসন্দেহে ক্রুশেড বাহিনী বদলা গ্রহণের অপেক্ষার দিন গুজরান করছিল। তারা মিশরের বর্তমান সামগ্রিক অধঃপতন মুহূর্তে নিজেদের প্রতিশোধ গ্রহণে উত্তম সময় মনে করল।

আজ থেকে দশ বছর পূর্বে ফিলিস্তিনে ক্রুশেড সাম্রাজ্যের বীজ বপিত হয়েছিল। এসবের বাইরে বড় দুঃশ্চিন্তা পূর্বদিক থেকে অগ্রসর হচ্ছিল। সেই দুঃশ্চিন্তার নাম 'তাতার'।

প্রেক্ষাপট পরিবর্তনে সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এর পদক্ষেপ

এভাবেই সাইফুদ্দীন কুতয রহ. দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার মিরাছ লাভ করেন। সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এই অধঃপতিত ও সংকটময় পরিস্থিতিতে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন?

পরিস্থিতি পরিবর্তনে তার পদক্ষেপসমূহ কী ছিল?

বর্বর তাতারীদের প্রতিহত করার জন্য তিনি কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন?

প্রথম পদক্ষেপ : সংকটময় পরিস্থিতিতে একাত্মতার ঘোষণা

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. প্রথম যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, তা হলো মিশরের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ স্থিতিশীল করা, রাজত্ব-লোভীদের লোভ মিটিয়ে দেওয়া। কারণ, রাজসিংহাসনে আসীন হওয়া ব্যতীত রাজত্ব-লোভীদের লোভ কখনো মিটে না। তাহলে এ পরিস্থিতে কুতয রহ. কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন?

তিনি শাসিয়ে কিংবা সতর্ক-বার্তা শুনিয়ে তাদের লোভ নিবারণ করেননি। কারণ, হিতে বিপরীত হতে পারে। পরিণামে হিংসা বিদ্বেষ আরও বেড়ে যেতে পারে। তিনি মিথ্যা প্রলোভন বা আশা দিয়েও তাদের থামাননি। ধোকা ষড়যন্ত্র বা কৌশল অবলম্বন করেও তাদের লোভ মেটাননি; বরং তিনি উত্তম চরিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে পরিস্থিতি শান্ত করেন। সেই চরিত্র মিশরভূমিতে দীর্ঘদিন ধরে মানুষ প্রত্যক্ষ করেনি।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. মিশরের সকল আমীর-উমারা, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বিগ্রেডিয়ার জেনারেল, বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম ও উপদেষ্টা মণ্ডলী একত্রিত করেন। এ সকল জ্ঞানীগুণী ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গই মিশরের সামাজিক চাকা সঞ্চালন করতেন। তিনি তাদের স্পষ্ট ভাষায় বলেন—

‘মিশরে রাজক্ষমতায় সমাসীন থাকা আমার মূল লক্ষ্য নয়। আমার লক্ষ্য হলো তাতারীদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া। আর এটা রাজক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা ব্যতীত সম্ভব নয়। যখন আমরা তাতারীদের পরাভূত করব, তখন আমি আপনাদের হাতে নেতৃত্ব ছেড়ে দেব। তখন আপনারা যাকে ইচ্ছা ক্ষমতায় বসাবেন।”

তার এই বক্তব্য শুনে উপস্থিত সকলেই নীরব হয়ে যান এবং তার কথা মেনে নেন।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. শত্রুপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন এবং তার ক্ষমতায় আরোহণের মূল লক্ষ্য ব্যক্ত করেন। একথা সবারই জানা যে, জাতির সকল বিপর্যয় ও সংকট-মুহূর্তেই দূর হতে পারে, যদি জননেতা জাতিকে কাজে লাগাতে পারেন। সবাইকে একত্রিত করা ও একই কাতারে দাঁড় করানোর জন্য সবচেয়ে উত্তম পন্থা হলো ‘জিহাদ’। এ কারণে কোনো নেতা যদি জাতিকে জিহাদের পতাকাতলে সঙ্ঘবদ্ধ করতে না পারেন, তাহলে তিনি জাতির ভালোবাসাও লাভ করতে পারেন না এবং তিনি তাদের আনুগত্যও হারাতে বসেন। তখন ফেতনা-ফ্যাসাদ আরও বৃদ্ধি পায়। মানুষ অন্যায় পন্থায়

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। অন্য দিকে ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করে যে, যখন কোনো মুসলিম সেনাপতি এখলাসের সঙ্গে জিহাদের পতাকা উত্তোলন করেছেন, তখন দেশে শান্তি বিরাজ করেছে। সকলেই পূর্ণ ওয়াফাদারী, এখলাস ও ভালোবাসা নিয়ে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে।

এছাড়াও সাইফুদ্দীন কুতয রহ. স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি নেতৃত্বের বিষয়টি জনগণের হাতে ছেড়ে দেবেন। তারা শর্তহীনভাবে যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করতে পারেন বা মামলুকরাও ক্ষমতায় আরোহণ করতে পারেন।

পশ্চিমা বিশ্লেষকগণ কিংবা কতিপয় মুসলিম বিশ্লেষক পশ্চিমা বিশ্লেষকদের বিশ্লেষণের ভরসা করে সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এর এই পদক্ষেপের যে ব্যখ্যা দাঁড় করিয়েছেন, তা সঠিক নয়। তারা বলেন, সাইফুদ্দীন কুতয রহ. বিরোধীদের দমন করতে, জিহাদের প্রতি মুসলমানদের ভালোবাসার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তার ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করার জন্য এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এসব কথা বলে কুতয রহ. এর নিয়তের মাঝে ত্রুটি অনুসন্ধান করা সঠিক নয়। তাদের এসব কথাবার্তার ভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে। তা ছাড়া মুমিনদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করা শরীয়তের নির্দেশ। কারণ, জীবন-চরিত্রের আলোকে মানুষের কথা ও কাজের ব্যাখ্যা করতে হয়। ইতিপূর্বে আমরা সিংহাসনে আরোহণের পর কুতয রহ.-এর চরিত্র প্রত্যক্ষ করেছি এবং আমরা সামনে আইনে জালুতের যুদ্ধের পূর্বাপর পদক্ষেপ ও কর্মকাণ্ডও প্রত্যক্ষ করেছি। এসবের আলোকে যা প্রমাণিত হয়, তা হলো, তার এই পদক্ষেপ এখলাসপূর্ণ ছিল। তিনি তার বক্তব্যে সত্যবাদী ছিলেন। রাজত্ব লোভের চেয়ে বহুগুণে তার মাঝে তাতারী আক্রমণের আকাঙ্ক্ষা তীব্র ছিল। আল্লাহ তা'আলা তার হাতেই এই উম্মতের বিজয় দিয়েছেন। এ বিষয়ে সামনে আলোচনা আসবে—ইনশাআল্লাহ! মুনাফিক বা ফেতনাবাজের হাতে উম্মাহর মুক্তি দান করা আল্লাহ তা'আলার নীতি নয়।

إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ

"আল্লাহ তা'আলা ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজ সফল হতে দেন না।"[৬৮]

ইসলামী সোনালি ইতিহাস এমন কাউকে স্মরণীয় করে রাখে না, যার অন্তর কপটতা ও কুপ্রবৃত্তিতে ভরপুর থাকে। এ কারণে আমরা তার সম্পর্কে সুধারণা

[৬৮] সুরা ইউনুস : ৮১।

পোষণ করি এবং একথাও সত্য যে, আমরা আল্লাহর সামনে আগ বাড়িয়ে কাউকে পবিত্র ঘোষণা করছি না। তার ন্যায়পরায়ণতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও খোদাভীতি সম্পর্কে উলামায়ে উম্মত একমত পোষণ করেন।

পশ্চিমা বিশ্লেষকদের আপত্তি—সাইফুদ্দীন কুতয রহ. রাজত্ব লোভী ছিলেন, জিহাদ তার লক্ষ ছিল না—মেনে নেওয়া হলেও [কারণ তারা তাদের জীবন ও রাজনীতিতে এমন খেয়ানত, লোভ ও বিশ্বাসঘাতকতা ব্যতীত কিছুই দেখতে পান না] মুসলিম বিশ্লেকদের বিশ্লেষণ মেনে নেওয়া যায় না। কারণ, মুসলিম ও একনিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের দৃষ্টান্ত, যারা নিজেদের স্বার্থে কিছুই করেননি, যারা নিজেদের জীবন রব, দ্বীন, জাতি ও উম্মতের খেদমতে বিলিয়ে দিয়েছেন, মুসলিম উম্মাহর মাঝে এমন দৃষ্টান্ত ভরপুর। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ব্যক্তির আগমন ঘটতেই থাকবে। সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এর পূর্বে এমন অসংখ্য বীর বাহাদুর অতিবাহিত হয়েছেন এবং ভবিষ্যতে এই কাতারে বহু মানুষ শামিল হবেন। উম্মতে মোহাম্মাদির মাঝে কল্যাণ কেয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. উলামায়ে কেরাম ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে একত্রিত করার জন্য সর্বোত্তম চরিত্র-মাধুর্যকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি দৃঢ় সংকল্প এবং সর্বোত্তম কৌশল অবলম্বন করতেও ভোলেননি। তাই তিনি শাজারাতুদ দুরের একান্ত অনুগত ও আস্থাভাজন আরেক জনকে [তিনি বাহরিয়া মামলূক হওয়া সত্ত্বেও] তার স্থলাভিষিক্ত করেন। তার নাম 'ফারেসুদ্দীন আকতাই ছগীর'। কারণ, তিনি তার মাঝে পর্যাপ্ত রণদক্ষতা, নেতৃত্বযোগ্যতা, সততা ও আমানতদারিতা প্রত্যক্ষ করেন। নেতৃত্বের জন্য এসব গুণ অবশ্যম্ভাবী। উল্লেখ্য, ফারেসুদ্দীন আকতাই ছগীর পূর্বের ফারেসুদ্দীন আকতাই নন, যিনি ছয় বছর পূর্বে ৬৫২ হিজরীতে নিহত হন।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. আমানত পূর্ণ হেফাজত করেছেন। কে বাহরিয়া দাস কে মুইজ্জিয়া দাস, তা বিবেচনা না করে প্রত্যেক যোগ্যকে দায়িত্ব প্রদান করেছেন। এটি তার নিরপেক্ষতার সুস্পষ্ট প্রমাণ। অনুরূপ এটি তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রমাণ। তার এই নিরপেক্ষ বিবেচনার মাধ্যমে তিনি সেই সব বাহরিয়া মামলুকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এবং আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হন, যারা তুরস্ক ও সিরিয়া পলায়ন করেছিল। নিঃসন্দেহে এতে মিশরের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহ দূর হবে এবং বাহরিয়া মামলুকদের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার মাধ্যমে দেশ উপকৃত হবে।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. কতিপয় ফেতনাবাজকে গ্রেপ্তার করেন, যারা রাষ্ট্রদ্রোহ করার চেষ্টা করেছিলেন। এভাবে মিশরের পরিবেশে শান্তি ফিরে আসে।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. জানতেন, যদি লোকেরা জিহাদে অংশ না নেয়, তাহলে নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। তাই তিনি মন্ত্রী যাইনুদ্দীন ও সেনাপতি ফারেসুদ্দীন আকতাই ছগীরকে সেনাবাহিনীকে সাজানো ও যুদ্ধের প্রস্তুতিগ্রহণের নির্দেশ দেন। মানুষ এই মহৎ লক্ষ্য ও গুরুত্বপূর্ণ টার্গেট 'জিহাদ ফি সাবিল্লিাহ' বাস্তবায়নে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

মোটকথা, সাইফুদ্দীন কুতয রহ.-এর প্রথম পদক্ষেপ ছিল অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহ নিরসন, মূল লক্ষ্য অর্জনে সবাইকে কাজে লাগানো এবং সুলতানের প্রধান লক্ষ্য তথা দ্বীন প্রতিষ্ঠা, দেশ রক্ষা, প্রজাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও জনসাধারণের কল্যাণসাধন প্রকাশ করা এবং একথা প্রকাশ করা যে, কেবল সম্পদ পুঞ্জীভূত করা, সন্তানদের হাতে মিরাছস্বরূপ ক্ষমতা হস্তান্তর করা ক্ষমতার উদ্দেশ্য নয়।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এর এই পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে মিশরে স্থিতিশীল পরিবেশ ফিরে আসে। সবাই ঐক্যের পতাকাতলে আশ্রয় নেয়। জাতির পুনর্নির্মাণে তার এই পদক্ষেপ বাস্তবেই বিশাল ভূমিকা রাখে।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ : সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা

দ্বিতীয় পদক্ষেপটি ছিল সাইফুদ্দীন কুতয রহ.এর বিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার চুড়ান্ত প্রকাশ। যা তার সর্বোত্তম চরিত্র-মাধুর্যকেও প্রকাশ করেছে।

তিনি সকল বাহরিয়া মামলুকদের প্রতি সত্যিকার অর্থের সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত নেন! তিনি না এই সাধারণ ক্ষমাকে কোনো কারণে রাজনৈতিক ছলচাতুরীতে পরিণত হতে দিয়েছেন, আর না সেটিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সাময়িক করেছেন। বরং তিনি প্রকৃত কল্যাণসাধনের লক্ষ্যে বাস্তবায়ন করেছেন।

এটি তার প্রাজ্ঞোচিত সিদ্ধান্ত ছিল। পক্ষান্তরে কতিপয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, যারা রাজনৈতিক দূরদর্শিতা রাখেন না এবং রাজ্যের শক্তির উৎস উপলব্ধি করেন না, তারা মূর্খোচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারা বিরোধীদের ওপর অন্ধ হয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করেন!! কখনো স্বাধীনচেতাদের নির্বিচারে বন্দী করেন! আবার কখনো দেশান্তরিত করেন। আবার কখনো তাদের চিরতরে নিস্তব্ধ করে দেন। তপ্তভূমিতে তাদের মস্তক রেখে নির্মমভাবে হত্যা করেন!

এগুলোর কোনো কিছুই দেশ বা জাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনে না। পক্ষান্তরে কুতয রহ. ছিলেন আল্লাহর জন্য নিবেদিতপ্রাণ। তিনি দেশ ও জাতিকে ভালোবাসতেন। তিনি এমন কাজই করতেন, যা দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর হয়, চাই তা তার ক্ষমতার জন্য আশঙ্কাজনক হোক না কেন।

আমরা ইতিপূর্বে বাহরিয়া মামলুক ও মুইজ্জিয়া মামলুকদের মধ্যকার বিরোধ সৃষ্টির কারণ সবিস্তারে আলোচনা করেছি। এই বিরোধ ও ফেতনা শুরু হয় ৬৫২ হিজরীতে বাহরিয়া মামলুকদের প্রধান ফারেসুদ্দীন আকতাই নিহত হওয়ার সময়। অতঃপর এই ফেতনা চূড়ান্ত আকার ধারণ করে ইজ্জুদ্দীন আইবেক ও শাজারাতুদ দুর নিহত হওয়ার পর। বিষয়টি এই পর্যায় গিয়ে গড়ায় যে, সেনাপতি রুকন উদ্দীন বাইবার্সের নেতৃত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাহরিয়া মামলুক সিরিয়ার বিভিন্ন ভূখণ্ডে পলায়ন করে। তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ সিরিয়ার আইয়ূবী নেতাদের মিশর আক্রমণের প্রতি উস্কে দেয়। ফলে ফেতনা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। ফলে সাইফুদ্দীন কুতয রহ. যখন মিশরের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন বাহরিয়া মামলুকদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রাজ্জ্বোচিত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন এবং তাদের স্বদেশ মিশর ফিরে আসার আবেদন জানান।

এই চমৎকার সিদ্ধান্ত এবং পূর্ববর্তী সকল অন্যায় ভুলে যাওয়া কুতয রহ. এর উত্তম আদর্শের পরিচয় বহন করে। এটি তিনি সেই মুহূর্তে করেছেন, যখন তার হাতে শাস্তি প্রদানের পূর্ণ ক্ষমতা বিদ্যমান। ক্ষমতা থাকতেও ক্ষমা প্রদর্শন হলো সর্বোত্তম চরিত্র। অনুরূপ এই সিদ্ধান্ত তার রাজনৈতিক গভীর দূরদর্শিতাও প্রকাশ করে। কারণ, শুধু মুইজ্জিয়া মামলুক ও অন্যান্য মিশরীয়দের শক্তি তাতারীদের মোকাবেলা করার জন্য যথেষ্ট ছিল না। আর নিঃসন্দেহে বাহরিয়া মামলুকগণ বিরাট শক্তির অধিকারী এবং তাদের রয়েছে বহু যুদ্ধের অভিজ্ঞতা। তাদের অনেকেই বহু ক্রুশেডযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে ৬৪৮ হিজরীতে সংঘটিত মানসুরার ঐতিহাসিক যুদ্ধ সুপ্রসিদ্ধ।

সুতরাং বাহরিয়া মামলুকদের শক্তি ও মুইজ্জিয়া মামলুকদের সংমিশ্রণে এমন এক শক্তিশালী বাহিনী গড়ে উঠবে, যারা তাতারীশক্তির মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে। এতে কারও সন্দেহ নেই। কারণ আমরা জানি, যেমন অনৈক্য, বিচ্ছিন্নতা, বিভক্তি ব্যর্থতা ও পরাজয়ের কারণ, অনুরূপ ঐক্য সহযোগিতালাভের অন্যতম পথ।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. জানতেন, সিরিয়ার বাহরিয়া মামলুকদের অবস্থান স্থায়ী নয়। তারা বাধ্য হয়েই সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের মন-প্রাণ, শক্তি-সামর্থ্য, আবেগ-ভালোবাসা তো মিশরে পড়ে আছে। ফলে তার এই দৃপ্ত ঘোষণার মাধ্যমে নিঃসন্দেহে বহুসংখ্যক বাহরিয়া মামলুক ফিরে আসবে। বাস্তবেই তার এই চিন্তা পরিপূর্ণ ফলপ্রসূ হয়েছিল। তার ঘোষণার পর পরই বাহরিয়া মামলুকগণ দলে দলে তুরস্ক, জর্দান, দামেস্ক ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে মিশর অভিমুখে রওয়ানা হয়। এভাবেই মামলুকরা নতুনভাবে ঐক্যশক্তিতে পরিণত হয়। সাইফুদ্দীন কুতয রহ. তাদের উষ্ণ সংবর্ধনা জানান। রাজার অহংকার ও বীরত্ব তাদের সম্মুখে প্রকাশ করেন না; বরং সাধারণ মামলুকের মতো তাদের সামনে নিজেকে দাঁড় করান।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. বাহরিয়া মমলুকদের প্রতি যেমন আচরণ প্রদর্শন করেছেন, তার চেয়েও উত্তম আদর্শ প্রদর্শন করেছেন বাহরিয়া মামলুকদের সেনাপতি রুকন উদ্দীন বাইবার্সের প্রতি। অথচ বাইবার্স তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ছিলেন। যদি কুতয রহ. এর মাঝে বিশ্বাসঘাতকতা, গাদ্দারী ও রাজনৈতিক ফায়েদা উঠানোর চেষ্টা থাকত, তবে তিনি কখনো বাইবার্সকে মিশরে নিয়ে আসতেন না।

ইতিপূর্বে বাইবার্স মিশর থেকে পলায়ন করে দামেস্কের শাসনকর্তা নাছের ইউসুফের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন। নাছের ইউসুফ ছিলেন বিশ্বাসঘাতক। তিনি বিভিন্ন সময় তাতারীদের সহযোগিতা করেছেন, আবার অনেক সময় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বান করেছেন। কিন্তু রুকন উদ্দীন বাইবার্স তাতারীদের সামনে বিনয়ী হওয়াকে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার সংকল্পের বিরুদ্ধে নিন্দাজ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু নাছের ইউসুফ তার কথা শোনেননি। আর যখন তাতারীরা দামেস্ক অভিমুখে রওয়ানা হয় তখন নাছের ইউসুফ সাথী-সঙ্গীসহ দক্ষিণে পলায়ন করেন। অন্যপায় হয়ে বাইবার্সও পালাবার পথ বেছে নেন। তিনি একাই ফিলিস্তিন অভিমুখে পলায়ন করেন। ফিলিস্তিনের গাজা নগরীতে তিনি একা পড়ে থাকেন। ভেবে পাচ্ছিলেন না কী করবেন?

এমন সংকট-মুহূর্তে যেনো পৃথিবী তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে আসছিল। তিনি তো সেই ব্যক্তি, যিনি সকল বাহরিয়া মমলুকদের নেতা ছিলেন, অর্থাৎ বর্তমান যুগের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর স্থলাভিষিক্ত। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি উত্তর প্রান্ত

থেকে আগত তাতারীশক্তি ও নাছের ইউসুফ (যিনি মরুভূমিতে পলায়ন করেছিলেন) এবং মিশরের মাঝে (যেখান থেকে তিনি পলায়ন করেছিলেন) দোটানায় ভুগছিলেন। এমন বিপদ-সংকুল মুহূর্তে সাইফুদ্দীন কুতয রহ. তাকে সসম্মানে মাথা উঁচিয়ে নিরাপদে মিশর প্রত্যাগমনের অনুরোধ জানান!! আহ! কী চমৎকার চরিত্র-মাধুর্য! কী চমৎকার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা।

কুতয রহ. বাইবার্সের মাঝে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলি দেখতে পেয়েছিলেন—

প্রথমত : তিনি তার মাঝে রণশাস্ত্রের পর্যাপ্ত জ্ঞান, দক্ষ নেতৃত্ব, উচ্চ মনোবল ও ইসলামী মর্যাদাবোধ দেখতে পেয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত : তিনি তার মাঝে প্রখর মেধা দেখতে পেয়েছিলেন। মেধার প্রখরতার কারণে রুকন উদ্দীন বাইবার্স অন্যদের চেয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিলেন। তিনি তার এই মেধাশক্তিকে মুইজ্জিয়া মমলুকদের বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর পরিবর্তে তাতারীদের বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন।

তৃতীয়ত : তিনি দেখেছেন বাহরিয়া মামলুকরা রুকন উদ্দীন বাইবার্সের অনুগত। সুতরাং বাইবার্স যদি পলায়ন করেন, তাহলে যেকোনো মুহূর্তে বাহরিয়া মমলুকরা বেঁকে বসতে পারে। সুতরাং রাজনৈতিক দূরদর্শিতার দাবি ছিল, বাইবার্সের গুণাবলির প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক তার যোগ্যতা ও মেধাকে কাজে লাগানো। এতে পরিস্থিতি অনুকূলে আসার পাশাপাশি তাতারীদের বিরুদ্ধে সজ্ঘবদ্ধ শক্তি গঠন হবে।

এ কারণেই বাইবার্স মিশর ফিরে এলে সাইফুদ্দীন কুতয রহ. তার প্রতি যথার্থ সম্মান-প্রদর্শন করেন এবং তাকে রাষ্ট্রীয় অতিথিশালায় মেহমানদারি করেন। এমনকি তাকে কালয়ূব ও কালয়ূবের পাশ্ববর্তী গ্রামসমূহের আমীর বানিয়ে দেন। একজন প্রবীণ আমীরের ন্যায় তাকে মূল্যায়ন করেন। এমনকি তাকে একপর্যায়ে সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ দেন। [এ বিষয়ে সামনে আলোচনা আসবে—ইনশাআল্লাহ] এভাবে আমরা কুতয রহ. এর কাছ থেকে শাস্তি প্রদানের পূর্ণ ক্ষমতা থাকার পরও ক্ষমাপ্রদর্শন ও অন্যকে কদর অনুযায়ী মূল্যায়ন এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও ঐক্যগঠনের স্পৃহা শিখতে পারি। এছাড়াও আমরা তার কাছে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী নীতিমালা জানতে পারি। তা হলো—

১. রাজনৈতিক দূরদর্শিতা অর্থ চারিত্রিক অধঃপতন নয়
২. ইসলামী রাজনীতিতে নেফাকি নেই
৩. ইসলামী রাজনীতিতে জুলুম ও অত্যাচার নেই
৪. ইসলামী রাজনীতিতে অহংকার নেই
৫. ইসলামী রাজনীতি কারও মন ভাঙে না
৬. ইসলামী রাজনীতি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না
৭. বরং ইসলামী রাজনীতি দ্বীন ইসলামের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

তাই কোনো অবস্থাতেই দ্বীনি ও ইসলামী রাজনীতির মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করা যাবে না। অথবা রাজনীতিতে এমন কোনো কিছু করা যাবে না, যা ইসলামের মূলনীতি-বিরুদ্ধ। যেমন সাইফুদ্দীন কুতয রহ. আমাদের শিখিয়েছেন। যোগ্য নেতা যিনি আত্মবিশ্বাসী। পক্ষান্তরে দুর্বল মনোবলহীন নেতৃবৃন্দ তাদের পাশে অন্য কোনো শক্তির বহিঃপ্রকাশ মেনে নেন না। তারা দুর্বল হয়ে পড়বে। ফলে তারা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এ কারণে তারা দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হয়। এসব আশঙ্কার মূল কারণ হলো, তারা নিজেদের দুর্বলতা, অক্ষমতা ও হীনতা-দীনতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। ফলে জাতির আস্থা হারানোর তীব্র আশঙ্কা সর্বদা তাদের মাঝে বিরাজ করে। কিন্তু কুতয রহ. এমন দুর্বল নেতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন শক্তিশালী, মেধাবী, আল্লাহর জন্য নিবেদিত, দ্বীন, দেশ ও জাতির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনকারী। তিনি নিজেও এসব বিষয় অনুধাবন করতেন। জাতিও তার এসব গুণাবলি উপলব্ধি করত। ফলে ভয়-ভীতি কিংবা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টিকারী কোনো কিছু ছিল না।

এভাবেই সেনাপতি রুকন উদ্দীন বাইবার্সের নেতৃত্বে বাহরিয়া মামলুকদের শক্তি মিশরীয় মুসলিম বাহিনীর শক্তির সঙ্গে মিলিত হয়। নিঃসন্দেহে এতে মিশরবাসীর মনোবল বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

বাহরিয়া মামলুকদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের পদক্ষেপটি সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এর জীবনের অন্যতম পদক্ষেপ ছিল। উল্লেখ্য, তার প্রত্যেকটি পদক্ষেপই ছিল যথার্থ।

মোটকথা, মিশরের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি শান্তকরণের প্রতি গুরুত্বারোপ ছিল তার প্রথম পদক্ষেপ। আর পলায়নকারী বাহরিয়া মামলুকদের ফিরিয়ে এনে তাদের যোগ্যতা ও শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সৈন্যবাহিনীর শক্তিবর্ধন ছিল তার দ্বিতীয় প্রদক্ষেপ।

তৃতীয় পদক্ষেপঃ সিরিয়ার সঙ্গে একাত্মতা

তার তৃতীয় পদক্ষেপটি ছিল অসাধারণ; বরং অতিঅসাধারণ!! সাইফুদ্দীন কুতয রহ. মিশরের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ শান্ত করার পর প্রতিবেশী মুসলিম দেশসমূহের সঙ্গে সুসম্পর্ক সৃষ্টির প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, সিরিয়ার আইয়ূবী সাম্রাজ্যের সঙ্গে মিশরের সম্পর্কের মাঝে খুব টানাপোড়া চলছিল। তারা অনেক বার মিশর আক্রমণের চিন্তা করেছিল। নাজমুদ্দীন আইয়ূব রহ.-এর যুগে তারা চুক্তি-ভঙ্গ করে এবং বাহরিয়া মামলুকরা মিশর ছেড়ে পলায়ন করলে তারা তাদের আশ্রয় দেয়। তারা সর্বদাই মিশরের বিপর্যয় ঘটার অপেক্ষায় থাকত। এমনকি আলেপ্পো ও দামেস্কের আমীর নাছের ইউসুফ আইয়ূবী বাগদাদ পতনের পর মিশর আক্রমণের জন্য তাতারীদের সহযোগিতা কামনা করেছিল!!

আইয়ূবী সাম্রাজ্যের সঙ্গে নব সম্পর্ক সৃষ্টির এত আয়োজন সত্ত্বেও সাইফুদ্দীন কুতয রহ. সিরিয়ার আমীরদের মধ্যেকার বিদ্যমান বিবাদ নিরসনেও জোরদার ভূমিকা পালন করেন। তিনি সিরিয়ার সঙ্গে একাত্মতা সৃষ্টির চেষ্টা চালান অথবা কমপক্ষে সিরিয়ার আমীরদের নিরপেক্ষ রাখার চেষ্টা করে। যাতে তারা তাতারীদের সঙ্গে মোকাবেলা করার সময় বিঘ্ন সৃষ্টি না করে—যেমনটি করা তাদের অভ্যাস।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. সিরিয়ার আইয়ূবী আমীরদের প্রধান। আলেপ্পো ও দামেস্ক নগরীরর প্রধান নাছের ইউসুফ আইয়ূবী। তিনি সিরিয়ার প্রধান দুটি শহর 'আলেপ্পো ও দামেস্ক' শাসন করেন। কুতয রহ. ভালোভাবে জানতেন, নাছের ইউসুফ তাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করেন। তিনি একথাও জানতেন, তিনি তার বিরুদ্ধে তাতারীদের সহযোগিতা কামনা করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি সুমিষ্ট ও কোমল ভাষায় একটি হৃদয়বিদারক চিঠি লিখেন। [মাক্রিজী রহ. *সালুক* গ্রন্থে সেই ঐতিহাসিক চিঠিটি উল্লেখ করেছেন]

এটি ছিল আলেপ্পো নগরীতে তাতারীদের আগমনের পূর্বের ঘটনা। তখন নাছের ইউসুফ ও তাতারীদের মধ্যকার সহযোগিতা প্রদানের সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল। তাই কুতয রহ. সিরিয়ার মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করার চেয়ে নাছের ইউসুফের সঙ্গে ঐক্য গড়ার ইচ্ছা করেন। কিন্তু কুতয রহ. জানতেন, নাছের ইউসুফের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো, রাজক্ষমতায় বলবৎ থাকা। পরিবেশ পরিস্থিতি যেই

রূপই ধারণ করুক না কেন, ক্ষমতা বলি দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তিনি তাকে একটি অদ্ভুত চিঠি প্রেরণ করেন!

নাছের ইউসুফ আইয়ূবী সিরিয়া ও মিশরের রাজা হবেন, এই শর্ত উল্লেখ করে তিনি ঐক্যের আহ্বান জানান!! চিঠিতে তিনি একথাও উল্লেখ করেন যে, কুতয রহ. তার অনুগত প্রজা হয়ে থাকবেন। অথচ কুতয রহ. এর সামরিক শক্তি নাছের ইউসুফের চেয়ে বহুগুণে বেশি এবং মিশর সাম্রাজ্য আলেপ্পো ও দামেস্ক নগরীর চেয়ে শক্তিশালী।

কুতয রহ. চিঠিতে লেখেন, তিনি তার বিরোধিতায় লিপ্ত হবেন না। মিশরে তিনি তার প্রতিনিধি। নাছের ইউসুফ মদীনায় এলেই তিনি তাকে সিংহাসনে আরোহণ করাবেন!!

এগুলো এমন সব সিদ্ধান্ত ছিল, রাজনৈতিক স্থূলদৃষ্টিতে তা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। এসব তখনই কল্পনা করা সম্ভব, যখন কেবল রাজনৈতিক নয়; বরং ঈমানী ও আখলাকী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কুতয রহ. আদর্শ গণ্য করা হবে।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. যখন জানলেন, নাছের ইউসুফ ঐক্যগঠন কিংবা মিশর আগমনের ব্যাপারে দ্বন্দ্বে ভুগছেন, তখন তিনি তাতারীদের বিপক্ষে তাকে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেন। ফলে তাতারীদের পরাজয় করার ক্ষেত্রে ঐক্যশক্তি গঠন হলো। যদিও মিশর ও সিরিয়ার মধ্যকার পূর্ণ ঐক্য জোট গঠন হলো না।

কুতয রহ. পূর্ণ শিষ্টাচার ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে লেখেন—

"আপনি আমাকে মনোনয়ন দিলে আমি আপনার খেদমত করব। আর আপনি চাইলে আমি সৈন্যবাহিনীসহ আপনার সহযোগিতায় আপনার খেদমতে আগমন করব। আর আপনি যদি আমার উপস্থিতিকে নিরাপদ মনে না করেন, আমি সৈন্যবাহিনীকে পাঠিয়ে দেব। আপনি যাকে ইচ্ছা [সেনাপতি হিসেবে] নির্বাচন করবেন!!"

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. নাছের ইউসুফকে মিশরের সেনাপ্রধান নির্বাচনের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেন!!

কিন্তু নাছের ইউসুফ সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এর কোনো ডাকে সাড়া দেন না। ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের চেয়ে বিবাদ ও বিভাজনকে তিনি প্রাধান্য দেন। তবে ফলাফল কী দাঁড়াবে?!

কাল-পরিক্রমায় একসময় আলেপ্পোর পতন ঘটে। দামেস্ক নগরী ছিন্ন ভিন্ন হয়। নাছের ইউসুফ লাঞ্ছিত হয়ে ফিলিস্তিন পলায়ন করেন। দীর্ঘদিন ধরে যে ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কথা ছিল, ফিলিস্তিনে তা সংঘটিত হয়। নাছের ইউসুফের বাহিনী বিদ্রোহ করে বসে। তারা সকলে সাইফুদ্দীন কুতয রহ.-এর নেতৃত্বাধীন মিশরীয় বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়। যাদের রয়েছে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, নির্ধারিত উদ্দেশ্য। তা হলো 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' [আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ]; জিহাদ ফি সাবিলিল কুরসী [ক্ষমতার জিহাদ] নয়।

নাছের ইউসুফ সকল পরীক্ষায় ব্যর্থ হন। তাতারীদের সামনে ব্যর্থ হন। সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এর সামনে ব্যর্থ হন। নিজ বাহিনীর সামনে ব্যর্থ হন। জাতির সামনে ব্যর্থ হন। এখন তার বাহিনী তাকে ছেড়ে মিশর অভিমুখে রওনা হয়েছে। জর্দানের কারাক দুর্গে তিনি একাকী পলায়ন করেন। অতঃপর দুর্গকে নিরাপদ কেন্দ্র মনে না হওয়ায় দুর্গ ছেড়ে মরুভূমিতে কতিপয় বেদুঈনের কাছে আশ্রয় নেন!

নাছের ইউসুফের শেষ পরিণাম

নাছের ইউসুফ যখন জর্দানের দক্ষিণে অবস্থিত উপত্যকার জাফার নামক অঞ্চলে পৌছেন, তখন তাকে গ্রেপ্তারের জন্য হালাকু খান কর্তৃক প্রেরিত তাতারী বাহিনীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। তারা তাকে ও তার সন্তান 'আযীয'কে লাঞ্ছিত অবস্থায় গ্রেপ্তার করে হালাকু খানের কাছে নিয়ে যায়। ইতিমধ্যে হালাকু খান আলেপ্পো নগরী ছেড়ে তিবরিয অভিমুখে রওয়ানা হয়। [পূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে] ফলে তারাও তিবরিয অভিমুখে রওয়ানা হয়। হালাকু খান তাকে জীবন্ত অবস্থায় বন্দী করে রাখার চিন্তা করে পরবর্তী তাকে সিরিয়ার নেতৃত্বের কাজে লাগানোর জন্য। তাই সে তাকে হত্যা না করে তাতারী বাহিনীর সঙ্গে সিরিয়া প্রেরণ করে। পথিমধ্যে নাছের ইউসুফ আইনে জালুতের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর সিরিয়া থেকে পলায়নকারী কতিপয় তাতারীর সঙ্গে দেখা হলে [আইনে জালুতের যুদ্ধের আলোচনা সামনে আসবে—ইনশাআল্লাহ] তারা তাকে হত্যা করে ফেলে!

এ ছিল আমীরদের অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও লাঞ্ছনার পরিণাম। যাদের পক্ষে অন্যের কাঁধে ভর করার সুযোগ ছিল, ইতিহাসের সূর্য-সন্তান হিসিবে স্মরণীয় হওয়ার সুযোগ ছিল, যদি তারা সততার সঙ্গে জিহাদের পতাকা হাতে তুলে নিত। কিন্তু

তারা সম্মানের জীবনের চেয়ে লাঞ্ছনার জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে। নিকৃষ্ট সংকীর্ণ ক্ষণস্থায়ী জীবনকে আল্লাহর রাহের সম্মানজনক মৃত্যুর ওপর শ্রেষ্ঠ মনে করেছে।

এভাবেই নাছের বাহিনীর সম্পৃক্ততা ও নাছের ইউসুফ [যিনি মুসলমানদের পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখতেন] তার মৃত্যুর ফলে সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এর শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. নাছের ইউসুফের সঙ্গে এসব কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ব্যয় করেই ক্ষান্ত হননি; বরং সিরিয়ার অন্যান্য আমীরদের নিকট চিঠি প্রেরণ করেন। হামাত শহরের কর্ণধার আমীর ইউসুফ তার ডাকে সাড়া দেয়। তিনি কিছুসংখ্যক সৈন্য নিয়ে মিশর আগমন করেন।

তবে কারাক শহর প্রধান মুগীছ ওমর নিরপেক্ষতার পথ বেছে নেন। তিনি সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত, যারা পূর্বের যুদ্ধে নাছের ইউসুফের সহযোগী ছিল। তিনি মুজাহিদ ছিলেন না। মামলুকদের প্রচণ্ড ঘৃণা করতেন। আমরা জানি, তিনি দুইবার মিশর আক্রমণের চেষ্টা করেছিলেন। দুইবারই সাইফুদ্দীন কুতয রহ. তাকে বাধা দিয়েছিলেন। তাই মুগীছ ওমর পরবর্তী পরিস্থিতির অপেক্ষা করছিলেন। যাতে বিজয়ী দলের সঙ্গে মিলিত হতে পারেন। চাই বিজয়ী দল মুসলমান হোক বা তাতারীরা।

তবে হিমসের আমীর আশরাফ আইয়ূবী কুতয রহ. ডাকে সাড়া দেওয়া তো দূরের কথা, সম্পূর্ণরূপে প্রত্যখ্যান করেন। তাতারীদের সহযোগিতা প্রদান করাকেই তিনি উত্তম গণ্য করেন এবং বাস্তবেই হালাকু খান তাকে গোটা সিরিয়ার রাজত্ব তাতারীদের নামে পরিচালনার জন্য দান করে।

বানয়াস শহরের রাজা হাসান ইবনে আবদুল আযীয [আল মালিকুস সায়ীদ তার উপাধি] কেবল সহযোগিতা প্রদানেই অস্বীকৃতি জানাননি, বরং সদলবলে তাতারীদের সঙ্গে মিলিত হয়!!

এভাবেই বহির্বিশ্বের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কেবল হামাত শহরের রাজা মানসুর ও নাছের ইউসুফের বিদ্রোহী সৈন্যরা সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এর সঙ্গে জোট বাঁধেন। আর কারাক শহরের আমীর মুগীছ ওমর নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেন। এসব কূটনৈতিক সম্পর্ককে পরবর্তী পরিণামের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী মনে করা হতো। অপর দিকে আশরাফ আইয়ূবী, মালিকুস সায়ীদ হাসান ইবনে আব্দুল আযীয তাতারীদের সঙ্গে জোট বাঁধেন।

কুতয রহ. এর পদক্ষেপসমূহের ফলাফল

নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে কুতয রহ.-এর পদক্ষেপসমূহের ফলাফল উল্লেখ করা হলো—

১. মিশরের অভ্যন্তরীণ অস্থিতিশীলতা দূর হয় এবং গোটা মিশর সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এর অনুগত হয়।

২. সে সময়ের মিশর সাম্রাজ্যের প্রধান লক্ষ্য সবার কাছে সুস্পষ্ট হয়। তা হলো তাতারীদের মোকাবেলা করার জন্য শক্তিশালী বাহিনী গঠন করা।

৩. বাহরিয়া মামলুকদের সাধারণ ক্ষমতা ঘোষণার ফলে মিশরবাসীর মাঝে শান্তির বাতাস বইতে থাকে। কেবল বাহরিয়া মামলুকদের মাঝেই নয়, কেবল সৈন্যবাহিনী ও সেনাপতিদের মাঝেই নয়, বরং গোটা জাতির মাঝে শান্তির হাওয়া বইতে থাকে। এমনকি মুইজ্জিয়া মামলুক ও বাহরিয়া মামলুকদের সম্মিলিত শক্তিতে মিশরীয় বাহিনীর শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

৪. মিশরীয় সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সিরিয়ার বহু সৈন্য মিলিত হয়। তাদের অধিকাংশ নাছের ইউসুফের সৈন্য ও হামাতের আমীরের নেতৃত্বাধীন সৈন্য।

এ ছিল ৬৫৮ হিজরীর শুরুর দিকের মিশরের রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থা। সে সময় তাতারী আক্রমণে আলেপ্পো, দামেস্ক ও ফিলিস্তিনের গাজা পর্যন্ত পতন ঘটে। একথা সবাই জানে, গাজা মিশর বর্ডারের খুব কাছে—মাত্র ৩৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

যুদ্ধের পূর্বে জাতির মানসিকতা

এই ছিল তৎকালীন মিশরের সেনাবাহিনী ও সরকার-প্রধানের অবস্থা। কিন্তু মিশরবাসীর কী অবস্থা ছিল? তাদের মানসিক অবস্থা ও মনোবল কেমন ছিল? তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী ছিল?

মিশরবাসী কি এই ভয়াবহ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল, যা সর্বজনবিদিত ভূপৃষ্ঠের শ্রেষ্ঠ পরাশক্তির সঙ্গে কয়েকদিন বা কয়েকমাস পর সংঘটিত হতে যাচ্ছে? মিশরবাসী কি পারবে সেই সীমালঙ্ঘনকারী শক্তির মোকাবেলা করতে, যারা ইতিমধ্যে অর্ধবিশ্বের পতন করেছে?

বস্তুত মিশরবাসী সে সময় চরম অর্থনৈতিক সংকটে ভুগছিল। আর আমরা জানি, অর্থনৈতিক সংকট সামাজিক জীবনে বড় বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে।

এমতাবস্থায় কেউ কিছুতেই মন বসাতে পারে না। এক মুঠো খাবারের জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। তবে যখন জননেতা তাদের সামনে শাহাদাতের মর্যাদা তুলে ধরেন, দ্বীনের মূল্য স্পষ্ট করেন, তখন জাগতিক বিপদাপদ, অর্থনৈতিক সংকট তাদের সামনে হীন হয়ে যায়। 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' ও শাহাদাতের মৃত্যু তাদের কাঙ্ক্ষিত বস্তুতে পরিণত হয়।

কিন্তু সাইফুদ্দীন কুতয রহ. যেই পরিস্থিতিতে মিশরের রাজত্ব গ্রহণ করেন, তা ছিল বড়ই ভয়াবহ। মিশর রাজত্বে টানা দশ বছর একের পর এক বিপর্যয় ঘটার ফলে শাসকবর্গ জাতির দিকে ফিরে তাকানোর সুযোগ পাননি। রাজ্যের স্তম্ভ মজবুত করাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। জাতিকে নিয়ে ভাববার বিষয়টি ছিল বিলম্বিত। ফলে সে সময় মিশরবাসী সেই মহিমান্বিত জাতি ছিল না, যারা নিজেদের মাঝে তাতারীদের মোকাবেলা করার স্বপ্ন পোষে এবং তারা সেই বিজয় দিবসের স্বপ্ন দেখত না, যেদিন বিজয় হবে কথিত 'অপরাজেয়' তাতারীদের বিরুদ্ধে। বরং তারা অন্যান্য সাধারণ মুসলমানদের মতই তাতারীদের ভয় পেত। তাতারীদের কথা শুনলেই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ত। তাতারীরা যতই মিশরের কাছে পৌঁছতে থাকে, মিশরবাসী ততই অস্থির হয়ে ওঠে, হৃদয়াত্মা ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে।

তাই জাতির হিম্মত বুলন্দ করা, মনোবল চাঙা করা, তাদের মাঝে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছিল সময়ের দাবি। কুতয রহ. এর সামনে যেসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল, এটি হলো অন্যতম। কারণ, জাতির সহযোগিতা ব্যতীত সৈন্যবাহিনী কখনোই বিজয় লাভ করতে পারে না।

তাই সেনাপতি ও সেনাবাহিনীর জন্য জাতির সহযোগিতা ছিল অত্যন্ত জরুরি। অন্যথায় বিজয় অসম্ভব।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এর জন্য অপরিহার্য ছিল জাতিকে জিহাদ, আত্মবিসর্জন, দান, অনুগ্রহ ও দ্বীনের জন্য আত্মনিবেদিত হওয়া এবং ইসলামী মর্যাদাবোধের শিক্ষা দেওয়া।

আল্লাহ্ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে মিশরবাসীর জন্য দুটি মহা মূল্যবান বস্তু হেফাজত করেছেন

উপরোল্লিখিত কাজসমূহ আঞ্জাম দেওয়া অত্যন্ত কঠিন হলেও মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন নিজ অনুগ্রহে মিশরবাসীর জন্য দুটি মহা মূল্যবান বস্তু হেফাজত করেছেন।

এক. ইলম ও উলামায়ে কেরামের মূল্য

মিশরে আইয়ূবী সাম্রাজ্যের দীর্ঘকাল ও সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী রহ. কর্তৃক সুন্নী মাযহাব প্রতিষ্ঠার পর থেকে উলামায়ে কেরামের মূল্য রাজা-প্রজা তথা সকলের কাছে ছিল সমুন্নত। এমনকি শাজারাতুদ দুর ক্ষমতায় আরোহণের প্রতি যখন উলামায়ে কেরাম নারী ক্ষমতায়নের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন, অন্যান্য রাষ্ট্রে এ বিষয়ে নিন্দা জানিয়ে চিঠি পাঠালেন এবং এ বিষয়ে সোচ্চার হওয়ার জন্য জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে শুরু করলেন, তখন খোদ শাজারাতুদ দুর কিংবা তার কোনো সহযোগী উলামায়ে কেরামের এই সাহসী পদক্ষেপকে বাধা প্রদান করতে পারেনি। কেউ উলামায়ে কেরামের স্বাধীনতা খর্ব করতে পারে নি। তারা কাউকে বন্দী করেনি। পঠনপাঠন কিংবা বক্তৃতা প্রদানেও কেউ তাদেরকে বাধাগ্রস্ত করতে পারেনি!! তা ছাড়া আইয়ূবীদের রীতি ছিল মামলুকদের প্রথমত দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। এরপর অশ্বচালনা ও রণশাস্ত্র। ফলে দ্বীনি তারবিয়াত তাদের মাঝে ক্রিয়া সৃষ্টি করত। ফলে তারা ইলম ও উলামায়ে কেরামকে তাজীম করত। যখন কেউ দাঁড়িয়ে বলত, 'আল্লাহ তা'আলা বলেছেন বা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন' তাহলে শাসক-শাসিত, রাজা-প্রজা সকলেই কান পেতে শুনত।

আইয়ূবী শাসনামল বা মামলুক শাসনামলে কেউ কোনো আলেম কিংবা শায়েখ বা ইসলামী বেশ-ভূষা ধারণকারী কাউকে ঠাট্টা করবে, তা অসম্ভব ছিল। যেমন তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল ইসলামের কোনো কানুন বা বিধান প্রত্যাখ্যান করা। হ্যাঁ! কেউ কেউ অসদুদ্দেশ্যে কিংবা কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় জেনেবুঝে দ্বীনের বিরোধিতায় লিপ্ত হতো। তবে কেউ এসে তাকে একথা বলত না, হারাম কাজ তথা সুদ, ঘুষ, মদ, নাচ-গান, খেল-তামাশা, খ্রিস্টানদের আনুগত্যে হালাল হয়ে গেছে। অনুরূপ কেউ এসে হালালকে হারাম সাব্যস্ত করত না। মসজিদসমূহে দ্বীনি হালকা বসত। উলামায়ে কেরাম মিম্বরে বসে বক্তৃতা প্রদান করতেন। বক্তৃতা প্রদান বা নসিহত প্রদানে কেউ বাধা দিত না।

মিশরবাসী দ্বীনের প্রতি এমনই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করত। তাদের অন্তরে ছিল ইসলামের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা।

মিশরে ইলম ও আলেম-উলামাদের মূল্যায়ন থাকার কারণে মিশর সেই সব উলামায়ে দ্বীনের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছিল, যারা নিজ দেশে অন্যকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ পেতেন না। কিংবা যেকোনো কারণে সরকার কর্তৃক

বাঁধাগ্রস্ত হতেন। এ কারণেই মিশরের ও আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আলেমদের চেয়ে পার্শ্ববর্তী মুসলিম রাষ্ট্র থেকে আগত উলামায়ে কেরামের সংখ্যা বেশি ছিল। নিঃসন্দেহে এ সকল আলেমদের আগমনের ফলে মিশরে দ্বীনি জ্ঞানচর্চা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

আগত উলামায়ে কেরামের মাঝে শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন শায়েখ ইজ ইবনে আবদুস সালাম রহ.। তার উপাধি ছিল 'সুলতানুল উলামা' [উলামাদের বাদশা]।

এ পর্যায়ে এই মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা জরুরি মনে করছি।

সুলতানুল উলামা [উলামাদের বাদশা]

ইজ ইবনে আবদুস সালাম রহ. সামগ্রিক বিবেচনায় মুসলিম উলামায়ে কেরামের মাঝে অন্যতম মহান ব্যক্তিত্ব। তিনি ৫৭৭ হিজরীতে দামেস্ক নগরীতের জন্মলাভ করেন। অর্থাৎ সুলতান সাইফুদ্দীন কুতয রহ. ক্ষমতায় আরোহণের সময় তার বয়স ছিল প্রায় আশি-উর্ধ্ব। তিনি সেই সব আলেম অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা আল্লাহর পথে নিন্দুকের নিন্দা পরোয়া করতেন না। তিনি অনেক সময় রাজা-বাদশাদের ভুল ধরিয়ে দিতেন এবং কোনোরূপ ভয়ভীতি ছাড়াই তাদের নসিহত প্রদান করতেন। তার মাঝে ইলম, আমল, ইত্তেবায়ে সুন্নত, ইজতেহাদে সহীহ, [সুন্নতের অনুসরণ ও কুরআন-হাদীসের সমন্বয়ে মাসআলা উদ্‌ঘাটন] ইবাদত, আকায়েদ, রাজনীতি ও সামাজিক বিষয়ের ফতোয়ার সুমন্বয় ঘটেছিল এবং তিনি সত্যিকার অর্থে আলেমদের বাদশা, দায়ীদের নেতা এবং সৎকাজে আদেশ প্রদানকারী ও অসৎকাজে বাধা প্রদানকারীদের আদর্শ ছিলেন।

দামেস্কের রাজ-সিংহাসনে সালেহ ইসমাঈল আইয়ূবী আরোহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি দামেস্কেই জীবন কাটান। ইসমাঈল আইয়ূবী হলেন নাজমুদ্দীন আইয়ুব রহ. এর ভাই, যিনি মিশরের হাকেম ছিলেন। যার সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু ইসমাঈল আইয়ূব ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি দেশ ও জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। তিনি খ্রিস্টানদের সঙ্গে জোট বেঁধেছিলেন সহোদর নাজমুদ্দীন আইয়ূব রহ.-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। তিনি যেসব শর্তসাপেক্ষে জোট বেঁধেছিলেন। তন্মধ্যে অন্যতম হলো—

১. তিনি তাদের সয়দা ও ছাকীফ শহর প্রদান করবেন
২. তাদের দামেস্ক থেকে অস্ত্র কেনার সুযোগ দেবেন
৩. মিশর আক্রমণের জন্য তাদের সঙ্গে একই দলে বের হবেন।

এ সংবাদ পেয়ে ইজ ইবনে আবদুস সালাম স্বভাবতই ক্ষিপ্ত হন এবং মিম্বরে দাঁড়িয়ে তার কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষণ প্রদান করেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, মুসলিম শহরগুলো সালেহ ইসমাঈলের ব্যক্তিগত সম্পদ নয় যে, সেগুলো খ্রিস্টানদের দান করবেন। তিনি এও বলেন যে, খ্রিস্টানদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করা না-জায়েয। তা ছাড়া মুসলমানরা একথা নিশ্চিত জানতেন যে, খ্রিস্টানরা এই অস্ত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করবে। সুলতানুল উলামা [উলামাদের বাদশা] এভাবেই অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে দৃপ্তকণ্ঠে হক কথা তুলে ধরেন। তার এই বক্তব্যে ইসমাঈল আইয়ূব ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে কাজীর পদ থেকে বরখাস্ত করেন। খুতবা প্রদানে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন এবং তাকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ জারি করেন। এরপর ইজ ইবনে আবদুস সালাম কিছুদিন জেলে বন্দী ছিলেন। অতঃপর তাকে কারামুক্তি দেওয়া হলেও গৃহবন্দী করে রাখা হয়। কারও সঙ্গে কথা বলা, দরস প্রদান কিংবা খুতবা প্রদান ছিল তার জন্য নিষিদ্ধ। ফলে তিনি বাকরুদ্ধ ও গৃহবন্দী জীবন থেকে মুক্তি পেতে এবং মানুষকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে দামেস্ক ছেড়ে বাইতুল মাকদিস চলে যান। কিন্তু ঘটনাচক্রে কিছুদিন পর ইসমাঈল আইয়ূব খ্রিস্টান নেতৃবর্গের সঙ্গে সৈন্যবাহিনীসহ মিশর আক্রমণের উদ্দেশ্যে বাইতুল মাকদিস আসেন। তখন ইসমাঈল তার নিকট এই সংবাদ জানিয়ে দূত পাঠান যে, তিনি তার প্রতি যারপরনাই দয়া করবেন। তিনি তাকে তার পূর্বপদে বলবৎ রাখবেন। তবে শর্ত হলো তাকে সন্তুষ্ট করতে হবে। তার সামনে ওজরখাহী করতে হবে এবং তিনি রাজনৈতিক বিষয়ে কথা বলতে পারবেন না। অন্যথায় পুনরায় তাকে গ্রেপ্তার করা হবে।

সালেহ ইসমাঈলের দূত ইজ ইবনে আবদুস সালাম রহ. এর কাছে এসে বলল, আপনার পূর্বাবস্থা ও আরও অতিরিক্ত পদমর্যাদা লাভের জন্য শর্ত হলো সুলতানের সামনে বিনয়ী হওয়া ও সুলতানের হস্তচুম্বন করা।

ইজ ইবনে আবদুস সালাম রহ. বীরদর্পে ও সসম্মানে তাকে উত্তর প্রদান করেন—

'হে মিসকীন, তার হস্তচুম্বন করা তো দূরের কথা, সে যদি আমার হস্তচুম্বন করে তাও আমি এই প্রস্তাবেই রাজি হব না। হে আমার সম্প্রদায়, আমি এক অঞ্চলে রয়েছি। তোমরা আরেক অঞ্চলে রয়েছ। সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি আমাদের ফেতনা থেকে মুক্তি দিয়েছেন, যে ফেতনায় তোমরাও নিপতিত।'

আল্লাহু আকবার! তারাই প্রকৃত আলেম

শায়েখ ইজ ইবনে আবদুস সালাম কর্তৃক ইসমাঈল আইয়ূবের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি ছিল খুব স্বাভাবিক। তিনি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে ইসমাঈল আইয়ূব তাকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ প্রদান করেন। তাকে তার তাঁবুর পার্শ্বে আরেকটি তাঁবুতে বন্দী করে রাখা হয়। শায়েখ ইজ ইবনে আবদুস সালাম তাঁবুতে বসে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। একদিন কুরআন তেলাওয়াত করাকালে ইসমাঈল আইয়ূব খ্রিস্টান রাজাদের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। ইসমাঈল শায়েখের কুরআন তেলাওয়াত শুনে খ্রিস্টানদের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা কি এই বৃদ্ধের কুরআন তেলাওয়াত শুনতে পাচ্ছেন? তারা বলল, হ্যাঁ! তিনি বললেন, তিনি মুসলমানদের বিখ্যাত আলেম। মুসলমানদের দুর্গসমূহ আমার হাতে অর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানালে আমি তাকে গ্রেপ্তার করি। কাজীর পদ থেকে তাকে বরখাস্ত করি এবং বক্তৃতা প্রদানে নিষেধাজ্ঞা জারি করি। অতঃপর তাকে দেশান্তরিত করলে বাইতুল মাকদিসে এসে আশ্রয় নেন। এখন তাকে পুনরায় আপনাদের কল্যাণের জন্য গ্রেপ্তার করি।

সালেহ ইসমাঈল আইয়ূব খ্রিস্টান রাজাদের মনোতুষ্টির উদ্দেশ্যে এসব কথা বলছিলেন। কিন্তু মনোতুষ্টি অর্জন তো দূরের কথা, এতে তার মর্যাদা ধুলোয় মিশে যায়। তারা বলেন, তিনি যদি আমাদের পাদরি হতেন, আমরা তার পা ধুয়ে দিতাম এবং তার পা-ধোয়া পানি পান করতাম।

পরবর্তীতে মালিকুস সালেহ নাজমুদ্দীন আইয়ূব রহ. ক্ষমতাসীন হওয়া পর্যন্ত তিনি বাইতুল মাকদিসে বন্দী অবস্থায় থাকেন। তিনি এসে যখন খ্রিস্টানদের হাত থেকে যখন বাইতুল মাকদিস মুক্ত করেন তখন তাকে কারামুক্ত করে মিশর নিয়ে আসেন। তাকে উষ্ণ-সংবর্ধনা জানান এবং নিজের নৈকট্যশীল বানিয়ে নেন। তাকে মসজিদে ওমর ইবনে আসের খতিব নিযুক্ত করেন এবং তার কাজীর পদে পুনর্বহাল করেন।

শায়েখ ইজ ইবনে আবদুস সালাম রহ. সম্পর্কে একথা খুব প্রসিদ্ধ যে, বাতিলের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার। পুনরায় মিশরে অবস্থানকালে স্বয়ং নাজমুদ্দীন আইয়ূব রহ. এর সঙ্গে তার সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। কারণ, মিশরে থাকাকালে তিনি দেখলেন, সরকারি ছোট বড় সব পদ ও ক্ষমতা মামলুকদের দখলে। যাদের নাজমুদ্দীন আইয়ূব ক্রয় করেছিলেন। এমনকি ভাইস প্রেসিডেন্টও মামলুক। তারা তো গোলাম বা দাস। আর স্বাধীনদের ওপরে তো গোলামদের ওলায়াত/কর্তৃত্ব না-জায়েয। তাই তিনি স্পষ্ট ভাষায় স্বাধীনের ওপর গোলামের কর্তৃত্ব না-জায়েয হওয়া সম্পর্কে ফতোয়া প্রকাশ করেন। এতে মিশরে ক্রোধের দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত মামলুকগণ রাগে ফেটে ওঠে। তারা শায়েখ ইজ ইবনে আবদুস সালামের নিকট এসে ফতোয়া প্রত্যাহারের প্রস্তাব প্রদান করে। এতে কোনো কাজ না হলে তাকে ধমকি দেওয়া শুরু করে। কিন্তু তিনি তাদের কোনো প্রস্তাব বা ধমকির পরোয়া করেন না। অথচ তিনি দামেস্কে কঠিন শাস্তি ভোগ করে এসেছেন। কিন্তু তিনি তো সেই মহান ব্যক্তিত্ব, যিনি জীবনভর হক কথা বলেছেন। মামলুকরা দিগবিদিক খুঁজে না পেয়ে সুলতান নাজমুদ্দীন আইয়ূব রহ. এর কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ করেন। শায়েখের কথায় নাজমুদ্দীন আইয়ূব হতভম্ব হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, এ বিষয়ে কথা বলার কোনো সুযোগ তার নেই। শায়েখ ইজ ইবনে আবদুস সালাম দেখলেন, তার কথার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। তাই তিনি কাজীর পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন, তিনি মাটির পুতুল হয়ে থাকতে চান না। তিনি জানতেন, কথা সম্পর্কে যেমন আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন, অনুরূপ নীরবতা সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করবেন। তাই তিনি কাজীর পদ থেকে স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। সামাজিক অবস্থান, ধন-সম্পত্তি, নিরাপত্তা—এমনকি গোটা পৃথিবী বিসর্জন দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

শায়েখ ইজ ইবনে আবদুস সালাম গাধার পিঠে আরোহণ করলেন আর পরিবারকে আরেক গাধার পিঠে আরোহণ করালেন। যেহেতু মিশরে তার ফতোয়ার মূল্যায়ন হয় না, তাই আনন্দচিত্তে চিরতরে মিশর ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী কোনো অঞ্চলে একাকী বসবাসের সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু মিশরের সাধারণ জনগণ, যারা উলামায়ে কেরামকে যথার্থ মূল্যায়ন করেন, তারা এই বিষয়টি মেনে নিতে পারল না।

মিশরের হাজার হাজার আলেমে দ্বীন, ব্যবসায়ী ও সাধারণ নাগরিক—এমনকি নারী-শিশুরাও শায়েখের সমর্থনে তার পিছে পিছে বের হলো।

মালিকুস সালেহ নাজমুদ্দীন আইয়ূব রহ.-এর কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি দ্রুত রওনা হন এবং শায়েখের ক্রোধ প্রশমিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু শায়েখ ফতোয়া কার্যকর না হলে কোনো কিছুই শুনতে রাজি নন। তিনি তাকে বললেন, আপনি যদি এ সকল আমীরকে নিজ নিজ পদে বহাল রাখতে চান, তাহলে প্রথমে তাদের বিক্রি করতে হবে। অতঃপর ক্রেতা তাদের আযাদ করবেন। আর যেহেতু তাদের বাইতুল মাল [রাষ্ট্রীয় কোষাগার] থেকে ক্রয় করা হয়েছিল, তাই তাদের বিক্রয়মূল্য বাইতুল মাল [রাষ্ট্রীয় কোষাগার]-এ ফেরত দিতে হবে। সালেহ নাজমুদ্দীন আইয়ূব রহ. একথা মেনে নিয়ে শায়েখ ইবনে আবদুস সালাম রহ. কেই এই কাজটি সুচারুরূপে পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করলেন। যাতে পরবর্তীতে নতুন কোনো সমস্যা সৃষ্টি না হয়। শায়েখ ইজ ইবনে আবদুস সালাম রহ. মামলুক আমীরদের বিক্রি করার জন্য বিক্রয়মূল্য বাড়িয়ে দেন। অসংখ্য ক্রেতা উপস্থিত হন। একপর্যায়ে মূল্য বহুগুণে বৃদ্ধি পেলে নাজমুদ্দীন আইয়ূব রহ. ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে সেই মমলুক আমীরকে ক্রয় করে বিক্রয়মূল্য বাইতুল মালে [রাষ্ট্রীয় কোষাগারে] জমা দেন এবং মামলুক আমীরকে আযাদ করে দেন। এভাবেই বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত সকল মামলুক বিক্রি হয়ে যায়। সেদিন থেকেই শায়েখ ইজ ইবনে আবদুস সালাম রহ. বাইউল উমারা [আমীর বিক্রেতা] নামে পরিচিতি লাভ করেন।

উক্ত ঘটনা ও শায়েখ ইবনে আবদুস সালামের সামগ্রিক জীবনচরিত থেকে আমরা তৎকালীন মিশরে ইলম ও উলামায়ে কেরামের মূল্যায়ন এবং শরীয়তের প্রতিটি কথার প্রতি মানুষের সম্পর্কে কিয়ৎ ধারণালাভ করতে পারি। মিশরীদের আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে এসব কিছু বিরাট বিরাট ভূমিকা রাখে এবং তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য সহযোগী হয়।

দুই. জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ

আল্লাহ তা'আলা মিশরবাসীর জন্য দ্বিতীয় যে মূল্যবান বিষয়টি হেফাজত করেছিলেন, তা হলো 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' তথা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের মূল্য।

তৎকালীন মিশরীয় মুসলমানগণ—যে জাতি নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে চায়, তাদের জন্য—জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করত। অর্থনৈতিক মহাসংকট, অস্তিত্বে আঘাত ও শক্তিমত্তা হারিয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের কাছে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর মূল্য হারিয়ে যায়নি।

মিশরীয় মুসলমানদের এই অনুভূতি জাগ্রত থাকার বড় কারণ হলো সিরিয়া ও মিশরের ওপর একের পর এক ক্রুশেড আক্রমণ। এসব অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি বিরাজ করবে, তারা এটাকে অসম্ভব মনে করত। বাস্তবেও এটি অসম্ভব ছিল। কারণ, আল্লাহ তা'আলার আমোঘ রীতি হলো, কেয়ামত অবদি হক ও বাতিলের লড়াই চলতে থাকবে এবং কেয়ামত পর্যন্ত বাতিলের অস্তিত্ব থাকবে। তাই যতদিন সকল বাতিলপন্থী হকপথে ফিরে না আসবে বা হকপন্থীরা বাতেল পন্থী না হবে, ততদিন পর্যন্ত হক-বাতিলের যুদ্ধ বন্ধ হবে না। উল্লেখ্য, এমনটি কখনোই হবে না। তাই স্থায়ী শান্তির শ্লোগান একটি মিথ্যা ধোঁকা। এর কারণে জাতি ধোঁকাগ্রস্ত হয় এবং যুদ্ধের প্রস্তুতিগ্রহণ থেকে বিরত থাকে।

তৎকালীন মিশরের মুসলমানরা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ বাক্যের প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করত এবং আল্লাহর সঙ্গে তাদের ছিল গভীর সম্পর্ক। তা ছাড়া ক্রুশেড বাহিনী সর্বদা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকার কারণে মুসলিম জাতি আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে আঁকড়ে থাকত। আল্লাহর দরবারে বিনীত আহাজারি করত এবং নিয়তকে সর্বদা এখলাসপূর্ণ রাখত। এ কারণে কখনোই তাদের কাছে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর মূল্য হ্রাস পায়নি। জিহাদকে ছোট করে দেখার মতো তখন কেউ ছিল না। অথবা সন্ত্রাসী বা চরমপন্থী কিংবা মৌলবাদী বলে কেউ জিহাদের অপব্যাখ্যা দাঁড় করাত না। 'জিহাদ' শব্দটি গালমন্দ ছিল না। জিহাদ ছিল মহা মর্যাদাপূর্ণ সুউচ্চ লক্ষ্য।

তাই মিশরীয় বাহিনী সর্বদা জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাকত। সর্বদা প্রস্তুতিগ্রহণে সচেষ্ট থাকত। বর্তমান জিহাদবিমুখ সাম্রাজ্যগুলোর মতো, যারা জিহাদের কোনো সৎ ইচ্ছাই রাখে না, সৈন্যবাহিনীকে নগরায়নের কাজে ব্যবহার করত না। তারা সর্বদা সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ, অস্ত্রচালনা, দেশরক্ষা, মুসলমানদের জান মালের নিরাপত্তা প্রদান এবং যুদ্ধের বিভিন্ন কলাকৌশল অনুশীলনে ব্যস্ত থাকত।

মিশরের সৈন্যবাহিনী সর্বদা জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাকত। অনুরূপ মিশরের সাধারণ জনগণও সর্বদা প্রস্তুত থাকত।

সেই জাতির মর্যাদা কত সুমহান, যারা জিহাদী অনুপ্রেরণা ও প্রশিক্ষণ নিয়ে বেড়ে উঠেছে! আর সেই জাতির মর্যাদা কতটা নীচ, যারা এই মনোভাব নিয়ে বেড়ে উঠেছে যে, শান্তির কোনো বিকল্প নেই, যুদ্ধ কল্যাণ বয়ে আনে না, বিশুদ্ধ কূটনীতি হলো দ্বি-পাক্ষিক সংলাপ, আলোচনা ও পর্যালোচনা।

যে জাতি শেষোক্ত মনোভাব নিয়ে বেড়ে ওঠে তারা ভারহীন খড়কুটার মতো বেড়ে ওঠে। যারা হয় রঙহীন, মর্যাদাহীন ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যহীন। সাইফুদ্দীন কুতয রহ.-এর যুগের মিশরবাসী এমন মনোভাব নিয়ে বেড়ে উঠেনি।

যে সময় সাইফুদ্দীন কুতয রহ. মিশরের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন মিশরের অর্থনৈতিক দুর্দশা, কূটনৈতিক সংকট, তাতারীত্রাস এবং আমীর-উমারাদের প্রতি আস্থাহীনতা সত্ত্বেও মিশরবাসী ইলম ও ইলমের ধারক-বাহক উলামায়ে কেরামদের যথার্থ মূল্যায়ন করত এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহকে মুসলিমবিরোধী শক্তিকে প্রতিরোধের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি মনে করত।

সাইফুদ্দীন কুতয সিংহাসনে আরোহণের প্রথম দিন থেকেই তাতারীদের ধ্বংস করাকে প্রধান লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছিলেন; বরং এভাবে বললে অত্যুক্তি হবে না যে, এটি ছিল তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। কারণ, তিনি যখন ছোট্ট শিশু, তখন তাতারীরা তার শহরে আক্রমণ করে শহরবাসী সবাইকে হত্যা করেছিল। তিনি জীবনের প্রতিটি ঘাঁটিতে বিভিন্ন রকম ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করেছিলেন। জীবনের এক নির্মম মুহূর্তে দাসত্বের শিকলও পরেছিলেন এবং কাল-পরিক্রমায় মিশরে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। বাল্যকাল থেকেই তার জীবনের মহৎ লক্ষ্য ছিল তাতারীদের ধ্বংস করা।

আমরা দেখেছি, কীভাবে সাইফুদ্দীন কুতয রহ. সৈন্যবাহিনীকে শক্তিশালী করেন, মিশরের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ সুসজ্ঘবদ্ধ করেন এবং বহিরাগত মুসলিম শক্তিদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করেন। নিঃসন্দেহে এসব কাজের জন্য তার দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু মুসলমানদের বিরুদ্ধে তো সর্বদা যুদ্ধ চলতেই থাকে। তাই তিনি প্রস্তুতি গ্রহণের যথেষ্ট সময় পাচ্ছিলেন না। সুতরাং যারা পৃথিবীর বুকে বুক উঁচিয়ে বেঁচে থাকতে চায়, তাদের উচিত স্থায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

হালাকু খানের মুখোমুখি সাইফুদ্দীন কুতয রহ.

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. যখন উৎসাহভরে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এবং দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করছিলেন, তখন হালাকু খানের দূত এসে এই মর্মে বার্তা প্রেরণ করল যে, খুব শীঘ্রই আকস্মিক যুদ্ধ সংঘটিত হবে, যা কুতয রহ. কল্পনাও করেননি। প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য যেখানে কুতয রহ.-এর কয়েক মাস প্রয়োজন ছিল,

সেখানে রাতারাতি যুদ্ধ সংঘটিত হতে যাচ্ছে। মিশরের ওপর বর্বর তাতারী আক্রমণ ধেয়ে আসছে। সাইফুদ্দীন কুতয রহ. যুদ্ধ করবেন কি করবেন না? সৈন্যবাহিনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে কি হবে না? জাতি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে কি পড়বে না? যুদ্ধ অত্যাসন্ন। মুমিন ও ভূপৃষ্ঠে শ্রেষ্ঠ পরাশক্তির মাঝে সংঘটিত হতে যাচ্ছে। যদিও সেই পরাশক্তি হলো অত্যাচারী পরাশক্তি। জালেম অহংকারীরা কখনোই নিরপেক্ষতা, বন্ধুত্ব ও মিশ্রতাকে মেনে নেয় না। তারা কেবল চায় সবাই আজ্ঞাবহ হবে। আর আজ্ঞাবহ অনুসারীরা তো অপমানিত হয়ে থাকে!!

হালাকু খানের দূত একটি বিষাক্ত চিঠি নিয়ে আগমন করল। যাতে ছিল উপচে পড়া হুমকি ও সতর্কবাণী। সেই ব্যক্তি তা পাঠের ক্ষমতা রাখে যাকে আল্লাহ তা'আলা দৃঢ় মনোবল দান করেছেন।

وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا

"আমি যদি তোমাকে অবিচলিত না রাখতাম, তবে তুমি তাদের দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়ার উপক্রম হতো।"[৬৯]

আল্লাহ রব্বুল আলামীন নিজ অনুগ্রহে সাইফুদ্দীন কুতয রহ. কে দৃঢ় মনোবল দান করেছিলেন। অবিচলিত রেখেছিলেন। তিনি ধীরস্থিরভাবে দৃঢ়চিত্তে চিঠি পাঠ করেন। সত্যিকার মুমিনগণ এমনই হয়ে থাকেন। যখন কোনো জালেম তাদের ভয় দেখায়, তারা আল্লাহর ভয় হৃদয়পটে উপস্থিত করেন। ফলে তারা সকল জালেম ও অহংকারীদের তুচ্ছ মনে করতে থাকেন।

হালাকু খানের চারজন দূত এই চিঠিটি বহন করে এনেছিল। কুতয রহ. চিঠিটা পড়লেন। তাতে লেখা ছিল—

"আসমানের অধিপতি, যার অস্তিত্ব চিরসত্য, যিনি তার পৃথিবীর রাজত্ব আমাদের দান করেছেন এবং তাঁর সৃষ্টিজীবের ওপর আমাদের ক্ষমতাবান বানিয়েছেন, সেই সুমহান সত্তার নামে শুরু করছি।

যার সম্পর্কে মামলুক বংশোদ্ভূত সকল রাজাও জানেন, যিনি মিশর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ, এই অঞ্চলের আমীর-উমারা, সৈন্যবাহিনী, লেখক-শ্রমিক, গ্রাম্য-শহুরে, ছোট-বড় সবার রাজা।

---

[৬৯] সুরা বনী ইসরাঈল : ৭৪।

আমরা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বাহিনী। আমরা আল্লাহর ক্রোধ থেকে সৃষ্টি হয়েছি। আমরা প্রেরিত হয়েছি তাদের ওপর, আল্লাহর ক্রোধ যাদের প্রতি নিপতিত।

সব অঞ্চল তোমাদের কর্তৃত্বাধীন। আর আমাদের কাজ হলো সতর্ককরণ। পর্দা উন্মোচনের ও ভুল করার পূর্বে অন্যের থেকে উপদেশ গ্রহণ করো। আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ কর।

আমরা ক্রন্দনকারীর প্রতি রহম করি না। অনুনয় বিনয়কারীর প্রতি দয়াদ্র হই না।

আমরা বহু ভূখণ্ড জয় করেছি। ভূপৃষ্ঠকে ফ্যাসাদমুক্ত করেছি। পালাবার পথ খোলা। তবে আমরা তোমাদের ধরে আনবই। কোন ভূখণ্ড তোমাদের আশ্রয় দেবে? কোন শহর তোমাদের রক্ষা করবে? সব ভূখণ্ড, সব শহর তো আমাদের।

আমাদের তলোয়ার থেকে তোমাদের রেহাই নেই। আমাদের হাত থেকে তোমাদের রক্ষা নেই।

আমাদের ঘোড়া তোমাদের অতিক্রম করবে। আমাদের তলোয়ার তোমাদের আঘাত হানবে। আমাদের বর্শা তোমাদের বিদীর্ণ করবে। আমাদের তীর তোমাদের দেহ ভেদ করবে।

কঠোরতায় আমাদের অন্তর পাহাড়সম। সংখ্যায় আমরা বালুকণার মতো। দুর্গ আমাদের কোরো বাধা নয়। কোনো সৈন্য আমাদের পরাস্ত করতে পারে না। আমাদের বিপক্ষে তোমাদের বদদুআ কবুল হবে না।

কারণ, তোমরা হারাম ভক্ষণ করছ। সালামের উত্তর দিতে [শান্তির আহ্বানে] তোমরা অহংকার করছ, তোমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করছ এবং তোমাদের মাঝে অবাধ্যতা ব্যাপকতা লাভ করেছে।

সুতরাং তোমরা লাঞ্ছনা ও অপমানের সুসংবাদ গ্রহণ করো।

আজ তোমাদের কৃতকর্মের কারণে তোমাদের লাঞ্ছনার শাস্তি প্রদান করা হবে।

একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, আমরা কাফের, আর তোমরা পাপিষ্ঠ।

তোমাদের ওপর আমাদের সেই সত্তা চাপিয়ে দিয়েছেন যিনি সবকিছুর মালিক, যিনি সবকিছুর ফায়সালা করেন।

তোমরা সংখ্যায় অনেক বেশি হলেও আমাদের কাছে নগণ্য। তোমাদের সম্মানিতরা আমাদের কাছে অপমানিত। তোমাদের রাজা-বাদশাদের অপমান করা ব্যতীত আমাদের কোনো উপায় নেই।

সুতরাং কথা না বাড়িয়ে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠার আগেই দ্রুত জবাব দাও। অন্যথায় আমাদের বর্শার শনশন শব্দ শুনলে আমাদের পক্ষ থেকে মান-মর্যাদা, ইজ্জত-সম্মান, চুক্তি বা নিরাপত্তানামা কিছুই পাবে না। মহাবিপদের মুখোমুখি হবে। তোমাদের শহর জনমানবশূন্য হয়ে পড়বে। শহর মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে।

আমরা তোমাদের নিকট দূত পাঠিয়ে ইনসাফ করেছি। দূত প্রেরণের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এহসান করেছি।"

এই ছিল হালাকু খান কর্তৃক সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এর নিকট প্রেরিত আতঙ্ক সৃষ্টিকারী চিঠি। যাতে কূটনীতির কোনো ঘ্রাণ ছিল না। এতে ছিল স্পষ্ট যুদ্ধের ঘোষণা অথবা আত্মসমর্পণের দাবি। আর আত্মসমর্পণ তো নিঃসন্দেহে অপমানবরণ। কারণ, তাদের দাবি ছিল শর্তহীন। তথা তাতে অধিকার তলবের কোনো সুযোগ ছিল না।

সাইফুদ্দীন কুতর রহ. কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ একটি পরামর্শ সভার আয়োজন করেন। পরামর্শ সভায় উপস্থিত ছিলেন সেনাপতি, আমীর-উমারা, মন্ত্রিপরিষদ তথা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ। তাদের সঙ্গে হালাকু খানের ভয়াবহ প্রস্তাব নিয়ে পর্যালোচনা করেন। সভায় তিনি উল্লেখ করেন, আমাদের সামনে পথ দুটি : ১. যুদ্ধ ২. শর্তহীন আত্মসমর্পণ।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এর সামনে খুব স্পষ্ট ছিল। তবে তিনি একা সিদ্ধান্ত নিতে চাননি। তিনি কখনো আত্মসমর্পণের পথ বেছে নেবেন না। কারণ, তিনি খুব জানতেন, 'অধিকার এমনি এমনি আসে না। অধিকার ছিনিয়ে নিতে হয়।'

সীমালঙ্ঘনকারী সৈন্যবাহিনী কখনো প্রত্যবর্তনে সন্তুষ্ট হয় না; বরং তারা বাধ্য হয়ে প্রত্যাবর্তন করে।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট।

কিন্তু পরামর্শ সভায় যে সকল আমীর উপস্থিত হয়েছিলেন, তাদের বুঝ ও সমঝ এত উঁচু পর্যায়ের ছিল না। হ্যাঁ! তাদের কাছে দ্বীনি মর্যাদাবোধ ছিল। তারা ইসলামকে প্রাণ উজার করে ভালোবাসতেন। অশ্বচালনা ও যুদ্ধশাস্ত্রে তারা ছিল বিজ্ঞ। তবে এবারের পরীক্ষা ছিল খুব কঠিন।

বাস্তবে তাতার ও মিশরবাসীর মধ্যকার ব্যবধান ছিল বিস্তর। তাতার সাম্রাজ্য ছিল পূর্বে কোরিয়া থেকে পশ্চিমে বুলেন্দা পর্যন্ত বিস্তৃত। পক্ষান্তরে মিশর হলো ছোট্ট একটি রাষ্ট্র। [তা যতই বড় হোক না কেন] পাশাপাশি অস্ত্র, সৈন্য ইত্যাদি বিষয়েও বিস্তর ব্যবধান ছিল। তা ছাড়া তাতারীত্রাস সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। আর মুসলমানরা তাতারীদের হাতে নির্মম বলিতে পরিণত হয়েছিল। খাওয়ারেযম, আর্মেনিয়া, জুর্জিয়া, আব্বাসীয়, ইউরোপ ও সিরিয়ার মুসলমানরা তাতারী বাহিনীর কাছে শোচনীয় পরাজয়বরণ করেছিল।

সে সময় আম-খাছ [সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ] তথা সবার মাঝে একটি কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা বলত, 'কেউ যদি তোমাকে এই সংবাদ দেয় যে, তাতারীরা পরাজিত হয়েছে, তাকে সত্যবাদী মনে কোরো না!!"

উল্লেখিত পূর্ব-অভিজ্ঞতা ও বিশ্ব-প্রেক্ষাপটের কারণে আমীরগণ সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। তারা মনোবলহীনতায় ভুগছিল। কিন্তু সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এর মাঝে কোনোরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল না।

এমন পরিস্থিতিতে প্রজ্ঞাবান জননেতা কী করবেন?

কীভাবে মানুষের অন্তর থেকে তাতারীত্রাস দূর করবেন?

কীভাবে এমন বিষয়ে সেনাপ্রধানকে আশ্বাস দেবেন, যাকে তারা অসম্ভব মনে করেন?

আসুন! সাইফুদ্দীন কুতয রহ. থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি!

আমি একাই তাতারীদের মোকাবিলা করব

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. অন্যকে শিক্ষা প্রদানের দুটি মহৎ পন্থা অবলম্বন করলেন। মানুষ যে বিষয়টিকে অসম্ভব মনে করে, সে বিষয়ে তাদের আশ্বস্ত করার জন্য তা ছিল অধিক কার্যকর।

প্রথম পন্থা হলো, নেতৃত্বসুলভ শিক্ষা প্রদান।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. দৃপ্তকণ্ঠে বীরত্বের ভাষায় তাদের বলেন, আমি একাই তাতারীদের মোকাবেলা করব।

কুতয রহ. যিনি মিশরের সিংহাসনে আরোহণ করেছেন, তিনি নিজেই তাতারীদের মোকাবিলা করার জন্য বের হবেন!

কুতয, যিনি এখনো ক্ষমতার স্বাদ ভোগ করেননি, তিনি জিহাদের জন্য বের হবেন!

যুবক কুতয, যার দীর্ঘজীবন এখনো বাকি, তিনি আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার জন্য বের হবেন!!

তিনি কায়রোর নিরাপদ প্রাসাদে বসে থেকে তাতারীদের মোকাবেলা করার জন্য সেনাবাহিনী পাঠাবেন না; বরং মিশরবাসী যে কষ্ট সহ্য করবে, তিনিও সেই কষ্ট সহ্য করবেন। যে যন্ত্রণা তারা বরদাশত করবে, তিনিও সেই যন্ত্রণা বরদাশত করবেন। যদি তিনি সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে কায়রোতে রাজমহলে বসে থাকতেন, তাহলে কেউ তার নিন্দা গাইত না। কারণ, তিনি মুসলমানদের রাজা। মানুষের সকল পরিকল্পনা তারই ওপর নির্ভরশীল। যদি তিনি মারা যান মুসলমানদের ঐক্যের রশি ছিঁড়ে যাবে। কিন্তু সাইফুদ্দীন কুতয রহ. মানুষের ভীত অন্তরে সাহস জোগানো ও অস্থির হৃদয়ে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য এর চেয়ে উত্তম কোনো পথ খুঁজে পেলেন না। তার মাঝে যেমন জিহাদের প্রেরণা ছিল, অনুরূপ শাহাদাতের কামনা ও জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা ছিল তীব্রতর।

কোনো অবস্থাতেই তিনি সেই ক্ষণের পূর্বে ইন্তেকাল করবেন না, যেই মৃত্যুক্ষণ আল্লাহ তা'আলা তার জন্য লিখে রেখেছেন।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. বাস্তবজ্ঞানে তা বুঝেছিলেন, মুসলমানরা যা যুক্তিজ্ঞানে বুঝেছিলেন। তা হলো, কোনো আত্মা মৃত্যুবরণ করবে না, যতক্ষণ না তার রিযিক পূর্ণ হয় এবং মৃত্যুক্ষণ আসে। কিন্তু ক'জন মুসলমান এমন পাওয়া যাবে, যারা উক্ত বাক্যের মর্মার্থকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে?!

মানুষ সর্বদা রিযিক বৃদ্ধির জন্য যুদ্ধ করতে থাকে এবং বয়স বৃদ্ধির জন্য সর্বদা যুদ্ধ করতে থাকে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না, কাপুরুষতার কারণে কখনো রিযিক হ্রাস পায় না এবং হায়াত কমে না। অনুরূপ বীরত্ব ও বাহাদুরীর কারণে মানুষের নির্ধারিত রিযিক বৃদ্ধি পায় না এবং চিরস্থায়ী জীবন লাভ করে না।

অনুরূপ সাইফুদ্দীন কুতয রহ. একটি চমৎকার বাস্তবতা বুঝেছিলেন। তা হলো, "লাঞ্ছনা ও অপমানের সঙ্গে যুগ যুগ বেঁচে থাকার চেয়ে সসম্মানে এক মুহূর্ত বেঁচে থাকা শ্রেয় [বিড়ালের মতো হাজার বছর বাঁচার চেয়ে সিংহের মতো এক মুহূর্ত বেঁচে থাকা উত্তম]"।

অন্যান্য আমীর ও মন্ত্রীদের প্রতিক্রিয়া কী ছিল?!

নিঃসন্দেহে কুতয রহ. এর বীরত্ব দেখে আমীর ও মন্ত্রীদের অন্তরও উত্তেজিত হয়ে পড়ে।

মুমিনগণ, একেই বলে যোগ্য নেতৃত্ব!!

'হাজারজন একজনকে উপদেশ প্রদানের চেয়ে হাজারজনের কল্যাণে একজনের কাজ করে যাওয়া উত্তম।'

জননেতা বিপর্যয়-মুহূর্তে অনেক সময় সৈন্যবাহিনী, সেনাপতি ও জনগণকে উৎসাহ প্রদান করেন, বিপর্যয় প্রতিরোধের সাহস জোগান। কিন্তু তারা জানে বিপদের মুহূর্তে তারা নেতাকে কাছে পাবে না। বরং তিনি নিজেকে ও নিজের প্রিয়জনদের নিয়ে নিরাপদে থাকবেন। আর সৈন্যবাহিনী ও জনগণকে বিপদে ঠেলে দিবেন। এ ধরনের উপদেশ বস্তুত মানুষের মাঝে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না।

সে সকল জননেতা জাতির ব্যথায় ব্যথিত হন, জাতির দুঃখে দুঃখিত হন এবং ছোট-বড় সবকাজে জাতির সঙ্গে শরিক থাকেন, তাদের সর্বোত্তম আদর্শ হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

ইমাম বুখারী রহ. হযরত আনাস রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন—

كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وأجود الناس، وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول : "لن تراعوا، لن تراعوا "، وهو على فرس لأبي طلحة، عري ما عليه سرج، في عنقه السيف، فقال: لقد وجدته بحراً

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী, দানবীর, বাহাদুর। মদিনাবাসী এক রাতে বিকট আওয়াজ শুনতে পেয়ে লোকজন আওয়াজ পানে দৌড় দিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পূর্বেই সেই স্থানে পৌঁছে যান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সঙ্গে মুলাকাত করে বলেন, 'আতঙ্কিত হোয়ো না, আতঙ্কিত হোয়ো না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু তালহা রা. এর ঘোড়ায় চড়ে সেখানে গিয়েছিলেন। ঘোড়ার পিঠে জিন ছিল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর

হাতে একটি তলোয়ার ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম [ঘোড়ার দিকে ইশারা করে] বললেন, আমি তাকে [দ্রুতগামিতায়] সমুদ্রতুল্য পেয়েছি।"[৭০]

উল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যা হলো, মদীনায় থাকাকালীন একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিকট এক আওয়াজ শুনতে পেলেন, আওয়াজের উৎস উদ্‌ঘাটনের জন্য কাউকে বের হওয়ার নির্দেশ না দিয়ে নিজেই বের হলেন। অথচ তিনি হলেন মদীনার নেতা, শেষনবী। খুব দ্রুত বের হওয়ার দরকার ছিল বিধায় তিনি হযরত আবু তালহা রা. এর কাছে একটি ঘোড়া ধার নিলেন। ঘোড়াকে জিন পরানোরা জন্য সময় নষ্ট না করে তলোয়ার নিয়ে জিন ছাড়াই রওনা হলেন। আওয়াজের কারণ উদ্‌ঘাটনের লক্ষ্যে ছুটলেন। যখন তিনি নিশ্চিত হলেন, এটা মদীনার জন্য বিপজ্জনক কোনো কিছু নয়, তখন মদীনায় ফিরে এলেন। দেখলেন, লোকজনও সেই দিকে ছুটছে। তিনি তাদের অভয় দিয়ে বললেন, আতঙ্কিত হোয়ো না। আতঙ্কিত হওয়ার কিছু হয়নি। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধীরগতিতে প্রসিদ্ধ ঘোড়াটির প্রশংসামূলক বাক্য বললেন। তিনি বললেন, 'আমি তাকে সমুদ্রতুল্য পেয়েছি।' অর্থাৎ ঘোড়াটি দ্রুততায় সমুদ্রের মতো সুবিশাল। *ইবনে মাজাহ শরীফে* এসেছে হাদীসটির বর্ণনাকারী সাবেত রহ. বলেন, আবু তালহা রা.-এর ঘোড়াটি খুব ধীরগতিসম্পন্ন ছিল। এরপর থেকে সেই ঘোড়াটিকে অন্য কোনো ঘোড়া পেছনে ফেলতে পারত না।

হাদীসটিতে লক্ষণীয় হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ উম্মতের ব্যথায় ব্যথিত হতেন। নিজের জান দিয়ে হলেও তাদের রক্ষা করতে সচেষ্ট ছিলেন। অথচ বিশ্বের অধিকাংশ নেতৃবর্গ জাতিকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করেন। অথচ জাতির তরে নিজেদের স্বার্থ বিসর্জন দেন না।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন—

كنا إذا احمر البأس (اشتدت الحرب) ولقي القوم القوم ، اتقينا(احتمينا)
برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فما يكون منا أحد أدنى من القوم منه

---

[৭০] *বুখারী :* ২৮২০।

"যখন প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হতো, যোদ্ধারা মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হতো আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে আত্মরক্ষা করতাম। সেদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে অধিক নিকটবর্তী কেউ হতো না।"[৭১]

এরই নাম হলো যোগ্য নেতৃত্ব।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ.-এর ঐতিহাসিক হুঙ্কার 'আমি একাই তাতারীদের মোকাবেলা করব' শুনে সবার অন্তরে সাহস ফিরে আসে।

জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ ও সুসংঘটিত করা এটি ছিল কুতয রহ. কর্তৃক গৃহীত প্রথম পন্থা।

কে ইসলামের তরে লড়বে, যদি আমরা না লড়ি

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. কর্তৃক গৃহীত পরিস্থিতি অনুকূলে আনার দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, মানবসৃষ্টির লক্ষ্য ও বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জাতিকে অবগত করানো।

তিনি মানুষের জাগতিক লোভ-লালসাকে আখেরাতের মহা সফলতার দিকে ফিরিয়ে দেন। তিনি মানুষকে প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ও দ্বীনের সহযোগিতার উদ্দেশ্যে করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন।

যখন আমাদের সকলের অন্তরে ইসলামের চেতনা উজ্জীবিত থাকবে, তখন দ্বীনের পথের সকল কুরবানী সহজ মনে হবে।

উৎসাহ প্রদান ও সাহস জোগানোর এটি অন্যতম মাধ্যম যে, আপনি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বৃহদাকারে তুলে ধরবেন। তাহলে চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও মেহনত-পরিশ্রম সবকিছু ইবাদতে পরিণত হবে।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. মিশরবাসীকে দুনিয়ার উৎসাহ প্রদান করেননি, নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে অনুসরণ করারও উৎসাহ প্রদান করেননি। মিশর কিংবা মিশর ভিন্ন অন্য কোনো দেশের গোত্রের প্রতি উৎসাহ দেননি, বরং তিনি তাদের আল্লাহর রাহে শহীদ হওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন।

ওই দুই মুজাহিদের মাঝে বিস্তর ব্যবধান বিদ্যমান। যাদের একজন শাহাদাতলাভের তীব্র আশায় জিহাদ করে। আরেকজন জিহাদ করে তবে

---

[৭১] *মুসনাদে আহমদ :* ১৩৪২।

অন্তরে শাহাদাত লাভের আশা লালন করেনা! বাস্তবেই এদের মাঝে বিস্তর ব্যবধান বিদ্যমান।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. তাদের পরিষ্কার ভাষায় বলেন—

يا أمراء المسلمين، لكم زمان تأكلون من بيت المال، وأنتم للغزاة كارهون، وأنا متوجه، فمن اختار الجهاد يصحبني، ومن لم يختر ذلك يرجع إلى بيته، وإن الله مطلع عليه، وخطيئة حريم المسلمين في رقاب المتأخرين

"হে মুসলিম নেতৃবর্গ, আপনারা বাইতুল মালের সম্পদ ভক্ষণ করেন। অথচ যুদ্ধের প্রতি অনাগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আমি জিহাদে যাচ্ছি। সুতরাং যে ব্যক্তি জিহাদ কামনা করে, সে যেনো আমার সাথী হয়। অন্যথায় যেনো ঘরে গিয়ে বসে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে উঁকি মেরে দেখবেন। মুসলমানদের সম্মানহানীর গুনাহ জিহাদ থেকে বিরত ব্যক্তিদের ওপর অর্পিত হবে।"

অতি সূক্ষ্ম কথা! বড় চমৎকার বাণী!

সামনে ঈমানের পরীক্ষা।

আপনি যখন একথা জেনেও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন না যে, আল্লাহ আপনাকে পর্যবেক্ষণ করছেন, তাহলে এর আজাব অবশ্যই আপনার প্রতি নাজিল হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো মুনাফিককে তার সঙ্গে যুদ্ধে বের হতে বাধ্য করতেন না; বরং জিহাদের বিষয়টি তিনি প্রত্যেকের সাধ্যের ওপর ছেড়ে দিতেন। এমনকি যখন মুমিনরা জিহাদ থেকে বিরত থাকত, [যেমন তাবুকের যুদ্ধের কতিপয় সাহাবী অংশগ্রহণ করেননি] তখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বাধ্য করতেন না; বরং জিহাদে অংশগ্রহণ করেনি এমন কারো কথা তাকে বলা হলে তিনি বলতেন—

دعوه، فإن يكن فيه خير سيلحقه الله بكم، وإن يكنغير ذلك فقد أراحكم منه

"এ বিষয়ে আলোচনা কোরো না। কারণ, তার মাঝে কল্যাণ থাকলে আল্লাহ তাকে তোমাদের সঙ্গে মিলিত করবেন। আর তার মাঝে কল্যাণ না থাকলে তার থেকে তোমাদের পরিত্রাণ দেবেন।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই আদর্শের পূর্ণ ঝাণ্ডাবাহী ছিলেন সাইফুদ্দীন কুতয রহ.। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন, যে ব্যক্তি জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হতে চায় সে যেনো বের হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ঘরে বসে থাকতে চায়, তার একথা জানা দরকার যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সর্বক্ষণ দেখছেন এবং মুসলমান নর-নারীর ইজ্জতহানীর যাবতীয় গুনাহ তার ওপরই বর্তিত হবে।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এর বক্তব্যে যে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত লুকিয়ে রয়েছে, তা আমাদের কাছে অস্পষ্ট নয়। তা হলো, এ সকল আমীর ও মন্ত্রীরা বছরের পর বছর রাষ্ট্রীয় কোষাগারের সম্পদ [যা মূলত সাধারণ মুসলমানদের সম্পদ] ভক্ষণ করছেন। এভাবে বললেও বাড়াবাড়ি হবে না যে, অধিক পরিমাণে ভক্ষণ ও সঞ্চয় করছেন। এমনকি তাদের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে হালাল-হারাম নির্বিচারে সম্পদ পুঞ্জীভূত করা। মন্ত্রীরা একথা ভুলতে বসেছিলেন যে, তাদের কোনো দায়িত্ব আছে। যেন তারা তাদের নেতা নয়; বেতন-ভাতার বিপরীতে যেনো তাদের কোনো কাজ নেই। এ বিষয়ে আল্লাহর দরবারে তারা জিজ্ঞাসিত হবেন, এই অনুভূতি তারা হারিয়ে ফেলেছিলেন! সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এর জ্বালাময়ী বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল, তাদের বদ্ধ হৃদয়ের দ্বার খুলে যাওয়া এবং আমানত সংরক্ষণের চেতনা জাগ্রত হওয়া। কিন্তু সাইফুদ্দীন কুতয রহ. দেখতেন, তার এই বক্তব্য সবার হৃদয়ের গহীনে প্রবেশ করেনি। এতে সাইফুদ্দীন কুতয রহ.-এর হৃদয়-জ্বালা আরও তীব্রতা ধারণ করে। ফলে ক্রন্দনরত অবস্থায় আমীরদের সম্বোধন করে বলেন—

يا أمراء المسلمين، من للإسلام إن لم نكن نحن

"হে মুসলিম নেতৃবৃন্দ, কে ইসলামের তরে লড়বে, যদি আমরা না লড়ি?"

হৃদয়-জাগানিয়া বাক্য! শিহরণ-জাগানিয়া বক্তব্য!!

একটি বাক্যই জীবনের কারিকুলাম হয়ে যেতে পারে।

এই বাক্যটি যদি প্রত্যেক মুসলমানের হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত হয়, তবে মুসলিম জাতির কখনোই অধঃপতন ঘটবে না।

কখনো কখনো মুসলমানরা এই আশায় দিনাতিপাত করে যে, অন্যান্য মুসলমানরা তাদের সহযোগিতা করবে। অপেক্ষায় থাকে যে, অমুক অমুক ব্যক্তি ইসলামের পক্ষে লড়বে। কিন্তু নিজেদের গা নাড়া দেওয়ার চিন্তাও খুব কম করে। এমনকি অনেক সময় কার্যত অন্যদের সক্রিয় করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতে নেয়। কিন্তু তারা একটুও নাড়া-চাড়া দেয় না!

অনেক সময় মুসলমানরা পাশের বাড়ি কিংবা পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে সালাহ উদ্দীন, খালেদ ইবনে ওয়ালীদ, সাইফুদ্দীন কুতয কিংবা কা'কার মতো সুমহান ব্যক্তিদের আত্মপ্রকাশের কামনায় বসে থাকে। কিন্তু তারা নিজ ঘর থেকে বের হয়না।

আপনি কেন সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী হন না?

আপনি কেন ইউসুফ ইবনে তাশেফীন হন না?

আপনি কেন শহীদ নূরুদ্দীন মাহমুদ হন না?

কেন? কেন?

'কে ইসলামের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেবে, যদি আমরা না দিই?'

এই বাক্যটি আমীরদের অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করে। কান্নার রোল পড়ে যায়।

তাদের অন্তর বিগলিত হয়। আর বিগলিত অন্তরের মানুষ থেকে কল্যাণের আশা করা যায়।

কতিপয় আমীর দাঁড়িয়ে উত্তম কথা বলেন। অবশিষ্টরা স্পষ্ট ভাষায় জিহাদের বিষয়ে এবং যেকোনো মূল্যে তাতারীদের মোকাবেলা করার বিষয়ে তাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। এভাবেই সাইফুদ্দীন কুতয রহ. তার এই কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণে সফল হন। সে সময় এটি ছিল তার সর্বশ্রেষ্ঠ পদক্ষেপ।

এখন মিশর তাতারীদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট যুদ্ধের ঘোষণা দেয়!!

এটি সামগ্রিক বিবেচনায় মিশরের ইতিহাসের গুরুতর সিদ্ধান্ত। তা এমন এক সিদ্ধান্ত, যে সিদ্ধান্ত থেকে পিছপা হওয়ার সুযোগ কারও ছিল না। না সেনাপতির, না সেনাবাহিনীর, আর না মিশরবাসীর। সাইফুদ্দীন কুতয রহ. জানতেন, আমীরদের অন্তর তার বক্তব্যের, আল্লাহর যিকিরের ও ইসলামের নামের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে। কিন্তু তাদের অন্তরে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হওয়া কিংবা ভীতি-সঞ্চার হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। তাই তিনি এমন এক কাজ করতে চাইলেন, যাতে আমীরদের পিছপা হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায় এবং আত্মসমর্পণের দ্বার চিরতরে রুদ্ধ হয়। যুদ্ধই যেন হয় তাদের একমাত্র পরিত্রাণ!

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন

সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে পরামর্শ করে সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, হালাকু খান যেই চার দূতের মাধ্যমে সতর্কবার্তা পাঠিয়েছে, তাদের মাথা ধড় থেকে পৃথক করা হবে এবং তাদের মাথাগুলো কায়রোর প্রধান ফটকে ঝুলিয়ে রাখা হবে। যাতে মিশরবাসী এই কাণ্ড প্রত্যক্ষ করে। এতে তার উদ্দেশ্য ছিল, জাতিকে এই বিষয়ে আশ্বস্ত করা যে, তাদের নেতা তাতারীদের ভয় পান না। এতে তাদের মনোবল চাঙা হবে। পাশাপাশি এই কঠোর প্রত্যাখ্যান তাতারীদের প্রতি এই কথার স্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করবে যে, আজ তারা যেই জাতির ওপর আগ্রাসন চালাতে যাচ্ছে, তারা পূর্বে তাতারীদের আক্রমণের বিধ্বস্ত হওয়া জাতির মতো নয়। নিঃসন্দেহে এটি তাতারীদের ওপর বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করবে। সামান্য হলেও তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হবে, থমকে দাঁড়াবে। দূত হত্যার মাধ্যমে সাইফুদ্দীন কুতয রহ.-এর মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হবে খুব সহজে। কারণ, তখন যুদ্ধভিন্ন মিশরবাসীর সামনে অন্য কোনো পথ খোলা থাকবে না। দ্বিতীয়ত মুসলমানরা আত্মসমর্পণ করতে চাইলে তাতারীরা তা কখনো চাবে না।

এটি ছিল সাইফুদ্দীন কুতয রহ. ও আমীর-উমারাদের ইজতেহাদ [গবেষণা]। যাই হোক, তবে সাইফুদ্দীন কুতয রহ.-এর এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ভাবতে হয়।

ইসলামের দৃষ্টি ও সাইফুদ্দীন কুতয রহ. কর্তৃক দূত হত্যার কারণ বিশ্লেষণ

দূত হত্যার পেছনে সাইফুদ্দীন কুতয রহ.-এর কোনো শরয়ী দলিল রয়েছে কি না, আমার জানা নেই।

ইসলামে হত্যা নিষিদ্ধ। মুসলিম দূত, কাফের দূত, এমনকি মুরতাদ দূত হত্যা করাকেও ইসলাম সমর্থন করে না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন—

‘মুসাইলামার দুই দূত ইবনে নাওয়াহা ও ইবনে আছাল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি সাক্ষ্য দাও, আমি আল্লাহর রাসূল? তারা উত্তর দিল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুসাইলামা আল্লাহর রাসূল। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি

ঈমান এনেছি। যদি আমি দূত হত্যা করতাম, তাহলে অবশ্যই আজ তোমাদের হত্যা করে ফেলতাম।'

হযরত আবদুল্লাহ মাসউদ রা. এই হাদীস বর্ণনা শেষে বলেন, এরপর থেকে এই সুন্নত জারি হয় যে, দূত হত্যা করা যাবে না।

এই হাদীসটি ইমাম আহমদ ও হাকেম রহ. বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম আবু দাউদ ও নাসায়ী রহ. সংক্ষেপে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আহমদ ও আবু দাউদ রহ. নাঈম ইবনে মাসউদের সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহর শপথ! যদি দূত হত্যা নিষিদ্ধ না হতো, তবে আমি তোমাদের গর্দান উড়িয়ে দিতাম।'

ইমাম শাওকানী রহ. তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *নাইলুল আওতার* এ লেখেন, উক্ত দুটি হাদীস—১. ইবনে মাসউদ রা.-এর হাদীস, ২. নাঈম ইবনে মাসউদ রা.-এর হাদীস—দূত হত্যা হারাম হওয়ার প্রমাণ বহন করে। যদিও তারা ইমাম কিংবা সকল মুসলমানদের উপস্থিতিতে কুফরি কথা বলে।

তাই ইসলামের শরয়ী বিধান হলো, দূত হত্যা করা যাবে না। আমি জানি না, শরীয়তের কোন দলিলের ভিত্তিতে সাইফুদ্দীন কুতয রহ. তাতারীদূতদের হত্যা করেছেন? আমি এও জানি না যে, তৎকালীন উলামায়ে কেরাম কেন নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন? হয়তো বা তারা এ বিষয়ে বিরোধিতা করেছিলেন, তবে আমাদের পর্যন্ত তা বর্ণিত হয়নি। অথবা এও হতে পারে যে, যেহেতু তাতারীরা সকল নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন, বিধি-বিধান, অঙ্গীকার-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। অগণিত নারী-শিশু ও যুদ্ধের অনুপযুক্ত বৃদ্ধদের হত্যা করেছে। শুধু বাগদাদেই এক মিলিয়ন মুসলিম হত্যা করেছে। পূর্বাপর বহু শহরের হত্যাযজ্ঞ তো আছেই। ফলে হয়তো সেই দূতরা অভদ্র আচরণ ও অহংকার প্রদর্শনের পর তিনি ইজতেহাদ [দূত হত্যার বিধানে গবেষণা] করেছেন। তবে আমার বক্তব্য হলো, আমরা জগতের গান্দা রাজনীতি অবলম্বনে কাফেরদের আদর্শ গ্রহণে বাধ্য নই।

কাফেররা মুসলিম শিশুদের হত্যা করলে 'হত্যার বদলে হত্যা' এই অজুহাতে কাফের শিশুদের হত্যা করা মুসলমানদের জন্য জায়েয হবে না। কাফেররা মুসলিম নারীদের সম্ভ্রমহানী করলে, হত্যা করলে, মুসলমানদের পক্ষে কাফের নারীদের সম্ভ্রমহানী করা বা তাদের হত্যা করার কোনো সুযোগ নেই। সম্ভ্রমহানী এমনিই একটি ঘৃণিত কাজ। চাই সাধারণ নারী হোক বা যোদ্ধা নারী হোক।

কাফেররা বিশ্বাসঘাতকতা করলেই মুসলমানদের জন্য বিশ্বাস ঘাতকতা জায়েয হয়ে যায় না। একই নিয়মে মুসলমানরা দূত হত্যা করতে পারে না। অনুরূপ মুসলমানরা নিরাপত্তা গ্রহণকারী কাফের হত্যা করতে পারে না।

দ্বীন ইসলামকে দুনিয়ার গান্দা নিয়মনীতি থেকে নিষ্কলুষ রাখতে ইসলামের সুমহান আদর্শকে চির উন্নত রাখতে এবং ইসলামের আদর্শিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে কেয়ামত পর্যন্ত আগত মানবজাতিকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্যই এসব বিধান প্রণীত হয়েছে।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. ও তার নেতৃবর্গ দূত হত্যার যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তা আমাদের দৃষ্টিতে ইজতেহাদী খাতা [শরীয়তের বিধান উদ্‌ঘাটন প্রয়াসের ভুল] ছিল। নিষ্পাপ আম্বিয়া আ. ব্যতীত ভুল মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবে ভুল নির্ণয় করতে পারা গর্বের বিষয়।

অর্থনৈতিক মহাসংকট

ঐক্যগঠন, যুদ্ধের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দূত হত্যা শেষে সাইফুদ্দীন কুতয রহ. খুব দ্রুত সৈন্যবাহনীর প্রস্তুতি শুরু করেন। কারণ, যুদ্ধ অতি সন্নিকটে। কিন্তু সাইফুদ্দীন কুতয রহ. একটি মহা সংকটের মুখোমুখি হন, যা পূর্ববর্তী কোনো সংকটের চেয়ে ছোট নয়। একটু ভেবে দেখুন, সাইফুদ্দীন কুতয রহ. ২৪শে যিলকদ ৬৫৭ হিজরীতে মিশরের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেছেন। আর হালাকু খান তাতার সম্রাট মানকু খানের মৃত্যুর পর সিরিয়া অতিক্রমের পূর্বে চিঠি প্রেরণ করে। আলেপ্পো নগরী পতনের কিছুদিন পর ও দামেস্ক বিজয়ের পূর্বে হালাকু খান সিরিয়া অতিক্রম করে। আলেপ্পো নগরী সফর ৬৫৮ হিজরীতে পতন ঘটে। আর দামেস্ক রবিউল আউয়াল ৬৫৮ হিজরীতে পতন ঘটে। অর্থাৎ সাইফুদ্দীন কুতয রহ. মিশরের নেতৃত্ব গ্রহণের মাত্র তিন মাস পর এই ঘটনা সংঘটিত হয়!

মোটকথা, সাইফুদ্দীন কুতর রহ. যাবতীয় পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ মাত্র তিন মাসে গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে তিনি যেসব বিপদ ও সংকটের মুখোমুখি হয়েছিলেন, সেগুলো থেকে উত্তমরূপে উত্তরণের জন্য কয়েক বছর বা কয়েক যুগের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কুতয রহ. আল্লাহর শরণাপন্ন হন। একমাত্র তার নিকটই সাহায্য কামনা করেন। পূর্ণ সাহসিকতা ও উদ্যমের সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবেলা করেন। একের পর এক বাধা-বিপত্তি পাড়ি দিতে থাকেন। তার

লক্ষ্য ছিল সুস্পষ্ট : "পৈশাচিক বর্বর তাতারীশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার।"

কুতয রহ. যে নব সংকটের মুখোমুখি হন তা হলো "অর্থনৈতিক সংকট"।

মুসলিম বাহিনী গঠনে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি প্রস্তুতকরণ, পুল নির্মাণ, দুর্গ ও ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা, যুদ্ধে পর্যাপ্ত সেনা মোতায়েন, অবরোধকালে পর্যাপ্ত পানাহার সরবরাহ ইত্যাদি ছিল যুদ্ধের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। কিন্তু সে সময় মিশরে চরম অর্থনৈতিক সংকট চলছিল। কালক্ষেপণ করার মতো সুযোগ ছিল না। এদিকে তাতারী বাহিনী দুর্বার গতিতে ধাবমান। তারা তখন ফিলিস্তিনের গাজা নগরীতে অবস্থান করছিল।

কী করবেন সাইফুদ্দীন কুতয রহ.?

কুতয রহ. পুনরায় পরামর্শ সভার আয়োজন করেন। আমীর-উমারা ও সেনাপতিদের পাশাপাশি পরামর্শ সভায় আলেম-উলামাকেও আহ্বান জানান। তাদের প্রধান ছিলেন সুলতানুল উলামা শায়েখ ইজ ইবনে আবদুস সালাম রহ.। সবাই মিলে অর্থনৈতিক সংকট সমাধানের চিন্তা করতে শুরু করেন এবং এও ভাবতে শুরু করেন যে, কীভাবে বহির্বিশ্বের পর্যাপ্ত সামরিক সহযোগিতা লাভ করা যায়।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. সামরিক উন্নয়ন ও সহযোগিতার জন্য জনসাধারণের ওপর কর ধার্য করার প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু কর ধার্যের স্বপক্ষে শরীয়তের সমর্থন প্রয়োজন ছিল। কারণ, মুসলিম রাষ্ট্রে যাকাত ব্যতীত অন্য কোনো কর বা ট্যাক্স প্রদান করা মুসলমানদের দায়িত্বে আসে না। উপরন্তু জাকাত সেই ব্যক্তির ওপরই ফরজ, যে ছাহেবে নেসাব [তথা যাকাত ওয়াজিব হয় এই পরিমাণ সম্পদের মালিক]। পক্ষান্তরে যাকাতের বাইরে কর ধার্য করা হয় বিশেষ কারণবশত ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। তবে এর স্বপক্ষেও শরীয়তের বৈধতার দলিল জরুরি। অন্যথায় সেটি অবৈধ কর সাব্যস্ত হবে এবং এর ধার্যকারী কঠিন শাস্তির উপযুক্ত হবে।

ইমাম আহমদ ও আবু দাউদ রহ. হযরত উকবা ইবনে আমের রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—

لا يدخل الجنة صاحب مكس

"অন্যায়ভাবে 'কর' ধার্যকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[৭২]

মুসলিম শরীফে হযরত বুরাইদা রা.-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, গামেদিয়া নিজেকে গুনাহমুক্ত করার জন্য যিনার স্বীকারোক্তি প্রদান করলে তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হয় [উল্লেখ্য গামেদিয়া বিবাহিতা ছিলেন]। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার তাওবার একনিষ্ঠতা ও মর্যাদা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন—

فوالذی نفسی بیدہ لقد تابت توبةً لوتابها صاحب مکس لغفرله

"সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার জীবন। সে এমন তওবা করেছে, যদি অন্যায় কর ধার্যকারী এমন তওবা করত, তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হতো।"[৭৩]

উক্ত হাদীসে অন্যায়ভাবে কর নির্ধারণ ও অন্যায় খাতে কর ব্যয়ের প্রতি কঠোর নিন্দাজ্ঞাপন করা হয়েছে।

ইমাম নববী রহ. উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লেখেন—

'অন্যায় কর নির্ধারণ একটি নিকৃষ্টতম গুনাহের কাজ এবং তা এমন গুনাহের অন্তর্ভুক্ত, যা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। কারণ, এতে অন্যায়ভাবে জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ করা হয় এবং অন্যায় খাতে তা ব্যায় করা হয়। এটি স্পষ্ট জুলুম।'

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এই প্রস্তাব পেশ করে উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করছিলেন।

যদিও সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এর লক্ষ্য ছিল সুমহান। কারণ, এই কর 'মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ'দের প্রয়োজন ও যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করা হবে। তথাপি শায়েখ ইবনে আবদুস সালাম রহ. এই পরামর্শকে একটি ভয়াবহ পরামর্শ আখ্যা দেন এবং তিনি দুটি শর্ত সাপেক্ষে এ মতের সঙ্গে একমত হন। শর্ত দুটি ছিল অত্যন্ত কঠোর!!

---

[৭২] *মুসনাদে আহমদ : ১৭০০২; আবু দাউদ : ২৯৩৭।*

[৭৩] *মুসলিম : ১৬৯৫।*

দুঃসাহসিক ফতোয়া

শায়েখ ইজ ইবনে আবদুস সালাম রহ. বলেন, কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের উপর শত্রু আক্রমণ করলে গোটা মুসলিমবিশ্বের জন্য তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ফরজ হয়ে যায়। তখন প্রজাদের কাছ থেকে যাকাত ছাড়াও যুদ্ধের সহযোগিতার জন্য অর্থকড়ি নেওয়া জায়েয আছে। দুটি শর্তসাপেক্ষে—এক. রাষ্ট্রীয় কোষাগারে সম্পদ না থাকতে হবে। দ্বিতীয় শর্তটি অপেক্ষাকৃত কঠিন। শায়েখ ইবনে আবদুস সালাম রহ. বলেন, দ্বিতীয় শর্তটি হচ্ছে, রাষ্ট্রের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ [যেমন : আমীর-উমারা, মন্ত্রিপর্ষদ] তাদের ঘোড়া ও তলোয়ার ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় সম্পদ বিক্রি করে দেবে। এ ক্ষেত্রে তারা সাধারণ প্রজাতুল্য বিবেচিত হবে। তাদের সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকাকালে প্রজাদের সম্পদ নেওয়া যাবে না!!

দুঃসাহসিক ফতোয়া!!

শায়েখ ইজ ইবনে আবদুস সালাম রহ. বলেন, রাজা-প্রজা সকলে সম্পত্তিতে বরাবর না হলে কর ধার্য করা জায়েয হবে না। আমীর ও মন্ত্রীদের সম্পদ ব্যয় করে সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করতে হবে। তাদের সম্পদ শেষ হলে প্রজাদের উপর সে পরিমাণ কর ধার্য করা হবে, যা দিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। এর চেয়ে অধিক কর ধার্য করা জায়েয হবে না।

শায়েখ ইবনে আবদুস সালাম রহ. প্রদত্ত ফতোয়া দুঃসাহসিক ও আশ্চর্যজনক বটে, তবে কুতয রহ. কর্তৃক ফতোয়া মেনে নেওয়া ছিল আরও আশ্চর্যজনক!!

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. সহাস্যবদনে শায়েখ ইজ ইবনে আবদুস সালাম রহ. এর কথা মেনে নেন এবং সর্বপ্রথম নিজেকে দিয়ে শুরু করেন। নিজের সম্পত্তি বিক্রি করেন এবং অন্যান্য আমীরদের শায়েখের কথামতো আমল করার নির্দেশ দেন। সকলেই নিজ সম্পত্তি বিক্রি করে দেয় এবং শরীয়ত সম্মত পদ্ধতিতে সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। এতে মিশরবাসীর সামনে একটি আশ্চর্য তথ্য আবিষ্কৃত হয়। তা হলো, মিশর খুবই সমৃদ্ধিশীল রাষ্ট্র। তীব্র অর্থ সংকট সত্ত্বেও দেশে বিপুল অর্থ রয়েছে। মন্ত্রী এমপিদের পকেট রাষ্ট্রীয় টাকায় ভরা। কারও কারও সম্পদ অন্যান্য দেশের বাৎসরিক বাজেট সমপরিমাণ। কারও কারও সম্পদ রাষ্ট্রের পুজীভূত ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট। কারও কারও সম্পদ ফকির-মিসকীনদের প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট এবং কারও একার সম্পদের মাধ্যমে গোটা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অধঃপতন এড়ানো সম্ভব।

কিন্তু আফসোস! আমীর-উমারাদের অধিকাংশ সম্পদই অবৈধ পন্থায় অর্জিত। কেউ চুরি করেছে। কেউ ঘুষ নিয়েছে। কেউ জুলুম করেছে। কেউ অবৈধভাবে দখল করেছে। এভাবেই মিশর সাম্রাজ্যের সম্পদ অবৈধ আত্মসাৎ হয়েছে। ফলে মিশর উল্লেখযোগ্য দরিদ্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। অথচ মিশর তৎকালীন বিশ্বের উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর প্রথম সিঁড়ির রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা ছিল।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. দেশকে সুশৃঙ্খল ও সুসংঘটিত করতে শুরু করলেন শক্তি প্রয়োগে ও অন্তরের ভালোবাসায়।

রাজা-প্রজাদের মাঝে দীর্ঘদিন সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন থাকার পর সাইফুদ্দীন কুতয রহ. প্রজাদের সঙ্গে নতুনভাবে সম্পর্ক সৃষ্টি করেন। ফলশ্রুতিতে এক সুবিশাল মর্যাদাপূর্ণ সৈন্যবাহিনী গঠিত হয়। যাদের লক্ষ্য ছিল সুদূরপ্রসারী। অর্থ-সম্পদ ছিল হালাল-পূতপবিত্র। যাদের জন্য মানুষ হৃদয়ের গভীর থেকে দুআ করত। যাদের যুদ্ধের প্রস্তুতি ছিল পূর্ণাঙ্গ।

এমন বাহিনী কীভাবে আল্লাহর সাহায্য লাভে ধন্য হবে না?

ইসলামধর্মে সহযোগিতা লাভ করা খুব কঠিন কাজ নয়।

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ভাষায়—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

"তোমরা যদি আল্লাহ [আল্লাহর দ্বীন]কে সহযোগিতা করো, তবে তিনি তোমাদের সহযোগিতা করবেন এবং তোমাদের কদম অবিচল রাখবেন।"[৭৪]

আর আল্লাহর শরীয়ত না মানলে সহযোগিতা লাভ করা যায় না। সুতরাং যে মুসলিম বাহিনী শরীয়তের মূলনীতির বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের পক্ষে আল্লাহর সহযোগিতা লাভ করা আদৌ সম্ভব নয়। তাই সাহায্যের সূচনা মুসলমানদেরই করতে হবে [কারণ, কুরআনে কারীমে প্রথমত মুসলমানদের আল্লাহকে সহযোগিতা করার কথা বলা হয়েছে। তাহলে আল্লাহর সহযেগিতা অবতীর্ণ হবে।] এভাবেই মিশরের মুসলিম বাহিনী গঠিত হয় এবং যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

---

[৭৪] সুরা মুহাম্মদ : ০৭।

ফিলিস্তিনে চূড়ান্ত জিহাদ

যুদ্ধের নকশা আঁকার সময় ঘনিয়ে এসেছে। সময় ঘনিয়ে এসেছে অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়ার।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. বিজয় ছিনিয়ে আনতে যুদ্ধের উত্তম পন্থা আবিষ্কারের জন্য সামরিক বাহিনীর সঙ্গে মিটিং করেন।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. বক্তৃতা প্রদানের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে যান। বক্তব্যে তিনি সামরিক ছক সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। তার অভিমত শুনে সবাই যুদ্ধের জন্য দাঁড়িয়ে যান। আর পিছে ফিরে তাকায় না। তার অভিমত সামরিক বাহিনীর মাঝে বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করে!

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. কী চেয়েছিলেন?

তিনি তাতারী বাহিনীর মোকাবেলার উদ্দেশ্যে কালবিলম্ব না করে সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফিলিস্তিনের উদ্দেশে রওনা হওয়ার ইচ্ছা করেছিলেন।

তিনি সিদ্ধান্ত নেন তাতারীরা মিশরে আসবে, এই অপেক্ষা না করে নিজেই সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের মোকাবেলা করতে বের হয়ে পড়বেন।

কিন্তু অধিকাংশ আমীর আপত্তি জানান। তাদের ইচ্ছা ছিল, কুতয রহ. মিশরে থেকে তাদের মোকাবেলা করবেন। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, মিশর আমাদের সাম্রাজ্য, ফিলিস্তিন আরেক সাম্রাজ্য!! আমীরগণ স্থূলদৃষ্টি দিয়ে বিষয়টি বিবেচনা করেন। অর্থাৎ তারা ভাবেন, যদি তাতারীরা মিশরে প্রবেশ না করে তাহলে আমরা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে বেঁচে গেলাম। পক্ষান্তরে আমরা যদি তাদের কাছে যাই, তাহলে যুদ্ধ ও রক্তক্ষয় ব্যতীত কোনো ফায়েদা হবে না।

কিন্তু সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অধিক ব্যাপকতর।

কুতয রহ. তাদের সঙ্গে পর্যালোচনা শুরু করেন এবং তাদের সামনে যুদ্ধের পরিকল্পনা এবং দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতা তোলে ধরেন। কুতয রহ. তাদের সম্মুখে এমন কতিপয় সূক্ষ্ম বিষয়াদি তুলে ধরেন, যা দীর্ঘদিন ধরে অধিকাংশ মিশরবাসী জানত না—

১. মিশরের জাতীয় নিরাপত্তা শুরু হয় পূর্ব সীমান্ত থেকে। মিশরের ভেতরাংশ থেকে নয়। অপর দিকে মিশরবাসী শক্তিশালী বিরোধীশক্তি ফিলিস্তিনে থাকতে কীভাবে নিরাপদ থাকতে পারে। তাই যুক্তির দাবি ছিল, এই বিরোধীশক্তি যেকোনো দুর্বলতার সুযোগে আক্রমণ করে বসবে, পূর্ব সীমান্ত দিয়ে মিশর

আক্রমণ করবে এবং কয়েক দিনের মাঝে সিনা উপত্যকা দখল করে ফেলবে। তাই ফিলিস্তিনে অবস্থানরত শক্তিশালী শত্রুবাহিনীকে দুর্বল করা ছিল সময়ের দাবি। তাদের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ করে অথবা এমন লোকদের সহযোগিতা করে, যারা সেখানে তাদের সঙ্গে লড়াই করবে। এটি ছিল বিবেক ও যুক্তির দাবি।

২. রণকৌশলের দাবি ছিল, সাইফুদ্দীন কুতয রহ. শত্রুর মাটিতে যুদ্ধ করবেন। কারণ, এতে শত্রুপক্ষের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। ফলে কোনো কারণে মুসলিম বাহিনীর পরাজয় হলে নিরাপদে ফিরে আসার পথ খোলা থাকবে। পক্ষান্তরে মুসলমানরা যদি মিশরের অভ্যন্তরে পরাজিত হয়, তবে শত্রুবাহিনীর সামনে কায়রোর পথ উন্মুক্ত হবে।

৩. মুসলমানদের হাতে আকস্মিক আক্রমণের সুযোগ থাকলে তা অধিকতর কল্যাণকর হবে। তাই মুসলমানরদের উচিত যুদ্ধের ক্ষণ ও স্থান শত্রুপক্ষ নির্ধারণ করার চেয়ে তারা নির্ধারণ করবে। শত্রুদের ওপর আকস্মিক আক্রমণ করবে। কারণ, আকস্মিক আক্রমণে জয়লাভ করার অধিক সুযোগ থাকে। তখন শত্রুরা পর্যাপ্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে না। পাশাপাশি এতে শত্রুরা মনোবল হারিয়ে ফেলে।

৪. [এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট] ফিলিস্তিন সিরিয়া লেবানন ইরাক আফগানিস্তান আজারবাইজান ও শিশান অঞ্চলের মুসলমানদের ওপর মিশরের মুসলমানদের অনেক অবদান রয়েছে। তাই এসব অঞ্চলের মুসলমানদের নির্মমভাবে হত্যা করা হবে, তাদের সম্ভ্রমহানী হবে, ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হবে, অথচ মিশরের মুসলমানদের গায়ে আঘাত লাগবে না, এটা হতে পারে না। ফিলিস্তিন ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের মুসলমানদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসা মিশরের মুসলমানদের জন্য নফল বা মুস্তাহাব নয়; বরং তা ফরজ। শুধু ফরজই নয়, বরং ফরজে আইন। শত্রুরা ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে অন্ধকার রাজ্যে পরিণত করেছে। কাজেই ফিলিস্তিনবাসীর জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি তারা যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়, তাহলে পার্শ্ববর্তী মুসলিম রাষ্ট্রগুলো তথা মিশর, সিরিয়া, জর্দান, লেবানন ইত্যাদির ওপর এই দায়িত্ব অর্পিত হবে। মিশর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহও যদি এই দায়িত্ব পালনে পিছপা হয় তাহলে অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী দেশসমূহের ওপর এই দায়িত্ব আবর্তিত হয়। এভাবে একপর্যায় ভূপৃষ্ঠের প্রত্যেক মুসলমানের ওপর যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়ায়।

চার নম্বর সূক্ষ্ম বিষয়টি বড়ই ভয়াবহ!

কোনো ভূখণ্ডের মুসলমানদের ইজ্জতহানী হলে অন্যান্য দেশে মুসলমানদের নীরবতা অমার্জনীয় অপরাধ ও শরীয়তবিরুদ্ধ। এ কারণেই সাইফুদ্দীন কুতয রহ. ফিলিস্তিন সিরিয়া ও অন্যান্য মুসলমানদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন।

৫. তাতারীদের দিক থেকে বিবেচনা করলেও এতে মুসলমানদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কারণ, তাতারীরা ইসলাম কবুল না করলে কিংবা কর প্রদানে অস্বীকৃতি জানালে মুসলমানদের জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়বে। আর মুসলিম ভূখণ্ডে এমন বর্বর বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া সত্যিই বড় বিপদ। অন্যদিকে এই ফেতনাকে নির্মূল করা মুসলমানদের জন্য আবশ্যকীয়। কারণ, পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ইসলামের সম্প্রসারণ ঘটানো, ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটানো এবং সব মানুষের হাত ধরে আল্লাহর পথে নিয়ে আসা মুসলমানদের দায়িত্ব।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে বলেন—

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

"[হে মুসলিমগণ,] তোমরা সেই শ্রেষ্ঠতম দল, মানুষের কল্যাণের জন্য যাদের অস্তিত্বদান করা হয়েছে। তোমরা পুণ্যের আদেশ করে থাকো ও অন্যায় কাজে বাধা দিয়ে থাকো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখো।"[৭৫]

বুখারী শরীফে এসেছে হযরত আবু হুরায়রা রা. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন—

خير الناسِ لِلناسِ تأْتونَ بِهِم فِي السلَاسِلِ فِي أَعناقِهِم حتى يدخلُوا فِي الْإِسلَامِ

"মানুষের জন্য সর্বোত্তম মানুষ তারা, যাদের বেড়ি পরিয়ে তোমাদের কাছে নিয়ে আসা হয় [বন্দী করে]। অতঃপর তারা ইসলাম গ্রহণ করে।"[৭৬]

---

[৭৫] সূরা আল ইমরান : ১১০।

[৭৬] *বুখারী :* ৪৫৫৭।

হাদীসের মতলব হলো ইসলামের ব্যাপক বিজয়সাধন হওয়া। প্রথমে মানুষ আক্রমণকারী মুসলমানদের ঘৃণা করবে। অতঃপর যখন ইসলামের হাকীকত জানতে পারবে, তখন তারা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করবে এবং এর মাধ্যমে তারা চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে এবং চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে যারা স্বঅবস্থায় বহাল থাকবে, মূর্তি, বাঁশ, গরু, আগুন বা মানুষের পূজা করতে থাকবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ তো দূরের কথা, জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ এ বিষয়ে কাউকে ক্ষমা করেন না যে, তার সঙ্গে কাউকে শরীক করা হোক। এর চেয়ে নিচের যেকোনো বিষয়ে যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।"[৭৭]

উল্লেখিত পাঁচটি কারণে সাইফুদ্দীন কুতয রহ. মিশরের পরিবর্তে ফিলিস্তিনে যুদ্ধক্ষেত্র স্থানান্তরের ইচ্ছা পোষণ করেন।

অন্য দিকে সাইফুদ্দীন কুতয রহ. একথা জানতেন যে, মিশরে তাতারী বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করার মাঝে কিছু সুবিধা রয়েছে। যেমন তাতারী বাহিনী ফিলিস্তিন থেকে মিশরের দিকে স্থানান্তরিত হলে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে যুদ্ধের সরঞ্জামাদি বহন ও অপরিচিত স্থানে গমন ইত্যাদি ঝুঁকি তাদের নিতে হবে। তা ছাড়া সিনা পর্বতের বিস্তীর্ণ মরুভূমি পাড়ি দেওয়া তাদের জন্য বড়ই কষ্টকর। কারণ, সিনা উপত্যকার পথ ঘাট যাদের কাছে অজানা, তা তাদের জন্য রীতিমতো ধ্বংসাত্মক।

মিশরে অবস্থান করা ও মিশর ছেড়ে ফিলিস্তিন গমন করা উভয় অবস্থারই যাবতীয় সুবিধা-অসুবিধার কথা সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এর খুব ভালো জানা ছিল। তবে তিনি জানতেন, তাতারী বাহিনী এর চেয়ে বহু বছর সংকটাকীর্ণ পথ পাড়ি দিতে সিদ্ধহস্ত। তা ছাড়া মুসলমান ঘরের বহু সম্পদ-লোভী, ক্ষমতা-লিপ্সু ও নিরাপত্তাকামী সন্তান রয়েছে, যারা তাতারীদের পক্ষাবলম্বন করবে এবং মিশরের সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ-ঘাটের দিশা তাদের দেবে। তাই সিনা উপত্যকা

---

[৭৭] সূরা নিসা : ৪৮।

পাড়ি দেওয়া তাতারীদের জন্য খুবই সহজ কাজ। পাশাপাশি সাইফুদ্দীন কুতয রহ. নিজ বাহিনীর প্রতি পূর্ণ আস্থাভাজন। তাদের রণদক্ষতা ও পর্যাপ্ত দক্ষ প্রশিক্ষণের প্রতি তিনি বিশ্বাসী। তিনি জানতেন, বিশ্বাস করতেন, সিনা উপত্যকা পাড়ি দিয়ে ফিলিস্তিন গমন করা তার বাহিনীর জন্য সম্ভবপর বিষয়; বরং খুব সহজ বললে অত্যুক্তি হবে না।

উক্ত সকল বিষয় বিবেচনা শেষে ফিলিস্তিন গমনের বিষয়টি চূড়ান্ত বিবেচিত হয় এবং সামরিক সভায় উপস্থিত উর্ধ্বতন সকল কর্মকর্তার সঙ্গে একমত পোষণ করেন। এরপর সাইফুদ্দীন কুতয রহ. সৈন্যবাহিনী প্রস্তুতকরণ, সিনা উপত্যকা পাড়ি দেওয়ার প্রস্তুতি ও যুদ্ধের চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করেন।

ঈমান সবচেয়ে বড় শক্তি

স্বঘোষিত যুদ্ধের ক্ষণ অত্যাসন্ন। শুধু নেতা কিংবা সেনাবাহিনীর জন্য নয়; বরং গোটা জাতির জন্য তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জাতির উচিত এই গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

জাতির উচিত খেল-তামাশার জীবন ছেড়ে মেহনত-মুজাহাদা ও সংগ্রামী জীবনযাপন করা। উচিত অন্তরে জিহাদের তীব্র আকাঙ্ক্ষা লালন করা। তবেই তাদের সম্মুখে জীবনের মূল লক্ষ্য স্পষ্ট প্রতিভাত হবে।

এমন কতিপয় মানুষের স্বঘোষিত যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত, যারা আল্লাহর জন্য হবে একনিষ্ঠ। কখনো কখনো কতিপয় মুনাফিক মুখে জিহাদের বুলি উড়ায়। আর অন্তরে মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ লালন করে। সাময়িক রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা এই কাজ করে। স্বার্থ উদ্ধার হলে তারা কেটে পড়ে। তখন তাদের মুখে জিহাদের বাণী আর শোনা যায় না।

এসব মুনাফিক চাটুদার বক্তা ও কলমসৈনিক জিহাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজের উপযুক্ত নয়। তাই উলামায়ে উম্মত ও ফুকাহায়ে কেরামের উচিত, তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রকাশ্য ডাক দেওয়া।

শায়েখ ইজ ইবনে আবদুস সালাম ও তার সাথী-সঙ্গী উলামায়ে কেরাম মসজিদের মিম্বরে আরোহণ করে জিহাদের জ্বালাময়ী বক্তব্যে মানুষের অনুভূতি জাগিয়ে তোলেন। তারা মানুষকে জান্নাতের স্বপ্ন দেখান। দুনিয়াবিমুখ করে তোলেন। তাদের মাঝে শাহাদাতের সুধাপানের তীব্র আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করেন।

তাদের বিখ্যাত মুসলিম মুজাহিদদের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তাদের খালেদ, কা'কা, ওয়াযির ও নুমানের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তাদের তারেক বিন যিয়াদ, মূসা ইবনে নুসাইর, ইউসুফ ইবনে নাশেফীন, ইমাদ উদ্দীন জঙ্গী, নূরুদ্দনি মাহমুদ ও সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী রহ.-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

তাদের বদর, খন্দক, ফাতহে মক্কা, ইয়ারমুক, কাদেসিয়া ও নাহাওয়ান্দ যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তাদের হিত্তিনের যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, যা মাত্র পচাত্তর বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল এবং তাদের মানসুরা ও ফারেসকুর যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। যেই যুদ্ধ দুটি মাত্র দশ বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল।

মুসলিম জাতির হৃদয়াত্মা জেগে ওঠে। হৃদয় কোণে লুকিয়ে থাকা সুপ্তবীরত্ব তীব্রাকার ধারণ করে।

হে সত্যিকারের মুমিনগণ, আজ মিশরবাসীর জেগে উঠা খুব জরুরি ছিল। গাফলতির চাদর সরিয়ে কোমর সোজা করে দাঁড়াবার খুব দরকার ছিল। পরবর্তী প্রজন্ম ও যুবকশ্রেণিকে জান্নাত, জিহাদ ও শাহাদাত ফি সাবিলিল্লাহর প্রেরণায় উজ্জীবিত করা আবশ্যকীয় ছিল।

সকল পিতা-মাতার দায়িত্ব ছিল সন্তাদের জিহাদী চেতনায় উদ্দীপ্ত করা এবং দ্বীন-ধর্ম ও ঈমান আমল বিধ্বংসী কার্যকলাপ থেকে তাদের দূরে রাখা।

পর্দার আড়ালের নারীদের জিহাদের মর্যাদা ও ফজিলত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা খুব দরকার। তবে তারা স্বামীদের জিহাদে বের হতে উদ্বুদ্ধ করতে ও সহযোগিতা করতে পারবে এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে সন্তানদের যথাযথ লালন-পালন করতে পারবে। তারা যেনো সর্বদা তাদের মৃত্যু তথা শাহাদাতের সংবাদকে সংবর্ধনা জানায় ধৈর্যের সাথে। প্রতিদান লাভের আশায়; বরং আনন্দচিত্তে। সত্যিই শহীদরা জান্নাতের সুউচ্চ মাকামে অবস্থান করবে।

জিহাদের জন্য মিশরবাসীর প্রস্তুতিগ্রহণ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাদামাটা কিংবা হাস্যকর বস্তু ছিল না। এর জন্য প্রয়োজন ছিল অক্লান্ত পরিশ্রম, দীর্ঘ পরিকল্পনা, নির্ভেজাল একনিষ্ঠতা ও দীর্ঘ সময়ের। কারণ, এসব বস্তু ব্যতীত জাতি কখনো জিহাদের জীবন, যুদ্ধের জীবন ও অবরুদ্ধ জীবনে ধৈর্যধারণ করতে সক্ষম হবে না।

বন্ধুরা, বিষয়টি অতি গুরুত্বের দাবিদার

তাদের হাতে আনন্দ-বিনোদন, খেল-তামাশা বা ক্রীড়া-কৌতুকের সময় ছিল না।

এর মানে এই নয় যে, শরীয়ত-সম্মত আনন্দ-বিনোদন, খেল-তামাশা ও ক্রিড়া কৌতুককে আমি হারাম বলছি। আমার উদ্দেশ্য হলো, মুজাহিদদের জীবনযাপন অন্যদের জীবনের মতো নয়। মুজাহিদদের জীবন কঠোর পরিশ্রমী। হ্যাঁ, তাতে সামান্য বিনোদন থাকে। তাদের জীবন আনন্দ-বিনোদনে ভরপুর সেই জীবন নয়, যাতে সামান্য পরিমাণ কষ্ট থাকে। যেকোনো জাতির মৌলিক অবকাঠামো ও চিন্তাশক্তির উন্নতি সাধনে এমন তরবিয়ত ও প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। এর জন্য প্রয়োজন সুদক্ষ প্রশিক্ষক ও সুযোগ্য অভিভাবক এবং এর বাস্তবায়নে উলামায়ে উম্মতের ভূমিকা শিরোধার্য।

এই দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উলামায়ে কেরাম এগিয়ে এসেছিলেন। তারা একথা উপলব্ধি করেছেন যে, কেবল বিভিন্ন সভা-সেমিনারে অংশগ্রহণ, রাজা-বাদশাদের মনোরঞ্জন ও মানবজীবনের মৌলিক চাহিদা [শিক্ষা চিকিৎসা খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান] পূরণই তাদের লক্ষ্য নয়; বরং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো মানবজাতিকে শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে আল্লাহর খাঁটি বান্দায় পরিণত করা।

আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উলামায়ে কেরাম সালাহ উদ্দিন আইয়ূবী রহ. মিশরে সুন্নি মাযহাব প্রতিষ্ঠা করার পর থেকে এই ভূমিকা পালন করে আসছেন। এই ভূমিকা তারা ক্রুশেড আক্রমণ, তাতারী আগ্রাসন এবং পরবর্তী খ্রিস্টানদের সঙ্গে সংঘটিত যুদ্ধ, মিশরে ফ্রান্স আক্রমণ, ব্রিটিশদের আক্রমণ এবং ইহুদী আক্রমণের সময় পালন করে এসেছেন।

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন যেনো উলামায়ে আযহারের এই পদক্ষেপকে উম্মতের প্রতিটি সংকট ও বিপদ-মুহূর্তে বলবৎ রাখেন। আমীন।

মিশরবাসী যুদ্ধের জন্য পূর্ণ প্রস্তুত।

দীর্ঘ পাঁচ মাসব্যাপী রবিউল আউয়াল ৬৫৮ হিজরী থেকে রজব ৬৫৮ হিজরী পর্যন্ত সৈন্যবাহিনীর প্রস্তুতি ও মুজাহিদদের অনুশীলন সম্পন্ন হয়।

আক্কা [Acre/ একর] প্রতিবন্ধকতা

এই সময়ের মধ্যে [যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পন্নকালীন] বহুল প্রতিক্ষিত তাতারীযুদ্ধের পথকে সুগম করতে সাইফুদ্দীন কুতয রহ. একটি চমৎকার কূটনৈতিক প্রচেষ্টার আশ্রয় নেন।

সেখানে ফিলিস্তিন লেবানন ও সিরিয়ার বেশ কিছু অংশ রয়েছে; বিশেষত ভূমধ্যসাগরের কিনারা। যেগুলো ক্রুশেড সাম্রাজ্যের দখলে ছিল। তখন আক্কা হাইফা সীদোন বাইরূত লাযেকিয়া আন্তাকিয়াসহ অনেক অঞ্চলে ক্রুশেড আধিপত্য বিস্তৃত ছিল। এসব অঞ্চলের মধ্যে ফিলিস্তিনের আক্কা নগরী সর্বাধিক শক্তিশালী ছিল। এই নগরীটি সাইফুদ্দীন কুতয রহ. যে পথে ফিলিস্তিন আগমন করবেন, সে পথেই অবস্থিত। কুতয রহ. আক্কা নগরীর খ্রিস্টানদের সঙ্গে কী করবেন?

আসুন কুতয রহ. এর সঙ্গে আপনিও ভাবুন—

১. তাতারীরা যেমন মুসলিম উম্মাহর শত্রু, অনুরূপ খ্রিস্টানরাও মুসলিম উম্মাহর শত্রু। এমনকি খ্রিস্টানরা ইসলামের জন্য তাতারীদের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর। [এ বিষয়ে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।] কারণ, তাতারীদের আক্রমণ হলো বর্বরোচিত। লক্ষ্য-উদ্দেশ্যহীন নীতিমালাহীন। 'জ্বালাও পোড়াও ধ্বংস করো' এই তাদের লক্ষ্য। পক্ষান্তরে খ্রিস্টানদের সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ হলো আকীদা-বিশ্বাসের যুদ্ধ। তারা অন্তরে মুসলমানদের প্রতি কঠিন ঘৃণা লালন করে। ইসলামকে নির্মূল করাই থাকে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। আর তাতারীরা তো যেকোনো মানুষ ও যেকোনো সভ্যতার বিরুদ্ধে মোকাবেলা করে। আর খ্রিস্টানদের হীন লক্ষ্য হলো, মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ওপর আধিপত্য বিস্তার করা এবং মুসলিম জনপদ, চাই তা ফিলিস্তিন বা সিরিয়া কিংবা লেবানন হোক, ঘাঁট পেতে বসা। এই হীন উদ্দেশ্যসাধনে প্রয়োজনে তারা মুসলিম বাহিনীকে ধ্বংস করতে পারে, প্রয়োজনে গোটা মুসলিম জাতিকেই বিলুপ্ত করতে পারে। তাতারীরা জনপদ ধ্বংস করে চলে যায়। সে অঞ্চলে আর অবস্থান করে না। পক্ষান্তরে খ্রিস্টানরা অধ্যুষিত অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। মোটকথা, খ্রিস্টানদের বিরোধিতা হলো আকীদাগত বিরোধিতা। তারা যুদ্ধ করে দেশ/জনপদ ধ্বংসের জন্য নয়; বরং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার উদ্দেশ্যে। যদিও তাতারীদের আক্রমণ তাদের চেয়ে অধিক ধ্বংসাত্মক। তবে এই উভয় পাষণ্ড পশুজাতিই নির্মম ও তিক্ত। সাইফুদ্দীন কুতয রহ. খুব

ভালোভাবে জানতেন, খ্রিস্টানরা যেমন তার শত্রু, তাতারীরা তার শত্রু। সুতরাং এ বিষয়ে খুব ভেবে-চিন্তে পা বাড়াতে হবে।

২. খ্রিস্টান ও তাতারীদের পরস্পর সহযোগিতার ইতিহাস বহু পুরোনো ও বহুল পরিচিত। খ্রিস্টানরা তো সেই জাতি, যারা চেঙ্গিজ খানের যুগে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুসলিম ভূখণ্ডে তাতারীদের উসকে দিয়েছিল। তারা তো সেই জাতি, যারা বাগদাদ ও সিরিয়ার অন্যান্য শহর পতনে হালাকু খানকে সহযোগিতা করেছিল। আর্মেনিয়া, জুজিয়া ও আন্তাকিয়ার সঙ্গে তাতারীদের জোট বাঁধার ইতিহাস তো খুব দূরের কথা নয়। তাই আক্কা নগরীতেও খ্রিস্টান ও তাতারীরা জোট বাঁধলে অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না।

৩. তাতার ও খ্রিস্টানদের জোট বাঁধার প্রবল আশঙ্কা থাকলেও সাইফুদ্দীন কুতয রহ. জানতেন, আক্কা নগরীর খ্রিস্টানরা তাতারীদের প্রচণ্ড ঘৃণা করে। যেমন তারা মুসলমানদের ঘৃণা করে। তারা তাদের কেবল ঘৃণাই করে না; বরং তাদের খুব ভয় পায়। কারণ, তাতারীরা কখনো ওয়াদা রক্ষা করে না। তাদের নির্মম হত্যাযজ্ঞের কথা তো জগদ্বিখ্যাত। পূর্ব ইউরোপ ও রাশিয়ায় তাদের ধ্বংসযজ্ঞের কথা পৃথিবীবাসী কখনোই ভুলবে না। তাদের হাতে খ্রিস্টানদের নিহতের সংখ্যা অগণিত। সীদোন ও বাইরূত তো কয়েক মাস পূর্বেই তাদের হাতে বিধ্বস্ত হয়েছে। এসব কিছুর পাশাপাশি হালাকু খানের প্রতি খ্রিস্টানদের চরম বিদ্বেষ তো আছেই। কারণ, হালাকু খান ইটালিয়ান ক্যাথলিক এন্টিয়ক গির্জায় গ্রিক অর্থডক্স বিশবকে [গির্জাপ্রধান] নিয়োগ করে। এমন ঘটনা ইতিপূর্বে কখনো ঘটে নি। অর্থডক্স ও ক্যাথলিকদের মধ্যকার বিরোধ সকলেরই জানা। আর আক্কা নগরীর খ্রিস্টানরা ছিল কট্টর ক্যাথলিক। তারা আক্কা নগরীতে এমন ঘটনা ঘটা তো দূরের কথা, আন্তাকিয়ায় ঘটার কথাও কল্পনা করত না। এসব কারণে আক্কা নগরীর খ্রিস্টানরা তাতারীদের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত থাকত এবং খুব সতর্কতার সাথে তাদের সঙ্গে চলাফেরা করত।

৪. তদানীন্তন সময়ে [৬৫৮ হিজরীতে] খ্রিস্টানরা খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ৬৪৮ হিজরীতে মানুসরার পরাজয়, ফ্রান্সের রাজা লুইস তাসের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, এ যুদ্ধে অসংখ্য খ্রিস্টান বাহিনী নিহত হওয়া ও অবশিষ্টরা বন্দী হওয়ার পর খ্রিস্টানরা খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। এসবের পাশাপাশি আমরা যদি ইতিপূর্বে ৬৪৩ হিজরীতে সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী রহ. এর হাতে বাইতুল মাকদিস স্বাধীন হওয়ার ইতিহাসকে সামনে রাখি, তাহলে আমাদের সামনে খ্রিস্টানদের অধঃপতনের প্রকৃত ইতিহাস প্রতিভাত হবে। একের পর এক

পরাজয় ও অধঃপতনের কারণে আক্কা নগরীর ক্রুশেড বাহিনী চরম অবক্ষয় ও অধঃপতনের শিকার হয়। বাহ্যিক শক্তি-সামর্থ্য হারানোর সঙ্গে সঙ্গে মনোবলও হারিয়ে ফেলে। এ সবকিছুর আলোকে সাইফুদ্দীন কুতয রহ. জানতেন, তিনি এমন শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন, যারা তাদের খুব ঘৃণা করলেও খুব শক্তিশালী নয়।

৫. আক্কা নগরী ছিল খুব শক্তিশালী ও সুরক্ষিত নগরী। এভাবে বললে অত্যুক্তি হবে না, সামগ্রিক বিবেচনায় আক্কা নগরী গোটা ফিলিস্তিন ও সিরিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী শহর ছিল। খ্রিস্টানরা ৪৯২ হিজরীতে তথা ১৬৬ বছর পূর্বে এই শহর দখল করে। সে সময় থেকে কোনো মুসলিম সেনাপতিই [সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী রহ.ও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন] আক্কা নগরী জয় করতে পারেননি। তাই কুতয রহ. জানতেন, আক্কা নগরী তার ইতিহাসের দুর্বল সময় পাড়ি দিলেও তা জয় করা বড় কঠিন।

মোটকথা, উক্ত বিষয়গুলোর সারমর্ম হলো, তাতারীরা যেমন মুসলমানদের শত্রু অনুরূপ খ্রিস্টানরাও মুসলমানদের শত্রু। আক্কা নগরীর খ্রিস্টানরা তাতারীদের সঙ্গে জোট বাঁধা খুব স্বাভাবিক বিষয়। যদিও খ্রিস্টানরা তাতারীদের প্রচণ্ড ঘৃণা করে ও ভয় পায়। সে সময় খ্রিস্টানরা মনোবল ও বাহ্যিক শক্তি-সামর্থ্যের দিক থেকে খুব নাজেহাল সময় পার করছিল। যদিও আক্কা নগরী ফিলিস্তিন ও সিরিয়ার সর্বাধিক সুরক্ষিত শহর হিসেবে পূর্ব থেকে পরিচিত।

এ সকল তথ্যের আলোকে সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এর কাছে একথা পরিষ্কার প্রতিভাত হলো যে, খ্রিস্টানদের সঙ্গে যুদ্ধ করলে তা তার বাহিনীর ওপর নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করবে। অবশ্যই কুতয রহ.-এর শেষ টার্গেট হলো বিরোধীশক্তির অশুভ থাবা থেকে সব মুসলিম ভূখণ্ডকে স্বাধীন করা। চাই সেই বিরোধীশক্তি তাতার হোক বা খ্রিস্টান। কিন্তু বর্তমান সময়ের দাবি হলো তাতারদের পরাস্ত করা; আক্কা নগরী অবরোধ করা। এখন আক্কা নগরীর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে মুসলমানদের শক্তি খর্ব হবে। সময় বিনষ্ট হবে এবং তাতারী যুদ্ধের পূর্বে মুসলিম বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়বে।

কিন্তু সাইফুদ্দীন কুতয সম্প্রতি আক্কার খ্রিস্টানদের বাধা অতিক্রম করে ফিলিস্তিনে তাতারীদের মোকাবেলা করতে পারছেন না। কালের দুর্যোগে যদি খ্রিস্টান-তাতার জোট সৃষ্টি হয়, তবে মুসলিম বাহিনী জাঁতাকলে পিষ্ট হবে। একদিকে তাতার, অন্যদিকে খ্রিস্টান—তারা এই উভয় সংকটে পড়বে।

তাই সাইফুদ্দীন কুতয রহ. দ্রুত খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মাঝে সাময়িক শান্তির প্রস্তাবনা পেশকরত আক্কা নগরীতে একদল দূত পাঠালেন। যদি এই সন্ধিচুক্তির সুযোগ হয়, তাহলে একদিকে তারা খ্রিস্টানদের নিরপেক্ষ রাখতে সক্ষম হবে, অন্যদিকে মুসলিম বাহিনী নিরাপত্তা লাভ করবে। কার্যত মুসলিম দূতগণ খ্রিস্টানদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি পরামর্শ সভায় একত্রিত হন। খ্রিস্টানরা নিজেদের দুর্বলতা হেতু [সম্প্রতি খ্রিস্টানরা খুব নাজেহাল সময় পার করছিল, যেমনটি আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি] এই আশঙ্কা বোধ করল যে, যদি তারা শান্তিচুক্তিতে একমত না হয়, তাহলে মুসলমানরা তাদের ওপর চেপে বসবে। তাই তারা দ্রুত শান্তিচুক্তিতে সম্মতি প্রকাশ করল। কোনো কোনো খ্রিস্টান তো তাতারী মোকাবেলায় সাময়িক জোট বাধার প্রস্তাবও পেশ করে। তবে এই বিষয়ে সকলেই একমত হতে পারেনি। তবে অন্যান্য খ্রিস্টান নেতাদের কেউ কেউ এই আশঙ্কা বোধ করে যে, না জানি যুদ্ধে মুসলমানরা জয়লাভ করলে তাদের আক্কা নগরী থেকে বের করে দেয়। কারণ—

এক. মুসলমানরা যুদ্ধকালীন বিশ্বাসঘাতকতাকে মেনে নেবে না।

দুই. বিশেষত তাতারী বাহিনী কতিপয় খ্রিস্টান রাজা-বাদশার সহযোগী [যেমন : আর্মেনিয়া, জুজিয়া ও আন্তাকিয়ার রাজা]

তিন. পাশাপাশি বর্তমান তাতার সেনাপতি সেনাপতি কাতবুগা খ্রিস্টান।

এ সকল বিষয়কে সামনে রেখে উভয়দল নির্দিষ্ট মেয়াদে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। তবে মুসলমানগণ এই মেয়াদকে তাতারী যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্তই বলবৎ রাখতে জোর দাবি পেশ করে। এরপর এই শান্তিচুক্তি বলবৎ থাকতে পারে না। কারণ, মুসলিম ভূখণ্ডে অন্যায় দখলকারী খ্রিস্টানজাতির সঙ্গে স্থায়ী শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া শরীয়তসম্মত নয়। পাশাপাশি এটাও শরীয়তসম্মত নয় যে, যত দীর্ঘকাল ধরে দখল করে কিংবা প্রভাব বিস্তার করে থাকুক না কেন, মুসলিম ভূখণ্ডের প্রতি খ্রিস্টান কিংবা অন্য বদদ্বীন শক্তির শাসনকে মুসলমানরা মেনে নেবে। মনে রাখবেন, খ্রিস্টান জাতি আক্কা নগরীতে দীর্ঘ ১৬৬ বছর যাবৎ প্রভাব বিস্তার করে আছে। অর্থাৎ আক্কা নগরী খ্রিস্টানদের কয়েক পূর্বপুরুষ অতিবাহিত হলেও সাইফুদ্দীন কুতয রহ. মুসলিম রাষ্ট্রে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে তাদের কর্তৃত্ব মেনে নেননি। কিন্তু সাইফুদ্দীন কুতয রহ. জানতেন খ্রিস্টানরা—

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً

"মুমিনদের সঙ্গে আত্মীয়তা বা অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষা করে না"[৭৮]

তাই তিনি তাদের সঙ্গে তারহীব ও তারগীব তথা ভীতি-প্রদর্শন ও আশা-সঞ্চার পদ্ধতিতে চুক্তি সম্পন্ন করেন। মুসলিম দূতগণ তাদের এই মর্মে কঠিন হুঁশিয়ারি-বাণী শোনান যে, কোনোরূপ বিশ্বাসঘাতকতা টের পাওয়া গেলে মুসলমানরা তাতারীদের পরিবর্তে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং আক্কা নগরী স্বাধীন না করে তাদের ছাড়বে না। শক্তিধরদের পক্ষ থেকে যে শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন হয়, তা দুর্বলদের পক্ষ থেকে সম্পাদিত চুক্তির চেয়ে বহুগুণে কার্যকরী হয়। শক্তিশালীরা সর্বদা শর্তারোপ করে। আর দুর্বলরা সর্বদা শর্ত গ্রহণ করে। এ কারণেই মুসলমানগণ যখন কারও সঙ্গে [চাই তারা তাতার খ্রিস্টান বা ইহুদী হোক] চুক্তি সম্পাদন করে, তখন বিশ্বাসঘাতকতা দেখা দিলে কিংবা চুক্তিভঙ্গ হলে তারা তাদের শাস্তির হুঁশিয়ারি প্রদান করে। অন্যথায় এমন শান্তিচুক্তির কী মূল্য যে, তারা সুযোগ পেলেই বিরোধিতা করে বসবে।

أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

"যখনই তারা কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সর্বদা একটি দল তা ভেঙে ছুড়ে মেরেছে; বরং তাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।"[৭৯]

এই ছিল কুতয রহ.-এর পক্ষ থেকে ভীতিপ্রদর্শন। আর তারগীব তথা আশা সঞ্চার হলো, সাইফুদ্দীন কুতয রহ. তাদের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলেন যে, যেকোনো অবস্থাতেই তাতারীদের বিপক্ষে জয়লাভ হলে মুসলমানরা মোঘলদের ঘোড়াগুলোকে অতি সস্তায় তাদের কাছে বিক্রি করবে। এটি তাদের জন্য বিরাট স্বপ্নের ব্যাপার ছিল। কারণ, আক্কাবাসী, আক্কা বাহিনী ও সেখানকার আমীর-উমারাগণ ঘোড়ার তীব্র সংকটে ভুগছিল। অন্যদিকে তাতারী ঘোড়া শক্তিধর ঘোড়া হিসেবে জগদ্বিখ্যাত।

কুতয রহ. খ্রিস্টানদের সঙ্গে এ বিষয়েও একমত হন যে, মুসলিম বাহিনী ফিলিস্তিন থাকাকালে তারা মুসলমানদের খাবার-দাবার ও নিত্য-প্রয়োজনীয় আসবাব দিয়ে সহযোগিতা প্রদান করবে। খ্রিস্টানরা এ বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করে।

---

[৭৮] সূরা তাওবা : ১০।

[৭৯] সূরা বাকারা : ১০১।

এভাবেই তাতারীযুদ্ধের কংকটাকীর্ণ সংকীর্ণ পথ সুগম ও নিরাপদ হয়। এবার সাইফুদ্দীন কুতয রহ. যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার শেষ প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করেন।

মুসলিম সেনাবাহিনীর পবিত্রতা

সুবহানাল্লাহ!

বৈষয়িক, কূটনৈতিক, অভ্যন্তরীণ ও অর্থনৈতিক প্রস্তুতি এবং উলামায়ে কেরাম কর্তৃক জাতিকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণের বলিষ্ঠ ভূমিকা সত্ত্বেও কতিপয় দুর্বল মুসলমান একথা বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে, সত্যি সত্যি যুদ্ধ হতে যাচ্ছে। তারা শারীরিকভাবে দুর্বল ছিল না, দুর্বল ছিল তাদের মনোবল। তারা মনে করত, এসব সাময়িক আবেগ ও আস্ফালন। শীঘ্রই তা থেমে যাবে। কুতয রহ.-এর বক্তব্যকে তারা অন্যান্য নেতার বক্তব্যের ন্যায় মনে করত, যা মিথ্যা আশ্বাস ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের অবাস্তব পদক্ষেপ। তারা কখনোই এ কথা বিশ্বাস করত না যে, কুতয রহ. প্রকৃত অর্থে জিহাদের প্রস্তুতি নিয়েছেন। যুদ্ধের সময় যত ঘনীভূত হয়, তাদের অবিশ্বাসের ধূম্রজাল ততই দূর হতে থাকে।

যুদ্ধ যখন অতি সন্নিকটে, তখন তাদের অন্তর কম্পমান হতে থাকে। তারা ভয়ে পালাবার চিন্তা শুরু করে। বাস্তবেই কেউ কেউ পালাবার বা আত্মগোপনের পথ বেছে নেয়। যারা সারা জীবনের জন্য মিশর ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়, তাদের মধ্যে কেউ হেজায, কেউ ইয়েমেন, কেউ পাশ্চাত্যের দেশসমূহে পালিয়ে যায়। কোনো কোনো গবেষকর দৃষ্টিতে এই পরিস্থিতি মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর ছিল। মুসলিম বাহিনী কিছুসংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হারালো বা কমপক্ষে শত্রুদের দৃষ্টিতে তাদের সংখ্যা হ্রাস পেল।

কিন্তু সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর কী মহিমা! যুদ্ধের পূর্বক্ষণে তাদের পলায়নপরতার মাঝে মুসলিম বাহিনীর জন্য ছিল কল্যাণই কল্যাণ। যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বমুহূর্তে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন মুসলিম জাতিকে অপবিত্রতা ও ভেজালমুক্ত করলেন। মুসলিম বাহিনী পরিণত হলো সত্যিকার অর্থে আল্লাহর রাহের একনিষ্ঠ নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদ বাহিনীতে। এখন কেবল তারাই জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হবে, যুদ্ধে যাদের জানবাজি রাখার সদিচ্ছা রয়েছে।

সূরা তাওবার ৪৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

"তারা তোমাদের সাথে বের হলে তোমাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ছাড়া অন্য কিছু বৃদ্ধি করত না এবং তোমাদের মধ্যে ফেতনা সৃষ্টির চেষ্টায় তোমাদের সারিসমূহের মধ্যে ছোটাছুটি করত। আর তোমাদের নিজেদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যারা তাদের মতলবের কথা বেশ শুনে থাকে। আল্লাহ জালেমদের সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন।"[৮০]

যদি এসব দোদুল্যমনা মানুষ মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে বের হয়, তবে তাদের দুর্বল বানিয়ে ফেলত, তাদের মাঝে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করত। কখনো অনিচ্ছায়, ভীরুতা ও কাপুরুষতায়। আবার কখনো স্বেচ্ছায় বিশৃঙ্খলা ছড়ানোর হীন উদ্দেশ্যে।

এটা কোনো সাধারণ সমস্যা নয়; বরং অনেক বড় সমস্যা। কারণ, সরলমনা কতিপয় মুসলমান তাদের কথায় প্রভাবিত হতো এবং দ্বন্দ্বে পড়ে যেত। ফলে মুসলমানরা শক্তি হারাতে বসত। এটা আল্লাহর বাণী। وفيكم سماعون لهم [তোমাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক রয়েছে যারা তাদের কথায় কান দেয়]-এর বাস্তব নমুনা। সেই যুদ্ধের প্রাক্কালে দল থেকে দুর্বল মনোবলসম্পন্ন লোকদের বের হয়ে যাওয়ায় মুসলিম বাহিনীর জন্য অতীব কল্যাণকর। যদিও বাহ্যত অকল্যাণকর মনে হয়। তাই সাইফুদ্দীন কুতয রহ. তাদের ফিরিয়ে আনার খুব বেশি চেষ্টা করেননি। ইসলামের খাঁটি সৈনিক জিহাদ ছেড়ে পলায়ন করে না; বরং জিহাদের তীব্র প্রেরণা তাদের হৃদয়ে লালিত হয়।

এভাবেই মুসলিম বাহিনী নির্ভেজাল নিষ্কলুষ পূতপবিত্র হয়।

ফিলিস্তিন অভিমুখে মুসলিম বাহিনী

মুসলিম বাহিনী ক্যাম্পে জমায়েত হতে শুরু করে। ক্যাম্পটি সালেহিয়া অঞ্চলের পূর্বে অবস্থিত ছিল। এটি একটি বিস্তীর্ণ মরুভূমি, যেখানে অসংখ্য সৈন্যবাহিনীর সংকুলান হতো। এটি ছিল পূর্বমুখী মিশরীয় বাহিনীর জন্য মিডেল পয়েন্ট।

---

[৮০] সূরা তাওবা : ৪৭।

কায়রো ও বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে থাকা প্রশিক্ষণ ক্যাম্প থেকে দলে দলে সৈন্যদল একত্রিত হতে থাকে। অতঃপর সাইফুদ্দীন কুতয রহ. ফিলিস্তিন অভিমুখে যাত্রা শুরু করার নির্দেশ দেন।

হে আল্লাহ, আমাদের এই সফর সহজ করে দিন। এর দূরত্বকে কমিয়ে দিন।

হে আল্লাহ, আপনিই আমাদের সফরসঙ্গী এবং আমাদের পরিবারের প্রতিনিধি।

হে আল্লাহ, আমরা আপনার কাছে সফরের কষ্ট ক্লান্তি, দৃষ্টির বিষণ্ণতা এবং পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের নিকৃষ্ট পরিণাম থেকে পানাহ চাচ্ছি।

মুসলিম বাহিনী সালেহিয়া থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে রওয়ানা হয় এবং একসময় সিনা উপত্যকায় পৌঁছে যায়। এরপর সেখান থেকে ভূমধ্যসাগরের উত্তর কিনারা ধরে রওয়ানা হয়।

এটি ছিল ৬৫৮ হিজরীর শাবান মোতাবেক ১২৬০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসের ঘটনা। অর্থাৎ প্রচণ্ড গরমের মাসে সুদীর্ঘ সিনাই মরুভূমির সফর। পথিমধ্যে আরিশ ব্যতীত কোনো জনপদ ছিল না। এতদসত্ত্বেও মুজাহিদ বাহিনী ধৈর্যধারণ করেন এবং সকলে তাবুক যুদ্ধ ও সমপর্যায়ের কঠিন যুদ্ধগুলোর কথা স্মরণ করেন। তাবুক যুদ্ধে মুসলমানরা তো এর চেয়েও অধিক উষ্ণতা সহ্য করেছেন এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা তো ছিল আরও নাজেহাল। দীর্ঘ মরুভূমির পথ পাড়ি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারাও তো তৎকালীন পরাশক্তি রোমকদের মোকাবেলা করেছেন। এখন মিশরবাসীও তো দীর্ঘ মরুপথ পাড়ি দিয়ে তীব্র গরমের ভেতরে অর্থনৈতিক দুরাবস্থা নিয়ে ভয়ংকর শক্তির মোকাবেলা করতে যাচ্ছে। এই ভয়ংকর শক্তির নাম তাতারীশক্তি। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। তবে তাবুকের মুসলমানরা রোমানদের অপেক্ষারত পায়নি। তাই যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। তবে মিশরের মুসলমানরা তাতারীদের অপেক্ষারত পেয়েছে। তারাও যুদ্ধের জন্য মুখিয়ে ছিল।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. পথিমধ্যে তাদেরকে সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্তভাবে নিয়ে যেতে থাকেন। যাতে আকস্মিক আক্রমণ সহজে মোকাবেলা করা যায়।

সৈন্যবাহিনীর শুরুতে তিনি সুদক্ষ সেনাপতি রুকন উদ্দীন বাইবার্সকে রাখেন। তিনিই যেনো সর্বপ্রথম তাতারীদের মোকাবেলা করেন। এতে মুসলমানদের মনোবল বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. সৈন্যবাহিনীকে সুবিন্যস্ত করতে এমন এক পদ্ধতি অবলম্বন করলেন, সমকালীন কেউ এই পদ্ধতি অবলম্বন করেনি। এটি ছিল

শত্রুদের পরাভূত করার নবপদ্ধতি। কুতয রহ. অগ্রগামী দল হিসেবে রুকন উদ্দীন বাইবার্সের নেতৃত্বে বিরাট এক বাহিনী পাঠান। এই অগ্রগামী দলটি অবশিষ্ট বাহিনীর বহু আগে অবস্থান করে। তাতারী গোয়েন্দারা প্রথম দলটিকে দেখে তা পূর্ণ দল মনে করবে। ফলে তাতারীরা সেই অনুপাতে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। এরপর কুতয রহ. আবির্ভূত হবেন। এতে তাতারীরা হিমশিম খেয়ে তাদের মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হবে।

গাজায় প্রথম বিজয়

সেনাপতি রুকন উদ্দীন বাইবার্স ২৬ জুলাই ১২৬০ খ্রিস্টাব্দে মিশর সীমান্ত অতিক্রম করেন এবং ফিলিস্তিনের সীমানায় প্রবেশ করেন। কুতয রহ. পিছে পিছে আসতে থাকেন। তারা একে একে রফাহ, খান ইউনুস ও দের বালাহ অতিক্রম করে গাজার খুব কাছাকাছি পৌঁছে যান। ইতিপূর্বে তাতারীরা গাজা নগরী দখল করেছিল। তা-ই ঘটল, যা কুতয রহ. ভেবেছিলেন। তাতারী গোয়েন্দারা সেনাপতি রুকন উদ্দীন বাইবার্সের নেতৃত্বাধীন বাহিনী দেখে মনে করল, এটি মুসলিম বাহিনীর পূর্ণ দল। এই সংবাদ গাজায় তাতারী রক্ষীবাহিনীর কাছে পৌঁছলে তারা দ্রুত রুকন উদ্দীনের মোকাবেলা করার জন্য এগিয়ে আসে। উভয় দলের মাঝে লড়াই শুরু হয়। তখন সাইফুদ্দীন কুতয রহ. কেবল ফিলিস্তিন সীমান্ত পার হচ্ছিলেন। কিন্তু আমরা আগেও উল্লেখ করেছি, রুকন উদ্দীন বাইবার্সের নেতৃত্বাধীন অগ্রগামী দলটি ছিল শক্তিশালী দল। আর রুকন উদ্দীন হলেন সুদক্ষ সেনাপতি। আর গাজায় তাতারী বাহিনী তুলনামূলক খুবই স্বল্প ছিল। তাতারীদের প্রধান দলটি গাজা নগরী থেকে বেশ দূরে অবস্থান করছিল। তাতারী সেনাপতি কাতবুগার নেতৃত্বে তাতারী বাহিনী গাজা নগরী থেকে আনুমানিক তিনশো কিলোমিটার দূরে লেবাননের সমতল ভূমিতে অবস্থান করছিল। তাই মুসলমান ও তাতারীদের প্রধান দুটি দলের অনুপস্থিতিতে গাজায় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মহান আল্লাহর অনুগ্রহে এই ছোট্ট যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করে। কতিপয় তাতারী নিহত হয়। আর অবশিষ্টরা লেবাননে অবস্থিত তাতারী সেনাপতি কাতবুগাকে সংবাদ পৌঁছানোর জন্য উত্তর অভিমুখে পলায়ন করে।

তাতারী বাহিনী গাজায় অপ্রত্যাশিত আক্রমণের শিকার হয়। তাদের পরাজয়ের বড় কারণ ছিল আকস্মিক আক্রমণ। গাজায় অপ্রত্যাশিত আক্রমণ সামরিক পরিকল্পনা কিংবা রণভূমি নির্বাচনে সূক্ষ্ম রণকৌশল বা অন্য কোনো সূক্ষ্ম

রণশাস্ত্র ছিল না। তবে তাদের জন্য প্রকৃত অপ্রত্যাশিত ঘটনা ছিল একদল মুসলিম মুজাহিদ সর্বদা ইসলামের তরে লড়ে যাবে। সর্বদা কাঁধে তরবারি বহন করবে এবং দ্বীন-ধর্ম, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও নিজেদের ইজ্জত-সম্মান রক্ষার জন্য লড়াই করবে। তাতারীরা ভেবেছিল মুসলিম বাহিনী ভয়ে পালাবে। তারা ভেবেছিল, মুসলিম নেতারা লাঞ্ছনার জোট বাঁধবে এবং অপমানিত হয়ে তাদের সামনে আত্মসমর্পণ করবে। তারা কখনো এ কল্পনা করেনি যে, একদল মুসলিম মুজাহিদ নিজেদের অধিকার আদায়ে সর্বদা সোচ্চার থাকবে।

এ ছিল বর্বর তাতারীদের কল্পনা। অবাস্তব কল্পনা। কারণ, মুসলিম উম্মাহ যত দুর্বলই হোক না কেন, কখনোই চিরদিনের জন্য মরে যাবে না। বিরাটসংখ্যক মুসলমান বিনয়ী হলেও অন্য একদল আমরণ সত্যের পথে লড়াই করবে।

ইমাম মুসলিম রহ. হযরত ছাওবান রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم، حتى يأتي أمر الله

"আমার উম্মতের মধ্য থেকে একটি দল সর্বদা সত্যের পক্ষে লড়াই করে যাবে। যারা তাদের বিরোধিতা করবে, কেয়ামত অবধি তারা তাদের কেনো ক্ষতি করতে পারবে না।"[৮১]

সুবহানাল্লাহ! ইমাম আহমদ রহ. হযরত আবু উমামা রা.-এর সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করেন। সেখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ বর্ধিত রয়েছে। তা হলো, উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা কোথায়? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

بيت المقدس وأكناف بيت المقدس

'বাইতুল মাকদিস ও বাইতুল মাকদিসের আশপাশে।'[৮২]

তবে গাজার যুদ্ধে ও পরবর্তীতে আইনে জালুতের যুদ্ধে যারা তাতারীদের পরাস্ত করেছিলেন, তাদের অধিকাংশ বাইতুল মাকদিস অঞ্চলের ছিলেন না,

---

[৮১] *মুসলিম : ১৯২০।*

[৮২] *মুসনাদে আহমদ : ৫/২৭৮।*

ফিলিস্তিনের বংশোদ্ভূতও ছিলেন না। তবে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন পবিত্র ভূমি 'ফিলিস্তিন'কে মুসলমানদের বিজয়ভূমি বানিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, সামান্য কিছু ত্রুটি ও ছোট ছোট কিছু ব্যর্থতা দেখা দিয়েছিল। তবে সেখানে সবাই অটল-অবিচল ছিল।

শীঘ্রই মিশরভূমিতে আল্লাহর অনুগ্রহে ইহুদীরা ধ্বংস হবে।

মুসলমান ও ইহুদীদের মধ্যকার সর্বশেষ যুদ্ধ এই মাটিতেই সংঘটিত হবে এবং মুসলমানগণ তাদের কচুকাটা করবে।

এটা কল্পনা কিংবা গবেষণাপ্রসূত নয়। এটা ছিল ঐশী বাস্তবতা ও নববী সুসংবাদ!!

ইমাম মুসলিম রহ. হযরত আবু হুরাইরা রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَا تقُوم الساعةُ حتيقَاتِلَ الْمسلِمونَ الْيهود، فَيقْتلُهمالْمسلِمونَ حتى يَختبِئَ الْيهودِ يمِنوراءِ الْحجرِ والشجر ، فَيقُولُ الْحجر أَو الشجر يا مسلِم يا عبدا للَّهِ هذَا يهودِ يَخلْفِي فَتعالَ فَاقْتلْه إِلَّا الْغرقَد فَإِنه مِن شجرِ الْيهودِ

"মুসলমানরা ইহুদীদের বিপক্ষে লড়াই করার পূর্বে কেয়ামত সংঘটিত হবে না এবং যুদ্ধে মুসলমানরা ইহুদীদের কচুকাটা করবে। এমনকি ইহুদীরা গাছের আড়ালে, পাথরের আড়ালে আশ্রয় নেবে। তখন গাছ বা পাথর বলবে, হে মুসলমান, হে আবদুল্লাহ, এই তো আমার পেছনে এক ইহুদী লুকিয়ে আছে। তাকে হত্যা করো। তবে গরকদ গাছ একথা বলবে না। কারণ, গরকদ ইহুদীদের গাছ।"[৮৩]

চলুন, বাইবার্স, কুতয ও মুসলিম বাহিনীর আলোচনায় ফিরে যাই—

মুসলমানরা তাতারীদের বিপক্ষে জয়লাভ করেন। যদিও এই বিজয় আংশিক অন্তর্বর্তীকালীন সহজ ছিল।

কোনো কোনো ইতিহাসবিদ গাজার যুদ্ধকে খুব ছোট বিষয় মনে করেছেন। এমনকি কেউ কেউ তো এই যুদ্ধের কথা উল্লেখই করেননি। কিন্তু তা ছিল আমার দৃষ্টিতে মুসলিম ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ যুদ্ধসমূহের অন্যতম। যুদ্ধে তাতারীদের

---

[৮৩] *মুসলিম :* ২৯২২।

নিহতের সংখ্যা অনেক কিংবা গাজার দক্ষ রণকৌশল বা অন্য কোনো কারণে নয়, বরং এই জন্যে যে, এই বিজয় মুসলমানদের মনোবলহীনতাকে দূর করেছিল।

মুসলমানরা নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করছিল যে, তাতারীরা লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছে এবং সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া ঐতিহাসিক বাণী 'যে বলবে তাতারীরা পরাজিত হয়েছে, তার কথা বিশ্বাস কোরো না' মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। এখন যে ব্যক্তি বলবে, তাতারীরা পরাজিত হয়েছে, তাকে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন। দীর্ঘদিন পর তাতারীরা প্রথমবারের মতো পরাজয়বরণ করল।

গাজার যুদ্ধ মুসলিম বাহিনীর ওপর ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে তা তাতারীদের ওপর ভয়াবহ নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করেছে।

মুসলমানদের উচিত কোনো আমলকে ছোট করে না দেখা।

কোনো মুসলমান যেন এই কাজটিকে ছোট না ভাবে যে, একটি ছোট পাথর নিক্ষেপ করার কারণে ইহুদী লোকটি পলায়ন করল।

কোনো মুসলমান যেনো ছোট করে না দেখে যে, মাত্র একজন ইহুদী সৈনিক বা আমেরিকান সৈনিক নিহত হলো।

হে বন্ধুরা, অন্তরাত্মার পরাজয় হলো প্রকৃত পরাজয়। ছোট্ট বিজয় যদিও বিশাল সামরিক রূপরেখা না থাকে, উম্মাহর মনোবল ও দৃঢ়তা বৃদ্ধিতে বিরাট ভূমিকা রাখে।

আইনে জালুতের পথে মুসলিম সৈন্যবাহিনী

গাজা জয়ের পর মুসলিম বাহিনী উত্তর দিকে রওনা হয়। তারা একের পর এক বিখ্যাত মুসলিম শহর অতিক্রম করার জন্য ভূমধ্যসাগরের কিনারা দিয়ে সফর করতে থাকে। তারা আসকালান ও ইয়াফার দৃষ্টিনন্দন মুসলিম শহর পাড়ি দেয়। আল্লাহ তা'আলা যেন ইয়াফাসহ গোটা ফিলিস্তিনকে ইহুদীদের অশুভ থাবা থেকে মুক্ত করেন—আমীন। অতঃপর কুতয রহ. ও মুসলিম বহিনী উত্তর দিকে সফর সমাপ্ত করেন। তেলকুরাম শহরের পশ্চিম দিক দিয়ে হাইফা শহরে পৌছেন। এরপর খ্রিস্টান অধ্যুষিত মুসলিম শহর আক্কা নগরীতে পৌছেন।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. আক্কা নগরীর পূর্বে সমতল ভূমিতে অবস্থিত আক্কা দুর্গবেষ্টিত বাগানে তাঁবু ফেলেন। অতঃপর কুতয রহ. ও খ্রিস্টান আমীরদের মধ্যে পূর্ববর্তী জোটকে শক্তিশালী করার জন্য চিঠি আদান-প্রদান শুরু হয়।

কুতয রহ. একদল মুসলিম আমীর পাঠান। তারা আক্কা দুর্গে প্রবেশ করে। খ্রিস্টান আমীররা তাদের উষ্ণ সংবর্ধনা জানায়। উভয় দল মিলে পূর্ববর্তী সম্পাদিত চুক্তিসমূহকে আরও জোরদার করেন। উভয় দলের মাঝে পরস্পর একাধিকবার যাতায়াত হয় এবং উভয় দলই পূর্ববর্তী চুক্তি বলবৎ থাকার বিষয়ে নিশ্চিত হয়। এরপর সাইফুদ্দীন কুতয রহ. আক্কা নগরী ছেড়ে তাতারীদের বিরুদ্ধে বহুকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধ করার জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের সংকল্প করেন।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. যখন আক্কানগরী ত্যাগ করতে শুরু করেন, তখন যেসব আমীর কুতয রহ. ও খ্রিস্টান আমীরদের মধ্যে চিঠি আদান-প্রদান করেছিলেন, তাদের একজন ইঙ্গিত করেন, আক্কা নগরী বর্তমানে খুব দুর্বল অবস্থায় রয়েছে। তারা ইসলামী চুক্তির প্রতি পূর্ণ আস্থাভাজন এবং যুদ্ধের জন্য অপ্রস্তুত। আপনার সামনে আক্কা নগরী দখল করার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনি চাইলে ১৬৬ বছর পর এই এই দখলকৃত মুসলিম নগরী স্বাধীন করতে পারেন। কুতয রহ. তার এই বক্তব্যের সুস্পষ্ট জবাব প্রদান করে বলেন—

نحن لا نخون العهود

"আমরা চুক্তি ভঙ্গ করি না।"

হে আল্লাহ!! সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সুস্পষ্ট, নির্ভেজাল। যোগ্য নেতৃত্ব প্রকৃত বিজয়লাভের কারণ। প্রকৃত বিজয়লাভের মাধ্যম হলো আল্লাহর ছোট-বড় সকল বিধান মেনে চলা, চুক্তি রক্ষা, অঙ্গীকার ভঙ্গ না করা।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"হে মুমিনগণ, তোমরা প্রতিশ্রুতি পূরণ করো।"[৮৪]

এ পর্যায়ে আমি খ্রিস্টান, ইহুদী, তাতার ও বিশ্ববাসীর জন্য রাসল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুসমৃদ্ধশীল একটি হাদীস বর্ণনা করতে চাই। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী ও আবু দাউদ রহ. বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটি হাসান সহীহ বলেছেন। হাদীসটি হযরত আমর ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

---

[৮৪] সুরা মায়েদা : ০১।

من كان بينه وبين قوم عهد، فلا يحلن عهداً، ولا يشدنه (أي لا يغيرن العهد بأي طريقة(حتى يمضي أمده، أو ينبذ إليهم على سواء

"কোনো সম্প্রদায়ের সঙ্গে কেউ যদি চুক্তিবদ্ধ হয়, সে যেন চুক্তিভঙ্গ না করে এবং পরিবর্তন না করে মেয়াদকাল অতিবাহিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অথবা তাদের চুক্তিভঙ্গ বিষয়ে অবহিত করার পূর্ব পর্যন্ত।"[৮৫]

হয়তো চুক্তির মেয়াদকাল ফুরিয়ে যাবে অথবা শত্রুপক্ষকে এ বিষয়ে অবহিত করা যে, যেকোনো কারণবশত আপনি চুক্তিভঙ্গ করতে চাইছেন। বিশ্বাসঘাতকতা বা গাদ্দারীর কোনো স্থান ইসলামে নেই।

এটাই হলো দ্বীন ইসলাম। এটাই হলো ইসলামী শরীয়ত। এই হলো ইসলামী আইন। আর এরা হলেন ইসলামী বীর সেনা।

এভাবেই সাইফুদ্দীন কুতয রহ. আক্কানগরী ছেড়ে পূর্ব-দক্ষিণ অভিমুখে রওনা হন আসন্ন যুদ্ধের উপযুক্ত স্থান খোঁজার জন্য।

ইতিমধ্যে গাজার পরাজিত তাতারী বাহিনী পালিয়ে তাতারী সেনাপতি কাতবুগার নিকটে পৌঁছে মুসলিম বাহিনী কার্যক্রমের সংবাদ দেওয়ার জন্য। কাতবুগা গাজায় তাতারীদের নির্মম পরাজয়ের কথা শুনে ক্রোধে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়। গাজায় তাতারীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য মুসলমানরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে। এই সংবাদ শুনে সে আরও ফেটে পড়ে। যেনো তাদের প্রণীত নীতিমালা হলো, প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কোনো অধিকার মুসলমানরা সংরক্ষণ করে না। শত্রুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের রুখে দাঁড়ানোই কাতবুগা ও তাতারীদের রাগের কারণ। কাতবুগা তার সেনাপতিদের নিয়ে একটি পরামর্শ সভার ব্যবস্থা করেন। এই সভায় হিমসের আমীর আশরাফ আইয়ূবী উপস্থিত হয়। সভায় কাতবুগা এই মর্মে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, দ্রুত চরমপন্থী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংঘটিত হবে।

একথা সুস্পষ্ট যে, তাতারীরা মুসলমানদের থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে। মুসলমানদের কাছাকাছি পৌঁছতে তাদের অনেক সময় লাগবে। কারণ সাইফুদ্দীন কুতয রহ. ইতিমধ্যে দক্ষিণের সীমানা থেকে উত্তরের শেষ সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন। অথচ তাতারীরা তখনো ফিলিস্তিনের সীমানায় পা দেয়

---

[৮৫] *তিরমিযী :* ১৫৮০, *দাউদ :* ২৭৫৯।

নি। যদিও লেবানন (তাতারীরা যেখানে ঘাঁটি পেতে বসেছে।) থেকে ফিলিস্তিনের বর্ডার সীমান্তের দূরত্ব হলো মাত্র পঞ্চাশ কিলোমিটার। তাতারী বাহিনী এই পথ মাত্র দুই-তিন দিনে পাড়ি দেবে।

এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, সাইফুদ্দীন কুতয রহ. নিজেই যুদ্ধের উপযুক্ত স্থান খুঁজতে শুরু করেছেন। এতে তিনি সৈন্যবাহিনীকে উত্তম পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করতে পারবেন। পারবেন সেই অঞ্চলের প্রকৃতি ও পথ-ঘাট সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে।

তাতারী সেনাপ্রধান কাতবুগা লেবাননের পর্বত প্রাচীরের মধ্যভাগ হয়ে ফিলিস্তিনের উত্তর-পূর্ব দিক দিয়ে প্রবেশ করে। এরপর জর্দান নদী পাড়ি দিয়ে 'জালিন শারকি' পৌঁছে যায়। আঞ্চলিক মুসলিম তদন্ত কমিটি কাতবুগার কার্যক্রম ও গতিবিধির সংবাদ সম্বন্ধে দ্রুত সাইফুদ্দীন কুতয রহ. কে অবহিত করেন। কুতয রহ. তখন আক্কানগরী ত্যাগ করে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে যাত্রা করেছিলেন। তিনি দ্রুত নাছেরা শহর অতিক্রম করে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বহু দূরে পৌঁছে যান। একপর্যায়ে 'আইনে জালুত' ইতিহাসখ্যাত সমতল ভূমিতে পৌঁছেন। আইনে জালুত অঞ্চলটি উত্তরের বিসান ও দক্ষিণের নাবলুস শহরের মধ্যখানে অবস্থিত। বর্তমানে তা জেনিন শিবিরের অতি নিকটে অবস্থিত।

এ অঞ্চলে পৃথিবীর ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। সুবহানাল্লাহ! কাল-পরিক্রমায় ২০০২ খ্রিস্টাব্দে ফিলিস্তিন মুজাহিদীন ও ইহুদীদের মাঝে জেনিনভূমিতে আরেকবার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে পাঁচশোর অধিক মুসলমান শাহাদাতবরণ করেন।

আইনে জালুত দক্ষিণে হিত্তিন পর্যন্ত পঁয়ষট্টি কিলোমিটার বিস্তৃত। যেখানে পঁচাত্তর বছর পূর্বে ৫৮৩ হিজরীতে চিরস্মরণীয় হিত্তিনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অনুরূপ পশ্চিমে ইয়ারমুক পর্যন্ত ষাট কিলোমিটার বিস্তৃত। সেখানে হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদ ও আবু উবাইদাতুবনুল জাররাহ রা. এর নেতৃত্বে ছয় শতাব্দী পূর্বে রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কালজয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

এসব বিজয়গাথা সুখকর ইতিহাস মুসলিম বাহিনীর মনোশক্তিকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. আসন্ন বহু প্রতীক্ষিত যুদ্ধের জন্য 'আইনে জালুত' কে উপযুক্ত স্থান মনে করলেন। হিত্তিন উপত্যকাটি উত্তর দিক ব্যতীত সবদিক থেকে মাঝারি আকারের টিলা দ্বারা বেষ্টিত। উত্তর দিকটি উন্মুক্ত ছিল। এসব

টিলার ওপর নানান প্রকার গাছ-গাছালি ও ঝোপ-ঝাড় ছিল। তাই এই স্থানটিকে মুসলিম বাহিনীর আত্মগোপন ও আত্মরক্ষার জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করা হয়। পাশাপাশি এতে চতুর্পার্শ্বে ওত পেতে থাকাও খুব সহজ হয়।

সাইফুদ্দীন কুত রহ. দ্রুততার সঙ্গে সৈন্যবাহিনী বিন্যস্ত করেন। রুকন উদ্দীন বাইবার্সের নেতৃত্বে উত্তরে এক বাহিনী স্থাপন করেন এবং তাকে প্রকাশ্যে ময়দানে থাকার নির্দেশ দেন। অবশিষ্ট বাহিনী নিয়ে সাইফুদ্দীন কুতয রহ. টিলা ও ঝোপঝাড়ের আড়ালে আত্মগোপন করেন।

এই সৈন্যবিন্যাস ও প্রস্তুতি সম্পন্ন হয় পবিত্র রমজানের ২৪ তারিখ ৬৫৮ হিজরীতে। এটি এমন এক পবিত্র মাস, যে মাসে ইতিপূর্বে মুসলমানদের বহু স্মরণীয় বিজয় সাধিত হয়েছে। যেমন : বদর, মক্কা বিজয়, স্পেন জয় ইত্যাদি। মুসলমান মুজাহিদগণ যুদ্ধের প্রতীক্ষায় দিন গুনতে থাকে। মুসলিম গোয়েন্দারা নিয়মিত কাতবুগা ও তাতারী বাহিনীর সংবাদ প্রেরণ করতে থাকে। তারা খুব কাছাকাছি চলে এসেছে।

মুসলিম উম্মাহ ও তাতারী বাহিনীর মধ্যকার ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার আর মাত্র কয়েক দিন বাকি ...।

আল্লাহ তা'আলা যেনো সর্বদা ইসলাম ও মুসলমানদের বিজয় দান করেন। আমীন।

আইনে জালুত

আত্মম্ভরিতা, দাম্ভিকতা ও অহংকারে ভরা কাতবুগার সৈন্যবাহিনী আগমন করল। অন্যায় হত্যা, জ্বালাও-পোড়াও ও জুলুম-অত্যাচারে তারা ছিল জগদ্বিখ্যাত। তারা নিজেদের বড় মনে করত এবং ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত। সৈন্যবাহিনী বিসানের পশ্চিমাঞ্চল হয়ে আইনে জালুতের দক্ষিণ অভিমুখে রওয়ানা হয়। সেখানে মুসলিম বাহিনী কাতারবদ্ধ হয়েছিল। প্রত্যেকে নিজ অবস্থান গ্রহণ করেছিল এবং দৃঢ়প্রত্যয়ী মনোভাবে তাতারী বাহিনীর অপেক্ষা করছিল।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. আইনে জালুত উপত্যকায় অবস্থানকালে ফিলিস্তিনের অসংখ্য মুসলিম বাসিন্দা মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে এসে মিলিত হয়। কারণ তারা নিশ্চিত হয়েছিল শীঘ্রই চিরশত্রু পাষণ্ড তাতারী বাহিনীর বিরুদ্ধে বিরাট যুদ্ধ সংঘটিত হতে যাচ্ছে।

সুবহানাল্লাহ!

প্রশ্ন হলো (?) যেদিন তাতারী বাহিনী উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত গোটা ফিলিস্তিন জ্বালিয়ে দিয়েছিল, এমনকি ফিলিস্তিনের সর্বশেষ শহর গাজা ধ্বংস করেছিল। সেদিন এ সকল মুসলিম কোথায় ছিল?

এখন তারা কীভাবে আইনে জালুত যুদ্ধের জন্য উজ্জীবিত হলো?

ইতিপূর্বে কেন তারা ঘাপটি মেরে ঘরে বসেছিল?

আজ কেন তারা যুদ্ধের জন্য অগ্রসর?

এই প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ।

আর তা হলো, নেতৃত্ব। যোগ্য নেতৃত্ব।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. ও তার একনিষ্ঠ বাহিনীর আলোচনায় আমরা একথা একাধিকবার উল্লেখ করেছি।

ফিলিস্তিনে ইসলাম ও দ্বীনের জন্য নিবেদিত প্রাণ অসংখ্য সরলমনা সত্যিকার মুসলিম ছিল। তবে যোগ্য নেতৃত্বের অভাব তাদের কাপুরুষ বানিয়ে রেখেছিল, যে তাদেরকে পরিচালনা করবে। অথবা মুসলিম নেতার অভাবে ভুগছিল, তারা

যার অনুসরণ করবে। এ সকল সরলমনা মুসলিম ফিলিস্তিনে বসে নির্বাক তাদের নেতাদের দেখেছে। তারা সিরিয়ায় তাতারীদের সাথে জোট বেঁধেছে, তাদের জন্য ঘর-বাড়ি, দুর্গ-প্রাচীর সব খুলে দিয়েছে এবং তাদের রাস্তায় গালিচা বিছিয়ে দিয়েছে!

এ সকল সরলমনা মুসলমান যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে ভুগছিল। ফলে তারা সুপ্ত চেতনায় উজ্জীবিত হয়নি। অভ্যন্তরীণ গুণাবলি প্রকাশ পায়নি। ফলে যখন সাইফুদ্দীন কুতয রহ. ও মুসলিম সৈন্যবাহিনী এগিয়ে এলেন, যুদ্ধের পথ উন্মুক্ত করলেন, তারা ছিল দৃঢ়প্রত্যয়ী, তারা নাছের ইউসুফ আইয়ূবীর মতো তাতারী বাহিনীর আগমন-বার্তা শুনে পলায়ন করেননি। যখন তারা এসব বিষয় প্রত্যক্ষ করল, তাদের অন্তরে সাহস ফিরে এল। তারা আবেগাপ্লুত হলো। তাদের মাঝে দ্বীনী মর্যাদাবোধ জাগ্রত হলো। ফলে আত্মবিসর্জন ও জিহাদ তাদের জন্য খুব সহজ হলো।

হ্যাঁ! প্রশিক্ষণ ও দক্ষতায় তারা সুশৃঙ্খল বাহিনীর মতো নয়, একথা সত্য। তবে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য তারা ছিল পাগলপারা। তাদের এই বীরত্ব যুদ্ধের ময়দানে অনেক উপকার ডেকে আনবে। যেমন সাইফুদ্দীন কুতয রহ. তাদের যুদ্ধের আনুষঙ্গিক কাজ—যেমন অস্ত্রবহন, খাদ্যসরবরাহ ইত্যাদি বিশেষ কাজে তাদের নিয়োজিত করেছিলেন। ফলে সৈন্যবাহিনী তাদের বহু সহযোগিতা লাভ করে যুদ্ধের প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করতে পেরেছিল।

তারা যুদ্ধের সরঞ্জামাদি স্থানান্তর, পানাহার ব্যবস্থা, তীর-বর্শা বহন, ঘোড়া দেখাশোনা, আহতদের চিকিৎসা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছিল। এসব কাজে অনেক শ্রম ও সময় ব্যয় হয়। যদিও এসব কাজের জন্য যুদ্ধের পর্যাপ্ত জ্ঞান ও রণদক্ষতার প্রয়োজন নেই, তবে বিজয়লাভের ক্ষেত্রে এসব কাজের অনস্বীকার্য ভূমিকা রয়েছে। এভাবেই সাইফুদ্দীন কুতয রহ. অনুগত ফিলিস্তিন বাহিনীর শক্তিকে কাজে লাগান।

সবার জন্য সেই কাজ সহজ করে দেওয়া হয় যে জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পাশাপাশি তারা যখন এসব কাজ আঞ্জাম দিল, তখন শত্রুবাহিনীর চোখে মুসলিম বাহিনী বিপুলসংখ্যক হিসেবে প্রকাশ পেল। নিঃসন্দেহে তা কাফের বাহিনীর অন্তরে প্রবল ভীতি-সঞ্চার করেছিল। মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখার বিষয় নয়।

ফিলিস্তিনবাসী ছাড়াও বিভিন্ন জনপদ থেকে অগণিত কৃষক এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হয়। যারা না পারত যুদ্ধ করতে আর না কোনো খেদমত করতে, অসুস্থতা, অপারগতা বা বার্ধক্যের কারণে। পাশাপাশি শিশু ও নারীরাও এসে মিলিত হয়। এভাবেই আইনে জালুতের চতুর্দিকে বিপুলসংখ্যক মানুষের সমাবেশ ঘটে। তাদের আল্লাহ আকবার ধ্বনিতে আইনে জালুতের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠে। তাদের দুআ ও দীপ্ত শ্লোগানে সৈন্যবাহিনী সতেজ ও প্রাণবন্ত হয়। তারা প্রাণভরে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে ইসলাম ও মুসলমানদের জয় এবং শিরক ও মুশরিকদের পরাজয়ের জন্য দুআ করতে থাকে।

এসব ছিল ২৪শে রমজান ৬৫৮ হিজরীর ঘটনা, যা আইনে জালুতের যুদ্ধের পূর্বের দিন সংঘটিত হয়।

তাতারী বাহিনীর মাঝে আল্লাহর সৈন্য

এমন সময় সিরিয়া থেকে এক লোক দ্রুত গতিতে এসে সাইফুদ্দীন কুতয ও অন্যান্য আমীরদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়। লোকটি বলল, আমি 'সারেমুদ্দীন আইবেকে'র পক্ষ থেকে প্রেরিত দূত।

সারেমুদ্দীন আইবেক সেসব মুলমানদের একজন, যাদের হালাকু খান সিরিয়া আক্রমণের সময় বন্দী করে। পরবর্তীতে তিনি তাতারী বাহিনীর বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। তাদের সঙ্গে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং আইনে জালুতের যুদ্ধেও আগমন করেছেন। তিনি কি স্বেচ্ছায় তাতারীদের সহযোগিতা করেছেন নাকি নিরুপায় হয়ে তা আমাদের জানা নেই। দূত সংবাদ প্রদান করল, তিনি মুসলমানদের উপকারসাধনের প্রতিশ্রুতি করেছেন। এর সত্যতা সম্পর্কে আমাদের সঠিক জ্ঞান নেই। এটি তার ও মহান আল্লাহর মধ্যকার বিষয়। আমরা এও জানি না যে, আইনে জালুতের যুদ্ধের পূর্বে তিনি কেন মুসলিম বাহিনীর সহযোগিতা করার ইচ্ছা করেছেন। সুবহানাল্লাহ!

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ

"আল্লাহ ব্যতীত তার সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে কেউ জানেন না।"[৮৬]

---

[৮৬] মুদ্দাস্সির : ৩১।

ওই লোকটিকে না কুতয রহ. চেনেন, না তার সম্পর্কে মুসলিম বাহিনীর নেতৃবৃন্দ জানেন। কিন্তু মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন মুসলমানদের বৃহৎ খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে নিয়োজিত করেন। এমন উপযুক্ত মুহূর্তে সেই সত্তা তাকে প্রেরণ করেছেন, যিনি ইতিপূর্বে গাযওয়ায়ে আহযাব চলাকালে নাঈম ইবনে মাসউদ রা. কে প্রেরণ করেছিলেন!!

আসুন! আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কর্মবিধানের সূক্ষ্মতা সম্পর্কে একটু আলোকপাত করি—

যখন মুসলিম বাহিনী ফিলিস্তিনে এল এবং তাতারী সেনাপতি কাতবুগা আইনে জালুত অভিমুখে রওয়ানা হলো, তখন সারেমুদ্দীন আইবেক মুসলিম বাহিনীকে তাতারী বাহিনী সম্পর্কে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে সেই দূতকে প্রেরণ করলেন।

দূত সাইফুদ্দীন কুতয রহ. কে তাতারী বাহিনী সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্যাবলি প্রদান করল—

১. তাতারী বাহিনী তাদের স্বাভাবিক ও পরিচিত শক্তি নিয়ে আগমন করেনি। হালাকু খান সামান্য কয়েক সৈন্য ও সেনাপতি নিয়ে এসেছে। সিরিয়া আক্রমণে তারা যে শৌর্য-বীর্য নিয়ে গমন করেছিল। এবার সেই শক্তি নিয়ে আসেনি। সুতরাং আপনারা তাদের ভয় পাবেন না। এই তথ্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ, যাদের অন্তর তাতারীদের ভয়ে কম্পমান ছিল, এই তথ্যটি শোনার পর তাদের মনোবল চাঙা হয়ে গেল। নিঃসন্দেহে মুসলিম বাহিনীর মাঝে এমন অনেক লোক ছিল, যারা মনে মনে কিংবা অন্যের সঙ্গে তাতারীদের অতীত নিয়ে আলোচনা করত। কীভাবে তারা মানুষ হত্যা করেছিল। দেশের পর দেশ বিরানভূমিতে পরিণত করেছিল। তাই এই তথ্যটি তাদের অন্তরশক্তিতে প্রাণ ফিরিয়ে দেয়।

২. তাতারীদের ডানদিক বামদিকের চেয়ে শক্তিশালী হবে। তাই মুসলমানদের উচিত বাম দিককে অধিক শক্তিশালী করা, যারা ডান দিকের তাতারীদের মোকাবেলা করবে।

৩. [এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য] হিমসের আমীর আশরাফ আইয়ূবী খুব শীঘ্রই সদলবলে তাতারী বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবেন। তার সঙ্গে ফারেসুদ্দীন আইবেকও আছেন। তবে তাতারী বাহিনী শীঘ্রই মুসলিম বাহিনীর সামনে পরাজিত হবে। অর্থাৎ আশরাফ আইয়ূবী অনেক চিন্তা-ভাবনার পর সাইফুদ্দীন

কুতয এর সঙ্গে অবস্থান করাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে তিনি বাহ্যত তাতারী বাহিনীর সঙ্গে বের হয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে।

উক্ত তথ্যসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং উপযুক্ত সময়ে এই তথ্যগুলো পাওয়া যায়। তবে হেকমতের দাবি ছিল এ সকল তথ্যের ওপর নির্ভর করে বসে না থাকা। কারণ, হতে পারে এসব তথ্য তাতারী কিংবা আশরাফ আইয়ূবী অথবা সারেমুদ্দীন আইবেকের পক্ষ থেকে ধোঁকা।

তাই আমীরগণ সামরিক দূরদর্শিতা ও প্রাজ্ঞোচিত ভাষায় পরস্পর বললেন, 'এটা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হতে পারে না।' অর্থাৎ তাতারীরা এর মাধ্যমে মুসলমানদের ধোঁকা দিতে পারে না।

তবুও মুসলমানগণ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন এবং সৈন্যসংখ্যা হ্রাস না করে কিংবা সতর্কতার অবলম্বনে অবহেলা না করে এসব তথ্যের আলোকে উপকৃত হয়েছেন।

এভাবেই ২৪ শে রমজানের দিনটি সমাপ্তি ঘটে।

মুসলমানগণ সারারাত জেগে নামাজ ও দুআয় নিমগ্ন থাকেন। এই রাতটি বছরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাত ছিল। কারণ, এটি রমজানের শেষ দশকের এক রাত। এমনকি এটি বেজোর রাত ছিল। হতে পারে সেটি লাইলাতুল কদর ছিল।

অনুরূপ এটি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাত। কারণ, এটি যুদ্ধের পূর্বরাত। এই রাত শেষে সকালেই বিরাট যুদ্ধ সংঘটিত হতে যাচ্ছে। যে যুদ্ধে মুসলমানগণ লক্ষ লক্ষ মুসলমানদের রক্তের বদলা নেবে। যাদের রক্তপাত ঘটেছে বর্বর তাতারীদের পাপিষ্ঠ হাতে।

বন্ধুরা, সত্যিই এটি একটি স্মরণীয় রাত।

এই রাতে সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এর অনুভূতি কেমন ছিল?

আমি দৃঢ়কণ্ঠে বলতে পারি, যুদ্ধের পূর্বরাতে হযরত খালেদ বিন ওয়ালেদ রা. এর অনুভূতি যেমন হতো, তার অনুভূতি কাছাকাছি তেমনই ছিল!!

খালেদ বিন ওয়ালিদ রা. বলতেন, 'বাসর রাত কিংবা যে রাতে আমাকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়, তা আমার নিকট সেই কনকনে শীতের রাতের চেয়ে অধিক প্রিয় নয়, যে রাতে আমি মুহাজিরদের সঙ্গে আল্লাহর শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি।'

প্রকৃত মুজাহিদ ব্যতীত এই স্বাদ অন্য কেউ উপলব্ধি করতে পারে না।

নিশ্চয়ই সে রাতে সাইফুদ্দীন কুতয রহ. সারারাত জায়নামাজে বসে দুআ করেছিলেন। 'হে আল্লাহ, মুসলমানদের জয়দান করুন। মুজাহিদদে অবিচল রাখুন।' তিনি দীর্ঘদিন ধরে এই রাতের অপেক্ষা করছিলেন। এটা এমন এক রাত, মিশরের রাজসিংহাসনে আরোহণের পর থেকে আজ পর্যন্ত তিনি যে রাতের অপেক্ষায় প্রহর গুনছিলেন।

তিনি দীর্ঘদিন ধরে ফসল বুনেছেন। এখন ফসল কাটার সময় হয়েছে।

ফজরের নামাজের সময় হলো। মুসলমানগণ মনোযোগ দিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করলেন, নামাজ শেষে তারা কাতার বিন্যাস করলেন এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। আর কিছুক্ষণ পরেই সূর্য উদিত হবে। সেটি ছিল ২৫ শে রমজান জুমাবার। পূর্বাকাশে সূর্য উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানগণ দূর থেকে তাতারী বাহিনীকে দেখতে পেলেন। বর্বর তাতারী বাহিনী উত্তর দিক থেকে আসছে। আইনে জালুত ময়দানের খুব কাছে চলে এসেছে। বিপুলসংখ্যক তাতারী ময়দানের শুরুভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। ময়দানে একজন মুসলমানও ছিল না। সকলেই টিলা ও ঝোপঝাড়ের আড়ালে অবস্থান করছিলেন।

তবে যখন তাতারী বাহিনী অগ্রসর হচ্ছিল তখন সাইফুদ্দীন কুতর রহ.-এর ইশারায় মুসলমানদের অগ্রগামী দল তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী রুকন উদ্দীন বাইবার্সের নেতৃত্বে ময়দানে নেমে আসে। কারণ, যেনো তাতারী বাহিনী তাদেরই পূর্ণ দল মনে করে।

আমিই তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করব

মুসলিম সৈন্যরা টিলার ওপর থেকে আইনে জালুতের ময়দানে নামতে থাকেন। অতঃপর ধীরে ধীরে ময়দানের উত্তর দিকে ধাবিত হতে থাকেন।

অগ্রগামী পুরো দল একবারই অবতরণ করেননি। তারা অদ্ভুত পদ্ধতিতে ধাপে ধাপে অবতরণ করেছে।

সারেমুদ্দীন আইবেক, যিনি মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, যিনি তাতারী সেনাপ্রধান কাতবুগার পার্শ্বে দীর্ঘদিন ছিলেন, তিনি মুসলিম বাহিনী টিলার আড়াল থেকে অবতরণ করার সময় মুসলিম বাহিনীকে সারিবদ্ধ করছিলেন, তিনি বলেন, সূর্য উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম বাহিনী বের হতে থাকে। তাদের পতাকা ছিল লাল-সাদা রঙের। তারা চমৎকার বর্ম পরিধান করেছিল।

অদ্ভুত দৃশ্য

মুসলমানদের প্রথম দল লাল সাদা রঙের চমৎকার পোশাক গায়ে মাঠে অবতরণ করেছে। সবাই একই রঙের পোশাক পরিহিত। তারা চমৎকার বর্ম পরিধান করেছে। অর্থাৎ তাদের বর্ম তলোয়র বর্শা ঘোড়া সবই ছিল দৃষ্টিনন্দন। তারা দৃঢ়পদে অভিনব পদ্ধতিতে অবতরণ করেছে।

মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের ময়দানে দলে দলে অবতরণ করছে। যেনো তারা সামরিক প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। তাদের রয়েছে ভাবগাম্ভীর্য। রয়েছে রক্তচক্ষু। যারাই তাদের দেখবে তাদের অন্তরে ভীতি-সঞ্চার হবে।

এই ছিল মুসলিম বাহিনীর প্রথম দল।

মনোযোগ দিয়ে সারেমুদ্দীন আইবেকের কথা শুনুন! তিনি তাতারী সেনাপ্রধান বর্বর খুনি কাতবুগার বর্ণনা দিচ্ছেন।

সারেমুদ্দীন আইবেক বলেন, কাতবুগা হতভম্ব। হতভম্ব তার সাথী-সঙ্গীরা। সুবহানাল্লাহ!

فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

> "যে কুফরি করেছিল সে হতভম্ব হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা জালেম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"[৮৭]

এবারই প্রথমবারের মতো কাতবুগা মুসলিম বাহিনীর বীরত্ব প্রদর্শন করে। সে তো মুসলিম বাহিনীকে দেখেছে তারা দুর্গের ভেতর আত্মগোপন করে। অথবা দেখেছে তারা তাতারীদের ভয়ে দ্রুত পলায়ন করেছে কিংবা দেখেছে, মুসলিম বাহিনী তাতারীদের তলোয়ারের নিচে নির্মম বলি হওয়ার জন্য নিকৃষ্ট আত্মসমর্পণ করেছে!!! কাতবুগা মুসলমানদের এই তিন অবস্থার কোনো এক অবস্থায় সর্বদা দেখে এসেছে। আজ যখন মুসলমানদের ময়দানে সশস্ত্র বীরত্ব প্রদর্শন করতে দেখছে, সে কোনোভাবেই হিসাব মেলাতে পারছে না।

কাতবুগা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বলল, হে সারেম, এরা কারা?!

মামলুকদের প্রত্যেকটি দল বিশেষ রঙে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল। যেমন এই দলটির রঙ ছিল লাল-সাদা। তারা লাল-সাদা পোশাক পরিধান করেছিল। তাদের পতাকার রঙও ছিল লাল-সাদা। তাদের ঘোড়া, উট ও অস্ত্রের ওপরও এই রঙের জীন বা কোষ ছিল ইত্যাদি। এই দলটি এই রঙ বিশেষিত ছিল।

---

[৮৭] সুরা বাকারা : ২৫৮।

তাই কাতবুগা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, এরা কারা? উত্তরে সারেমুদ্দীন আইবেক বললেন, এরা রোমান মামলুকদের একদল।

মুসলিম বাহিনীর বীরত্ব ও বাহ্যিক সৌন্দর্য যতই সুন্দর হোক না কেন, আমরা এই ক্ষুদ্রদলের বিপরীতে ভয়ংকর বর্বর পৈশাচিক তাতারী বাহিনীর সেনাপ্রধানের ভয় ও আতঙ্কের কারণ হাদীসের ভাষায়ই বুঝতে পারি। হাদীসটি ইমাম বুখারী রহ. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাবের রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির একাংশ হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

مسيرة شهر يقذفه في قلوب

"আমাকে এমন প্রভাব দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে, একমাস দূরত্বেও তা প্রতিফলিত হয়।"[৮৮]

ইমাম আহমদ রহ. হযরত উমামা রা.-এর সূত্রে আরেকটু অতিরিক্ত অংশ বর্ণনা করেছেন—

نصرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه في قلوب أعدائ

"আমাকে এমন প্রভাব দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে, একমাসের দূরত্বে যা প্রতিফলিত হয়, যা আল্লাহ তা'আলা আমার শত্রুদের অন্তরে ঢেলে দেন।"[৮৯]

ইমাম সিন্দি রহ. উল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখেন, এই ভীতি বাহ্যিক উপকরণ ছাড়াই শত্রুর অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করে। তবুও সাইফুদ্দীন কুতয রহ. যথাসাধ্য বাহ্যিক উপকরণ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেছেন। সুশৃঙ্খলভাবে তাদের সারিবদ্ধ করেছেন ইত্যাদি। এসবের কারণে তাতারীদের ভীতি আরও বেড়ে যায়।

ইমাম সিন্দি রহ. বলেন, এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খাসিয়ত (বৈশিষ্ট্য)। তবে উম্মতে মুহাম্মাদী যতদিন রাসূলের আদর্শ আঁকড়ে ধরবে ততদিন এই খাসিয়তের ফলাফল প্রতিফলিত হবে।

চলুন মূল আলোচনায় ফিরে যাই। কাতবুগা টিলার ওপর থেকে মুসলিম বাহিনীর অবতরণ দেখছিল।

---

[৮৮] *বুখারী :* ৩৩৫।

[৮৯] *মুসনাদে আহমদ :* ২২১৩৭।

প্রথম দলের অবতরণ শেষে দ্বিতীয় দল অবতরণ করল। যাদের গায়ে হলুদ বর্ণের সাজ-সজ্জা ছিল। তাদের সৌন্দর্যও অবর্ণনীয়।

ভয়ে কম্পমান কাতবুগা সারেমকে জিজ্ঞাসা করল, এরা কারা?

সারেম বললেন, এরা বালবান রুশাইদী মামলুকদের এক দল।

অতঃপর বিভিন্ন রঙের পোশাক পরিহিত মুসলিম দলগুলো একে একে অবতরণ করতে থাকে। কোনো দল বের হলেই কাতবুগা জিজ্ঞাসা করে, এরা কারা?

সারেম বলেন, যা মনে আসে আমি তাকে তা-ই বলতাম। অর্থাৎ তিনি দলগুলোর পরিচয় বিভিন্ন নামে দিতেন, যেগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। কারণ, তিনিও এসব দলকে চেনেন না। তবে তিনি কাতবুগার অন্তরে ভীতি সৃষ্টির ইচ্ছায় তাদের পরিচয় তুলে ধরেন।

বন্ধুরা, এসব দল ছিল মুসলিম বাহিনীর অগ্রগামী দল। তবে তা তাতারী বাহিনীর তুলনায় খুব সামান্য ছিল। সাইফুদ্দীন কুতয রহ. তার প্রধান দলটিকে টিলার আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তাতারীরা ধ্বংস হওয়ার পূর্বে তারা ময়দানে অবতরণ করবেন না।

সেনাপতি রুকন উদ্দীন বাইবার্সের নেতৃত্বে মুসলিম অগ্রগামী দল মাঠে নেমে আসার পর মামলুক মুসলিম সংগীত ব্যান্ড সামরিক বাহিনী মাঠে নেমে আসে। জোরে জোরে তবলা বাজাতে থাকে। শিঙ্গায় ফুঁ দিতে থাকে এবং অশুভ বাণী শোনাতে থাকে। মামলুকবাহিনীর এসব সাংকেতিক ধ্বনি তাতারীদের খুব অপরিচিত ছিল। যুদ্ধের প্রত্যেক কলা-কৌশলের ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনি ছিল। ডানে যাওয়া, বামে যাওয়া, অগ্রসর হওয়া, ফিরে আসা, ঘুরে দাঁড়ানো তথা প্রত্যেক অবস্থার জন্য পৃথক পৃথক ধ্বনি নির্ধারিত ছিল। এসব আওয়াজের মাধ্যমে সাইফুদ্দীন কুতয রহ. অতি সহজে দূর থেকে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করতে পারছিলেন। এমনিতে শত্রুরা ভীতিবিহ্বল ছিল। উপরন্তু এসব সাংকেতিক আওয়াজ শুনে তারা কাঁপতে শুরু করে। অপরদিকে মুসলিম সৈন্যবাহিনী এই সব আওয়াজের ফলে দৃঢ় থাকেন এবং প্রতিটি পদক্ষেপ সেনাপতি তাদের সঙ্গে আছেন, তা বুঝতে পারেন। সেনাপতি রুকন উদ্দীন বাইবার্স সৈন্যবাহিনীসহ আইনে জালুতের উত্তর প্রবেশদ্বারে অবস্থান করেন। যুদ্ধের সময় ঘনিয়ে আসে।

শুরু হলো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ

তাতারী সেনাপতি কাতবুগা মুসলিম অগ্রগামী দল প্রত্যক্ষ করল। কিন্তু টিলার আড়ালে যে প্রধান সৈন্যদল লুকিয়ে আছে, তা সামান্যও অনুধাবন করতে ব্যর্থ

হলো। তাই সে মুসলমানদের তাদের তুলনায় খুব সামান্য মনে করল। তবুও সে তার চির ভয়াবহ আকৃতিতে সামনে এগিয়ে এল। সে প্রথম ধাপেই মুসলিম বাহিনীকে ধ্বংস করতে চাইল। তাই সে তার পূর্ণ শক্তি নিয়ে মুসলিম অগ্রগামী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. যা চেয়েছিলেন, পরিপূর্ণভাবে তা-ই ঘটল।

তাতারী সেনাপ্রধান যুদ্ধের ইঙ্গিত প্রদান করল। তার ইঙ্গিতে ভয়ংকর তাতারী বাহিনী বিদঘুটে আওয়াজ তুলে মুসলিম বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এদিকে মুসলিম সেনাপতি রুকন উদ্দীন বাইবার্স শান্তমনে সৈন্যবাহিনীর মাঝে অবস্থান করছিলেন। তার সঙ্গে মুসলিম বীর বাহাদুর অটল অবিচলতার মূর্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মাঝে শান্তি ও ধীরস্থিরতা দান করেছিল। যেন তাদের সামনে তাতারীরা ছিলই না। যেন শত্রুরা এখনো মাঠেই আসেনি।

যখন তাতারীরা এগিয়ে এল, রুকন উদ্দীন বাইবার্স রহ. মুসলিম বাহিনীকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তারা বিরল বীরত্বে তাতারী বাহিনীর সম্মুখে এগিয়ে গেল। ভুলে যাবেন না, তাতারীদের তুলনায় মুসলিম অগ্রগামী দল ছিল খুব স্বল্প। উভয় দল ভয়াবহ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়।

যুদ্ধের ময়দানে ধুলো-বালি উড়তে থাকে। মামলুকদের তবলা ও বিভিন্ন সরঞ্জামাদির আওয়াজ সুউচ্চ হয়। ময়দানে চারপাশে দণ্ডায়মান কৃষকদের 'আল্লাহু আকবার' তাকবীর ধ্বনিতে আইনে জালুতের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়। মুসলিম সেনারা তাতারী বাহিনীর প্রাচীর ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে পড়ে। তাতারীরা একে একে ধরাশয়ী হতে থাকে। আর ময়দানে রক্তের বন্যা বয়ে যায়। সৈন্যবাহিনীর চিৎকারের পাশাপাশি তলোয়ারের ঝনঝন আওয়াজ ভেসে ওঠে।

মুহূর্তের মাঝে যুদ্ধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করে। উপস্থিত সকলে এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করে, যা ইতিপূর্বে জীবনে কখনো প্রত্যক্ষ করেনি।

এই দলটি মুসলিম দলগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ দল ছিল। সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এই দলটিকে তাতারীদের প্রথম ধাক্কা সামলানোর জন্য নির্বাচন করেছিলেন। সত্যি তার এই নির্বাচন ছিল অতি প্রশংসনীয়। যে দল যুদ্ধের প্রথম ভাগে বিজয়ী হতে পারে। সেই দল সাধারণত শেষ পর্যন্ত বিজয় ধরে রাখতে সক্ষম হয়। কেবল

সামরিক বিজয়ই তাদের পক্ষে থাকে না, বরং মানসিক বিজয়ও তাদের পক্ষে থাকে।

রুকন উদ্দীন বাইবার্সসহ অগ্রগামী দলের অধিকাংশ সৈন্যই সেইসব বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, যারা ইতিপূর্বে ফ্রান্সের রাজা লুইস তাসে'র নেতৃত্বাধীন ফারেসকুর ও মানসুরা এই দুই ক্রুশেড যুদ্ধে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধ দুটি দশ বছর পূর্বে ৬৪৮ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। ফলে তারা ছিল রণশাস্ত্রে দক্ষ ব্যক্তিত্ব। যুদ্ধনীতি ও যুদ্ধপদ্ধতি সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।

শক্তির অকার্যকারিতা

সৈন্যস্বল্পতা সত্ত্বেও যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী অটল-অবিচল থাকেন। অথচ টিলার ওপারে অবস্থিত বাহিনীর জন্য কোনো শক্তি সংরক্ষণ না করে কাতবুগা তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে।

এত কিছু সত্ত্বেও সাইফুদ্দীন কুতয রহ. দূর থেকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। উপযুক্ত মুহূর্ত আসার পূর্বে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হন না। কয়েক মিনিট কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত হয়, যেন কয়েক দিন ও কয়েক মাস অতিবাহিত হলো।

দুই দলের সৈন্যসংখ্যায় আকাশ -জমিন ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও উভয় দলের মঝে বিজয়ের হাতছানি দেখা দিচ্ছিল। কখনো মনে হচ্ছিল মুসলমানদের বিজয়ের পাল্লা ভারী। আর কখনো মনে হচ্ছিল তাতারীদের বিজয়ের পাল্লা ভারী।

এটি সামরিক পরিকল্পনার প্রথম অংশ ছিল তথা তাতারী বাহিনীর শক্তি খর্ব করা এবং মুসলমানদের শক্তি প্রদর্শন করত তাদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করা।

এরপর দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রয়োগের সময় ঘনিয়ে এল। দ্বিতীয় পরিকল্পনা ছিল তাতারী বাহিনীকে আইনে জালুত ময়দানের মাঝখানে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা করা। কারণ, যদি কোনোভাবে তাদের ময়দানের মাঝে নিয়ে আসা যায় তাহলে তাদের চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলা খুব সহজ হবে।

কঠিন হলেও রুকন উদ্দীন বাইবার্স দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন শুরু করেন। এই পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের পদ্ধতি হলো, বাহ্যত তাতারীদের সম্মুখে পরাজয়ভাব প্রকাশ করতে হবে এবং যুদ্ধরত অবস্থায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে হবে।

এমনভাবে ফিরে আসার ভাব প্রকাশ করতে হবে যেন তা খুব দ্রুত না হয় যে, তাতারীদের দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। আবার ধীর গতিতে ফিরে আসা যাবে না, নতুবা ধ্বংসের কবলে পড়তে হয়। প্রত্যাবর্তনে এই ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন দক্ষ নেতৃত্বের, অনুরূপ প্রয়োজন যুদ্ধশাস্ত্রে পারদর্শী সৈন্যের।

আলহামদুলিল্লাহ! মুসলিম বাহিনীর মাঝে এই গুণগুলো পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। তা ছাড়া এই দলের সঙ্গে আল্লাহর সহযোগিতা শামেলে হাল ছিল।

বন্ধুরা, উনিশ হিজরীতে পারস্যশক্তির বিরুদ্ধে সংঘটিত বিখ্যাত নাহাওয়ন্দ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। সেই যুদ্ধে মুসলিম সেনাপতি বিখ্যাত সাহাবী কা'কা' ইবনে আমর তামীমী রা. যেই ভূমিকা পালন করেছিলেন, আইনে জালুতের যুদ্ধে সেনাপতি রুকন উদ্দীন বাইবার্স সেই ভূমিকা পালন করেন। নাহাওয়ন্দ যুদ্ধে বিখ্যাত সাহাবী মুজাহিদে আজম নু'মান ইবনে মুকাররিন রা. সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, আইনে জালুতের যুদ্ধে সাইফুদ্দীন কুতয রহ. সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। সেই যুদ্ধে কা'কা' ইবনে আমর তামীমী রা. মুসলিম বাহিনীকে সাময়িক ফিরিয়ে এনে পারস্য বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে ফেলেন।

আইনে জালুতের যুদ্ধে সাইফুদ্দীন কুতয রহ. মুসলমানদের সেই পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগান এবং নাহাওয়ন্দ যুদ্ধের পরিকল্পনাকে পুরোপুরি বাস্তবায়ন করেন। রুকন উদ্দীন বাইবার্স ধীরে ধীরে পিছপা হতে থাকেন। তিনি এক কদম পিছপা হলে তাতারী বাহিনী এক পা অগ্রসর হয়।

মুসলমানরা অতি উত্তমভাবে পরাজয়ভাব গ্রহণ করেন। অন্যদিকে তাতারী সেনাপ্রধান কাতবুগা ও তাতারী বাহিনীর মুসলমানদের পরাস্ত করার লোলুপ দৃষ্টি প্রসারিত করে। মুসলমানদের পাকড়াও করার অভিলাষে তারা ময়দানে প্রবেশ করে। এভাবে কিছু সময় ব্যয় হয়। অবশেষে গোটা তাতারী বাহিনী আইনে জালুতের সমতল ভূমিতে প্রবেশ করে। এদিকে রুকন উদ্দীন বাইবার্স মুসলিম অগ্রগামী দল নিয়ে আইনে জালুত ময়দানের দক্ষিণ পার্শ্বে গিয়ে অবস্থান করে। কাতবুগা তার সর্বশক্তি ও গোটা বাহিনী নিয়ে মাঝ মাঠে চলে আসে। আত্মরক্ষামূলক কোনো বাহিনী বা শক্তি মাঠের বাইরে রাখে না!!

কাতবুগা এই কাজ কীভাবে করল?

নিঃসন্দেহে এটি সামরিক বড় ভুল!!

কাতবুগা তো দক্ষ সামরিক সেনাপতি। তার রয়েছে রণক্ষেত্রের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা। তার জীবনের দীর্ঘ ষাট কিংবা সত্তর বছর অতিবাহিত হয়েছে। সে তো চেঙ্গিজ খানের সমসাময়িক। চেঙ্গিজ খান আইনে জালুত যুদ্ধের প্রায় চৌত্রিশ বছর পূর্বে ইন্তেকাল করেছে। কাতবুগা তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যুদ্ধ ও নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনে কাটিয়েছে।

একজন যোগ্য সেনাপ্রধান হিসেবে তার দায়িত্ব ছিল, বিপর্যস্ত মুহূর্তে ফিরে যাওয়ার পথ উন্মুক্ত রাখার জন্য ময়দানের বাইরে একদল সেনাবাহিনী মোতায়েন করা। পাশাপাশি তারা যেন মুসলিম বাহিনী ধাওয়া করলে তাদের প্রতিহত করতে পারে।

কিন্তু কাতবুগা এসব প্রতিরক্ষা গ্রহণ করেনি!!

যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে যথাযথ চিন্তা-ভাবনা করতে তাতারী বাহিনী বিবেকশূন্য হয়ে পড়েছিল। তাদের বিবেক সঠিক চিন্তা করতে পারেনি। তার এই বিবেকহীন কাজের কখনো এই ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হয় যে, সে মুসলিম বাহিনীকে চিরতরে ধ্বংস করে দিতে মুখিয়ে ছিল। আবার কখনো এই ব্যাখ্যা করা হয় যে, তাতারী গোয়েন্দাদের অদূরদর্শিতার কারণে এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল। কারণ, গোয়েন্দারা মুসলিম বাহিনী সম্পর্কে সঠিক তথ্য সেনাপ্রধান কাতবুগাকে প্রদান করতে পারেনি। আর কেউ কেউ বলেন, কাতবুগা এই যুদ্ধে আত্মম্ভরিতা ও অহংকারের কারণে ধোঁকাগ্রস্ত হয়েছে। কারণ, কাতবুগার মাথার তালু থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত অহংকারে ভরা ছিল। অহংকারবশত সে মুসলিম বাহিনীকে তুচ্ছ মনে করেছিল। কেউ বলেন, এই ভয়াবহ ঝুঁকি গ্রহণের মাঝে কাতবুগার বিশেষ টার্গেট ছিল। যা আমরা জানি না।

কাতবুগার ভুলের যেই ব্যাখ্যাই দাঁড় করানো হোক না কেন, কোনো ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, কাতবুগার মতো বিখ্যাত তাতারী সেনাপ্রধান, যার সত্তর বছরের দীর্ঘ জীবন শত শত যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় পূর্ণ, তার পক্ষে এমন সাধারণ ভুল কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।

তবে একটি ব্যাখ্যা অবশিষ্ট আছে, যা এই স্থানে গ্রহণযোগ্য। তা হলো, এটি ছিল মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের তদবীর, যা মানুষের অনুমান ও জ্ঞানের গণ্ডির বহির্ভূত। আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট মানুষকে নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে নিয়োজিত করেন। যদি কারও জীবনে হাজারবার একই বিষয় সামনে

আসে, তবুও সে নিজ জ্ঞানে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। আল্লাহ রব্বুল আলামীন চেয়েছেন তাতারী বাহিনী মুসলমানদের হাতে ধ্বংস হোক। তাই আল্লাহ তা'আলা কাতবুগাকে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করেছেন, তা কখনোই কোনো ব্যাখ্যাই তার মতো সুদক্ষ অভিজ্ঞ সেনাপ্রধানের জন্য সমীচীন নয়। তার বিরাট সৈন্যদলের জন্যও এই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া সমীচীন হয়নি। তা ছাড়া আইনে জালুতের ময়দান পাখির খাঁচার মতো যার প্রবেশদ্বার একটি, এমন রণভূমিতে এই সিদ্ধান্ত ধ্বংসাত্মক বৈ আর কী? সৈন্যবাহিনী খাঁচায় প্রবেশ করল। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো। তখন মুক্তি পাওয়া তো অসম্ভব।

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

"তারা ষড়যন্ত্র করে। আল্লাহ কৌশল করেন। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী।"[৯০]

আমরা ইতিপূর্বে বদর যুদ্ধে দেখেছি, আবু জাহেল কাফের বাহিনীকে বদর প্রান্তরে প্রবেশ করতে বাধ্য করেছে। অথচ সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ বিষয়ে তাকে বাধা প্রদান করেছিল। ফলে মক্কার সরদার আবু জাহেলের কারণে মক্কার কাফেরদের ধ্বংস হয়েছিল।

আমরা ইতিপূর্বে ইয়েমেনের বিখ্যাত যুদ্ধে মুসায়লামাতুল কাযযাবকে দেখেছি, সে তার বাহিনীকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

নাহাওয়ান্দ যুদ্ধে ফিরোযানকে দেখেছি, সে সৈন্যবাহিনীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

আমরা ইয়ারমুক যুদ্ধে রোমান সেনাপতি বাহানকে দেখেছি, সে তার বাহিনীকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে ফেলে দিয়েছিল।

কারও একথা বলার সুযোগ নেই যে, যদি সেনাপতি ভেবে-চিন্তে পদক্ষেপ নিত, তাহলে এমন হতো না। যদি সেনাপতি অমুকের কথা শুনত বা মানত।

বন্ধুরা, তাদের ধ্বংসের পথে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল।

শক্তি যত বেশি হোক না কেন, সৈন্যসংখ্যা যত বেশি হোক না কেন, যত প্রকার অস্ত্রশস্ত্র থাক না কেন, আল্লাহর অভিপ্রায় থেকে তারা কখনোই বের হয়ে

---

[৯০] সুরা আনফাল: ৩০।

আসতে পারবে না। সে সকল বান্দা আল্লাহকে সহযোগিতা করেন আল্লাহ তা'আলা তাদের বিজয় দান করেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন—

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

"যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো, আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন।"[৯১]

এটি এমন অমোঘ বিধান, যার ব্যতিক্রম কখনো হয় না। এ কারণেই কাতবুগা তার গোটা সৈন্যবাহিনীকে আইনে জালুতের মাঝ মাঠে যেতে বাধ্য করে। এভাবেই মুসলিম বাহিনীর দ্বিতীয় পরিকল্পনাটিও সফল হয়। এবার তৃতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পালা। সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এর পক্ষ থেকে সঙ্গীতের ভাষায় তবলার বাজনায় তৃতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশ এল।

কাতবুগা ফাঁদে আটকা পড়ল

টিলার পেছন থেকে মুসলিম বাহিনীর প্রধান দলটি যুদ্ধের ময়দানে নেমে এল। চতুর্দিক থেকে মুসলমানরা নেমে এল। শক্তিশালী বাহিনীটি দ্রুত উত্তরের প্রবেশদ্বারটি ঘেরাও করে ফেলল। কয়েক মিনিটের মধ্যে মুসলমানরা তাতারীদের বেষ্টন করে ফেলল, চুড়ি যেমন হাতের কব্জিকে বেষ্টন করে।

এই পরিকল্পনাটি ছিল অতি সূক্ষ্ম ও অত্যন্ত উপকারী। তবে এই পরিকল্পনাটি মুসলিম বাহিনীর জন্য অত্যন্ত ক্ষতির কারণ হতে পারে। কেন? কারণ, পালাবার পথ না রেখে চতুর্দিক থেকে তাতারীদের অবরোধ করলে প্রাণরক্ষার জন্য তারা তাদের সর্বশক্তি ব্যয় করতে বাধ্য হবে। তখন তারা আত্মঘাতী হামলায় অবতীর্ণ হবে।

অবরুদ্ধ ব্যক্তির লড়াই ... বাঁচা-মরার লড়াই; জয়-পরাজয়ের লড়াই নয়। কিন্তু যদি এই পরিকল্পনাটি সফলতার মুখ দেখে তবে বিপুলসংখ্যক তাতারীদের ধ্বংস অনিবার্য। এতে চিরদিনের জন্য তাতারীদের কোমর ভেঙে যাবে।

সময় ফুরিয়ে যাওয়ার পর কাতবুগা মুসলমানদের সামরিক পরিকল্পনা বুঝতে পারে। সে এবং সকল তাতারী বাহিনী আইনে জালুতের মাঝমাঠে আটকা পড়ে। পৃথিবীর ইতিহাসে মারাত্মক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মুখোমুখি হয় তাতারী বাহিনী। পালাবার পথ নেই। মুক্তির কোনো উপায় নেই। মুসলিম মুজাহিদগণ

---

[৯১] সুরা মুহাম্মদ : ০৭।

চার পাশ থেকে তাদের বেষ্টন করে রেখেছে। তলোয়ার ও বর্শা ব্যতীত আত্মরক্ষার কিছুই নেই। মৃত্যুই একমাত্র পরিণাম।

আত্মবিনাশী নির্মম যুদ্ধ। তাতারীরা নিজেদের সর্বশক্তি ও ক্ষমতা ব্যয় করে। প্রাণপণ লড়াই শুরু করে। আর মুসলমানগণ অটল-অবিচল।

ডান দিকের তাতারী বাহিনী বীরত্ব প্রকাশ শুরু করে। যেমনটি সারেমুদ্দীন আইবেক বলেছিলেন, তাদের ডানদিক অধিক শক্তিশালী হবে। ডান দিকের তাতারীরা বামদিকের মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করে। বাম পাশের মুসলিম বাহিনীর ভেতরে ঢুকে পড়ে। বাম দিকের মুসলমানরা উপর্যুপরি আক্রমণে পশ্চাদ্ধাবন করতে শুরু করে। শহীদরা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তাতারীদের পাল্লা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ময়দানের প্রবেশদ্বার বন্ধ করে ফেলা বাহ্যত মুসলমানদের জন্য ভয়াবহ ক্ষতির কারণ মনে হয়।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. উঁচু স্থানে বসে সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন এবং শূন্যস্থান পূরণে মুসলিম বাহিনীদের বিভিন্ন স্থানে পাঠাচ্ছিলেন।

বাম দিকের মুসলিম বাহিনী যে দুর্যোগের শিকার, সাইফুদ্দীন কুতয রহ. তা প্রত্যক্ষ করছিলেন। তিনি সেদিকে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করেন। এদিকে তাতারীদের উপর্যুপরি আক্রমণ অব্যাহত। কতিপয় মুসলমান পরিস্থিতিকে বড় কঠিন মনে করলেন। হয়তো কেউ কেউ জয়লাভের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়েন। তাতারীদের সম্পর্কে প্রসিদ্ধ ভয়াবহ বাণী আমরা ভুলিনি—'তাতারীরা অপরাজেয়!'

হায়! ইসলা...ম

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. যুদ্ধের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যাবেক্ষণ করছিলেন। বামদিকে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করেন। কিন্তু পরিস্থিতি ছিল বড়ই ভয়াবহ। কুতয রহ. এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একটি উপায় দেখছিলেন। এছাড়া তার সামনে কোনো পথ ছিল না।

তিনি স্বশরীরে যুদ্ধের ময়দানে অবতরণ করাকে অপরিহার্য মনে করলেন।

যুদ্ধের ময়দানে স্বশরীরে উপস্থিত থেকে যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে সৈন্যবাহিনীকে উজ্জীবিত রাখতে হবে।

তিনি কার্যকরী পদ্ধতিতে সৈন্যবাহিনীর সামনে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেন যে, আল্লাহর পথের মৃত্যুই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

আমরা আখেরাত চাই। তারা পার্থিব জগৎ চায়... ইত্যাদি।

এই কাজগুলো সাইফুদ্দীন কুতয রহ. উত্তমপন্থায় আঞ্জাম দেন।

তিনি নিজ শিরস্ত্রাণ মাটিতে ফেলে দেন শাহাদাতলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও মৃত্যুর অভয় প্রকাশ করার জন্য। তিনি তার প্রসিদ্ধ গর্জন দেন, যা রণক্ষেত্রের মানদণ্ডকে পরিবর্তন করে দেয়।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. উচ্চকণ্ঠে আওয়াজ দেন—হায়! ই স লা...ম। হায়! ই স লা...ম!!

তিনি নিজেকে জনসমুদ্রের মাঝে নিয়ে যান।

সৈন্যবাহিনী সাইফুদ্দীন কুতয রহ. কে তাদের মাঝে দেখতে পেয়ে হুঁশ ফিরে পান, সম্রাটও আমাদের মতো দুর্ভোগ সহ্য করছেন! আমাদের মতো লড়াই করছেন!!

বলুন, আর কোকো সেনা মোতায়েন, কিংবা সান্ত্বনা বা প্রবোধ প্রদানের দরকার আছে?!

এতে সকলের কাছে পরিস্থিতি মোকাবেলায় কী করবে, তা স্পষ্ট হয়।

করণীয় একটিই। ইসলাম বাঁচাও, ইসলাম রক্ষা করো। রাজত্ব রক্ষা করা কিংবা রাজসিংহাসন টিকিয়ে রাখা উদ্দেশ্য নয়; পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সম্পদ রেখে যাওয়াও উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হলো ইসলাম রক্ষা করা।

বন্ধুরা, এটি ছিল যথাযথ সিদ্ধান্ত

দুই সেনাপতির মধ্যে অনেক পার্থক্য, যাদের একজন সত্যবাদী, যিনি ধর্ম ও জাতির জন্য লড়াই করেন। আরেকজন মিথ্যাবাদী, যিনি কথার ফুলঝুরি ওড়ান। আর নিজের জন্য বেঁচে থাকেন।

যুদ্ধের অগ্নিশিখা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। তাতারীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুসলিম বহিনীর প্রাণ হাতের মুঠোয় চলে আসে।

এই আক্রমণ মুসলিম বাহিনীর ওপরই ছিল না, বরং এটি ছিল ইসলামধর্মের ওপর আক্রমণ।

আইনে জালুত প্রান্তরে যুদ্ধের লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। কৃষকদের 'আল্লাহু আকবার' তাকবীর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাশ মুখোরিত হয়। মুসলমানগণ রমজানুল মোবারকের এই পবিত্র দিবসে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করেন।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. আশ্চর্যভাবে লড়ে যান।

জনৈক তাতারী কুতয রহ. কে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে, তীরটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কুতয রহ. এর ঘোড়ার গায়ে বিদ্ধ হয়। ফলে কুতয রহ. ঘোড়া থেকে পড়ে যান। ঘোড়াটি তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হয়। এবার কুতয রহ. পদব্রজে লড়াই করতে থাকেন। ঘোড়া নেই। তবু অন্তরে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। তিনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেননি। জীবনের মায়া তাকে বাধাগ্রস্ত করেনি।

জনৈক মুসলিম আমীর কুতয রহ. কে পদব্রজে লড়াই করতে দেখে দ্রুত এগিয়ে এসে নিজের ঘোড়া থেকে নেমে তাকে ঘোড়ায় আরোহণের অনুরোধ জানান। কিন্তু কুতয রহ. তাকে বাধা প্রদান করে বলেন, আমি মুসলমানদের তোমার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করতে চাই না।

তিনি অবিরাম পদব্রজে লড়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় সৈন্যরা একটি অতিরিক্ত ঘোড়া নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হয়!!

তার এই পদক্ষেপের কারণে কয়েকজন আমীর তাকে তিরস্কারের ভাষায় বলেন, কেন আপনি অমুকের ঘোড়ায় আরোহণ করেননি? শত্রু আপনাকে দেখলে তো হত্যা করে ফেলত এবং আপনার কারণে ইসলামে ধ্বংস নেমে আসত।

কুতয রহ. দৃঢ়তার সঙ্গে তাদের উত্তর দেন, 'আমি জান্নাতপানে ধাবিত হতাম। আর ইসলামের মালিক ইসলামকে ধ্বংস হতে দিতেন না। ইসলামের জন্য অমুক অমুক অমুক নিহত হয়েছেন। তিনি এক জামাত রাজার নাম উল্লেখ করলেন [যেমন হযরত উমর, উসমান, আলী রা.]। তাদের মৃত্যুর পর আল্লাহ এমন কাউকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন, যারা অন্যদের হেফাজত করেছেন এবং ইসলাম ধ্বংস হয়নি।'

হে কুতয, তুমি মুসলমানদের আদর্শ ছিলে, থাকবে

আপনার মতো মহান ব্যক্তিদের কাঁধেই মুসলিম উম্মাহ আরোহণ করে। এমন পরিস্থিতিতে মুসলিম বাহিনী প্রাণপণ লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়। তাতারীদের মতো তাদের সামনে বাঁচা-মরার প্রশ্ন ছিল না। তাদের সামনে ছিল বিজয় বা শাহাদাতলাভের প্রশ্ন।

আল্লাহর রহমতে মুসলমানদের জয়ের পাল্লা ভারী হতে থাকে। তাতারীরা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। ক্রমান্বয়ে তাতারীদের ওপর মুসলিম বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে। কাফেরদের জন্য দিনটি বড়ই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

তাগুতি শক্তির পতন

জামাল উদ্দীন আকুশ শামসী নামক জনৈক দক্ষ যোদ্ধা ও মামলুক আমীর এগিয়ে আসেন। তিনি প্রথমত নাছের ইউসুফ আইয়ূবীর মামলুক ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি নাছের ইউসুফের বিশ্বাসঘাতকতা প্রত্যক্ষ করেন, তখন তিনি তার দল ত্যাগ করে সাইফুদ্দীন কুতয রহ.-এর দলে যোগ দেন। তিনি লড়াই করতে করতে এগিয়ে যান। তাতারীদের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ডিঙিয়ে একপর্যায় তিনি তাতারী সেনাপ্রধান কাতবুগার কাছাকাছি পৌঁছে যান!!

আল্লাহ তা'আলাই জামাল উদ্দীনকে কাতবুগার কাছে প্রেরণ করেছেন। মুসলিম বীর জামাল উদ্দীন তলোয়ার উঁচিয়ে ধরেন এবং নিজের সর্বশক্তি দিয়ে অহংকারী তাগুত কাতবুগার গর্দানে তলোয়ার চালান। অহংকারীর মস্তক মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তাতারী নেতার পতন ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে তাতারী বাহিনীর যাবতীয় সংকল্প ধূলিসাৎ হয়।

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ

> "তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে, তখন তুমি নিক্ষেপ করো নি। আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন।"[৯২]

তাতারীদের যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে পরিবর্তন আসে। তাদের সামনে দুশ্চিন্তা দূর হওয়ার একটাই পথ, কোনোভাবে আইনে জালুতের উত্তর দিকে পালাবার পথ বের করা। এদিকে মুসলমানগণ তাদের পেছনে ধাওয়া করে কাউকে হত্যা করছেন আবার কাউকে বন্দী করছেন।

তাতারী বাহিনী মুসলমানদের পদতলে পিষ্ট। যেনো তারা খেজুর বৃক্ষের শুকনো ডাল। সব সুনাম জলে ভেসে যায়। সব অহংকার ধুলোয় মিশে যায়। পৃথিবীবাসীর অন্তর থেকে চিরতরে 'তাতারীত্রাস' দূর হয়। তাতারীরা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে।

বিসান নামক স্থানে আবার যুদ্ধ

তাতারীরা আইনে জালুতের উত্তর দিকে পালাবার সামান্য পথ তৈরি করতে সর্বশক্তি ব্যয় করে। ময়দানের প্রবেশদ্বারের প্রাচীর ভেঙে একসময় তারা পালাবার সামান্য পথ খুঁজে পায়। অতি দ্রুতবেগে তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। অল্প

---

[৯২] সূরা আনফাল : ১৭।

সময়ের মাঝে অসংখ্য তাতারী পলায়ন করে। যেনো সেদিকে কোনো পালাবার স্থান রয়েছে। মুসলিম বাহিনী তাদের পিছে পিছে ছুটছে। তাদের কোনোভাবেই তারা ছেড়ে দেবে না। কারণ, যুদ্ধে জয়লাভ করা কিংবা সাময়িক রাজনৈতিক ফায়েদা অর্জন করাই মুসলমানদের লক্ষ্য নয়; বরং মুসলমানদের লক্ষ্য হলো, জিহাদের মাধ্যমে গোটা মুসলিমবিশ্বের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়া।

তাতারীরা উত্তর দিকে ধাবমান কিন্তু মুসলমানরা কিছুতেই তাদের পিছু ছাড়ছে না

পলাতক তাতারী বাহিনী [আইনে জালুতের উত্তর-পূর্বে বিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত] বিসান নামক স্থানে পৌঁছে। তারা উপলব্ধি করে, মুসলমানরা তাদের ধরতে বদ্ধপরিকর। তাই তারা বিসানের নিকটবর্তী স্থানে নতুন করে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। সকল ইতিহাসবিদ এ ব্যাপারে একমত যে, এই যুদ্ধটি পূর্বের যুদ্ধের চেয়ে আরও কঠিন ছিল। কারণ, এ যুদ্ধে তাতারীরা জীবন-রক্ষার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যয় করেছিল। প্রাণপণে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুসলমানদের ওপর। পরিস্থিতি পাল্টে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। মুসলমানরা পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছিল। মুসলমানদের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড ভূমিকম্প বয়ে যায়। এই মুহূর্তগুলো মুসলিম বাহিনীর জীবনের সবচেয়ে দুর্বিষহ মুহূর্ত ছিল। সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এ সবকিছু প্রত্যক্ষ করছিলেন।

তিনি এই ঘটনার পাশে ছিলেন না; বরং ঘটনার কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

কুতয রহ. পুনরায় সৈন্যদের অনুপ্রাণিত করতে শুরু করেন এবং তাদের জন্য অবিচলতার দুআ করেন। এরপর তিনি স্মরণীয় আহ্বানে গর্জে ওঠেন—হায়! ইসলা...ম! হায়! ই সলা...ম! হায়! ই স লা...ম!!

তিন বার এই আহ্বান শেষে বিনম্রচিত্তে দুআ করেন, হে আল্লাহ, তোমার বান্দা কুতযকে তাতারীদের বিরুদ্ধে সাহায্য করো। আল্লাহু আকবার!

এমন বিপদ-মুহূর্তে তিনি নিজের পরিচয় কতইনা চমৎকারভাবে পেশ করেন। 'তোমার বান্দা।'

হে আল্লাহ, তোমার বান্দা কুতযকে তাতারীদের বিরুদ্ধে সাহায্য করো।

আমি কোনো রাজা-বাদশা নই। আমি আমীরুল মুসলিমীন নই। আমি মিশরের রাজাও নই। আমি তোমার বান্দা।

দেখুন! বান্দা কীভাবে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করে। এরপরও কি আল্লাহ তা'আলা তাকে বঞ্চিত করবেন?

ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. হযরত আবু হুরাইরা রা. সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني؛ فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب مني شبراً تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة

"আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, আমি সেরূপই যেরূপ বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি তার সাথে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও নিজে তাকে স্মরণ করি। আর যদি সে আমাকে লোক-সমাবেশে স্মরণ করে, তবে আমিও তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশে তাদের স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। যদি সে আমার দিকে এক বাহু অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দুই বহু অগ্রসর হই। আর যদি সে আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই।"[৯৩]

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এমন দরজায় কড়া নেড়েছেন, সেই দরজায় মন দিয়ে কেউ যদি কড়া নাড়ে তবে তা তার জন্য খুলে দেওয়া হয়।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এমন সত্তার নৈকট্য অবলম্বন করেছেন, আসমান জমিনের চাবিকাঠি যার হাতে।

বন্ধুরা, যখন পৃথিবীর রাজা বিনয়ী হয়, তখন আসমান-জমিনের রাজা তার প্রতি অবশ্যই রহম করেন।

যেনো রূপকথার গল্প

সাইফুদ্দীন কুতয রহ.-এর দুআ ও রোনাজারি শেষ না হতেই তাতারীশক্তি সম্পূর্ণরূপে দুর্বল হয়ে পড়ে।

---

[৯৩] *বুখারী :* ৭৪০৫, *মুসলিম :* ২৬৭৫।

যারা গোটা দুনিয়াকে স্তম্ভিত করে রেখেছিল। তারা বিসানভূমিতে মাছির মতো পড়তে থাকে। মুসলমানগণ অপরাজেয় শক্তিকে রূপকথায় পরিণত করেন। ইসলামের পতাকা সমুন্নত হয়। তাতারীদের পতাকা মাটিতে লুটে পড়ে। চল্লিশ বা তদূর্ধ্ব বছর ধরে মুসলমানগণ সেই দিনটির অপেক্ষা করছিলেন, সেই দিনটি চলে এসেছে।

وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

"সেদিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে আল্লাহপ্রদত্ত বিজয়ের কারণে। তিনি যাকে ইচ্ছা বিজয়দান করেন। তিনিই ক্ষমতার মালিক। পরম দয়ালুও বটে।"[৯৪]

পাঠকবৃন্দ, আপনারা কি জানেন, আইনে জালুতের যুদ্ধের পর কয়জন তাতারী বেঁচে ছিল?

গোটা তাতারী বাহিনী ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়েছিল। একজন তাতারীও বেঁচে ছিল না। আপনারা কি এমন ঘটনা কখনো শুনেছেন? যেই বাহিনী অর্ধ-দুনিয়া দখল করেছিল, মুহূর্তেই তারা ধ্বংস হলো। যারা লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তপাত ঘটিয়েছিল, শত শত শহর বিরানভূমিতে পরিণত করেছিল, মুহূর্তেই তারা অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ল।

মুসলিম বাহিনী বিরাট জয়লাভ করল।

স্বাগতম হে মুসলিম বীর সেনা!

স্বাগতম হে কুতয! এখন তো ফসল কাটার সময় এসেছে।

ومالنصر إلا من عند الله

"এ বিজয় তো কেবল আল্লাহরই দান।"

বিসান ভূমিতে তাতারীদের ধরাশায়ী হতে দেখে কুতয রহ. কী করলেন

মুজাহিদে আজম, বীর সেনানী খোদাভীরু মুত্তাকী সাইফুদ্দীন কুতয রহ. ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচে নামলেন। মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে সেজদায় অবনত হয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন।

---

[৯৪] সূরা রূম : ৪-৫।

বিজয়ীদের ধোঁকায় তিনি সেজদাবনত হন নি এবং অহংকারবশত তিনি মাথা তোলেননি।

তার মাঝে এই ক্রিয়াও সৃষ্টি হয়নি যে, তিনি কিছু একটা করেছেন। বরং তার হৃদয় গহীনে একথা বদ্ধমূল ছিল, এসবই মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপা। তিনিই তাকে মুজাহিদ হিসেবে নির্বাচন করেছেন, তিনিই তাকে অবিচল রেখেছেন। তিনিই তাকে যুদ্ধের প্রজ্ঞা দান করেছেন। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের তৌফিক দান করেছেন। তিনি তাকে সঠিক পথে পরিচলিত করেছেন।

চমৎকার একটি কবিতা শুনুন!

أن تعرف أنك عبد الله.. لا تنصر إلا بنصره

.. ولا تنجو إلا برحمته، ولا تتحرك إلا بإرادته

.. لله الأمر من قبل ومن بعد "

"সর্বদা মনে রেখো, তুমি আল্লাহর বান্দা।
তার সাহয্যেই তুমি জয়লাভ করো।
তার দয়া ছাড়া তুমি মুক্তি পাবে না।
তার ইচ্ছা ব্যতীত তুমি এক কদম নড়তে পারবে না।"
"সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহরই; পূর্বেও এবং পরেও।"[৯৫]

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এর প্রকৃত পরিচয় জানতে হলে পৃথিবীর অন্যান্য রাজা বাদশাদের দেখুন, যারা অহংকার ও গর্বে ফুলে থাকে, যারা সৃষ্টিজীবের ওপর বড়ত্ব প্রদর্শন করে, যারা মুখ বাকিয়ে কথা বলে, যারা দম্ভ করে জমিনে চলাফেরা করে। কিন্তু সাইফুদ্দীন কুতয রহ. জাতির জন্য যা করেছেন, তারা তার এক-দশমাংশও করেনি; বরং তারা জগদ্বাসীর জন্য বিপদ ছিল। অন্যান্য রাজা-বাদশাদের এসব পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলেই কুতয রহ. প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

"বিপরীত বস্তুর মাধ্যমে বস্তুর পরিচয় পরিষ্কার হয়।"

এ কারণেই কুতয রহ.-এর জয়লাভে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। কারণ, আল্লাহ রব্বুল আলামীন কারও প্রতি সামান্য অবিচার করেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

---

[৯৫] সূরা রূম : ০৪।

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ

"আমি তাকে [মানুষকে] দুইটি পথ [ভালো-মন্দ] দেখিয়েছি।"[৯৬]

মানুষ ভালো-মন্দের মাঝে যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করে।

কুতয রহ. শান্ত ও অনুকূল পরিস্থিতিতে মিশরের ক্ষমতায় আসেননি।

মিশর সাম্রাজ্য শক্তিশালী সুপ্রতিষ্ঠিত থাকাকালীন তিনি মিশর শাসন করেন নি। তিনি মিশরে অঢেল সম্পত্তি থাকাকালীন সিংহাসনে আরোহন করেন নি; বরং পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টো ছিল।

তবে তিনি আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করেছেন। সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছেন এবং অন্যদেরও সততার সাথে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাই সফলতা ছিল অবশ্যম্ভাবী।

আজও যদি মুসলমানগণ কুতয রহ. এর মত সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যান, তবে তারাও তার মতো সফল হবেন।

সময় পরিবর্তন হতে দীর্ঘ বছর বা দীর্ঘ যুগের প্রয়োজন হয় না।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. মিশরের সিংহাসনে আরোহণের মাত্র দশ মাস পর আইনে জালুত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

হে আল্লাহ, তুমি এ যুগেও সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এর মতো মহান ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করো। আমীন।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেননা।

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ

"নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদের এবং মুমিনদের সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যেই দিন সাক্ষী দণ্ডায়মান হবে।"[৯৭]

---

[৯৬] সূরা বালাদ : ১০।

[৯৭] সূরা মু'মিন : ৫১।

আইনে জালুতের যুদ্ধ থেকে শিক্ষণীয় বিষয়াদি

বর্বর তাতারী বাহিনী নিজেদের পাতানো ফাঁদে ধ্বংস হলো।

তাতারীরা জমিনে বিরাট বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। আর আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নীতি হলো, তিনি বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কাজ সফল হতে দেন না। তাতারীরা বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হওয়ার পাশাপাশি প্রায় চল্লিশ বছর মুসলমানদের শাসন করেছে। প্রায় শত যুদ্ধে মুসলমানরা তাদের কাছে হার মেনেছে। এরপর কালের বির্বতনে আইনে জালুতের যুদ্ধে মুসলমানগণ ঐতিহাসিক জয়লাভ করে। আর তাতারীদের নাম পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে মিটে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

"এ তো দিন-পরিক্রমা, যা আমি মানুষের মাঝে বদলাতে থাকি।"[৯৮]

বিশ্লেষক ও চিন্তাবিদদের মনে তাতারীদের পরাজয়কে কেন্দ্র করে দুটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। প্রশ্ন দুটির উত্তর একই;

প্রশ্ন : ০১

মুসলিম জাতি নীতি-নৈতিকতার যতই অধঃপতনের শিকার হোক না, তারা তো তাতারীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাহলে কীভাবে তাতারীরা মুসলমানদের ওপর চেপে বসল?

প্রশ্ন : ০২

আইনে জালুত যুদ্ধে তাতারীরা কেন পরাজিত হলো? অথচ এরাই তো পূর্বে শত যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিল। পূর্বে কেন তারা জয়লাভ করল? আর আইনে জালুতে এমন কী ঘটল, যার ফলে তারা পরাজিত হলো?

উক্ত প্রশ্ন দুটির উত্তর আমরা আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর এক বক্তব্যে খুঁজে পাই। তিনি কাদেসিয়া যুদ্ধের সেনাপতি হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. কে চিঠি মারফত বলেছিলেন—

---

[৯৮] সূরা আল ইমরান : ১৪০।

فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو، وأقوى المكيدة في الحرب، وآمرك ومن معك أن تكون أشد احتراساً من المعاصي منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، ولولا ذلك لم تكن لنام قوة، لأن عددنا ليس كعددهم، ولا عدت نا كعدم، فإن استوينا في المعصية، كان لهم الفضل علينا في القوة، وإلا ننصرعليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا .. فاعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من الله، يعلمون ما تفعلون، فاستحيوا منهم، ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله، ولا تقولوا إن عدونا شر منا، فل نيسلّط علينا، فرب قوم سلِّط عليهم من هو شر منهم، كما سلّط على بني إسرائيل لما عملوا بمساخط الله كفاراوس، فجاسوا خلال الديار، وكان وعداً مفعولاً

"আমি তোমাকে ও তোমার বাহিনীকে সর্বক্ষণ আল্লাহকে ভয় করার জোর তাকিদ করছি। কেননা, আল্লাহর ভয়ই শত্রুর মোকাবেলায় সবচাইতে উত্তম হাতিয়ার এবং যুদ্ধের সবচাইতে বেশি প্রভাবশালী কৌশল। তুমি এবং তোমার বাহিনী শত্রুবাহিনী সম্পর্কে যতটুকু সতর্ক ও সজাগ থাকবে তার চেয়ে অধিক হুঁশিয়ার থাকবে অন্যায়কর্ম ও গুনাহ থেকে। কেননা, সীমালঙ্ঘন ও পাপের কারণে সেনাবাহিনীর যে ক্ষতি হয়, শত্রু দ্বারাও তার এত ব্যাপক ক্ষতি হয় না। মুসলমানের বিজয়ের রহস্য এখানেই নিহিত যে, তাদের শত্রুরা পাপ-সাগরে নিমজ্জিত। অন্যথায় আমাদের কীই বা সাধ্য আছে? আমরা তাদের চেয়ে সংখ্যায় অল্প, আমাদের হাতিয়ারও তাদের হাতিয়ারের তুলনায় নিম্নমানের। এখন যদি পাপের ক্ষেত্রেও আমরা শত্রুদের বরাবর হয়ে পড়ি, তাহলে তারা শক্তির দিক থেকে আমাদের চেয়ে বেড়ে যাবে। যদি আমরা ন্যায়-নিষ্ঠা ও সত্যবাদিতার শক্তি দিয়ে তাদের ওপর প্রাধান্য না পাই, তাহলে সৈন্যবল দিয়ে অবশ্যই প্রাধান্য পাওয়া যাবে না। মনে রেখো, তোমাদের সাথে আল্লাহর পক্ষ হতে এরূপ ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন, যারা তোমাদের চাল-চলনের ওপরেও নজর রাখেন, যারা তোমাদের

প্রতিটি কাজ সম্পর্কে অবগত। তাদের লজ্জা করো এবং আল্লাহর নাফরমানী (ও পাপ) থেকে বেঁচে থাকো। আবার মনে কোরো না যে, দুশমন যেহেতু নিকৃষ্ট এবং পাপাচারে লিপ্ত, অতএব তারা আমাদের সম্মুখে বিজয়লাভ করতে পারবে না। কেননা, কখনো এরূপ হয় যে, কোনো নিকৃষ্ট জাতিও উৎকৃষ্টের মোকাবেলায় বিজয়ী হয়ে যায়। যেরূপভাবে অগ্নিপূজকরা অতীতে অনেক সময় অকৃতজ্ঞ বনু ইসরাঈলদের ওপর বিজয়ী হয়েছে। এর কারণ ছিল বনু ইসরাঈলের নাফরমানী, যার ফলে আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। অগ্নিপূজকরা তাদের অন্দরমহলে পর্যন্ত ঢুকে পড়েছিল। আর অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছিল আল্লাহর এই বাণী—

فجاسوا خلال الديار وكان امر الله مفعولا

'অনন্তর এরা ঢুকে পড়ল ঘর-বাড়ির অভ্যন্তরে। আর আল্লাহর নির্দেশ কার্যকরী হয়েই থাকে।"

এই হলো হযরত ওমর রা. এর চিঠির একাংশ। এই চিঠিটাকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করা হয় এবং ভূপৃষ্ঠের অন্য সকল চিঠির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গণ্য করা হয়। চিঠিটি অনেক লম্বা। উম্মাহর উন্নতিসাধন করতে হলে চিঠিটা পাঠ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[৯৯]

উল্লেখিত চিঠির আলোকে একথা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, মুসলমানগণ অন্যায়-অপরাধে লিপ্ত হলে কখনো কখনো আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেন। আবার যখন মুসলমানরা আল্লাহর তাকওয়া আঁকড়ে ধরে এবং আল্লাহর বিধান ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নত মোতাবেক জীবন পরিচালনা করে, তখন তারা সেই জালেম বাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করে, যারা দীর্ঘ দিন তাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিল।

মোটকথা, আইনে জালুতের যুদ্ধে মুসলমানগণ শারীরিক শক্তি, কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়লাভ করেনি; বরং তারা আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরার কারণে জয়লাভ করেছেন।

---

[৯৯] হযরত ওমরা রা. এর সরকারী পত্রাবলি; মূল : খুরশীদ আহমদ ফারিক, অনুবাদ : আল্লামা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ; প্রকাশনা : ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। পাঠক সমীপে গ্রন্থটি পাঠের সবিনয় অনুরোধ রইল। –অনুবাদক

এ থেকে এ প্রশ্নের উত্তরও পাওয়া যায়, কেন তাতারীরা দীর্ঘ চল্লিশ বছর মুসলমানদের শাসন করেছে। একথাও সুস্পষ্ট হয় যে, কীভাবে মুসলমানরা আইনে জালুতের যুদ্ধে তাতারীদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক জয়লাভ করেছিলেন।

এ থেকে আমরা ঐতিহাসিক বহু প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাই ও বহু সমস্যার সমাধান খুঁজে পাই।

বন্ধুরা, আমরা আল্লাহ রব্বুল আলামীন থেকে যত দূরেই সরে যাই না কেন, আবার কখনো আমরা তার দিকে ফিরে এলে তিনি আমাদের আপন করে নেন। এমনকি আমরা তার দিকে ফিরে এলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন।

ইমাম বুখারী রহ. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

للّه أَفْرح بِتوبةِ عبدِهِ مِنرجلٍ نزلَ منزِلًا وبِهِ مهلَكَةٌ ومعه راحِلَته علَيها طَعامه وشرابه، فَوضع رأْسه فَنام نومةً فَاستيقَظَ وقَدذَهبت راحِلَته حتى إِذَا اشتدعلَيهِ الْحرِوالْعطَش أَو ما شاءَ اللَّه قَالَ: أَرجِعإِلَى مكَانِي فَرجع فَنام نومةً ثُمرفَعرأْسه فَإِذَا احِلَته عِنده

"কোনো এক ব্যক্তি [সফরের অবস্থায় বিশ্রামের জন্য] কোনো এক স্থানে অবতরণ করল। সেখানে প্রাণের ভয়ও ছিল। তার সাথে তার সফরের বাহন ছিল, যার ওপর তার খাদ্য ও পানীয় ছিল। সে ঘুমিয়ে পড়ল। জেগে দেখল তার বাহন চলে গেছে। যখন সে গরমে ও পিপাসায় কাতর হলো, তখন সে বলল, আমি যে জায়গায় ছিলাম সেখানেই ফিরে যাই। এরপর সে নিজ স্থানে ফিরে এসে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর জেগে দেখল, তার বাহনটি তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। তখন সে ব্যক্তি যে পরিমাণ খুশি হবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার তওবায় এর চাইতে অনেক বেশি খুশি হন।"[১০০]

আমাদের করণীয় হলো আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া। তাহলে আমরা আবার শীঘ্রই আইনে জালুত দেখতে পাব। এমনকি হাজারো আইনে জালুত দেখতে পাব।

---

[১০০] *বুখারী : ৬৩৪৮।*

ইসলামের জয়-পরাজয়ের শরীয়তসম্মত ব্যাখ্যা এটিই। আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গভীর হলেই মুসলমানগণ বিজয়লাভ করেন। আবার আল্লাহ থেকে দূরে সরে গেলে তারা পরাজিত হন। আল্লাহ তা'আলা কারও প্রতি সামান্য অবিচার করেন না। কিন্তু মানুষই নিজে নিজের প্রতি অবিচার করে।

দামেস্ক পুনরুদ্ধার

আইনে জালুতের ঐতিহাসিক বিজয়ের আলোচনা শেষে আমরা পুনরায় সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এর আলোচনায় ফিরে যাই—

আইনে জালুতের জয়লাভের পর সাইফুদ্দীন কুতয রহ.-এর অভিযান থেমে যায়নি। কারণ, তখনো সিরিয়ার বিভিন্ন শহরে তাতারীরা অবস্থান করছিল। দামেস্ক, হিমস, আলেপ্পো ইত্যাদি শহরে তাতারীরা ছিল। ইরাক তুরস্ক পারস্য ইত্যাদি দেশে তখনো তাতারীরা অবস্থান করছিল।

কুতয রহ.-এর জীবনে কোনো আরাম নেই। নেই কোনো বিরতি। চরম ক্লান্তি, অক্লান্ত কষ্ট ও প্রচণ্ড প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও জুলাই মাসে গোটা সিনা উপত্যকা পাড়ি দেওয়া, গাজা নগরী জয় করা, ফিলিস্তিন দক্ষিণ থেকে উত্তর সফর করে আক্কা নগরী পৌঁছে আবার আইনে জালুত ফিরে আসা—এসব কষ্ট উপেক্ষা করে এখন দামেস্ক অভিমুখে রওনা!!

দামেস্ক তৎকালীন ইসলামের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রভূমি, যা তাতারী আগ্রাসনের শিকার। তা আইনে জালুতের উত্তর-পূর্বে প্রায় দেড়শো কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এই সুবিশাল মুসলিম ভূমিকে তাতারীদের অপবিত্রতা থেকে রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি ছিল এবং তাতারীদের বর্তমান ভগ্নাবস্থাকেই কাজে লাগাতে হবে। সুতরাং কুতয রহ. সিদ্ধান্ত নিলেন, পারস্য ইউরোপ ও চীন থেকে তাতারীদের সহায়তা আসার পূর্বেই দামেস্কসহ অন্যান্য শহর পুনরুদ্ধার করতে হবে। সাইফুদ্দীন কুতয রহ. জানতেন, আইনে জালুতে একজন তাতারীও প্রাণ রক্ষা পায়নি এবং এই সংবাদ কেউ দামেস্কে পৌঁছায়নি। তাই স্বয়ং তিনি দামেস্কে এই সংবাদ প্রেরণের ইচ্ছা করলেন। যাতে এতে মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি পায় এবং দামেস্কে অবস্থিত তাতারীদের মনোবল হারিয়ে ফেলে। এতে দামেস্ক জয় করা সহজ হবে। এই মর্মে তিনি মুসলমানদের মহান বিজয়ের সুসংবাদ সম্বলিত একটি চিঠি প্রেরণ করেন। চিঠিতে লেখা ছিল—

"মুসলমানদের মহান বিজয় সাধিত হয়েছে। সৈন্যবাহিনীরা যার সত্যতা প্রত্যক্ষ করেছে। আর নিন্দুকরা তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করেছে। তাতারী যারা দীর্ঘদিন শাসন করেছে, সিরিয়ার শহরগুলো ধ্বংস করেছে আল্লাহ তা'আলা তাদের পরাজিত করেছেন [দেখুন, তিনি পরাজয়ের তৌফিকদাতা হিসেবে আল্লাহ তা'আলাকে উল্লেখ করেছেন]।

আর মুসলিম সৈন্যরা নিজ বাড়িতে বসে ছিল। মুমিন কখনো কারও ভয়ে প্রকম্পিতি হয়না। মুমিনের ঈমান সর্বদা সুদৃঢ়। কুরআন পূর্ববর্তী সকল কিতাবকে রহিত করেছে। আজানের ধ্বনী পূর্ববর্তী সকল ধ্বনিকে ম্লান করেছে।

মুমিনদের সংবাদ সর্বদা কাফেরদের নিকট পৌঁছেছে এবং কাফেরদের সংবাদও সর্বদা মুমিনদের নিকট পৌঁছেছে। এমনকি প্রভাতের রৌপ্যের গায়ে নিখাদ স্বর্ণের প্রলেপ লেগেছে। বর্তমান অতীতের ন্যায় রূপ ধারণ করেছে এবং সূর্যের শুভাগমনে রাতের প্রভাব বিদূরিত হয়েছে।

একসময় যুদ্ধের ঘণ্টা বেজে ওঠে। উভয় দলের মাঝে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুশরিকদের অঙ্গ-পতঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হয়। অহংকারী জালেম মুশরিকরা নিহত হয়। এ তো ছিল তাদের কর্মফল। 'হে নবী, তোমার প্রতিপালক কারোর প্রতি জুলুম করেন না।"

উক্ত সুসংবাদবাহী চিঠিটি সম্ভবত ২৭-২৮ রমজানে দামেস্কে পৌঁছে। দামেস্কের মুসলমানরা এ সংবাদ পেয়ে আনন্দে ফেটে পড়েন। তারা অনেকেই তাতারীদের পরাজয়ের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছিল। মুসলমানদের অভাবনীয় বিজয়ের কথা শুনে তাদের হিম্মত আকাশচুম্বী আকার ধারণ করে। দামেস্কবাসী তাতারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু একজন তাতারীও প্রতিবাদ করতে পারেনি।

তাতারীত্রাস বিদূরিত হয়। দীর্ঘদিন পর দামেস্কবাসী বুক ভরে শ্বাস নেয়। তাতারীদের কেউ নিহত হয়, কেউ বন্দী হয়, কেউ পলায়ন করে। অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। কতিপয় অতি উৎসাহী মানুষ দামেস্কে অবস্থানরত ইহুদীদের আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। যদি তৎকালীন উলামায়ে কেরাম অন্যায়-জুলুম থেকে বেঁচে থাকার উপদেশ প্রদান না করতেন, তাহলে পরিস্থিতি বেগতিক হয়ে যেত। কারণ, ইহুদীরা তাতারীদের শাসনামলে মুসলমানদের কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারে মুশরিকীনদের সঙ্গ দেয়নি।

এমতবস্থায় ৬৫৮ হিজরীর ৩০ রমজান মহামান্য সম্রাট সাইফুদ্দীন কুতয রহ. আইনে জালুতের বিজয়লাভের পাঁচদিন পর দামেস্কে পৌছেন। দামেস্কবাসী তাকে বীরবিজয়ীর সংবর্ধনা প্রদান করে। দামেস্কের রাস্তায় লাল গালিচা বিছিয়ে দেয়। নারী-পুরুষ; শিশু-বাচ্চা সবাই কুতযকে অভিবাদন জানানোর উদ্দেশ্যে রাস্তায় নেমে আসে।

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

"[হে নবী,] বলো, এটা আল্লাহর অনুগ্রহে হয়েছে। সুতরাং এতে তারা যেনো আনন্দিত হয়। তারা যা পুঞ্জীভূত করে, তা হতে এটি শ্রেয়।"[১০১]

দ্বীনের বিজয়ের আনন্দ। ইসলাম সমুন্নত হওয়ার আনন্দ। মুসলমানদের ইজ্জত রক্ষার আনন্দ। আপনি এই আনন্দে যেনো কোনো পার্থিব আনন্দের সঙ্গে তুলনা করতে পারবেন না।

প্রকৃত ঈদ আনন্দ

মুসলিম মামলুকবাহিনী দামেস্কে প্রবেশ করল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রকৃত নিরাপত্তা পুনরুদ্ধার হয়। এমনকি ইহুদী-খ্রিস্টানরাও নিরাপত্তা ফিরে পায়। কুতয রহ. তাতারী কর্তৃক নিযুক্ত দামেস্কের বিচারপতি ইবনে সাফিকে অপসারণ করে তদস্থলে নাজমুদ্দীন আবু বকর ইবনে সদর উদ্দীনকে নিযুক্ত করেন। বিচারপতি নাজমুদ্দীন বিচারকার্য শুরু করেন। মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যকার বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলোর সমাধান করেন। মুসলিম ভূমিতে একজন খ্রিস্টানও অন্যায় অবিচারের শিকার হয় না।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এর দামেস্কের দ্বিতীয় দিন ছিল ঈদুল ফিতর। এই ঈদটি গত চল্লিশ বছরের মধ্যে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ ঈদ ছিল। তা শুধু ঈদুল ফিতরই ছিল না। পাশাপাশি দিনটি ছিল বিজয় ও নিজেদের পুরোনো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার দিবস।

وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের কথাকে হেয় করে দেখালেন, বস্তুত আল্লাহর কথাই সমুচ্চ। আল্লাহ ক্ষমতারও মালিক। হেকমতেরও মালিক।"[১০২]

---

[১০১] সূরা ইউনুস : ৫৮।

[১০২] সূরা তাওবা : ৪০।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. কালবিলম্ব না করে রুকন উদ্দীন বাইবার্সের নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন পলাতক তাতারীদের পাকড়াও করতে এবং অন্য শহরগুলোকে তাতারীদের অশুভ থাবা থেকে মুক্ত করতে। মুসলিম বাহিনী হিমসে পৌঁছে তাতারীদের ওপর আক্রমণ চালায়। তারা কোনো মতে জান বাঁচিয়ে পালায়। মুসলিম বাহিনী তাতারীদের হাতে বন্দী মুসলমানদের মুক্ত করে। পলাতক তাতারীদের পেছনে লাগিয়ে দেয়। তারা অধিকাংশ তাতারীদের হত্যা করে এবং অবশিষ্টদের বন্দী করে।

এভাবে হিমস নগরীও দ্রুত স্বাধীনতা ফিরে পায়। এবার আলেপ্পো নগরীর পালা। তাতারীরা সেখান থেকে ভীত ইঁদুরের ন্যায় পলায়ন করে। চোখের পলকে আল্লাহ রব্বুল আলামীন সবকিছুতে পরিবর্তনের তৌফিক দেন।

মুসলমানগণ গোটা সিরিয়া ভূখণ্ডকে কয়েক সপ্তাহের ভেতরে তাতারীদের আগ্রাসন থেকে মুক্ত করেন। সিরিয়া ভূখণ্ড নতুনভাবে ইসলাম ও মুসলিম রাজত্বে ফিরে আসে। আল্লাহ তা'আলা যেনো গোটা মুসলিমবিশ্বেকে স্থায়ী স্বাধীনতা ও চিরসম্মান দান করেন। আমীন।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. মিশর ও সিরিয়াকে ৬৪৮ হিজরীতে নাজমুদ্দীন আইয়ূব রহ. এর ইন্তেকালের পর এক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেন। মিশর ফিলিস্তিন ও সিরিয়ার সব শহরে কুতয রহ. এর জন্য মঞ্চ তৈরি করা হয়।

মুসলমানগণ সর্বাধিক নিরাপদ ও সৌভাগ্যের দিন যাপন শুরু করে।

কুতয রহ. রাষ্ট্রীয় দায়িত্বসমূহ মুসলিম আমীরদের মাঝে বণ্টন শুরু করেন। তিনি প্রজ্ঞার সাথে কতিপয় আইয়ূবী আমীরকে পূর্বপদে বহাল রাখেন। যাতে ভবিষ্যতে আবার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়। কারণ, নিঃসন্দেহে অনেক মুসলমান তাদের অনুসারী। অন্যদিকে কুতয রহ. তাদের বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারে শঙ্কামুক্ত নন। তিনি হিমসের আমীর পদে আশরাফ আইয়ূবীকে নিযুক্ত করেন, যিনি পূর্বে তাতারীদের সহযোগী ছিলেন। পরবর্তীতে তওবা করেন এবং আইনে জালুতের যুদ্ধের পূর্বে সারেমুদ্দীন আইবেকের মাধ্যমে আত্মসমর্পণ ও মুসলমানদের হয়ে যুদ্ধ করার অঙ্গীকার করেন। তবে মনের খবর তো আল্লাহই ভালো জানেন। তবে যেহেতু তিনি পূর্ব অপরাধের কারণে লজ্জিত, তাই তাকে তার পদে বহাল রাখেন। আলেপ্পোর ইমারত প্রদান করেন মসুলের আমীর আলাউদ্দীন ইবনে বদর উদ্দীন লুলুকে। যিনি কয়েকমাস পরই ইন্তেকাল করেন। হামাত নগরীর আমীর হিসেবে আমীর মানসুরকে নিয়োগ করেন,

ফিলিস্তিন ও গাজার আমীর হিসেবে জামাল উদ্দীন আকুশ শোমসীকে নিয়োগ দেন। আর ইলমুদ্দীন সাঞ্জার হালবীকে দামেস্কে আমীর পদে নিয়োজিত করেন। এভাবে গোটা সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের ভারসাম্যপূর্ণ নিরাপদ পরিবেশ ফিরে আসে। ইসলামের শৌর্য-বীর্য সমুন্নত হয়। ইসলাম ও মুসলমানদের নিরাপত্তা খর্বকারী সকল দুশ্চক্রশক্তি অপসারিত হয়।

৬৫৮ হিজরীর ১৭ ই শাওয়াল আইনে জালুতের যুদ্ধের ঠিক এক মাস পর সাইফুদ্দীন কুতয রহ. রাজধানী মিশরে ফিরে যেতে শুরু করেন। রাজনৈতিক প্রয়োজন ও রাজধানী পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ কাজে দ্রুত মিশর ফিরে আসা ছিল অত্যন্ত জরুরি। কুতয রহ. এর রাজত্ব ফুরাত নদীর তীর থেকে লিবিয়ার সীমান্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। আমরা জানি, কুতয রহ. শাসনক্ষমতা গ্রহণের মাত্র এগারো মাস অতিবাহিত হয়েছে। তিনি ২৪ শে যিলকদ ৬৫৭ হিজরীতে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। এভাবেই তাতারীদের বিরুদ্ধে মুসলিম জাতির সুস্পষ্ট বিজয় লাভ হয়, তাতারীত্রাসের শিকল থেকে চিরমুক্ত হয়।

আইনে জালুতের ফলাফল

সুবহানাল্লাহ! আইনে জালুত কেবল একটি যুদ্ধ ও একদিনেই শেষ হয়ে গেলেও এর ফলাফল ও প্রভাব ছিল অতুলনীয় ও অগণিত। এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে সামগ্রিক ফলাফল আলোচনা করা বড়ই কঠিন। তবে সংক্ষিপ্তাকারে তা আমরা এখানে উল্লেখ করব।

ফলাফল এক

যুদ্ধের প্রস্তুতিকালে ও পরবর্তী সময় মুসলমানরা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করেছিলেন। মুসলমানগণ একথা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে, যখন তারা আল্লাহ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল, তখনই বর্বর তাতারী বাহিনী তাদের ওপর চেপে বসেছিল। আবার যখন তারা আল্লাহর দিকে ফিরে এসেছে, তখন এমন বিজয় সাধিত হয়েছে, বহুসংখ্যক ইতিহাসবিদ যাকে অলৌকিক বিজয় আখ্যায়িত করেছেন। সত্যিই মুসলিম জাতি আল্লাহর দিকে ফিরে আসলে অপরাজেয় শক্তির বিরুদ্ধে তাদের জয়লাভ হয়।

মুসলমানদের সম্মুখে একথাও সুস্পষ্ট হয় যে, ধর্মের ইস্যুতে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয় ইস্যুতে যুদ্ধ সংঘটিত হলেও প্রত্যেক

যুদ্ধের মূলে থাকে ধর্ম বৈপরীত্য। তাই ধর্ম বৈপরীত্য বিদ্যমান অবস্থায় কখনো অস্ত্র যুদ্ধ থেমে গেলেও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ কখনোই থামে না। এই বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেই মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে বলেছেন—

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

"ইহুদী-খ্রিস্টানরা তোমার প্রতি কিছুতেই সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবে।"[১০৩]

সুতরাং আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তা'আলা তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের উপায় হিসেবে তাদের ধর্মের অনুসরণ করাকে সাব্যস্ত করেছেন। তাদের বৈষয়িক স্বার্থ রক্ষাকে নয়। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন—

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

"তারা [কাফেরগণ] ক্রমাগত তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকবে। এমনকি পারলে তারা তোমাদের তোমাদের দ্বীন থেকে ফেরাতে চেষ্টা করবে।"[১০৪]

সুতরাং বোঝা গেল, মুসলমানগণ নিজেদের দ্বীন-ধর্ম ছেড়ে না দিলে যুদ্ধ চলতে থাকবে। এর পূর্বে কখনোই যুদ্ধ বন্ধ হবে না। মুসলিম ভূখণ্ডের জাতি, সম্পদ, পেট্রোল তথা কোনো কিছু থেকে ইহুদী, খ্রিস্টান, তাতার, মুশরিক ও হিন্দু তথা বিধর্মীদের অশুভ থাবা দূর হবে না। শুধু এতটুকুই নয়; বরং তাদের প্রধান লক্ষ্য হলো, ইসলামধর্মের ওপর প্রভাব বিস্তার করে বসা অথবা চিরতরে তা মিটিয়ে দেওয়া।

এই ছিল ঐতিহাসিক আইনে জালুতের যুদ্ধের প্রথম ফলাফল।

ফলাফল দুই

আইনে জালুতের যুদ্ধের পূর্বে মুসলমানগণ ছিলেন অধঃপতনের অতল গহ্বরে। পরবর্তীতে সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এর যোগ্য নেতৃত্বে তারা মনেপ্রাণে একথা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে কখনো নিরাশ হতে নেই। আর

---

[১০৩] সূরা বাকারা : ১২০।
[১০৪] সূরা বাকারা : ২১৭।

কাফের মুশরিকরা যতই শক্তিশালী হোক না কেন, তা কালের বিবর্তনে ধ্বংসে পর্যুদস্ত হয়।

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

"যারা কুফরি অবলম্বন করেছে দেশে দেশে তাদের [স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ] বিচরণ যেনো তোমাকে কিছুতেই ধোঁকায় না ফেলে। এটা সামান্য ভোগ [যা তারা লুটছে]। এরপর তাদের ঠিকানা জাহান্নাম, যা নিকৃষ্টতম বিছানা।"[১০৫]

আইনে জালুতের যুদ্ধ শেষে মুসলমানদের সম্মুখে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। আসমান-জমিনের কোনো কিছুই তাকে পরাভূত করতে পারে না। আইনে জালুত যুদ্ধের পূর্বে একথার প্রতি তাদের পূর্ণ ঈমান থাকলেও যুদ্ধ শেষে এ বিষয়ে তাদের বাস্তব জ্ঞান অর্জিত হয়। এ বিষয়ে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্বও থাকে না।

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

"আল্লাহ যদি তোমাদের কোনো কষ্ট দান করেন, তবে তিনি ছাড়া এমন কেউ নেই, যে তা দূর করবে এবং তিনি যদি তোমার কোনো মঙ্গল করার ইচ্ছা করেন, তবে এমন কেউ নেই যে তার অনুগ্রহ রদ করার ইচ্ছা করবে। তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১০৬]

ফলাফল তিন

দীর্ঘ ষাট বছর পর মুসলিম উম্মাহর শৌর্য-বীর্য ফিরে আসে। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে মুসলিম জাতি ছিলেন বিশ্বরাজত্বের সিংহাসনে আরোহিত। কিন্তু ফিলিস্তিনের হিত্তিন ও স্পেনের আরাক যুদ্ধের পর মুসলিম উম্মাহর মাঝে ব্যাপক অধঃপতন নেমে আসে। এতে বিধর্মীদের অন্তর থেকে মুসলমানদের ভয়ভীতি দূর হয়। এমনকি অনাস্থা এতটাই লোভনীয় রূপধারণ করে যে, কুকুর

---

[১০৫] সূরা আল ইমরান : ১৯৬-১৯৭।
[১০৬] সূরা ইউনুস : ১০৭।

মুসলমানদের লাশ কুড়ে কুড়ে ভক্ষণ করতে শুরু করে এবং মুসলিম আকাশে শকুন উড়তে থাকে।

কিন্তু আইনে জালুত যুদ্ধ মুসলিম জাতির সেই শৌর্য-বীর্য পুনরুদ্ধার করেছে। এমনকি পারস্যের তিবরিয শহরের অবস্থানরত হালাকু খান তার সঙ্গে ছিল বিপুলসংখ্যক শক্তিশালী তাতারী বাহিনী, তবুও সে দ্বিতীয় বার সিরিয়া আক্রমণের চিন্তাও করেনি।

প্রত্যেক আইনে জালুতের পরই মুসলিম জাতির শৌর্য-বীর্য ফিরে আসে।

আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে এমন অনেক কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, যা কুরআনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করেন না।

ফলাফল চার

সিরিয়া, তুরস্ক ও ফিলিস্তিনে চিরদিনের জন্য তাতারীদের নাম-নিশানা মুছে যায়। এরপর কয়েক দশক তাতারীদের এসব অঞ্চলে তাতারীদের নামও শোনা যায় না। অন্যায়-অবিচার দূর হয়। তাতারীত্রাস মুছে যায়। মানুষ জান-মাল ইজ্জত-আব্রুর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়। আইনে জালুত যুদ্ধের পর এসব অঞ্চলবাসীকে দীর্ঘ একশো চল্লিশ বছর পর্যন্ত কেউ ভয় দেখায় নি। ৮০৪ হিজরীতে তাতারী বংশোদ্ভূত তাইমুর লঙ্গ সিরিয়ায় প্রবেশ করে আবার দামেস্ক ও আলেপ্পো নগরী আক্রমণ করে।

[মামলুক সাম্রাজ্য ও উসমানী সাম্রাজ্য আলোচনার সময় তাইমুর লঙ্গ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব—ইনশাআল্লাহ!] আইনে জালুত যুদ্ধের চতুর্থ ফলাফল হলো মুসলমানগণ পূর্ণ ১৪৬ বছর নিরাপত্তা লাভ করেছিল।

ফলাফল পাঁচ

ইতিহাসের কিতাবাদিতে আইনে জালুত দিবসকে মমিলুক সাম্রাজ্যের উত্থানদিবস গণ্য করা হয়। মামলুক সাম্রাজ্য দীর্ঘ ২৭০ বছর ইসলামের পতাকা সমুন্নত রাখেন। যদিও মামলুক সাম্রাজ্যের শুরু হয় ৬৪৮ হিজরীতে শাজারাতুদ দুর ও স্বামী ইজ্জুদ্দীন আইবেকের ক্ষমতাগ্রহণের মাধ্যমে। তবে আইনে জালুত বিশ্ববাসীর সামনে মামলুকদের সাম্রাজ্য হিসেবে আইনত বৈধতা প্রদান করেছে। এই দশ বছরে মামলুকগণ দুটি বিরাট জয়লাভ করে।

এক. লুইস তাসে'র নেতৃত্বাধীন ফরাসি বাহিনীর বিরুদ্ধে মানসুরা ও ফারেসকুর যুদ্ধে।

দুই. আইনে জালুত যুদ্ধে তাতারীদের বিপক্ষে। এই উভয় যুদ্ধে মামলুকদের অবদানই মুসলমানদের বিজয় সাধিত হয়। এতে বিশ্বমানবতা এ কথার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি প্রদান করে যে, মামলুকরাই বিশ্বের শক্তিশালী সাম্রাজ্য।

ফলাফল ছয়

মিশর ও সিরিয়াকে তদানীন্তন মুসলিমবিশ্বের কূটনৈতিক, রাজনৈতিক, ভৌগলিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রাণকেন্দ্র মনে করা হত। তবে এই দুই দেশের মাঝে বিরোধ বিরাজমান ছিল। মিশর ও সিরিয়ার দিকে সর্বদা শত্রুবাহিনীর লোলুপ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকত। ফলে মিশর ও সিরিয়াশক্তির ঐক্য অত্যন্ত জরুরি ছিল। এতে শত্রুবাহিনী বাধাগ্রস্ত হতো। তাই শত্রুবাহিনীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে গোটা সিরিয়া [সিরিয়া, ফিলিস্তিন, জর্দান, লেবানন] ও মিশরের ঐক্য গঠন ছিল আবশ্যকীয়। এই বৃহৎ কাজটি মামলুকরাই সম্পাদন করেছিল।

ফলাফল সাত

তদানীন্তন সকল আইয়ূবী আমীর আইনে জালুত যুদ্ধ শেষে আত্মগোপন করেছিলেন। যারা সে সময়ের সবচেয়ে নিকৃষ্ট আমীর হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তারা সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী রহ. এর রেখে যাওয়া আমানতের পূর্ণ খেয়ানত করেছিলেন। তাদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল রাজত্ব, সম্পদ সঞ্চয়। মোটকথা, পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাসই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এমনকি দুনিয়ার লোভে তারা একসময় মুসলমানদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদের সহযোগিতা করতে শুরু করেন। নিজেদের ভাইদের সঙ্গে খেয়ানত শুরু করেন। তাদের প্রতি অবিচার শুরু করেন। এমনকি তারা মামলুক সাম্রাজ্য পতনের জন্য খ্রিস্টানদের সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেন। আইনে জালুত যুদ্ধ এ সকল আইয়ূবী নেতাদের সকল জল্পনা-কল্পনার পর্দা কেড়ে মুসলিম উম্মাহকে সকল অনিষ্ট ও ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করে।

ফলাফল আট

মিশর সিরিয়ার মধ্যকার ঐক্য, আইয়ূবী আমীরদের আত্মগোপন, মামলুক সাম্রাজ্যের বিজয়, ইসলামের গণজাগরণ ইত্যাদি বিষয়ের ফলে পরবর্তী সময়ে মুসলিমবিশ্বের ইসলামের বিশ্বজাগরণের দ্বার উন্মুক্ত করে।

মামলুক সাম্রাজ্য ৪৯১ হিজরী থেকে শাসন করে আসা খ্রিস্টানদের হাত থেকে সিরিয়া ও ফিলিস্তিন স্বাধীনতার দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেন। অর্থাৎ খ্রিস্টানরা আইনে জালুতের পূর্বে দীর্ঘ প্রায় ১৬০ বছরের বেশি সিরিয়া ও ফিলিস্তিন রাজত্ব করেছিল। যদিও ইমাদুদ্দীন জঙ্গী, নূরুদ্দীন মাহমুদ ও সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী রহ. এসব অঞ্চল স্বাধীন করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ব্যয় করেছিলেন, তবুও তারা অনেক অঞ্চল স্বাধীন করতে পারেননি। পাশাপাশি তাদের সন্তানরা স্বাধীনকৃত অনেক অঞ্চলকে খ্রিস্টানদের হাতে ছেড়ে দেয়। তাই আইনে জালুতের ঐতিহাসিক জয়লাভের পর ও রাজক্ষমতায় আরোহণের পর মামলুকগণ একের পর এক অঞ্চল স্বাধীন করার জন্য সৈন্য পাঠাতে থাকেন। একে একে ফিলিস্তিন, সিরিয়া, জর্দান, লেবানন ও তুরস্ক স্বাধীন হয়। আল্লাহ তা'আলা যেন এসব মুসলিম ভূখণ্ডকে কেয়ামত পর্যন্ত স্বাধীন রাখেন। আমীন।

তাই আইনে জালুতের কয়েক মাস পর জহির বাইবার্স রহ. ৬৫৯ হিজরীতে এসব অঞ্চলে আক্রমণ শুরু করেন। কিছুদিনের মাঝেই মুসলিম মুজাহিদদের হাতে খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। ৬৬৪ হিজরীতে মুসলমানরা ক্বিসারিয়া, হাইফা ইত্যাদি অঞ্চল জয় করেন। এগুলো ফিলিস্তিন অন্তর্গত শহর। অতঃপর ৬৬৫ হিজরীতে ফিলিস্তিনের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত সফাদ নগরী বিজিত হয়। রুকন উদ্দীন বাইবার্স ফিলিস্তিন অন্তর্গত বিভিন্ন শহর স্বাধীন করাকালীন সেনাপতি সাইফুদ্দীন কালাউন তুরস্কের কালিকিয়া নগরী স্বাধীন করেন এবং রাজা হাইতুমের খ্রিস্টরাজ্য আর্মেনিয়াও জয় করেন। অঢেল গনিমত লাভ করেন এবং ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) খ্রিস্টান বন্দী করেন। এরপর ৬৬৬ হিজরীতে জহির বাইবার্স ইয়াফা নগরী স্বাধীন করেন এবং ৬৬৭ হিজরীতে তাতারীদের মিত্র বুহমন্দ আমীরকে রাজ্য আন্তাকিয়া স্বাধীন করেন। এটি ছিল ৪৯১ হিজরীতে মুসলমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া খ্রিস্টানদের প্রথম রাজ্য। এটি খ্রিস্টানদের সবচেয়ে ধনাঢ্য রাজা ছিল। এমনকি এ অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত গনিমতের রুপা আনুপাতিক হারে অনুমান করে বিজয়ীদের মাঝে বণ্টন করা হয়েছিল; গুনে গুনে নয়!!

জহির বাইবার্স ইন্তেকালের সময় আক্কা নগরী ব্যতীত অন্য সকল মুসলিম শহর স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছিল। আক্কা নগরীর খ্রিস্টান অধ্যুষিত শহরগুলোর মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী ছিল। এছাড়াও লেবাননের সয়দা, ত্রিপোলি, বাইরুত, তরতুস, লাযেকিয়া ইত্যাদি শহর খ্রিস্টানদের দখলে ছিল।

আইনে জালুত যুদ্ধের ২৬ বছর পর ৬৮৪ হিজরীতে মানসুর কালউনের ত্রিপোলি স্বাধীন হয়। তারপর তার ছেলে আশরাফ খলিল অন্যান্য শহর স্বাধীনের দায়ভার কাঁধে তুলে নেন। অতঃপর ৬৯০ হিজরীতে পরাধীনতার শিকলে দুই বছর আবদ্ধ থাকার পর আক্কা নগরী স্বাধীন হয়।

আক্কা নগরী স্বাধীনতার মাধ্যমে সিরিয়ার খ্রিস্টরাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটে। এরপর সয়দা, বাইরূত, জাবিল, তরতুস, লাযিকিয়া স্বাধীন হয়। এটি আইনে জালুতের ৩২ বছর পরের ঘটনা। এসব শহর স্বাধীনতার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। *খ্রিস্টযুদ্ধ* গ্রন্থে এ বিষয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব—ইনশাআল্লাহ!

ফলাফল নয়

মামলুক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, আইনে জালুতের বিজয়; বিশেষত ৬৫৩ হিজরীতে তাতারীদের হাতে বাগদাদ পতন ও ৩৬৩ হিজরীতে খ্রিস্টানদের হাতে কর্ডোভার দখল হওয়ার পর মিশরের রাজধানী কায়রোর মূল্য অধিক হারে বৃদ্ধি পায়।

কায়রো আলেম-উলামা ও কবি-সাহিত্যিকদের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। কায়রো ইলমী গবেষণা শুরু হয়। মুসলিমবিশ্বের সবচেয়ে বড় বিদ্যাপিঠ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। মিশর বিশ্বময় দ্বীন হেফাজত ও সংরক্ষণ তাবলীগ ও দাওয়াত এবং জিহাদ লি এলায়ে কালিমাতুল্লাহর দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেয়।

ফলাফল দশ

এটি হলো সর্ববৃহৎ ও উপকারী ফলাফল!!

মুসলমানদের সঙ্গে টানা যুদ্ধের ফলে অধিকাংশ তাতারী খুব কাছ থেকে ইসলামধর্মকে দেখার সুযোগ পেয়েছে। তারা ইসলামের আদব-শিষ্টাচার, আখলাক ও চরিত্র দেখার সুযোগ পেয়েছে। এতে তারা অভিভূত হয়।

মুসলমানদের আদর্শিক প্রভাবে প্রভাবিত হয়। কারণ, তাদের কাছে ইসলামধর্মের কাছাকাছি মানের কোনো ধর্ম ছিল না। তাই যে-ই ইসলামধর্মের কাছাকাছি আসত এবং ইসলাম নিয়ে গবেষণা করত, সেই প্রভাবিত হতো, যদি সে সত্য সন্ধানী হতো এবং তার সত্য পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকত।

কোনো কোনো তাতারী ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করে। অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছায় তাতারীদের স্বর্ণগোত্র নামে খ্যাত এক গোত্র প্রধান ইসলাম গ্রহণ করলেন। তিনি হলেন, হালাকু খানের চাচাত ভাই, প্রসিদ্ধ তাতারী নেতা বাতুর ভাই। তার উপাধী ছিল 'বারাকা'। তিনি ৬৫২ হিজরীতে স্বর্ণ গোত্রের গোত্রপ্রধান নিযুক্ত হন। এ থেকেই তার নাম হয় 'বারাকা খান'। সমুদ্রের উত্তরস্থ অঞ্চল তারা শাসন করত। ইতিহাসের বইপুস্তকে এই অঞ্চলটিকে কাজাক নামে অবিহিত করা হয়। বর্তমানে অঞ্চলটি রাশিয়াতে অবস্থিত। বারাকা খান ইসলাম গ্রহণের ফলে তার গোত্রের অসংখ্য মানুষ ইসলামধর্মে দীক্ষিত হয়।

এ বিষয়টি রীতিমতো বিস্ময়কর। কারণ, তারা আইনে জালুতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, যখন তাতারীরা মুসলমানদের শাসন করত। তখন মুসলমানরা সর্বত্র পরাজিত ছিল। ইতিহাসের পাতায় এমন ঘটনা খুবই বিরল যে, শক্তিশালীরা দুর্বলদের ধর্ম গ্রহণ করে। আইনে জালুতের যুদ্ধের বড় সফলতা হলো, ধীরে ধীরে স্বর্ণগোত্রের সকল লোক ইসলাম গ্রহণ করে। তারা জহির বাইবার্সের সঙ্গে হালাকু খানের বিরুদ্ধে জোট বাঁধে। তাদের সঙ্গে হালাকু খানের একাধিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ বিষয়ে আমরা মামলুক সাম্রাজ্যের ইতিহাসে বিস্তারিত আলোচনা করব—ইনশাআল্লাহ!

এই ছিল আইনে জালুত যুদ্ধের দশম ফলাফল।

এই হলো পূর্ণ দশটি ফলাফল।

এছাড়াও এই বিখ্যাত যুদ্ধের বহুবিধ ফায়েদা রয়েছে। গবেষক ও পাঠক সমীপে এ বিষয়ে বিস্তারিত পড়াশোনা করার সবিনয় অনুরোধ রইল।

আইনে জালুতে বিপুল সহযোগিতা লাভের কারণ

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, আইনে জালুত যুদ্ধের ফলাফল ছিল ব্যাপক ও সর্বব্যাপী। তাই আইনে জালুতে বিপুল সহযোগিতা লাভের কারণ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা অত্যন্ত জরুরি।

ইতিপূর্বে আমরা এই বিজয়ের জন্য সৈন্যবাহিনীকে প্রস্তুত করতে ও জাতিকে সুসংঘটিত করতে সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এর পদক্ষেপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে আমরা সংক্ষিপ্তাকারে কতিপয় উপায়-উপকরণের কথা উল্লেখ করব। কুতয রহ. সহ অন্যান্য যোদ্ধারা যেগুলো গ্রহণ করেছিলেন, যার ফলে এই ঐতিহাসিক জয়লাভ হয়।

প্রথম কারণ : আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা

এটি ছিল আইনে জালুতে জয়লাভের অন্যতম কারণ। মুসলমানদের অন্তরে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছিল যে, একমাত্র আল্লাহর তৌফিকেই জয়লাভ হবে; অন্য কোনো উপায়ে নয়। এ কারণেই সাইফুদ্দীন কুতয রহ. সৈন্যবাহিনী ও জাতির ঈমান মজবুত করার প্রতি পূর্ণ গুরুত্বারোপ করেন এবং উলামায়ে কেরামের প্রতি পূর্ণ সম্মান জ্ঞাপন করেন। এ জন্যই তিনি আইনে জালুত যুদ্ধে 'ওয়া ইসলা...মা...হ' [হায় ইসলাম!] বলে উচ্চকণ্ঠে ডাক দিয়েছিলেন। তিনি 'হায় শহর! হায় রাজত্ব!' বলে ডাক দেননি। কুতয রহ.-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল সুস্পষ্ট। ইসলামই ছিল তার একমাত্র কামনা-বাসনা। এটিই ছিল জয়লাভের অন্যতম কারণ।

আইনে জালুতে প্রচণ্ড বিপদের মুহূর্তে কুতয রহ. যখন আল্লাহর আশ্রয় কামনা করেছিলেন, তখন বিষয়টি তার অন্তরে আরও বদ্ধমূল হয়। তিনি কাতর কণ্ঠে দোয়া করেছিলেন 'হে আল্লাহ, তোমার বান্দা কুতযকে তাতারীদের বিরুদ্ধে সহযোগিতা করো।' হাদীসের ভাষায় দুআ ইবাদত। দুআর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর সম্মুখে নিজের হীনতা-দীনতা প্রকাশ করে। দুআ বান্দার পক্ষ থেকে একথার সুস্পষ্ট ঘোষণা দেয় যে, সে জগতের প্রতিপালকের প্রতি মুখাপেক্ষী।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. যুদ্ধের প্রতিটি পদক্ষেপে একথা স্মরণ রাখতেন যে, আল্লাহ না চাইলে কখনো জয়লাভ করা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহর কাছ থেকে অনুনয়-বিনয় করে ও বারংবার চেয়ে জয় আদায় করে নিতে হবে। তিনি কখনোই জয়ের সম্বন্ধ নিজের দিকে করেননি; বরং সর্বদা জয়ের সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে করতেন। কারণ, তিনি জানতেন, আল্লাহর দরবারে বহুবার যাচনার ফলে আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহ ও কৃপায় তাকে এই জয় দান করেছিলেন। সুতরাং সকল শ্রেষ্ঠত্ব একমাত্র আল্লাহরই।

দ্বিতীয় কারণ : মুসলমানদের ঐক্য

শতধা বিভক্ত জাতি কখনো বিজয়লাভ করতে পারে না। কুতয রহ. মিশরের সিংহাসনে আরোহণের প্রথম দিন থেকেই মুসলমানদের ঐক্যগঠনে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করেন। তাই তিনি বাহরিয়া মামলুকদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন এবং তাদের মুইজ্জিয়া মামলুকদের সঙ্গে একত্রিত করেন। সিরিয়ার আইয়ূবী নেতাদের কাছে ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে চিঠি প্রেরণ করেন। এভাবেই অধিকাংশ বিশ্ববাসী যেই জয়কে অসম্ভব মনে করত, তা সহজসাধ্য জয়ে পরিণত হয়।

তৃতীয় কারণ : উম্মাহর মাঝে জিহাদের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করা

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. মনেপ্রাণে একথা বিশ্বাস করতেন, মুসলমানদের হক আদায়ের মৌলিক পন্থা হলো জিহাদ। কখনো কখনো শান্তিচুক্তি করা হয়। তবে যখন মুসলমানদের হক নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়, নির্বিচারে তাদের রক্তপাত করা হয়, তখন হক আদায়ের একমাত্র পন্থা হলো জিহাদ। তখন শান্তিচুক্তি শান্তিচুক্তি হয় না। তা হয় আত্মসমর্পণ। শরীয়তের দৃষ্টিতে এই চুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

বাস্তবতা হলো, মিশরবাসী টানা ক্রুশেড আক্রমণের ফলে পূর্ব থেকেই জিহাদের জন্য প্রস্তুত ছিল। ফলে কুতয রহ. এর জন্য 'জয়লাভের একমাত্র প্রধান উপায় হলো জিহাদ' একথা বোঝানো অতি সহজ ছিল। পাশাপাশি জাতিকে একথা বুঝানো অবশ্যকীয় ছিল যে, মিশর ভূখণ্ডে মাথা উঁচু করার একমাত্র পথ হলো জিহাদ। এ কারণেই জিহাদ ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া। সুতরাং যে ব্যক্তি জিহাদকে আঁকড়ে ধরবে সেও সর্বোচ্চ ব্যক্তিতে পরিণত হবে।

চতুর্থ কারণ : যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. সৈন্যবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য বৈষয়িক যাবতীয় প্রস্তুতি—যেমন অস্ত্র সংগ্রহ, প্রশিক্ষণ, যুদ্ধের সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা ইত্যাদি—গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যথার্থ পরিকল্পনা ও উপযুক্ত স্থানও গ্রহণ করেছিলেন।

কেউ যদি প্রস্তুতি ব্যতীত জয়ের স্বপ্ন দেখে, বলতেই হয়, সে কল্পনার জগতে বাস করে। এটা আল্লাহর মনোনীত পন্থা নয়।

পঞ্চম কারণ : যোগ্য নেতৃত্ব

ওয়াজ নসিহত ও বক্তৃতার চেয়ে যোগ্য নেতৃত্বের প্রভাব বহুগুণ বেশি। কুতয রহ. যোগ্য নেতা ছিলেন উন্নত আখলাক ও চরিত্র-মাধুর্যে, আত্মশুদ্ধি ও হৃদয়ের বিশুদ্ধতায়, যুদ্ধ ও জিহাদে, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ঈমান ও আস্থায় এবং ক্ষমা-প্রদর্শন ও উদারতায়।

সৈন্যরা কখনোই উপলব্ধি করেনি যে, তারা কুতয রহ. এর কাছে অপরিচিত। কুতয রহ. নিজে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং সবার সঙ্গে মিলে যুদ্ধ করেন। তাই সৈন্যরাই প্রাণ উজাড় করে তার সঙ্গে যুদ্ধ করে।

ষষ্ঠ কারণ : বিপক্ষ শক্তির পরোয়া না করা

সৈন্যসংখ্যা ও শক্তি-সামর্থ্যের বিস্তর ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও কুতয রহ. কখনো তাতারীদের পরোয়া করেননি। অনুরূপ সিরিয়া আক্রমণের সময় সেখানকার খ্রিস্টানদের সামান্য পরোয়া করতেন না। পূর্বেকার বহু নেতা কাফেরদের গোলামি করতে গিয়ে ধ্বংস হয়েছে। তারা প্রথমত নিজেদের রক্ষা করবার চিন্তায় এসব করতেন। অতঃপর জাতিকে রক্ষা করার চিন্তা করতেন। ফলে তারা গর্হিত অন্যায়ে জিহাদ বর্জন করতেন। ফলে তারা—

এক. জিহাদ বর্জন গুনাহে লিপ্ত হতেন।

দুই. জাতিকে জিহাদ বর্জনের অনুপ্রেরণা প্রদানের গুনাহে লিপ্ত হতেন।

তিন. শত্রুপক্ষকে বন্ধু বানানোর তৃতীয় গুনাহে লিপ্ত হতেন।

কিন্তু সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সুস্পষ্ট। তিনি কুরআনে কারীমে পাঠ করেছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

"হে মুমিনগণ, ইহুদী ও খ্রিস্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না। তারা নিজেরাই একে অন্যের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের বন্ধু বানাবে, সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালেমদের হেদায়েত দান করেন না।"[১০৭]

এটি মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে ভয়াবহ সতর্কবাণী। যে ব্যক্তি এই গুরুতর সতর্কবাণী শুনেও এ বিষয়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না, সে চরম নির্বোধ ও দুর্বল মুমিন বৈ আর কী!

সপ্তম কারণ : উম্মাহ ও সেনাবাহিনীর মাঝে আশা সঞ্চালন

আশাহত, নিরাশ ও অধঃপতিত উম্মাহর পক্ষে জয়লাভ করা অসম্ভব। অধঃপতন ও নৈরাশ্য মুমিনের গুণ নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

"নিশ্চিত জেনে রেখো, আল্লাহর রহমত থেকে কেবল তারাই নিরাশ হয়, যারা কাফের।"[১০৮]

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. উম্মাহ ও সৈন্যবাহিনীর হিম্মত ও মনোবল বৃদ্ধির জন্য কাজ করেন। তাদের পরিষ্কার ভাষায় বলেন, যে জাতি আল্লাহর নির্দেশিত পথে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তারা অবশ্যই আল্লাহর সহযোগিতা লাভে ধন্য হয়। এটি সুনিশ্চিত, সুনির্ধারিত ও আকীদা-বিশ্বাসের বিষয়। আল্লাহ তা'আলা সুরা মুজাদালায় বলেন—

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

"আল্লাহ সিদ্ধান্ত করেছেন, আমি অবশ্যই বিজয়ী হব এবং আমার রাসূলগণও। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান ও পরাক্রমশালী।"[১০৯]

---

[১০৭] সূরা মায়েদা : ৫১।
[১০৮] সূরা ইউসুফ : ৮৭।
[১০৯] সূরা মুজাদালা : ২১।

অষ্টম কারণ : যথাযথ পরামর্শ গ্রহণ

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। পরামর্শ মূলত সর্বোত্তম মতামত গ্রহণের জন্য হয়; নেতার রায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নয়। পরামর্শ শরীয়তের একটি অন্যতম মৌলিক নীতি। যে পরামর্শ বর্জন করে, সে আম্বিয়া আ. এর আদর্শ-বিরুদ্ধ কাজ করল। সে অনুসারীদের অন্তরে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে এবং একের পর এক ভুলের শিকার হয়। সবচেয়ে বড় কথা হলো, সে আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশের ব্যতিক্রম করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

"[হে নবী,] গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করো।"[১১০]

নবম কারণ : যোগ্য ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. প্রত্যেক দায়িত্বে কেবল সেই সব লোককেই নিয়োগ দেন, যারা দুটি গুণে গুণান্বিত। গুণ দুটি হলো, এক. শক্তিশালী দুই. আমানতদার। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আ. এর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত শুআইব আ. এর মেয়ের কথা উল্লেখ করেন। মেয়ে শুআইব আ. কে বলেছিলেন—

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

"আপনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কারও থেকে কাজ নিতে চাইলে এমন ব্যক্তিকেই উত্তম যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।"[১১১]

শক্তিশালী ব্যক্তি নিজ কাজে আস্থাশীল হয়, অন্যদের ছাড়িয়ে যায়। আর বিশ্বস্ত ব্যক্তি স্রষ্টা, সৃষ্টি ও জাতি তথা কারও হক নষ্ট করে না; এমনকি নিজের হকও নষ্ট করে না।

দায়িত্ব ও পদ অযোগ্যকে অর্পণ করলে জাতি সীমাহীন ক্ষতিগস্ত হয়। এমনকি এটি কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন।

---

[১১০] সূরা আল ইমরান : ১৫৯।

[১১১] সূরা কাসাস : ২৬।

ইমাম বুখারী রহ. হযরত আবু হুরাইরা রা. সূত্রে বর্ণনা করেন—

أن أعرابياً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فقال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال : كيف أضاعتها؟ قال : إذا وسد الأمر إلى غير أهله، فانتظر الساعة

"জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করে, কখন কেয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন আমানতের খেয়ানত হবে তখন কেয়মতের অপেক্ষা করো। বেদুঈন জিজ্ঞাসা করল, আমানত কীভাবে ধ্বংস হয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যখন অযোগ্যকে দায়িত্ব প্রদান করা হবে, তখন কেয়ামতের অপেক্ষা করো।"[১১২]

যখন দুর্বল ও বিশ্বাসঘাতক শ্রেণির মানুষ রাজক্ষমতায় আরোহণ করে এবং সুদ-ঘুষ ও মাধ্যম ছাড়া জনগণ তাদের কাছে পৌঁছতে পারে না, তখন জয়লাভ করা অসম্ভব।

আমরা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে দেখেছি, কীভাবে সাইফুদ্দীন কুতয রহ. সারেমুদ্দীন আকাতইকে বাহরিয়া মামলুক হওয়া সত্ত্বেও সেনাপ্রধান নিযুক্ত করেন। অনুরূপ রুকন উদ্দীন বাইবার্স তার প্রতিদ্বন্দ্বী ও বাহরিয়া মামলুক হওয়া সত্ত্বেও আইনে জালুত যুদ্ধে অগ্রগামী সৈন্যদলের প্রধান নিযুক্ত করেন। আমরা আরও দেখেছি, কীভাবে তিনি নিজের আত্মী-স্বজন ও সাথী-সঙ্গীদের পরোয়া না করে সিরিয়ার পূর্ব আমীরদের তাদের পদে বহাল রাখেন! এমন গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি তো সফল হবেই হবে। কারণ, যে আমানত হেফাজত করে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাকে হেফাজত করেন।

"তুমি আল্লাহকে হেফাজত করো, আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করবেন।" এটি সাহায্য লাভের অন্যতম মূলনীতি।

---

[১১২] *বুখারী* : ৫৯।

দশম কারণ : দুনিয়াবিমুখতা ও অনাড়ম্বতা

রাজা-বাদশারা তখনই পদস্খলিত হয়, যখন তার পার্থিব মোহে হাবুডুব খায় এবং পার্থিব লালসায় আকৃষ্ট হয়। ইতিহাস একথার অকুণ্ঠ প্রমাণ, স্থুল দুনিয়ার মোহ ও পার্থিব লালসায়ই রাজা-বাদশারা প্রজাদের প্রতি জুলুম করে।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা দুনিয়ার বিষয়ে সতর্ক করতেন। ইমাম বুখারী ও নাসায়ী রহ. হযরত আবু সাঈদ রা. সূত্রে বর্ণনা করেন—

جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ، وجلسنا حوله .. فقال: "إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها

"একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে বসলেন। আমরা তার চারপাশে বসলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি আমার মৃত্যুর পর তোমাদের ব্যাপারে যে বিষয়ের আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি করি তা হলো, তোমাদের জন্য দুনিয়ার শোভা-সৌন্দর্য উন্মুক্ত হবে।"[১১৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া সম্পর্কে মুসলমানদের মাত্র একবার সতর্ক করেননি, বরং বহুবার বিভিন্ন বাক্যে একাধিকবার একাধিক স্থানে এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন।

আমরা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে দেখেছি, দুনিয়ার মোহাবিষ্ট লোকদের জীবন-যাপন, চিন্তা-ভাবনা কেমন হয়! কীভাবে তারা নিকৃষ্ট দুনিয়ার বিনিময়ে নিজেদের মান-মর্যাদা ও আকীদা-বিশ্বাস বিক্রি করে দেয়। আমরা দেখেছি, তারা কীরূপ লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার জীবনযাপন করে এবং কীভাবে অপমানের মৃত্যুবরণ করে। আমরা মুহাম্মদ ইবনে খাওয়ারেযম, জালালুদ্দীন ইবনে খাওয়ারেম, আব্বাসী খলিফা নাছের আইয়ূবী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গকে দেখেছি।

কিন্তু সাইফুদ্দীন কুতয রহ. জাতির এই ব্যাধি সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি লাভকরত দুনিয়াবিমুখতা অবলম্বন করেন। তিনি জানতেন, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস মাত্র কয়েক দিনের। তাই তিনি এক মুহূর্তের জন্যও দুনিয়ার ধোঁকায় পড়েন নি; বরং তিনি গোটা দুনিয়ার বিনিময়ে জান্নাত লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন।

---

[১১৩] *বুখারী :* ১৪৬৫; *নাসায়ী :* ২৫৮১।

তাই তিনি তার অধীনস্থ অঢেল সম্পত্তি ইসলামের পথে বিলিয়ে দিয়েছেন; এমনকি নিজস্ব মালিকাধীন সম্পত্তিও মুসলিম বাহিনী গঠনে বিক্রি করেছেন।

রাজসিংহাসনের প্রতিও তার কোনো লোভ ছিল না। এমনকি মিশর সিরিয়া ঐক্যের সময় তিনি নাছের ইউসুফ আইয়ূবীকে তার অযোগ্যতা সত্ত্বেও ক্ষমতা গ্রহণের প্রস্তাব প্রদান করেছিলেন। তার রাজ্যজীবন ছিল জিহাদের জীবন, আতঙ্কের জীবন। তার মাঝে জীবনের কোনো মায়া ছিল না। তাই তো তিনি তাতারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সশরীরে যুদ্ধের ময়দানে অবতরণ করেছিলেন। অথচ তিনি জানতেন, যুদ্ধে অবতরণ না করলে কেউ তাকে নিন্দা করবে না। কারণ, জাতির জন্য রাজার বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরি। তবে তার অন্তরে জিহাদের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি সর্বদা শাহাদাতের মৃত্যু কামনা করতেন। তাই তিনি অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। এক মুহূর্তের জন্যও নশ্বর পৃথিবীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করেননি। এ কারণেই মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাকে দুনিয়া দান করেছিলেন, যে দুনিয়া থেকে তিনি পলায়ন করতেন, তাকে সেই সিংহাসন দান করেছিলেন, যেই সিংহাসনগ্রহণে তিনি বিমুখতা প্রদর্শন করতেন এবং এমন ধন-সম্পত্তি দান করেছিলেন, যা অর্জনের চিন্তাও তিনি করেননি!!

কুতয রহ. জানতেন, জন্মের পূর্বে বান্দার রিজিক লিপিবদ্ধ হয়। ভাগ্যে লিপিবদ্ধ ধন-সম্পত্তি, রাজ্য-ক্ষমতা তথা সব ধরনের রিজিক অবশ্যই সে প্রাপ্ত হবে। এমনকি তা তার পিছে পিছে ঘুরতে থাকে। তাই তিনি ভাগ্যের প্রতি ভরসা করতেন। যিনি রিজিকদাতা সর্বক্ষমতার মালিক, তিনি তার কাছে সবকিছু চাইতেন। তিনি অন্যের দরবারে কখনো নিজেকে হেয় করেননি, চাই তার শক্তি যত বেশিই হোক না কেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিম্নোক্ত বাণীকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। হাদীসটি ইমাম ইবনে মাজা রহ. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির একাংশ হলো—

ايها الناس اتقوا الله و اجملوا في الطلب فان نفسا لن تموت حتى تستوفى رزقها وان ابطا عنها فاتقوا الله واجملوا في الطلب خذوا ما حل و دعوا ما حرم -

"হে লোকসকল, আল্লাহকে ভয় কর এবং উত্তমভাবে তার কাছে প্রার্থনা করো। কারণ, ভাগ্যে লিপিবদ্ধ রিজিক পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কেউ ইন্তেকাল করবে না, যদিও তা বিলম্বিত হয়। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং উত্তমভাবে তার কাছে প্রার্থনা করো। হালাল বস্তু গ্রহণ করো আর হারাম বর্জন করো।"[১১৪]

আল্লাহ তা'আলা এই মহান পুরুষ অবিসংবাদিত নেতার প্রতি অফুরন্ত নেয়ামত বর্ষণ করুন। দুনিয়ার মতোই আখেরাতও যেন তার কল্যাণকর হয়। মহান পুনরুত্থান দিবসে বিশ্ববাসীর সামনে আল্লাহ যেন তাকে সম্মানিত করেন যেমন তিনি তাকে আইনে জালুত যুদ্ধের দিন সম্মানিত করেছিলেন এবং আল্লাহ যেন মুসলিম মুজাহিদদের দলে তাকে লিপিবদ্ধ করেন।

আইনে জালুত যুদ্ধে বিপুল সহযোগিতা লাভের এই ছিল দশটি কারণ। আল্লাহ তা'আলা যেন ইসলাম ও মুসলমানদের সর্বদা বিজয় দান করেন। আমীন।

---

[১১৪] *ইবনে মাজা : ২১৪৪।*

শেষ কথা

এই হলো তাতারীদের ইতিহাস।

এই হলো তাতারী হামলার বীভৎস রূপ।

এই হলো তাতারী আগ্রসনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এই হলো ইতিহাসের চিরন্তন বিধান।

ইতহাসের চরিত্র হলো, কোনো জাতিকে সফলতার স্বর্ণশিখরে উন্নীত করে আবার অধঃপতনের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে।

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

"এ তো কালপরিক্রমা, যা আমি মানুষের মাঝে পালাক্রমে বদলাতে থাকি।"[১১৫]

তাতারীরা সফলতার স্বর্ণচূড়ায় আরোহণ করেছিল। আবার ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়েছে। অন্যদিকে মুসলমানরা ধ্বংসের অতল গর্ত থেকে আবার সফলতার শীর্ষে আরোহণ করে।

আমরা কেবল উত্থান-পতনের ইতিহাস গবেষণার জন্য বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ রচনা করিনি; বরং সেই সব কারণ অনুসন্ধানের জন্য রচনা করেছি, যদ্দরুন জাতির উন্নতি ও অবনতি ঘটে। ইতিহাস বারংবার পুনরাবৃত্ত হয় আশ্চর্য মহিমায়।

আমরা বক্ষ্যমাণ ইতিহাসগ্রন্থটিতে দেখেছি, কীভাবে মহান ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে ইতিহাসের প্রেক্ষাপট সমূলে পরিবর্তন হয়, যেভাবে চেঙ্গিজ খানের আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে পূর্বে ইতিহাসের প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হয়েছিল। অথচ এই দুই ইতিহাসখ্যাত ব্যক্তির মাঝে আকাশ-পাতাল ব্যবধান বিরাজমান। তবে এই দুই ব্যক্তির মাঝে একটি গুণের সুসমাবেশ ঘটেছিল। তা হলো, তারা উভয়ই ছিল ক্রিয়াশীল প্রভাব বিস্তারকারী। তারা উভয়ই বিশ্ববাসীর মাঝে প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। তারা পৃথিবীর ভৌগলিক মানচিত্রকে পরিবর্তন করে দিয়েছিল। তারা উভয়ই ইতিহাসের প্রেক্ষাপটকে পরিবর্তন করে

---

[১১৫] সূরা আল ইমরান : ১৪০।

ফেলেছিল। তবে উভয়ের প্রভাবের মাঝে বিস্তর ব্যবধান ছিল। একজন দল-বল, অস্ত্র-শস্ত্র ও জঙ্গিশক্তিকে কাজে লাগিয়েছিল। আর অপরজন ঈমানী শক্তি ও শরীয়তের শক্তিকে কাজে লাগিয়েছিলেন।

বন্ধুরা, ধ্বংস করা খুব সহজ, তবে নির্মাণ করা খুব কঠিন।

বন্ধুরা, জুলুম করা খুব সহজ, তবে ইনসাফ করা খুব কঠিন।

বন্ধুরা, রাগ করা সহজ, তবে ক্ষমা করা কঠিন।

এই দ্বিতীয় কাজগুলোই হলো ইসলামী আদর্শ।

কুতয রহ.ও মানুষ ছিলেন। চেঙ্গিজ খানও মানুষ ছিল।

তবে প্রথমজন ইসলামী আদর্শের মূর্তপ্রতীক। আর দ্বিতীয়জন ঘৃন্য জঘন্য।

তাই উভয়ের বেলায় ইতিহাস তাদের অনুগামীরূপ ধারণ করে।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. সভ্য বিশ্বমানবতা নির্মাণ করেছিলেন। তিনি ভূপৃষ্ঠের খলিফা হওয়ার উপযুক্ত ছিলেন।

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

"আমি ভূপৃষ্ঠে খলিফা বানাতে চাই।"[১১৬]

অপর দিকে চেঙ্গিজ খান মানবসভ্যতাকে ধ্বংস করেছিল। তাই সে ছিল অভিশপ্ত।

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا

"আল্লাহ বললেন, যাও তোমাদের মধ্যে যারা তোমাদের অনুসরণ করবে জাহান্নামই তোমাদের সকলের পূর্ণ শাস্তি।"[১১৭]

ভূপৃষ্ঠে চেঙ্গিজ খানের দৃষ্টান্ত অসংখ্য। পক্ষান্তরে সাইফুদ্দীন কুতয রহ. এর দৃষ্টান্ত বিরল। কারণ, আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, ধ্বংস করা সহজ, নির্মাণ করা অনেক কঠিন!!

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

"তুমি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের অনুসরণ করো, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে।"[১১৮]

---

[১১৬] সূরা বাকারা : ৩০।

[১১৭] সূরা বনী ইসরাইল : ৬৩।

[১১৮] সূরা আন'আম : ১১৬।

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

"তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ মানুষই ঈমান আনবার নয়।"[১১৯]

কোনো কোনো ইতিহাসবিদের মতে ইতিহাস নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির অবদানে রচিত হয় না, নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি সমাজ পরিবর্তন করতে পারে না, ইতিহাসের গতিকে পরিবর্তন করতে পারে না; বরং ইতিহাস আপনা-আপনিই রচিত হয়।

আমি তাদের সাথে সহমত পোষণ করতে পারছি না। কারণ, বহু কালে বহু স্থানে নির্দিষ্ট ব্যক্তির আবির্ভাবে ইতিহাস পরিবর্তন হয়েছে। আমি বলছি না নবী বা রাসূলের আবির্ভাবে ইতিহাস পরিবর্তন হয়েছে। কারণ, নবী-রাসূলের আবির্ভাবে ইতিহাস পরিবর্তন হওয়া, সমাজ পাল্টে যাওয়া স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। আমি বলতে চাচ্ছি, এমন কতিপয় নির্দিষ্ট ব্যক্তির আবির্ভাবে ইতিহাস পরিবর্তন হয়েছে, যারা নবী বা রাসূল নন। ইতিহাস আবু বকর রা. এর মত মহান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবে পরিবর্তন হয়েছে। ইতিহাস পরিবর্তন হয়েছে ওমর রা.-এর মতো ব্যক্তিত্বের শুভাগমনে। ইতিহাস পরিবর্তন হয়েছে ওমর ইবনে আবদুল আযীয, মূসা ইবনে নাসীর, আবদুর রহমান দাখেল, আবদুর রহমান নাছের, ইমাদুদ্দীন জঙ্গী, নূরুদ্দীন মাহমুদ, সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী, সাইফুদ্দীন কুতয, আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসিন, ইউসুফ ইবনে তাশেফীন, মুহাম্মদ ফাতেহ রহ. প্রমুখ অবিসংবাদিত মহান পুরুষদের আবির্ভাবে।

এমন মহান ব্যক্তিত্ব দীর্ঘদিন পর আবির্ভূত হন, তবে তাদের সুমহান কীর্তি দীর্ঘদিন অবশিষ্ট থাকে।

ইমাম বুখারী রহ. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন—

انما اناس كالابل المائة لا تكاد تجد فيها راحلةً

"মানুষ একশত উটের ন্যায়, যাদের একটিও বাহনযোগ্য নয়।"[১২০]

তবে সেই বাহনযোগ্য একজনকে যদি পাওয়া যায়, তবে সুস্বাগতম হে পৃথিবীবাসী!

---

[১১৯] সূরা ইউসুফ : ১০৩।

[১২০] *বুখারী* : ৪৬৯৮।

ইমাম আবু দাউদ রহ. হযরত আবু হুরাইরা রা. সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক শতাব্দীতে এমন এক মহান পুরুষ পাঠান, যিনি দ্বীনের সংস্কার করেন।"[১২১]

সাইফুদ্দীন কুতয রহ. নিঃসন্দেহে সেই সব সৌভাগ্যবান মুজাহিদদের অন্যতম। আপনি চাইলে তার ঈমান-আমল, দুনিয়া-বিমুখতা, অনাড়ম্বতা, যোগ্যতা, দক্ষতা, সততা-নিষ্ঠতা, জিহাদ-বিসর্জন, ধৈর্য-সংযম এবং বিনয়-সহনশীলতা সম্পর্কে জানতে পারেন। তার মাঝে যাবতীয় পুণ্যের সুসমন্বয় ঘটেছিল। তিনি আক্ষরিক অর্থেই একজন যুগ-সংস্কারক ছিলেন।

ইমাম যাহাবী রহ. *সিয়ারু আলামিন নুবালা* গ্রন্থে তার সম্পর্কে বলেন—

كان فارسا شجاعا ساءسا دينا محببا الى الروعة، هزم التتار، وطهر الشام منهم يوم عين جالوت، ويسلم له ان شاء الله جهاده، وكان شابا اشقر، وافر اللحية، تام الشكل، وله اليد البيضاء في جهاد التتار، فعوض الله شبابه بالجنة، و رضي عنه.

"তিনি ছিলেন বীর বাহাদুর, যোদ্ধা, রাজনীতিক, দিয়ানতদার, প্রজাদের প্রতি সংবেদনশীল। তিনি তাতারীদের পরাজিত করেন। আইনে জালুত যুদ্ধে সিরিয়াকে তাতারীমুক্ত করেন। তিনি ছিলেন সুদর্শন, সুঠাম দেহের অধিকারী। তার মুখভর্তি দাড়ি ছিল। তিনি তাতারীদের বিরুদ্ধে ছিলেন কঠোরহস্ত। আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাত দান করুন এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট হন।"[১২২]

আল্লামা ইবনে কাছীর রহ. *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* গ্রন্থে তার সম্পর্কে বলেন—

"তিনি ছিরেন বীর পুরুষ। ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কল্যাণকামী, সৎপরায়ণ। মানুষ তাকে খুব ভালোবাসত এবং তার জন্য শুভ দুআ করত।"[১২৩]

---

[১২১] *আবু দাউদ : ৪১৯১।*

[১২২] *সিয়ারু আলামীন নুবালা।*

[১২৩] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া।*

খেয়াল করে দেখবেন, মুসলিম ইতিহাসবিদগণ সর্বদা প্রজা ও সাধারণ নাগরিকের ভালোবাসার কথা উল্লেখ করে থাকেন। প্রজাদের ভালবাসা প্রকৃত অর্থে মহৎ হওয়ার অন্যতম সূক্ষ্ম মানদণ্ড। কারণ, সৎ-নেককার প্রজা কেবল সৎ শাসককেই ভালোবাসে। আর ফেতনাবাজ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী শাসককেই ঘৃণা করে। সুতরাং নেককাররা যাকে ভালবাসে, সে আল্লাহর কাছে প্রিয়। আর নেককাররা যাকে ঘৃণা করে সে আল্লাহর নিকটেও ঘৃণ্য।

ইমাম মুসলিম রহ. হযরত আবু হুরাইরা রা. সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال : إني أحب فلاناً فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول : إن الله يحب فلاناً فأحبوه .. فيحبه أهل السماء . قال: ثم يوضع له القَبول في الأرض. وإذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقول: إني أُبغض فلاناً فأبغضه، قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض.

"আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন জিবরাঈল আ. কে ডেকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালোবাসি। সুতরাং তুমিও তাকে ভালোবাসো। তখন জিবরাঈল আ.ও তাকে ভালোবাসতে শুরু করেন। অতঃপর তিনি আসমানে ঘোষণা দেন, আল্লাহ তা'আলা অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন। সুতরাং তোমরাও তাকে ভালোবাসো। তখন আসমানবাসীও তাকে ভালোবাসে। এভাবে পৃথিবীতে তাকে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা প্রদান করা হয়। আর যখন আল্লাহ তা'আলা কাউকে ঘৃণা করেন, তখন জিবরাঈল আ. কে ডেকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ঘৃণা করি। তুমিও তাকে ঘৃণা করবে। অতঃপর জিবরাঈল আ. তাকে ঘৃণা করতে শুরু করেন। অতঃপর তিনি আসমানবাসীর মাঝে ঘোষণা দেন, আল্লাহ তা'আলা অমুক ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন, সুতরাং তোমরাও তাকে ঘৃণা করবে। এরপর আসমানবাসীও তাকে ঘৃণা করতে শুরু করে। এভাবে জমিনে তার প্রতি ঘৃণা ছড়িয়ে দেওয়া হয়।"[১২৪]

---

[১২৪] *মুসলিম :* ২৬৩৭।

বন্ধুরা!

এভাবেই কতিপয় মহান ব্যক্তিত্ব ইতিহাসের পাতায় পরিবর্তনের আহ্বান লেখেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, মানুষ সব সময় সেই মহান মানুষটিকে খুঁজতে থাকে ঘরের বাইরে, প্রধান সড়কে, শহর-বন্দরে। তারা বিশ্বাস করে, নিশ্চয়ই সেই মহান মানুষটির শুভাগমন ঘটবে অচিরেই নিকটবর্তী স্থানে। অথবা পৃথিবীর বাইরে থেকে!! কিন্তু কেন আমরা নিজেকে, নিজের পরিবারকে, নিজের সন্তান-সন্ততিকে সেই মহান মানুষ হতে অনুপ্রাণিত করি না?!

কেন আপনি সাইফুদ্দীন কুতয হন না?

কেন আপনার সন্তান সাইফুদ্দীন কুতয হয় না?!

কেন আপনার ভাই সাইফুদ্দীন কুতয হয় না?!

বন্ধুরা!

কেন আমরা ইতিহাস পাঠ করি না?! তাহলে আমরা নেককার পথ ও পন্থা অবলম্বন করতে পারব ও বদকারদের পথ ও পন্থা বর্জন করতে পারব।

কেন আমরা কুতয রহ.-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করি না; তাহলে তো এখনো আমরা আইনে জালুত স্থানে পৌঁছতে পারতাম। এখনো তো তাতার ও তাতারদের সহোদর বিদ্যমান।

আল্লাহর শপথ! আমাদের কোনো ওজর বা অপারগতা নেই; বরং আমাদের বিরুদ্ধে দলিল আছে।

'যার ধ্বংস হওয়ার, সে সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখেই ধ্বংস হয়। আর যার বেঁচে থাকার, সে সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখেই বেঁচে থাকে।'

এই হলেন সাইফুদ্দীন কুতয রহ.।

বিদায় হে কুতয!

বিদায় হে কুতয! কুতয রহ. এর অকাল মৃত্যু ঘটল। তিনি মিশরের সিংহাসনে মাত্র এগারো মাস সতেরো দিন সমাসীন ছিলেন। পূর্ণ এক বছরও ছিলেন না।

বিজয়ের এই মহান ইতিহাস, যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি যথার্থ প্রশিক্ষণ, অবিশ্বাস্য বিজয় এবং সুবিশাল ফলাফল এক বছরের কম সময়ে সংঘটিত হয়।

সাইফুদ্দীন কুতয আইনে জালুত যুদ্ধের মাত্র পঞ্চাশ দিন পর মৃত্যুবরণ করেন।

ব্যক্তির বীরত্ব, বড়ত্ব ও মর্যাদা তার ধন-সম্পত্তি, রাজত্ব কিংবা দীর্ঘ জীবন হিসেবে নির্ণীত হয় না; বরং তা নির্ণীত হয় তার ঐতিহাসিক কর্ম-কীর্তি দ্বারা,

যা ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, অবশ্যই সেসব কর্ম-কীর্তি শরীয়তসম্মত হতে হবে।

কে কুতয, যদি তিনি আল্লাহর বিধান আঁকড়ে না ধরতেন এবং শরীয়তকে আঁকড়ে ধরার অসিলায় আইনে জালুত যুদ্ধে জয়লাভ না করতেন?! কে কুতযকে চিনত, যদি তিনি এই পন্থা অবলম্বন না করতেন?! নিঃসন্দেহে ইতিহাস অন্যান্য মানুষ—যারা ছিল স্রোতের খড়কুটার ন্যায়। এমনকি যারা ছিল নিজ গোত্রের জন্য বিপদের কারণ—তাদের ন্যায় তাকেও ভুলে যেত। ইতিহাসের পাতায় কারও নাম লিপিবদ্ধ হওয়ার জন্য প্রয়োজন মহামানব হওয়া। এর জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন নেই।

মানুষ মনে করে, পরিবর্তন সাধনের জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ কাল। আর এই স্থূল ধারণার বশবর্তী হয়েই তারা ধ্বংস হয়। তাদের ধারণা সঠিক নয়। পরিবর্তন সময়ের ওপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে পরিবর্তনকারী সমাজের গুণাবলির ওপর। যদি তারা মহান আদর্শবান হয়—কুতয রহ.-এর মতো—তাহলে পরিবর্তন খুব সহজ। যদি আপনি বলেন, পরিবর্তনকারীর মাঝে এসব গুণাবলি থাকলে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, তবুও অত্যুক্তি হবে না। পক্ষান্তরে যদি তাদের মাঝে সাইফুদ্দীন কুতয রহ.-এর মতো উত্তম গুণাবলির অপূর্ব সমন্বয় না ঘটে, তাহলে কয়েক যুগ অতিবাহিত হলেও সমাজের কোনো উন্নতি ঘটবে না; বরং দিন দিন তারা অধঃপতনের দিকে ধাবিত হবে।

সাইফুদ্দীন কুতয রহ.-এর অকাল মৃত্যুর পর শায়েখ ইজ ইবনে আবদুস সালাম রহ. এই মহান বিজয় ধূলিসাৎ হওয়ার এবং উম্মাহর পুনঃধ্বংসের আশঙ্কা ব্যক্ত করে বলেছিলেন—

> ‘আল্লাহ তা‘আলা কুতয রহ. কে রহম করুন। তিনি যদি দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতেন, তাহলে যুবসমাজকে ইসলামের জন্য প্রস্তুত করতে পারতেন।’

তবে সাইফুদ্দীন কুতয রহ. দীর্ঘ হায়াত না পেলেও যুবসমাজকে তৈরি করে গিয়েছিলেন। তার মৃত্যুর পর মামলুক সাম্রাজ্য দীর্ঘ তিন যুগ ইসলামকে নিষ্কলুষ রেখেছিল। ইসলামের পতাকা সমুন্নত রেখেছিল। কুতয রহ. সুদূর ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। যেই ভিত্তির ওপর পরবর্তী প্রজন্ম দাঁড়িয়েছিল। মজবুত ভিত ব্যতীত কোমর সোজা করে দাঁড়ানো যায় না।

শায়েখ ইজ ইবনে আবদুস সালাম রহ. বলেন, ওমর ইবনে আবদুল আযীয রহ. এর পর সততা ও ন্যায়পরায়ণতার দিক থেকে কুতয রহ. সমমানের কোনো মুসলিম নেতা জন্মগ্রহণ করেনি।

আমরা ভাবি, কুতয রহ. কীভাবে এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করলেন?!

এও ভাবি, কীভাবে কুতয রহ. গঠিত হলেন?!

কুতয রহ. কুরআন-সুন্নাহর সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিলেন।

দ্বীন ইসলামের সবচেয়ে বড় মু'জিযা হলো 'ব্যক্তি গঠন করা'।

ইসলাম ব্যতীত ওমর কে?

ইসলাম ব্যতীত খালেদ কে?

ইসলাম ব্যতীত তারেক বিন যিয়াদ কে?

ইসলাম ব্যতীত কুতয কে?

আল্লাহর সেই কিতাব, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সেই হাদীস আমাদের সামনে রয়েছে, যা আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে ছিল। আল্লাহ তা'আলা কুরআন-হাদীসকে আমাদের জন্য হেফাজত করেছেন। কেয়ামত অবধি করবেন। মুসলিম উম্মাহ যতদিন কুরআনহাদীস আঁকড়ে ধরবে, ততদিন গোমরা হবে না।

ইমাম মালেক রহ. *মুওয়াত্তায়* বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم : كتاب الله وسنةَ نبيه.

"আমি তোমাদের মাঝে দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা এই বস্তু দুটিকে আঁকড়ে ধরবে ততদিন গোমরা হবে না। এক. কিতাবুল্লাহ দুই. সুন্নতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।"[১২৫]

আল্লাহ সেই সত্তা, যিনি উম্মাহর জন্য খালেদ, কা'কা, তারেক, সালাহ ও কুতয রহ. কে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই উম্মাহর জন্য সর্বদা এমন মুজাহিদ জামাত সৃষ্টি করবেন, যারা সর্বদা দ্বীনকে সমুন্নত রাখবে, প্রজন্মের অন্তরে আশা জাগাবে, তাদের বিশ্ব নেতৃত্ব দেওয়ার উপযুক্ত করে গড়ে তুলবে; এভাবে তাদের জান্নাতুন নাঈমে পৌঁছে দেবে।

---

[১২৫] *মুওয়াত্তা* : ১৮৪৭।

আল্লাহর শপথ! ইসলামের মাঝেই দুনিয়া ও আখেরাতের সম্মান নিহিত।

তাতারীদের ইতিহাস শেষ হলো। শেষ হলো আইনে জালুতের ইতিহাস। এরপর আরও বহুকাল অতিবাহিত হয়েছে। সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। শুধু রয়ে গেছে ইবরত ও শিক্ষা।

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

"নিশ্চয়ই তাদের ঘটনায় বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপাদান রয়েছে।"[১২৬]

সবশেষে শুনুন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী বলেন! হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. হযরত আবু হুরাইরা রা. সূত্রে বর্ণনা করেন—

تكفّل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخلَه الجنة، أو يرجعه إلى مسكَنِه الذي خرج منه مع ما نال من أجرٍ أو غنيمة

"আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির দায়িত্ব গ্রহণ করেন, যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়। 'জিহাদ ও আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে' একথার সত্যায়নেই সে ঘর থেকে বের হয়। অথবা জিহাদ শেষে ছওয়াব বা গনিমতের সম্পদ নিয়ে ঘরে ফিরে আসে।"[১২৭]

ঐশী সংবিধান চিরকাল অক্ষত অপরিবর্তিত—

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ

"আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করলে কেউ তোমাদের পরাস্ত করতে পারবে না।"[১২৮]

আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করি, তিনি যেন আমাদের তার পথে গোটা জীবন ব্যয় করার তৌফিক দান করেন। আমাদের যাবতীয় কথাবার্তা, কাজকর্মকে

---

[১২৬] সূরা ইউসুফ : ১১১।

[১২৭] *বুখারী* : ৩১২৩, *মুসলিম* : ১৮৭৬।

[১২৮] সূরা আল ইমরান: ১৬০।

সাহাবায়ে কেরামের কথা-বার্তা, কাজ-কর্মের অনুরূপ বানান। তাদের ন্যায় যেন বলার তৌফিক দেন—

نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما بقينا أبداً

"আমরা সেই সব লোক, যারা মুহাম্মদের হাতে মৃত্যু পর্যন্ত জিহাদ করার বায়াতগ্রহণ করেছি।"

দুআ করি, আল্লাহ যেনো আমাদের মাঝে ইতিহাসখ্যাত মহান ব্যক্তি তৈরি করেন। আমীন।

উম্মাহর ব্যাধি ও আল্লাহর মদদ লাভের উপায়

আল্লাহর মদদ লাভের উপায় হলো, উম্মাহর ব্যাধি নির্ণয় করে তার প্রতিকার করা।

সংক্ষেপে উম্মাহর ব্যাধিসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো—

১. ইসলামের প্রকৃত মর্যাদা সম্পর্কে অনবগতি
২. মুসলমানদের অনৈক্য
৩. দুনিয়াপ্রীতি ও বিলাসী জীবনযাপন
৪. জিহাদ বর্জন
৫. জিহাদের বাহ্যিক প্রস্তুতিগ্রহণে অবহেলা
৬. মুসলমানদের নেতৃত্ব সংকট
৭. শত্রুকে মিত্র বানানো।
৮. হতাশা ও মনোবলহীনতা
৯. অযোগ্যকে দায়িত্ব প্রদান
১০. পরামর্শ বর্জন

উম্মাহর এই ব্যাধিসমূহ বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে বিভিন্ন স্থানে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এবার আসুল উক্ত বিষয়গুলো নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করি—

প্রথম ব্যাধি : ইসলামের প্রকৃত মর্যাদা সম্পর্কে অনবগতি

ইসলামের একটি মূলনীতি হলো—

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ

> "তোমরা যদি আল্লাহকে [আল্লাহর দ্বীনকে] সহযোগিতা করো, আল্লাহ তোমাদের সহযোগিতা করবেন।"[১২৯]

আল্লাহকে সাহায্য করা অর্থ হলো, তার শরীয়ত মেনে চলা, ইসলামী জীবনব্যবস্থা মতো জীবন পরিচালনা করা। আল্লাহর বিধান ছেড়ে দেওয়া, কুরআল-সুন্নাহকে উপেক্ষা করা এবং পশ্চিমাবিশ্ব প্রণীত বিধান ও সমাজব্যবস্থা

---

[১২৯] সূরা মোহাম্মদ : ৭।

মেনে নেওয়াই হলো বিপদাপদ ও বালা-মসিবতের মূল কারণ। তাতারসহ সকল অনৈসলামিক শক্তি থেকে ইসলাম ও মুসলমানরা তখনই রেহাই পাবে, যখন তাদের মাঝে সেই ব্যক্তির শুভাগমন ঘটবে, যিনি ওয়া ই স লা মা...হ [হায়!! ইসলা...ম!] বলে ডাক দেবেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুতয রহ.-এর এই বাণীর মাধ্যেমে আমাদের ওই পতাকাতলে সমবেত হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন, যেই পতাকাতলে আশ্রয়গ্রহণকারী সকলেই বিজয়ের স্বাদ ভোগ করে।

ইসলামকে উপেক্ষা করে সেনাপতি সৈন্যবাহিনীকে যতই সুসংগঠিত করুক না কেন, সফলতা ও বিজয় কখনো আসবে না। আমরা আমাদের ভেতর-বাহির যদি তার সঙে সম্পৃক্ত না করি, তবে তিনি কখনোই আমাদের দিকে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করবেন না। আমাদের ভেতরে মুসলমান হতে হবে, বাহিরেও মুসলমান হতে হবে। আমাদের রাজনীতি, আমাদের অর্থনীতিকে ইসলামায়ন করতে হবে। আমাদের জীবন, আমাদের মরণ, আমাদের সেনাপতি, আমাদের সৈন্যবাহিনী সবই একনিষ্ঠ ইসলামী সংবিধান অনুযায়ী পরি

চালিত হতে হবে। একথা সুস্পষ্টভাষায় বলতে কোনো দ্বিধা নেই। এতে লজ্জার কোনোকিছু নেই। বরং যারা দ্বীনের পরোয়া করে না, বস্তুত তাদেরই লজ্জিত হওয়া উচিৎ।

সুবহানাল্লাহ! আমাদের অবস্থা দেখুন—

বর্তমান সমাজের অবস্থা হলো, যারা দ্বীনের কথা বলে, তাকে সাবধানে কথা বলতে হয়, কথা-কাজে তাকে সাবধানী হতে হয়—না জানি সুযোগ পেলে অন্যরা তার কথার অপব্যাখ্যা করে বসে। পক্ষান্তরে যারা অন্যায়-অপকর্মের কথা বলে বেড়ায়, তাদের কোনো নিয়মনীতি মানতে হয়না। তারা সমাজে বে-পরোয়। যে জাতির অবস্থা হলো এমন, সে জাতি কিভাবে বিজয় লাভ করবে বলুন?!

সে জাতি কিভাবে সফল হবে, যে জাতির আলেমগণ হক-কথা বলতে লজ্জা পায়, কিন্তু পাপিষ্ঠ-পাপাচাররা প্রকাশ্যে গুনাহ ও অন্যায়ের প্রচার করতে লজ্জাবোধ করে না!

হে মুসলিম ভাইরা, বিষয়টি নিয়ে একটু ভাবুন। মুসলমানদের এই মানসিক বিপর্যই হলো মুসলিম দেশসমূহে শত্রুদের প্রতিষ্ঠা পাওয়ার অন্যতম কারণ।

দ্বিতীয় ব্যাধি : মুসলমানদের অনৈক্য

আমরা তাতারীদের ইতিহাস পাঠ করে দেখতে পেয়েছি, তাতারীদের আক্রমণ যেমন অবিরাম ছিলো, মুসলিম ভূখণ্ডসমূহে যেমন তাতারীত্রাস ছড়িয়ে পরেছিলো, অনুরূপ মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহও ছিলো তুঙ্গে। মুসলমানরা নিজেরা নিজেদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতো। নিজেদের দ্বন্দ্ব-কলহের পিছে পড়ে শত্রুদের দিকে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পেতো না। আর এই সুযোগে শত্রুরা আক্রমণ করে বসত। মুসলমানদের পরস্পরিক সংঘাত ব্যর্থতা ও পরাজয়ের অন্যতম কারণ—নিঃসন্দেহে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন—

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

"তোমরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না। তাহলে তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। তোমরা ধৈর্যধারণ করো, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"[১৩০]

তৃতীয় ব্যাধি : দুনিয়াপ্রীতি ও বিলাসী জীবনযাপন

তাতারীদের যুগে মুসলমানদের চোখে দুনিয়া অনেক বড় হয়ে গিয়েছিল—বর্তমান মুসলিম জাতিরও একই অবস্থা। একটি বৃহৎ প্রজন্ম কেবল দুনিয়ার জন্যই বেড়ে উঠছে। অথচ দুনিয়া হলো সবচেয়ে তুচ্ছ, নগণ্য বিষয়। সবাই কেবল সম্পদ সঞ্চয়, সুন্দর জীবনযাপন ও দুনিয়াদারির জন্যই বেঁচে আছে। ভোগ-বিলাস, খাবার-দাবার, গাড়ি-বাড়িই আজ মুসলিমসমাজের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা আজ বিধ্বংসী গান-বাজনা, মিউজিক-বাদ্যে উপভোগ করে। এভাবেই মুসলমানরা আজ দুনিয়ায় ডুবে রয়েছে। অধিকাংশ যুবক কুরআনের চেয়ে বেশি অশ্লীল গান মুখস্ত করে। অধিকাংশ যুবক গায়ক-গায়িকা ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জাবনী সবিস্তারে অধ্যয়ন করে। নিজ দেশের বা ভিনদেশের খেলোয়ারদের জীবনী তারা খুব ভালো জানে। অথচ মুসলিমসমাজের কাণ্ডারী উলামা, বীরযোদ্ধাদের জীবনী সামান্যও জানে না। তারা সাহাবীদের জীবনীও জানে না। এমনকি রাসূল সা.-এর জীবনীও জানেনা!!

এ কি এমন ব্যাধি নয়, যার আশু চিকিৎসা দরকার।

---

[১৩০] সূরা আনফাল : ৪৬।

ধ্বংসের সুস্পষ্ট কারণসমূহের অন্যতম কারণ হলো দুনিয়া ভোগ-বিলাস। আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে বলেন—

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

"আমি যখন কোনো জনপদকে ধ্বংস করতে চাই, তখন তার সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিবর্গকে সৎকর্ম করতে আদেশ দিই। কিন্তু তারা অসৎকর্ম করে। ফলে তাদের প্রতি আমার সিদ্ধান্ত অবধারিত হয় এবং আমি তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি।"[১৩১]

ভোগ-বিলাসী মানসিকতা আজ মুসলমানদের মাঝে ব্যাপকার ধারণ করেছে; এমনকি তা গরিব-মিসকীনদের মাঝেও শুরু হয়েছে। অনেক মানুষ এমন আছে, যে দিনের খাবার জোগাতে পারে না, কিন্তু সিগারেট ছাড়া তার চলে না। অনেকে এমন আছে, পরার কাপড় ব্যবস্থা করতে হিমশিম খায়, কিন্তু কফি-হাওজের আড্ডা সে ত্যাগ করতে পারে না। সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ ব্যয় করতে পারে না, কিন্তু চলচ্চিত্র-সিনেমা নিয়মিত দেখে!

এমন ভোগ-বিলাসী মানসিকতার মানুষ কিভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াবে! যারা সফলাত ও উন্নতির চরম-শিখরে আরোহণ করতে চায়, তারা কিছুতেই এমন বিলাসী হতে পারে না।

চতুর্থ ব্যাধি : জিহাদ বর্জন

দুনিয়ার লোভ ও সীমাতিরিক্ত বিলাসিতার পরিণামের মতোই জিহাদ বর্জনের ফলাফল অবশ্যম্ভাবী। আজ মুসলমানরা সর্বাধিক অধঃপতিত জাতির মতো জীবনযাপনে সন্তুষ্ট। মুসলমানরা শত্রুদের সালাম [শান্তিচুক্তি]কে মেনে নিয়েছে—যা মূলত ইস্তেসলাম [আত্মসমপর্ণ]। তারা আত্মসমর্পণের জীবন বেছে নিয়েছে।

মুসলমানরা তাতারীযুগে বোঝেনি—যেমন বর্তমান মুসলমানরা বুঝতে পারছে না—যে, মুসলমানদের অধিকার আদায়ের একমাত্র মৌলিক ও কার্যকরী পথ হলো, জিহাদ। শান্তিচুক্তি বা সন্ধিচুক্তি যদিও কখনো কখনো কল্যাণকর, তবে

---

[১৩১] সূরা বনী ইসরাইল : ১৬।

যখন মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার খর্ব হবে, তাদের রক্তপাত হবে অন্যায়ভাবে, তাদের কোণঠাসা করে রাখার চেষ্টা করা হবে, তাদের দ্বীনধর্ম নিয়ে বিদ্রূপ করা হবে, তাদের মান-সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হবে তখন শান্তিচুক্তির কোনো অবস্থাতেই কল্যাণকর হয় না।

মুসলমানরা ভোলতে বসেছে, পূর্ণ অধিকার পুনরুদ্ধারের পূর্বে শান্তিচুক্তি হতে পারে না। শান্তিচুক্তি তখনই হতে পারে, যখন আমরা থাকবো সম্মানিত এবং যখন শান্তিচুক্তি লঙ্ঘন করলে আমরা চুক্তি বাতিলের অধিকার সংরক্ষণ করব। এ ছাড়া শান্তিচুক্তি তো আত্মসমর্পণ বৈ কিছু নয়। এমন শান্তিচুক্তি শরীয়তসম্মত নয়।

মুসলমানদের বোঝা উচিৎ, 'জিহাদ' শব্দটি কোনো দোষণীয় শব্দ নয়, যা লুকিয়ে রাখতে হবে বা তা প্রকাশে লজ্জা পেতে হবে। 'জিহাদ' এমন কোনো নিকৃষ্ট শব্দ নয়, যা শিক্ষাসিলেবাস, পত্র-পত্রিকা, বই-পত্র, কিতাবাদি থেকে মুছে ফেলতে হবে। জিহাদ তো ইসলামের শীর্ষ চূড়া। জিহাদ ইসলামের অন্যতম প্রধান আমল। ইসলামের শত্রু কিংবা ভাব শত্রুরা তা মানুক বা না-মানুক। জিহাদ শব্দটি নানা রূপে কুরআনে কারীমে ত্রিশবারের অধিক ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপ কিতাল [যুদ্ধ তথা মুসলিম উম্মাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা] শব্দটিও ব্যবহৃত হয়েছে।

এসকল আয়াত নিয়ে আমরা কোথায় যাবো? এই আয়াতগুলো নিয়ে কি আমরা পালাবো?

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ

'হে নবী, মুমিনদের যুদ্ধের প্রতি উৎসাহিত করুন।'[১৩২]

আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত আয়াতটি নিয়ে আমরা কোথায় পালাবো? আল্লাহ তা'আলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

---

[১৩২] সূরা আনফাল : ৬৫।

"হে মুমিনগণ, কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সাথে যুদ্ধ করো এবং তারা যেনো তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। জেনে রাখো, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।"[১৩৩]

কুরআনের এই বাণীটি নিয়ে আমরা কোথায় পালাব?

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

"তোমরা মুশরিকদের সাথে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করো। যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে থাকে এবং মনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।"[১৩৪]

হে আমার ভাই-বোনেরা, জিহাদ ছেড়ে দিয়ে কতদিন পর্যন্ত নিজেদের রক্ষা করতে পারবেন? কতদিন পর্যন্ত নিজের মান-সম্মান ধরে রাখতে পারবেন?

প্রাচ্যে-পশ্চিমে যে সকল মুসলমান নির্মমভাবে ধ্বংস হচ্ছে, তাদেরকে কোন নীতিমালা ও সংবিধানের আলোকে জিহাদ থেকে দূরে রাখবেন?

আমি মনে করি, এই ব্যাধি—জিহাদ বর্জন, জিহাদের কথা না বলা ও জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ না করার ব্যাধি—এই জাতির অন্যতম ব্যাধি। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে তারা কখনোই জিহাদ ব্যতীত সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি। আমাদের তো ইতিহাস থেকেই শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে।

পঞ্চম ব্যাধি : জিহাদের বাহ্যিক প্রস্তুতিগ্রহণে অবহেলা

তাতারীরা জয়লাভের যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণে সচেষ্ট ছিলো। সৈন্যবাহিনী প্রস্তুতকরণ, অস্ত্র সংগ্রহ, পরিকল্পনাগ্রহণ, ছঁক আঁকা তথা জয়লাভের যাবতীয় প্রস্তুতি তিনি গ্রহণ করতেন।

অথচ তখন মুসলমানরা অন্য উপত্যকায় বসবাস করত। এদিকে তাদের কোনো খেয়াল ছিলো না।

মুসলিম বাহিনী ছিলো অবহেলিত, তাদের প্রশিক্ষণ, অস্ত্রচালনা বিষয়ে কোনো গুরুত্বারোপ করা হতো না। মুসলমানগণ যুদ্ধের প্রস্তুতিগ্রহণে খুব অবহেলা করতো। বাহ্যত তাদের শ্রেণিবিন্যাসও ছিলো অনেকের জন্য লাঞ্ছনার। তাদের

[১৩৩] সূরা তওবা : ১২৩।
[১৩৪] সূরা তওবা : ৩৬।

উন্নতির পেছনে পর্যাপ্ত অর্থ ব্যয় করা হতো না। অথচ প্রাসাদ নির্মাণ, পার্ক-বিনোদন কেন্দ্র উন্নয়নের পেছনে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হতো। সামরিকপ্রস্তুতির খাতে সামান্য অর্থ ব্যয়িত হতো না।

যে জাতির সামরিকপ্রস্তুতি হাল এতো নাজেহাল, তার পরাজয় তো অবশ্যম্ভাবী, সময়ের ব্যাপার। মুসলিম জাতি প্রস্তুতি ব্যতিত কখনো দাঁড়াতে পারে না। বাহ্যিক প্রস্তুতি ছেড়ে দিয়ে শুধু আল্লাহর উপর ভরসা করার কোনো অর্থ হয় না। বাহ্যিক প্রস্তুতিও তাওাক্কুলের অন্তর্ভুক্ত। এটা ভালোভাবে মনে রাখার দরকার।

ষষ্ঠ ব্যাধি : মুসলমানদের নেতৃত্ব সংকট

বক্তৃতা ও উপদেশ প্রদানের চেয়ে যোগ্য নেতা কর্তৃক প্রতিপালন হাজার গুন উত্তম। সৈন্যবাহিনী যখন যোগ্য নেতাশূন্য হয়ে পড়ে, তখন অসহায়ত্ব অনুভব করতে শুরু করে।

জিহাদের জন্য হাজার বক্তৃতা প্রদান কোনো কাজে আসবে না, যদি সেনাপতি বিপদের মুখোমুখি হওয়ার সময় হার মেনে বসে।

যদি সেনাপতি রাজপ্রাসাদে ভোগবিলাসে মত্ত থাকে, নিজ বিলাসিতায় হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে, তাহলে সৈন্যবাহিনীকে ধৈর্যধারণ, অল্পেতুষ্টি ও দুনিয়াবিমুখতার হাজার উপদেশ কোনো কাজে আসবে না।

যতি নেতা নামাজ না পড়েন, যদি নেতার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্র না হয়, তবে এমন নেতা তার প্রজা সাধারণকে উত্তম চরিত্রের যতই বয়ান করুন না কেন তা সামান্য ফলপ্রসু হবে না।

জাতি কিভাবে আল্লাহর দ্বীন ও শরীয়তকে আঁকড়ে ধরবে যদি দেশপ্রধানের আমল-আখলাকের অবস্থা এমন হয়!!

যে নেতা যুদ্ধ-জিহাদ, আমল-আখলাক, ধৈর্য-সবর, ন্যায়বিচার, দুনিয়াবিমুখতা ইত্যাদি কল্যাণকর কাজে নিজে অগ্রগামী না হন, তার সৈন্যবাহিনী তাকে কিভাবে রক্ষা করবে! বিপদাপদে তো তারা নেতার সঙ্গ ছেড়ে দেবে!!

আমাদের ইতিহাস ভুলে গেলে চলবে না—ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

সপ্তম ব্যাধি : শত্রুকে মিত্র বানানো

তাতারীযুগে অধিকাংশ মুসলিম নেতা শত্রুবাহিনীকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে শুরু করেছিল। তাদের বক্তব্য ছিল, তারা মৌলিকভাবে নিজেদের ও দেশবাসীর

আত্মরক্ষা করছে। অথচ তারা শরয়ীতের দৃষ্টিতে ও যৌক্তিকভাবেও তাদের এই সিদ্ধান্ত ভুল ছিলো। তারা ভুলের শিকার ছিল। জিহাদের প্রয়োজন থাকার পরও জিহাদ থেকে দূরে প্রকাশ্য ভুল। আবার দেশবাসীকে এর মাধ্যমে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া আরেক ভুল। উপরন্তু শত্রুদের মিত্র বানানো তৃতীয় ভুল। তারা একসাথে এই তিন ভুলে নিমজ্জিত ছিল।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

"হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদের-ই একজন বলে বিবেচিত হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা জালেম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"[১৩৫]

এটি আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট ভয়াবহ হুঁশিয়ারবাণী। ওই ব্যক্তির চেয়ে অধিক নির্বোধ—বা দুর্বল ঈমানের অধিকারী—আর কে আছে, যে এই হুঁশিয়ারবাণী শোনেও এর দিকে দৃষ্টি দেয় না।

অষ্টম ব্যাধি : হতাশা ও মনোবলহীনতা

হতাশ জাতি কখনো জয়লাভ করতে পারে না। হতাশা, নিরাশা মুমিনের গুণ নয়। আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন—

وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

"তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে কেবল কাফের সম্প্রদায়ই নিরাশ হয়।"[১৩৬]

তাতারীরা আমেরিকানদের মতো কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছিল। তারা নিজেদেরকে মহান ও শক্তিশালী-সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো। আর মুসলমানদের ভীত করে রেখেছিল। তাদের মনোবল হারানোর জন্য যাবতীয় পদক্ষেপগ্রহণ করেছিল—ইতিপূর্বে তা আমরা উল্লেখ

---

[১৩৫] সূরা মায়েদা : ৫১।
[১৩৬] সূরা ইউসুফ : ৮৭।

করেছি। তারা মুসলমানদের সামনে একথা তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিল যে, মুক্তির একমাত্র পথ হলো বিনয় ও আত্মসমর্পণ।

আমরা তাতারীদের ইতিহাস সবিস্তারে পাঠ করলাম। আমরা দেখেছি কুতয রহ.-এর হাতে তাদের শোচনীয় পরাজয়। মুসলমানদের এই অভাবনীয় জয়ের মূল কারণ হলো, ইমাম কুতয রহ. মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ হতাশাকে দূর করে তাদের মাঝে আশার আলো জ্বালিয়েছিলেন। তাদের সুপ্তশক্তিকে জাগিয়ে তোলোছিলেন। তিনি তাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, তাতারীরা আল্লাহর অন্য সৃষ্টি মতো সৃষ্টিজীব। তারা আল্লাহকে পরাজিত করতে পারবেনা। সুতরাং যদি মুসলমানরা আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে তাদের সাথে পৃথিবীর কোনো শক্তি পেরে উঠবে না। চাই সে শক্তি তাতার হোক বা আমেরিকা, ইহুদী হোক বা খ্রিস্টান। শেষ জয় নিঃসন্দেহে মুসলমানদের।

মুসলমানদের এই মানসিক প্রস্তুতি ব্যতীত জয় অসম্ভব।

নবম ব্যাধি : অযোগ্যকে দায়িত্ব প্রদান

আমরা বাগদাদের প্রথম পরাজয়ে দেখেছি, কীভাবে অযোগ্যের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, কীভাবে আমানত ধ্বংস করা হয়? যেভাবে মাঝে তাকওয়াস্বল্পতা আছে, তাদের আরও আত্মিক পরিশুদ্ধতার প্রয়োজন, তাদেরকে কীভাবে রাষ্ট্রের উচ্চপদসমূহের দায়িত্ব দেওয়া হয়? আল্লহর শপথ! এটি ছিল মহাবিপদ!!

যখন ক্ষমতায় কেবল নিকটবর্তী পরিচিতজনরা যেতে পারে, যখন সুদ-ঘুষ ব্যতীত পদ পাওয়া যায় না, মুসলিম দেশসমূহে এমন পরিস্থিতি তো সত্যিই ভয়াবহ।

আপনি যখন দেখবেন, যোগ্যতার বিবেচনা ছেড়ে মানুষ কাছের মানুষকে প্রাধান্য দেয়, চাকরি-আসন-ক্ষমতা কেনা-বেচা হয়, পক্ষান্তরে যোগ্যরা পিছিয়ে পড়ে, তাদের কোনো মূল্যায়ন করা হয় না, তখন মনে রাখবেন, বিজয় অসম্ভব। এমন জাতির উন্নতি কখনো আশা করা যায়না।

তাতারীদের যুগে মুসলমানরা যেমন অধঃপতিত গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল, আজও মুসলমানরা তা-ই হতে যাচ্ছে। আজও রাষ্ট্রীয় মূল্যবান পদগুলোয় অযোগ্যরা বসে আছে। তারা নিশ্চয়ই এমন পদ্ধতিতে এখানে এসেছে, যা আল্লাহ তা'আলা পসন্দ করেন না।

যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্যস্থানে বসানো ও যোগ্যদের যোগ্যতার যথাযথ মূল্যায়ন না করা হলে সফলতা ও বিজয় অসম্ভব।

দশম ব্যাধি : পরামর্শ বর্জন

ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা অন্যতম মূলনীতি হলো মশওয়ারা বা পরাশর্ম। যে ব্যক্তি রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে পরাশর্মভিত্তিক পদক্ষেপগ্রহণ করে না, সে জাতির সম্ভাবনাকে নষ্ট করলো, আম্বিয়া আ.-এর মত ও পথবরুদ্ধ আমল করল। সে তার অনুসারী প্রজাদের অন্তরে কাপুরুষতা ঢেলে দিল। এমন নেতা একের পর এক ভুলের শিকার হবে নিঃসন্দেহে। সর্বোপরি কথা হল, সে আল্লাহর নির্দেশের খেলাফ করল। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন—

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

"[হে নবী,] কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো।"[১৩৭]

পরামর্শ বলতে এখানে প্রকৃত কার্যকরী পরামর্শকে বোঝানে হয়েছে। কেবল ভারহীন অমূল্যবান পরামর্শের কথা বোঝানো হয়নি।

এই ছিলো দশম ব্যাধি। এই দশটি ব্যাধি মুসলমানদের তাতারীদের অধীনস্থ করেছিলো। পৃথিবীর শুরু থেকে আজ অবধি মুসলমানরা যতবার পরাজিত হয়েছে, এর মূল কারণ এই দশটি। মনে রাখবেন, আমরা কখনো শত্রু শক্তিশালী বলে আর আমরা দুর্বল হিসেবে পরাজিত হয়নি। আমরা পরাজিত হয়েছি উল্লিখিত ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে।

আল্লাহর মদদলাভের উপায় ও বিজয়ের পথ

আল্লাহর মদদ লাভের উপায় খুব সহজ ও সুস্পষ্ট। তা হলো, উম্মাহর যে দশটি ব্যাধির কথা আমরা উল্লেখ করলাম, যেগুলোর যথাযথ চিকিৎসা নেওয়া। নিম্নোক্ত দশটি বিষয় অবলম্বন করলে আল্লাহর মদদ লাভ করা খুব সহজ। যথা—

১. আল্লাহর দিকে পূর্ণাঙ্গ প্রত্যাবর্তন করা।
২. মুসলমানদের ঐক্য গঠন।
৩. দুনিয়াবিমুখতা, বিলাসিতা বর্জন ও জান্নাতের প্রতি ঈমান।

---

[১৩৭] সূরা আল ইমরান : ১৫৯।

৪. জাতিকে জিহাদ ও মউত ফি সাবিলিল্লাহর প্রতি উদ্বুদ্ধ করা।

৫. জিহাদের বৈষয়িক প্রস্তুতি যথা, অস্ত্র সরবরাহ, অর্থনৈতিক প্রস্তুতি ইত্যাদি গ্রহণ করা।

৬. যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি করা।

৭. শত্রুকে পরোয়া না করা। শত্রু ও মিত্রের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করা।

৮. মুসলিম উম্মাহর মাঝে আশার প্রাণ সঞ্চালন করা। তাদের হতাশা ও মনোবলহীনতা দূর করা।

৯. যোগ্যকে দায়িত্ব প্রদান করা। যোগ্যতার পরিচয় হলো আমানতদারিতা ও শক্তিশালী হওয়া।

১০. যথাযথ পরামর্শ গ্রহণ, যার মাধ্যমে সর্বোত্তম মতামত গ্রহণ করা হয়।

আল্লাহর দরবারে সবিনয় ফরিয়াদ, তিনি যেনো আমাদের গোটা জীবন তার পথে ব্যয় করার তৌফিক দান করেন। আমাদের যাবতীয় কথা-বার্তা কাজ-কর্মকে সাহাবায়ে কেরামের কথা-বার্তা কাজ-কর্মের অনুরূপ বানান। তাদের মতো যেনো বলার তৌফিক দেন—

نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما بقينا أبداً

"আমরা সেইসব লোক, যারা মুহাম্মদের হাতে মৃত্যু পর্যন্ত জিহাদ করার বায়াত গ্রহণ করেছি।"

—আমীন ॥

স মা প্ত

গ্রন্থপঞ্জি

১. কুরআনুল কারীম।
২. একাধিক তাফসীরগ্রন্থ।
৩. হাদীসের মূল গ্রন্থাদি।
৪. হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ।
৫. *আল কামিল ফিত তারীখ* : ইবনুল আছীর জাযারী রহ.।
৬. *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ইবনে কাছীর রহ.।
৭. *তারীখুল খুলাফা* : হাফেজ সুয়ূতী রহ.।
৮. *তারীখুল আইয়ূবিয়ীন ফি মিশর ওয়া বিলাদিশ শাম* : ড. মুহাম্মদ সুহাইল তকুশ।
৯. *তারীখুল মামালিক ফি মিশর ওয়া বিলাদিশ শাম* : ড. মুহাম্মদ সুহাইল তকুশ।
১০. *সুলতান সাইফুদ্দীন কুতয রহ.* : ড. কাসেম আবদুহু কাসেম।
১১. *আল মুজাফফার কুতয ওয়া মারিফাতু আইনে জালুত* : বিসাম আসালী।
১২. *আন নুজুমুয যাহেরা ফি মুলুকি মিশর ওয়াল কাহেরা* : ইবনে তাগরী বারদী।
১৩. *আত তারীখুল ইসলাম* : মাহমুদ শাকের।
১৪. *আতলাসুত তারীখিল আরাবিল ইসলামী* : ড. শুকী আবু খলীল।
১৫. *আতলাসুদ দুআলিলি আলামিল ইসলামী* : ড. শুকী আবু খলীল।
১৬. *আতলাসুল ওয়াতনিল আরবি ওয়াল আলম* : দারুশ শারজিল আরবি।
১৭. *তারীখে ইবনে খালদুন* : আবদুর রহমান ইবনে খালদুন।
১৮. *মিন রাওয়াইসী হাজারাতিনা* : ড. মুস্তফা সিবায়ী।
১৯. *মাওয়াকিফু হাসিমা ফি তারিখিল ইসলাম* : ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আনান।

আমাদের প্রকাশিত বাংলা বইসমূহ

ক্র:	বইয়ের নাম	মূল্য
০১	**স্পেনের কান্না** মূল : মুফতী তকী উসমানী অনুবাদ : কাজী মুহাম্মদ হানীফ	৯০
০২	**মনীষীদের স্মৃতিকথা** মূল : মুফতী তকী উসমানী অনুবাদ : আবদুল্লাহ আল ফারুক	১৮০
০৩	**গীবত ও পরনিন্দা** মূল : মুফতী তকী উসমানী অনুবাদ : আবদুল্লাহ আল ফারুক	৫৫
০৪	**অনিবার্য মৃত্যুর ডাক** মূল : শায়খ যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী অনুবাদ : আবদুল্লাহ আল ফারুক	১০০
০৫	**আপনার দু'আ কি কবুল হচ্ছে না** মূল : শায়খ যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী অনুবাদ :	৫৫
০৬	**শাশ্বত ঈমানের পরিচয়** মূল : শায়খ যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী অনুবাদ :	৫৫
০৭	**সনাতন হিন্দুধর্ম ও ইসলাম** মূল : ওবায়েদুল্লাহ মালির কোটলায়ি অনুবাদ : আবদুল্লাহ আল ফারুক	১২০
০৮	**ফিকাহ্ সংকলন : প্রাসঙ্গিক কিছু কথা** মূল : সাইয়্যেদ আবুল হাসান নদভী অনুবাদ : আবদুল্লাহ আল ফারুক	৮০

ছোটদের জন্য
আমাদের কিছু বই

ক্রম	বই	মূল্য
১৯	**এসো আল কোরআনের গল্প শুনি** আহমদ বাহজাত অনুবাদ : আবদুল্লাহ্ আল ফারুক	২৫
২০	**গল্প শুনি হাদিস শিখি** সামাহ্ কামেল অনুবাদ : আবদুল্লাহ্ আল ফারুক	৪৫
২১	**সীরাতের ছায়াতলে** আবদুত তাওয়াব ইউসুফ অনুবাদ : আবদুল্লাহ্ আল ফারুক	৬০
২২	**আল আসমাউল হুসনা** মহান আল্লাহর ৯৯ টি নাম ও গল্প-কথায় হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা মূল : সামীর হালবী,আহমদ তাম্মাম,সালামাহ্ মুহাম্মদ অনুবাদ : আবদুল্লাহ্ আল ফারুক ও আশেক মাহমুদ	১৩০
২৩	**সোনামনিদের জন্য কিছু দোয়া কিছু আদব** ওমায়ের লুতফুর রহমান	৩৫
২৪	**গল্পে আঁকা সীরাত** ইয়াহইয়া ইউসূফ নদভী	প্রকাশিতব্য
২৫	**জীবন গড়ার গল্প** ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী	প্রকাশিতব্য

আমাদের প্রকাশিত আরবি কিতাব

মূল্য	লেখকের নাম	কিতাবের নাম	ক্র.
350	عبد الفتاح ابو غده	صفحات من صبر العلماء	1
350	عبد الفتاح ابو غده	العلماء العزاب	2
20	عبد الفتاح ابو غدة	مسئلة خلق القران	3
350	محمد عوامة	معالم إرشادية	4
80	محى ا لدين عوامة	من صحاح الاحاديث القصار	5
380	الامام حافظ ابى عمر يوسف بن عبد البر الاندلسي	الانتقاء في فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء	6
		الخيرات الحسان	7
50	جلال الدين السيوطى	تبييض الصحيفة في مناقب الإمام أبي حنيفة	8
35	محمد رشاد منصور شمس	المدخل إلى المذهب الحنفى	9
150	على الطنطاوى	هتاف المجد	10
150	على الطنطاوى	مع الناس	11
150	على الطنطاوى	قصص من الحياة	12
300	على الطنطاوى	رجال من التاريخ	13
15	على الطنطاوى	إلى الطلاب	14
40	على الطنطاوى	رسائل على الطنطاوى	15
220	ابراهيم مصباح الألعى	روائع الطنطاوى روائع من ادبه وقواعد من كتبه	16

350	صالح احمد الشامى	من معين الشمائل	17
800	مجد الدين ابن الاثير الجزرى	النهايه في غريب الحديت والاثر	18
60	شاه ولى الله الدهلوى	الانصاف فى أسباب الاختلاف	19
	مصطفى السباعى	الاستشراق والمستشرقون	20
350	شمس الدين الذهبى	الموقظة فى علم مصطلح الحديث	21
400	زاهد الكوثرى	من تراث الكوثرى (رسالة زاهد بن الحسان الكوثرى)	22
150	عبد المالك بن عبد القادر المؤقر	كشف الموضوعات والمشتهرات	23
20	سمير حلبى	بلال ابن رباح مؤذن الرسول	24
1000	عبد الله الخطيب التبريزى رحــ	مشكوة المصابيح مع حاشية السهارنفورى ١-٢ Computer	25
320		المعجم الوسيط في الإعراب	26

অনুবাদক

মাওলানা আবদুল আলীম
জন্ম : ০২.১০.১৯৮৮ ঈ.
পিতা : জনাব মোকছেদ আলী (মাস্টার)
পেশা : শিক্ষকতা

অসামান্য মেধাবী ঈর্ষণীয় প্রতিভার অধিকারী তরুণ আলেম। ১৯৮৮ সালে দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ থানার চাউলিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ছোট বেলা থেকেই প্রখর মেধার অধিকারী। যার স্বাক্ষর রাখেন বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ (কওমী মাদরাসা) শিক্ষা বোর্ডে নাহবেমীর জামাতে মেধা তালিকায় ১০ম স্থান, শরহে বেকায়া জামাতে ২য় স্থান, মেশকাত ও দাওরা হাদীসে মুমতাজ বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে। তাঁর শিক্ষাজীবনে অধিকাংশ সময় জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ ও জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া তেজগাও-এ অতিবাহিত হয়। দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করেন [২০১২-১৩ ইং শিক্ষাবর্ষ] বাংলাদেশে অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া ইদারাতুল উলূম, আফতাবনগর, ঢাকা থেকে। সেখান থেকেই 'আদ দা'ওয়াল ওয়াল ইরশাদ' বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা কোর্স সম্পন্ন করেন এবং কর্মজীবনের সূচনা থেকেই ইদারাতুল উলূমের মুহাদ্দিস পদে নিয়োজিত হন। তাছাড়াও তিনি ইদারার দেয়ালিকা ও স্মারক সম্পাদনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। ছাত্রজীবনেই সাহিত্য চর্চা শুরু। বিভিন্ন সাহিত্য সভায় অংশগ্রহণ এবং দেয়ালিকা ও সাহিত্য সাময়িকীতে লিখতে লিখতে তার সাহিত্য প্রতিভা বিকশিত হয়। ইতিমধ্যেই তিনি বেশ কয়েকটি বইয়ের সফল অনুবাদ করেছেন।

অনূদিত বই— (প্রকাশিত)

১. তাতারীদের ইতিহাস
২. কিছু গল্প কিছু শিক্ষা
৩. জ্ঞান সাধানায় উলামায়ে
কেরামের ত্যাগ ও কুরবানী
৪. গুনাহমুক্ত জীবন
৫. ইখলাস ও তাওবা
৬. ইবাদতের তাৎপর্য ও ফযীলত

সম্পাদিত বই— (প্রকাশিত)

১. সীরাতে রাসূলে আ'জম
২. আমরা যাদের উত্তরসূরী-১
৩. আমরা যাদের উত্তরসূরী-২

এ ছাড়াও তার অনূদিত আরো কয়েকটি বই শীঘ্রই আলোর মুখ দেখবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা তাকে তাঁর বরিত কলম সৈনিকদের কাতারে ঠাঁই দিন। আমীন॥

তাতারীদের ইতিহাস গ্রন্থটি ষষ্ঠ শতাব্দীর মুসলিম সাম্রাজ্যের উপর ধেয়ে আসা তাতারী আগ্রাসনের ইতিহাস নিয়ে রচিত একটি অনবদ্য গ্রন্থ। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ড. রাগেব সারাজানীর অনন্য সৃষ্টি এই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয় বর্বর তাতারীদের ঘৃণ্য জঘন্য ইতিহাস। লেখক প্রতিষ্ঠিত সত্যের পাটাতনে দাঁড়িয়ে বলে গেছেন ইতিহাসের দাস্তান। সেই সঙ্গে ইসলামের শাশ্বত বিশ্বাস বরিত চরিত্র এবং মুসলমানদের রক্তে নির্মিত ঐতিহ্য ও আদর্শের প্রতি যত্নবান থেকেছেন পূর্ণ সতর্কতায়। লেখকের গদ্য বড় অদ্ভুত সুন্দর। সহজ। সুখপাঠ্য। শক্তিমান ও প্রাঞ্জল। আরবী আধুনিক এবং বর্ণনাভঙ্গি ঋজু। ইতিহাসের গ্রন্থ বলে শব্দ ব্যবহারে ভাষা প্রাচুর্যও লক্ষণীয়। সবমিলিয়ে *'তাতারীদের ইতিহাস'* একটি বর্ণাঢ্য রচনা।

বর্ণনার ধারাবাহিকতা, তথ্যের সহজ উপস্থাপন, কাহিনীর বিন্যাস, ঘটনা চয়নের- নিপুণতা, ইতিহাসের চুলচেরা বিশ্লেষণ ইত্যাদির মাধ্যমে ইতিহাসের একঘেয়ে ও জটিল আবহ থেকে পাঠককে বের করে নিয়ে এমন এক অদ্ভুত উপলব্ধির জগত নির্মাণ করেন, এখান থেকে বের হতে সময় লাগে। লেখক ইতিহাসের নির্মোহ কথকের মতো শুধু ঘটনা-ঘনঘটার বয়ান দিয়ে যান নি; তিনি জায়গায় জায়গায় বিরতি নিয়েছেন, ঘটনার কারণ বিশ্লেষণ করেছেন, আহাজারি করেছেন, বর্তমানকে অতীতের সাথে মিলিয়ে দেখিয়েছেন। বারবার বলেছেন— ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হয়। তাতারীদের আমরা অতীতের অচেনা কোন ভূমিতে রেখে আসিনি। তাতারদের পেছনে রেখে আসা যায় না। ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য, সত্যিকার অর্থে তাবৎ পৃথিবীর জন্যে এরা সার্বজনীন, সর্বকালের। লেখক তিরস্কার আর মমতার ছুরি দিয়ে আমাদের চেতনা ও অনুভূতিকে তুমুল আঘাতে রক্তাক্ত করতে চেয়েছেন। বলতে চেয়েছেন— উত্থান পতনই এই পৃথিবীর জীবনছন্দ এবং যুদ্ধে পরাজয় কোনো বীরের জন্যে সাময়িক অপমান হতে পারে; আবার সেটাই হতে পারে তার জাতির জন্যে বিজয়ের পাঠ ও পাঠশালা। এ কারণেই আমাদের পূর্বসূরী মনীষীগণ শত্রুর কয়েদখানায় বসেও জিহাদের দাস্তান লিখতে ভুলেন নি। কয়লার কালিতে কাফনের কাপড়ে ইতিহাস লেখার ইতিহাস তো আমাদেরই। সে হিসেবে তাতারীদের কাহিনী আমাদের তরুণদের দৃষ্টির আড়ালেই রয়ে গেছে। এটি আমাদের আলোচনায় আসা একান্ত দরকার। 'আইনে জালূত' আমাদের বিজয়ের মাঠ। 'ইমাম কুতয' আমাদের নায়ক নন; মহা নায়ক। আমাদের আদর্শ ও চেতনার অমর তেজস্বী শিক্ষক। তার 'মান লিল ইসলাম ইন লাম নাকুন নাহনু'-র আওয়াজ আজো বাতাসে ভাসে। অথচ আমরা তাকে চিনিই না! তাতার আমাদের মুসলমানদের জন্য সবসময়ই প্রাসঙ্গিক। বর্তমান সময়ে আরো বেশি প্রাসঙ্গিক। দোয়া করি এটি আমাদের তরুণদের হাতে হাতে উঠে আসুক।

– যাইনুল আবিদীন